লেখকের লেখক

দস্তয়েফস্কি

[illegible] প্রকাশ ভবন

১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

মূল্য—২০ টাকা

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
দুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
১১ তারক প্রমাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ :
শিল্পী গৌতম রায়

প্রচ্ছদ প্রতিকৃতি :
রুশী ভাস্কর স. কনেন্‌কভ্‌

কুমারী মন্দিরা রায়

কল্যাণীয়াসু—

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস :

পলিমাটি লোনা জল
যে তাপে রঙ বদলায়
ক্রীতদাস
মৌরিগ্রামের মেয়ে
একবৃত্ত অন্য বলয় (২য় সং)
শান্তনু (২য় সং)
সুজাতার স্বপ্ন (২য় সং)

প্রবন্ধ :

ভালবাসা ও বিবাহ
নারী ও সমাজ

জীবনী :

বালজাক

কিশোর উপন্যাস :

বাহাদুর
কিশোর-সম্ভব
ভুতুড়ে বিমান

উনিশ শতকের পৃথিবীতে অনেক মনীষীর জন্ম হয়েছে। তাঁদের কারোর জীবনেই দুঃখ কষ্ট কম ছিল না; কিন্তু জীবন-যন্ত্রণার প্রচণ্ড দাহে দস্তয়েভ্‌স্কির মতন এমন নির্মম ভাবে পোড়েন নি কেউ। যৌবনে পা দিতেই শুরু হয় জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা। খ্যাতির শিরোপা পরিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার তা কেড়ে নেন নিষ্ঠুর নিয়তি। রাজদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃত্যুমঞ্চ থেকে নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ার তুষার-শীতল মৃত্যু-পুরীতে। নির্বাসনের শেষ বছর কাটান সৈনিক-জীবনের কঠোর শাসনে। শোনেন নিষিদ্ধ প্রেমের ডাক। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন দেহের ক্ষুধায় আর হৃদয়ের পিপাসায়। সর্বনাশের নেশায় মেতে ওঠেন। জুয়াখেলায় বার বার নিঃস্ব হয়ে ঋণের পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে যান। কখনো অস্বীকার করেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, কখনো তাঁকে নতজানু হয়ে মেনে নেন।

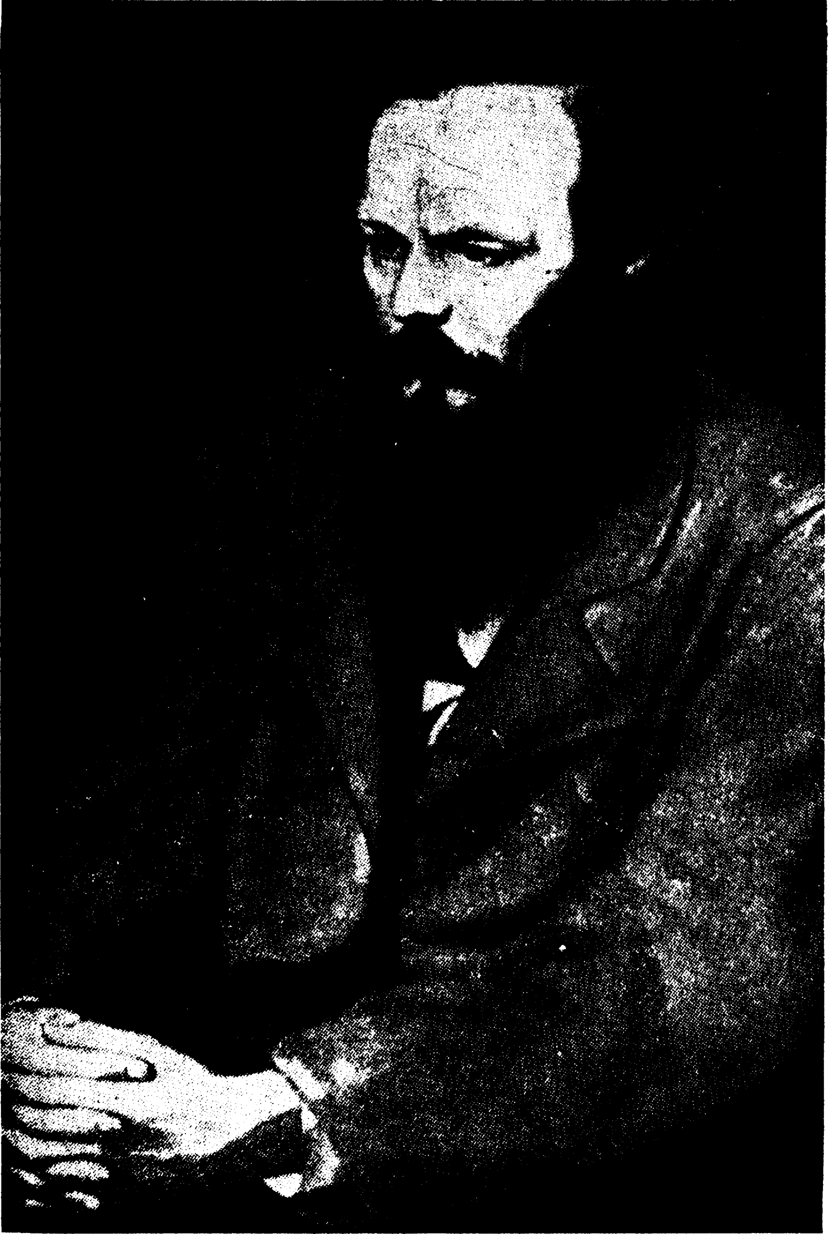
অসীম প্রাণ-শক্তি, তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভাধর এই মনীষীর জীবন যেন ভাগ করে দখল করে নিয়েছিল দেবতা আর শয়তান। কখনো শরণাগত কখনো বিদ্রোহী এই মানুষটি পাপ ও পবিত্রতার দুই মেরুতে ঘড়ির দোলকের মতন অহর্নিশ দুলেছেন। ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সত্তা শুদ্ধ জ্বলতে থেকেছে তাঁর। আর সে আগুনের দীপ্ত আলোতে শিল্পী-মানসের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে মানব-জীবনের অন্তর্লীন নিগূঢ় রহস্য।

রাশিয়ার প্রফেট, বিশ্বের প্রিয় কথাশিল্পী এই অমর মানুষটির বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, নাটকের চেয়েও সংঘাতময়—এ ফিলসফি ইন ফ্লেশ।

সূচীপত্র

দস্তয়েফ্‌স্কি ফিওদর মিখাইলোভিচ

প্রথম পর্ব



শিল্পী ভি, পেরভ অঙ্কিত ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েফস্কির প্রতিকৃতি (১৮৭২)। দস্তয়েফস্কিকে সামনে বসিয়ে আঁকা এই ছবিটি লেখকের বিভিন্ন প্রতিকৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত।

'প্রফেট', 'প্রফেট'

সভাগৃহ মুখর করে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠেছে—'প্রফেট,' 'প্রফেট'।

পুসকিনের মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে মস্কোআর উৎসব-সভায় দস্তয়েফ্‌স্কির ঐতিহাসিক বক্তৃতা শেষ হলে সভায় সমবেত বিদগ্ধজন কলারসিক ও বুদ্ধিজীবী মানুষ 'প্রফেট', 'প্রফেট' ধ্বনি তুলে তাঁকে প্রাণের প্রণাম জানিয়েছিলেন। স্বতোৎসারিত সে উচ্ছ্বাসের ধ্বনি শুধু সে সভাগৃহেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পাইন-অরণ্য আর তুষার স্তূপ পেরিয়ে রাশিয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নতশির সমস্ত রাশিয়া তার পরম শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দিয়েছিল : পুসকিন যদি রাশিয়ার ঈশ্বর, দস্তয়েফ্‌স্কি পরম-পুরুষ।

রাশিয়ার এহেন প্রাণের মানুষটিকে তার মৃত্যুর পরে তুরগেনিয়েফ্‌ বলেছিলেন, 'দ্য সাদ্‌ অব রাশিয়া'। যৌনবিকারের জন্যে কুখ্যাত ওই ফরাসী-চরিত্রের সবটুকু কলঙ্ক ওই কথা বলে দস্তয়েফ্‌স্কির গায়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন একলা মানুষ তুরগেনিয়েফ্‌। সমকালের ও সমবয়সী অন্যতম সেরা লেখক তুরগেনিয়েফ্‌ সহযাত্রীর প্রতি অতিরিক্ত ঈর্ষায় কি আক্রোশে কলঙ্কের কালি একটু বেশীই হয়ত মাখিয়ে দিয়েছিলেন; সে কালিতে হাত লাগাতে তখন বা পরে আর কেউ বড় একটা আগ বাড়িয়ে আসেন নি, তাই বলে কি উক্তিটা সর্বৈব মিথ্যে? না। আসলে সমগ্র রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার অভিনন্দন যেমন সত্য, তেমনি তারপরে, একলা বললেও তুরগেনিয়েফ্‌-এর উক্তিও একেবারে মিথ্যে নয়। বস্তুত দস্তয়েফ্‌স্কি ছিলেন দ্বিখণ্ডিত সত্তার মানুষ; তাঁর একটি সত্তা যেমন ছিল 'প্রফেট' আর একটি সত্তা তেমনি ছিল 'দ্য সাদ' বা 'ইভিল'। এবং

রুশ নাম-এ যেখানে য়ে আছে সেখানে উচ্চারণ হবে ইএ।

এই উভয় সত্তাই ছিল তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্রখর। এই দুই প্রখর ও প্রবল সত্তা—গুড এবং ইভিল-এর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে সারাজীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আর সেই ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবনে শান্তি খুঁজতে শিল্পের শরণাগত হয়ে অবশেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন—তাঁর সিদ্ধান্ত…good and evil are one. Evil is merely the wrong choice at the moment of truth. এই 'ট্রুথ্‌'-এর সন্ধানই ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির ষাট বছরের জীবন-পরিক্রমা।

কালের পথে দস্তয়েফ্‌স্কির এই কালবিজয়ী গতির ধারা সম্যক ধারণায় আনতে হলে তাঁর জীবনের উৎস থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। সেই ১৮২১ থেকে।

১৮২১-এর ৩০ অক্টোবর মসকোআর মারিনস্কায়া দাতব্য হাসপাতালে ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েফ্‌স্কির জন্ম। জায়গাটা শহরতলি। আর সেদিনের শহরতলি মানেই দুর্গন্ধ নোংরা আর কাদা, তার মধ্যে সারি সারি বস্তি। বস্তির খোপে খোপে দরিদ্র ও অবহেলিত অভাজনদের বাস। দাতব্য হাসপাতালটাও তাদের জন্যে। বাবা মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ দস্তয়েফ্‌স্কি তখন ওই হাসপাতালেরই একজন স্টাফ ডাক্তার।

অথচ ডাক্তার নয়, তাঁর হওয়ার কথা ছিল একজন পুরোহিত। বাবা পুরোহিত। জ্যাঠা পুরোহিত। বংশের সবাইর ওই এক পেশা। ছেলে পুরোহিত হবে না ত কী হবে?

অবশ্য মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ-এর বাবা পুরোহিত বলে গর্ব করলেও ইতিহাস বলে, মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ-এর বাবার বাবা না হোক তাঁদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ পুরোহিত ত নয়ই ভদ্রলোকও ছিল না। ছিল দস্যু। তাতার দস্যু। ষোড়শ শতক অব্দি পশ্চিম রাশিয়ার পিনস্ক মারশেস-এর ছোট্ট গ্রাম দস্তয়েভোর এই মানুষেরা লুঠতরাজ, রাহাজানি, খুন-খারাবি করে বেড়াত। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে তাদেরই একটি পরিবার পৃথক হয়ে এসে য়ুক্রেনে বসতি স্থাপন করে। দস্তয়েভো থেকে এসেছে বলে এ পরিবারটিকে স্থানীয় লোকেরা দস্তয়েফ্‌স্কি বলে ডাকত। সে থেকে এ পরিবারের পদবী দস্তয়েফ্‌স্কি। সেই থেকে তাদের ধমনীতে বইতে শুরু করেছে পোলিশ-লিথুয়ানিয়ান মিশ্র রক্ত। জীবনযাপনের ধারাও পালটে গেছে। তখন আর তারা দস্যু নয়। পৌরোহিত্য তাদের পেশা। সেই পেশায় শিক্ষিত করে তুলতে মিখাইলের বাবা তাঁকে চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করে দেন।

সে-যুগের চতুষ্পাঠীগুলিতে বেতই ছিল সরস্বতীর বাহন। আর মাস্টার মশাইরা পড়ানোর চাইতে বেত মারতেই বেশী উৎসাহী ছিলেন। এ-উৎসাহ শুধু মাস্টার মশাইদের ছিল না, বাড়ির অভিভাবকরাও সে বিষয়ে ভীষণ দড় ছিলেন। মিখাইলের বাবা-মাও তার কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু মিখাইল ছিলেন সাংঘাতিক রাগী ছেলে। পরিবারের আর পাঁচটা ছেলের মতন নিত্য মার খাওয়া তাঁর ধাতে সইল না। তিনি বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে জন্মের মতন চলে এলেন য়ুক্রেন থেকে মসকোআতে। পুরোহিত নয়, ডাক্তার হবেন এই পণ করে ভর্তি হলেন তখনকার দিনের একমাত্র চিকিৎসা-বিদ্যালয় মেডিকোসার্জিক্যাল অ্যাকাডেমিতে। সেটা ১৮০৯ সাল, বয়স তখন মাত্র কুড়ি। তার পরে অনেক বছর গেছে, বিয়ে করেছেন, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তারাও বড় হয়েছে এবং স্বাভাবিক কৌতূহলে ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার গল্প তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটির খবর জানতে চেয়েছে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ সে সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করেন নি। শিশু কিশোরদের কাছে পূর্বপুরুষের খবর কবর দিয়ে রেখেছেন, এমনই রাগ ছিল তাঁদের ওপরে তাঁর।

ভাই-বোনদের মধ্যে ফিওদরই ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, বাবার সঙ্গে ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার এমন সাংঘাতিক ঝগড়া হয়েছে যে তিনি আর তাঁদের মুখ দেখা দূরে থাক, নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন। এই বিশ্বাস ফিওদরকে খুব পীড়িত করত। তাঁর কেবল ইচ্ছে করত ঝগড়া মিটে যাক; কিন্তু মিটে যেত না বলে, বাবা মুখ খুলতেন না দেখে, তিনি আরও পীড়িত হতেন। খব বেশী বয়সেও পূর্বপুরুষ সম্পর্কে এ কৌতূহল ও ঝগড়া মিটানোর ব্যাকুলতা দস্তয়েফ্‌স্কির মনে সুপ্ত ছিল। বাবাকে তিনি কখনো কখনো স্বপ্নে দেখতেন। অবশ্য যখনই তাঁকে স্বপ্নে দেখতেন তাঁর কোন না কোন বিপদ ঘটত। তিনি যেন সর্বনাশের সংবাদ দিতেই স্বপ্নে দেখা দিতেন। দস্তয়েফ্‌স্কির মৃত্যুর ন'বছর আগে তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর বাবাকে—অনেক মানুষের মধ্যে বসে আছেন তাঁর বাবা, যেন তাঁদের কেউ তাঁর ঠাকুর্দা ঠাকুমা কি পরিবারের আত্মীয়স্বজন। তাঁদের মধ্যে বসে বাবা খুব খুশী, তাঁর চোখে ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় পূর্বপুরুষ সম্পর্কে দস্তয়েফ্‌স্কির কৌতূহল শেষ বয়স অব্দি কি তীব্র ছিল।

অবশ্য বাবা যেমন পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি, তেমনি জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর বাবা সম্পর্কে অত্যন্ত স্বল্পবাক ছিলেন। জেদী

পিতার জেদী ছেলেরও বাবার প্রতি রোষ অসন্তোষ কম ছিল না। যদিও শেষ বয়সে পিতার বিবিধ গুণের প্রতি ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি—বাবাকে বলেছেন তাঁর কালের সব থেকে প্রগতিশীল মানুষ। 'তখন ১৮৭৪ কি ৭৫', ছোট ভাই আন্দ্রেই তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'বাবা সম্পর্কে দাদার ওই উদার মন্তব্য শুনে বলেছিলাম, দাদা তুমি কি আমাদের ছোটবেলার কথা ভুলে .গছ ? দাদা শুনে অমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। হাত বাড়িয়ে আমার ডানা চেপে ধরেছেন তিনি। ওই তাঁর এক স্বভাব ছিল, হৃদয়ঘটিত কোন প্রসঙ্গ উঠলে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন আর আবেগে হাত বাড়িয়ে হাত কাঁধ চেপে ধরতেন। আমার হাতের ডানা চেপে ধরে বললেন, বাবাকে তুমি প্রগতিশীল মানুষ মনে কর না ?

'বাবা বেঁচে থাকলে আজও তিনি প্রগতিশীলই থাকতেন। তোমার মনে নেই, কী ভীষণ ভালবাসতেন তিনি আমাদের ? অমন ক্রোধী মানুষ তবু কখনো আমাদের গায়ে হাত তোলেন নি। অথচ শুধু এই রাশিয়ায় কেন ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও সেদিন ছেলেমেয়েদের শায়েস্তা রাখতে বেতকেই মনে করা হত সেরা ওষুধ। বল ? সে যুগের মানুষের পক্ষে বাবা কি দুর্লভ নয় ? দেখো, আমরা কোনদিনই বাবার মতন হতে পারব না আমাদের ছেলেমেয়েদের চোখে।' ১৮৭৬-এর মার্চে আমাকে দাদা আর একবার প্রসঙ্গত লিখেছিলেন, 'আমাদের শিক্ষিত ও মার্জিত করার জন্যে মা, বাবার আগ্রহের অবধি ছিল না। হতে পারে তাঁদের অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল কিন্তু সন্তানের মঙ্গল কামনায় কোথাও তাঁদের খাদ ছিল না। বাবা কঠিন পরিশ্রমের আয়েও সব দিক কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। তবু তারই মধ্যে খরচ বাঁচিয়ে কিছু কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করার অভ্যাস ছিল ; তাই বলে কখনো আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে কৃপণতা করেন নি।'

পিতা সম্পর্কে এমন মর্যাদার উক্তি দস্তয়েফ্স্কি আর কখনো করেন নি। অধিকন্তু ১৮৪৮ থেকে তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি বরং পিতার প্রতি তাঁর ক্ষোভ অসন্তোষটাই বেশী করে প্রকাশ করেছেন, তাঁর দোষঘাটগুলিকেই খুলে মেলে ধরেছেন বারবার। তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস 'নেতোচকা নেজভানোভা'-র ফিওদর ফেরাপোন্তভিচ ত বস্তুত তাঁর পিতারই চরিত্র :

'মানুষটি যে আসলে মন্দ তা না,' ফেরাপোন্তভিচ-এর বর্ণনা দিচ্ছেন দস্তয়েফ্স্কি, 'হয় ত ক্রোধ ক্ষোভই মানুষটিকে ওই রকম করেছিল। কেউ হয়ত তার মনকে আহত করে থাকবে, সে হয়ত কাউকে তার গোপন শত্রু ভেবে

বসে আছে কি কারো কদর্য ব্যবহারে আচরণে বিরক্ত বিচলিত হয়েছে খুব, আর সে-ঝাল ঝাড়ছে তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ওপর। সে ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে মারত কিংবা স্ত্রীকে গালমন্দ করত তা নয় কিন্তু এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি মুখ করে থাকত যে ছেলেমেয়েরা এমন কি নিরীহ বউটিও ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত তার কাছে। অসন্তোষ যেদিন তার মনটাকে বেশী ক্ষিপ্ত করে তুলত, সে-দিন সে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করত। অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে গালমন্দ করত। সে যে দেশের জন্যে কত কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছে, জাতির সেবার জন্যে কতখানি রক্ত জল করেছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ সংশয় জেনেও কেমন যত্নে আহতের চিকিৎসা করেছে তার ফিরিস্তি দিত আর পরম ক্ষোভে বলত বিনিময়ে কি পেয়েছে, না শত্রুতা। সবাই শত্রু হয়ে উঠেছে তার।··· বলতে বলতে কখনো কখনো সে কেঁদে ফেলত। কিন্তু কান্নার জল পরক্ষণে ক্রোধের উত্তাপে শুকিয়ে যেত। তখন ড্রেসিং গাউনটা টান মেরে খুলে নগ্ন ছাতি মেলে ধরে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বলত, মার, এই বুকে মার আমায়। অথবা ছেলেমেয়েদের সম্বোধন করে বলত—কী দিয়েছে আমাকে দেশ, কী করেছে তারা আমার জন্যে, এত যে কঠিন সেবা, এত যে কঠোর পরিশ্রম করলাম, কী পেলাম তার বদলে।···ইত্যাদি বলতে বলতে ফেরাপোন্তভিচ তার সব জ্বালা সব ঘৃণা সব তিক্ততা উজাড় করে দিয়ে বাড়ির আবহাওয়া ঘুলিয়ে তুলত। পরিবারের শান্তি পরিবারের পবিত্রতার প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকত না।'

শুধু 'নেতোচকা নেজভানোভা'-তে না, 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'-তেও। পিতার কারামাজোভও তাঁর পিতার চরিত্রের উপাদান থেকেই তৈরি। বস্তুত যেখানেই দস্তয়েফ্স্কি পিতার চরিত্র আঁকতে চেয়েছেন তাঁর নিজের পিতাই ছদ্মবেশে এসে হাজির হয়েছে। না শুধু তাঁর স্বষ্ট পিতার চরিত্রেই না, তাঁর নিজের চরিত্রেও পিতার স্বভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। পয়সার অভাব, শূন্য পকেট হওয়ার ভয় বাবার মতন তাঁরও অনুক্ষণের সঙ্গী ছিল। কিন্তু পিতার মতন ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না তিনি। এখানে পিতার চরিত্র উলটো হয়ে উপস্থিত ছিল। দস্তয়েফ্স্কি ছিলেন ভীষণ অমিতব্যয়ী, আয়-ব্যয়ের কোন হিসেব-নিকেশ করেন নি তিনি কোনদিন। যেমন অনায়াসে দান ও খরচ করতেন, তেমন অনায়াসেই আবার ঋণ করতেন তিনি। আর বাবার মতনই সম্পদ ও সম্মানের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর বিমর্ষতা, নিঃসঙ্গতা, আচরণে রূঢ়তা সবই বাবার কাছ থেকে পাওয়া। বাপ ছেলে দুইজনেই ছিলেন খিটখিটে, হঠকারী, আর সংকীর্ণ মনের মানুষ।

ঈর্ষায় আর তিক্ততায় দু'জনেই সারা জীবন ভুগেছেন। দু'জনের মধ্যেই উচ্চাশা আর স্বার্থপরতা ছিল। দু'জনেই তা সযত্নে নিজের মনে গোপন করে রাখতেন।

ডাক্তার দস্তয়েফ্‌স্কির জীবন মূলত ছিল নিঃসঙ্গ। তাঁর নিজের কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। আপনজন বলতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই আসা যাওয়া করত। তাদের সঙ্গে কোন হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না তাঁর। তাছাড়া স্ত্রীর কোন কোন আত্মীয় ছিলেন ধনী, তাঁদের সেই সম্পদ সম্মান ডাক্তারকে হীনমন্য ও অসন্তুষ্ট করে রাখত সব সময়। আহত-সম্ভ্রম মানুষটি ওই সব ব্যাপার নিয়ে অসুখী থেকে থেকে শেষমেশ স্নায়ু-বিকারের রোগী হয়ে উঠেছিলেন।

আর দস্তয়েফ্‌স্কির মা এই বদমেজাজী মানুষটির সঙ্গে ঘর করতে করতে ক্রমশ শরীরের রস লাবণ্য হারিয়ে হয়ে উঠেছিলেন যক্ষ্মা রোগী। অবশ্য এ নারী প্রভুত্ববিলাসী স্বামীর সব শাসনই মুখ বুজে সহ্য করতেন, তাঁর সমস্ত অনুযোগ অভিযোগই মাথা নিচু করে মেনে নিতেন তা নয়। অনেক জীবনীকার যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি বরং তার বিপরীতই ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাবত প্রফুল্ল ও বুদ্ধিমতী। গৃহিণীপনাতেও তাঁর নিপুণতা গৃহস্থালীকে সুন্দর করে রেখেছিল। স্বামীকে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় চেষ্টা সত্বেও তিনি তাঁর প্রভুত্বের প্রতি প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আন্তরিক ছিলেন। তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না, নানা আঘাতে সংঘাতে সে ভালবাসা বরং আরও শরণাগত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। স্বামীকে লেখা তাঁর পত্রগুলি যেমন আন্তরিক তেমনি ভক্তিপূর্ণ। তাঁর পত্র রচনার মধ্যে গ্রামীণ সারল্যের সঙ্গে কবিতার রমণীয়তা মিশে থাকত। ১৮৩০-এর কালের সাধারণ শিক্ষিত এক রমণীর পক্ষে তা ছিল এক বিস্মিত প্রশংসার গুণ। মা তাঁর এই কবিমন ও শিল্পরুচি তাঁর প্রথম দু'টি সন্তানের মধ্যে সার্থক ভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। মিখাইল প্রথম যৌবনে কিছুদিন কবিতা লিখেছিলেন তারপরে এনজিনিয়ারিং কলেজে ঢুকে ছেড়ে দেন। কিন্তু ফিওদর লিখতে শুরু করে কখনো আর তা ছাড়তে পারেন নি। নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় দুঃখে ও যন্ত্রণায়-যখন মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়েছে, কলম রাখতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে পাওয়া কবিমন ও শিল্পরুচি অনুক্ষণ তাঁকে সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ রেখেছিল। মৃত্যুর সময় ফিওদরের মাথায় হাত রেখে মা কী বলেছিলেন জানি না কিন্তু সন্দেহ নেই মায়ের সেই অস্ফুট আশীর্বাদের শক্তিতেই অর্থাৎ মায়ের থেকে পাওয়া গুণের আত্যন্তিক চর্চার মাধ্যমেই ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েফ্‌স্কি অপঘাত মৃত্যু, নির্বাসন, অপমান, অনটন, লাঞ্ছনার

কঠোর দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চিরকালের আধুনিক শিল্পীর মর্যাদায় পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন।

দুই

উচ্চাভিলাষের প্রেরণায় নাকি যুবক ডাক্তার মাত্রেরই সেদিন যুদ্ধের তাঁবুতে তলব পড়েছিল—মিখাইল আন্দ্রেয়েভিচ ডাক্তারী পাশ করে নাপোলিওঁ-র সঙ্গে রাশিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধে যোগ দেন ১৮১২-য়। ১৮১৯-এ তিনি যখন আঠারো বছরের বণিক-কন্যা মারিয়া নেচায়েভা-কে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ। তখনও তিনি সেনাবাহিনীর ডাক্তার। ১৮২০-র ১৩ অক্টোবর প্রথম ছেলে মিখাইল-এর জন্মের পরে তিনি যুদ্ধের চাকরি থেকে অব্যাহতি পান ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার বহির্বিভাগের প্রধান হিসেবে মারিনস্কায়া সাধারণ হাসপাতালে যোগ দেন। এখানেই জন্মগ্রহণ করে পরপর ফিওদর ভারভারা, আন্দ্রেই ও ভেরা, অনেক বছরের ব্যবধানে তাদের আরও এক ভাই ও বোন জন্মে—নিকোলাস ও আলেকসান্দ্রা, তখন ফিওদরের বয়স চোদ্দ, তখন ফিওদর ও তাঁর দাদা দূরের বোর্ডিং-এ থেকে পড়েছেন।

জন্ম থেকে বোর্ডিং-এ আসা পর্যন্ত চোদ্দটা বছর ফিওদরের কেটেছে হাসপাতালের ছোট্ট কোয়ারটারে। ডাইনিং রুম ড্রইং রুম কিচেন আর একটি অন্ধকার লম্বা বারান্দা এই নিয়ে সেই সংকীর্ণ কোয়ারটার। তার মধ্যে তারা দাসদাসী মিলে থাকত চোদ্দটি প্রাণী। সকলের জন্যে জায়গার সংকুলান করতে তাই ঘরে বারান্দায় পারটিসান করতে হয়েছিল। বারান্দায় পারটিসান তুলে জায়গা করা হয়েছিল মিখাইল আর ফিওদরের। সে ঘরে না ছিল জানলা না ভেনটিলেটার, তাই ঘরটা অচল বাতাসে ভ্যাপসা আর অন্ধকার থাকত সব সময়। ওঁরা শুতে ছাড়া বড় একটা ও-ঘরে ঢুকতেন না। ডাইনিং রুমটা ছিল বাড়ির মধ্যে সব থেকে বড় ঘর এবং ভাল ঘর। উঠোন আর রাস্তার দিকে মিলিয়ে ঘরটায় ছিল পাঁচটা জানলা। তাই যেমন অনেক আলো তেমনি প্রচুর বাতাস ছিল ঘরখানায়। ও-ঘরটারই খানিকটা পারটিসান দিয়ে ঘিরে বাবা-মার জায়গা হয়েছিল। সেখানেই আলাদা খাটে শুতো আন্দ্রেই আর ভেরা। ঘরখানার অবশিষ্ট অংশে ছোট বড় দুটো টেবিল এবং সে দুটিকে ঘিরে চেয়ার থাকত। আর এক পাশে থাকত সোফা। রাতে এই সোফায় শুয়ে

ঘুমোত ভারভারা। দিনের বেলা ওখানেই সকলে জড়ো হত। ছোট টেবিলটায় পড়ালেখা করত ছেলেমেয়েরা। বড় গোল টেবিলটায় বসে খেত সবাই। অন্য ঘরখানা ছিল বসবার। ছোট হলেও ঘরখানা মন্দ ছিল না। দুটো জানলা ছিল। রোদ আসত। বাতাস খেলত। এখানে এসে সবাই বিশ্রাম করত, গল্প করত। ডাক্তার এখানে তাঁর হাসপাতালের কাগজপত্র নিয়ে বসতেন, ছেলেদের পড়াতেন। দিবা-নিদ্রাটাও এখানেই সারতেন তিনি। চাকর-বাকর থাকত কিচেনে। আর দুধ-মা নার্স আর ঝি শুতো সিঁড়ির তলায় বাক্স মতন একটা খুপরিতে।

ফিওদরের জন্মের পরে থেকেই মারিয়া ফিওদরোভনার স্বাস্থ্য ভাঙতে থাকে। তাই ফিওদরের পরে তাঁর যত সন্তান হয়েছে, তিনি আর বুকের দুধ দেন নি কাউকে। তাদের জন্যে গ্রাম থেকে দুধ-মা আনা হত। যতদিন সন্তানের দুধ প্রয়োজন সে বাড়িতে থাকত। আর থাকত কোচমান ডেভিড। এই কেনা গোলাম সারাজীবন বিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রভুর সেবা করে শেষমেশ তাঁরই হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বাড়িতে আর একজন ছিল, নার্স আলিওনা। মারিয়া ফিওদরোভনা মারা যাওয়ার পরেও সে ছিল। তাঁর শেষ দুটি শিশু সন্তানকে বুকে করে এই লক্ষ্মীছাড়া সংসার ওই প্রবীণাই দু' হাতে আগলে রেখেছিল।

কোয়ারটারের সেই চাপাচাপি ঠাসাঠাসির ঘরে ডাক্তারের অসন্তুষ্ট মনের বিষোদগার, অদৃশ্য শত্রুর প্রতি গালাগাল, পালিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিল না বলে ছেলেমেয়েরা যে যেখানে থাকত ঘাড় গুজে শুনত, সহ্য করত। ডাক্তার ভাবপ্রবণ ছিলেন ঠিক কিন্তু অবিবেচক ছিলেন না; আসলে বিবেচনার বাড়াবাড়িটাই পীড়িত করত সকলকে।

আন্দ্রেই তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন, 'বাবা একদিন যে নিয়ম্‌ কায়েম করেছিলেন বাড়িতে, তা আর কোন দিন নড়চড় হতে দেন নি। বাড়ির রাত পোহাত ছ'টায়। ছ'টার মধ্যে সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। বাবা আটটায় হাসপাতালে বেরিয়ে যেতেন। তখন ঘরদোর সাফ করা ধোয়া মোছা হত। শীতের দিনে হলে ঘর গরম রাখার উনুনে নূতন করে কাঠ দেওয়া হত; গরমকালে সব ক'টা জানলা দরজা খোলা থাকত। ন'টা নাগাদ বাবা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসতেন, আবার তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তেন নিজের রোগী দেখতে। সরকারী ডাক্তার হলেও বাবাকে প্রাইভেট প্যাকটিস করতে অনুমতি দেওয়া

হয়েছিল। তাঁর রোগী দেখা শেষ করে আসতে বেলা বারোটা বাজত। তার অল্প পরেই দুপুরের খাওয়ার ডাক পড়ত আমাদের। বাবা খেয়ে উঠে চলে আসতেন বসবার ঘরে; এখানে তিনি চারটে অব্দি ঘুমোতেন। তখন খাওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত যেন সেখানকার গোলমাল তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। তখন বাড়িতে একবিন্দু শব্দ হওয়ার জো ছিল না। শব্দ হলে, শব্দে বাবার ঘুম ভেঙে গেলে, সে যে কী কুরুক্ষেত্র বেধে যেত সে আর বলে বোঝানো যাবে না। শুধু শব্দে না, মাছির কামড়েও যদি ঘুম ভেঙে যেত তিনি ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠতেন। মাছি তাড়ানোর দায়িত্ব ছিল আমার আর ফিওদরের ওপরে। খাবার ঘরে সকলে তখন নিঃশব্দে বাসন-কোসন গুছোচ্ছে কি খাচ্ছে। আমরা যারা তখন পড়ার ঘরে, নিঃশব্দে পড়ছি অথবা হাঁটছি—কথা বলার সময় একজন আর একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসছি, ফিসফিসিয়ে বলছি কথা, নয়ত দূর থেকে আকারে ইঙ্গিতে মূকাভিনয় চলছে।

'মাছি তাড়ানোর কাজটা কঠিন হত গরমের দিনে। তখন মাছির উপদ্রব ভীষণ বেড়ে যেত। আমি পারতপক্ষে ও-কাজটা তখন এড়াতে চাইতাম, ফিওদরের ঘাড়ে চাপাতে চাইতাম; কিন্তু সহজে রেহাই মিলত না। বাবার ধারণা ছিল ও-কাজটা আমিই সব চেয়ে ভাল পারি তাই হুকুমটা আমার ওপরেই জারি হত সব আগে। মাছি তাড়ানোর জন্যে রোজ একটা করে নেবু গাছের তাজা ডাল ভেঙে নিয়ে আসতে হত বাগান থেকে। ওই ডাল হাতে বাবার শিয়রে বসে মাছি তাড়াতাম। দেড় দু'ঘণ্টা ধরে ওই কাজ করতে শুধু যে আমার হাত ব্যথা হয়ে যেত তাই না, সকলকার কাছ থেকে একলা হয়ে চুপচাপ একজায়গায় বসে থেকে থেকে আমার মেজাজও খারাপ হয়ে উঠত। এত যে কষ্ট করতাম মাছি তাড়ানোর জন্যে তবু হঠাৎ যদি আমার সতর্ক চোখ এড়িয়ে একটা মাছিও ঘুমের মানুষটির নাকে ঠোঁটে এসে বসত কি হঠাৎ উড়ে এসে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত, একবিন্দু ক্ষমা ছিল না তাঁর কাছে। তিনি রেগে মেগে, জেগে উঠে এমন হুংকার হুমকি ঝাড়তে থাকতেন যে, আমি ত আমি মা সুদ্ধ বাড়ির সব লোক ভয়ে একরত্তি হয়ে যেত।'

পরিবারের এই প্রভুর সামন্ততান্ত্রিক কঠিন মেজাজের জন্যে তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট ছিল সংসারের সবাই। কিন্তু ফিওদরের অসন্তোষ ছিল সেই বয়সেই সব থেকে গভীর ও তীব্র। আন্দ্রেই লিখছেন, 'দাদা যেমন ছিল দুরন্ত তেমনি জেদী। সামান্য কিছুতেই বাবার মতন দপ্ করে জ্বলে ওঠা ছিল

তার স্বভাব। মা তাই একদিন মন্তব্য করেছিলেন, ফেদিয়া যেন একটা আগুনের গোলা।

মাছি তাড়াতে গিয়ে বাবার হুংকারের সামনে পড়লে কি অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের মতন চুপ থেকে কোন আদেশ মেনে নিতে চাইত না দাদা, সে তার মতামত মন্তব্য স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করত না একমুহূর্ত। সে-সব সময় বাবা প্রায়ই বলতেন—ফেদিয়া, মেজাজ সামলাতে শেখ, নয় ত ভবিষ্যতে তোমাকে খুব ভুগতে হবে বলে দিচ্ছি। একদিন দেখো, তোমাকে না 'লাল-টুপি' পরতে হয়।

'জার সম্রাট প্রথম নিকোলাস ছিলেন অত্যন্ত কঠিন মানুষ। সামান্য দোষের জন্যে হলেও কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁর কাছ থেকে রেহাই পেত না। সেদিন জার সম্রাটের মর্জি হলে তাকে তুচ্ছ অপরাধেও মাথায় লাল টুপি চাপিয়ে সাধারণ সৈনিকের কাজে যোগ দিতে হত। কী আশ্চর্য, বাবার সে-ভবিষ্যৎ বাণী দাদার বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। কিন্তু সে পরের কথা, পড়ানোর কথা বলি।

'সন্ধ্যা পড়তেই আমাদের ঘরে ঘরে চর্বির বাতি জ্বলে উঠত। বাবা তেলের বাতি পছন্দ করতেন না। সাধারণত চর্বির তৈরি বাতি ব্যবহার করা হত। আর বিশেষ উপলক্ষে জ্বলত দামী মোম। গভীর রাতে সব বাতি নিভে গেলে মেরী মায়ের বিগ্রহের সামনে রাখা মোম শুধু জ্বলত সারারাত।

'সন্ধ্যে হলেই আমরা পড়তে বসতাম। বাবা হাসপাতালের কাগজপত্র নিয়ে বসতেন। শেষে আমাদের নিয়ে পড়তেন। মাছি তাড়ানোর বেলা বাবা ঘুমিয়ে থাকতেন বলে তাঁর রুক্ষ মুখটা শান্ত দেখাত; তাকানো যেত তাঁর দিকে কিন্তু পড়ানোর বেলাতে সেই রুক্ষ মুখে ভ্রূ এমনই উঁচিয়ে থাকত যে চোখ পাতা যেত না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সবাইর বুক টিপটিপ করত। আমারও করত।' কিন্তু দাদাদের দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তেও আমার ভীষণ হাসি পেত। দাদারা মিখাইল আর ফিওদর তখন স্যুচার্ড-এ ভর্তি হয়েছে। সকাল বেলার স্কুল। দুপুর বেলা খাওয়ার সময় বাবার সঙ্গে গাড়িতে ফিরে আসত ওরা। সেখানে যে-সব বিষয় ওরা পড়ত তার মধ্যে অঙ্ক আর ফরাসী ভাষা ছিল। ল্যাটিনটা বাবা শেখাতেন বাড়িতে। অন্য বিষয় শেখানোর জন্যে দু'জন প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়েছিল। তাঁদের সামনে দাদারা বসতে পেত। কেবল পড়া বলার সময় উঠে দাঁড়াতে হত। কিন্তু বাবার কাছে পড়তে এসে তাদের সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত। বসবার অনুমতি ছিল না। এমন কি

টেবিলের কোণে ভর দিয়ে থাকতেও দিতেন না বাবা। ঠায় খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ল্যাটিন শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ বলে যেতে হত। তাও এক-আধটু সময়ের জন্যে নয়। এক ঘণ্টা কি তারও বেশী সময় ধরে পড়া চলত। দাদাদের তখন দেখে মনে হত মূর্তি, শক্ত অনড় কাঠের মূর্তি।

'আমরা ছোট ছিলাম বলে বসবার অনুমতি ছিল আমাদের। আমরা বসে বসে ওদের দুর্দশা দেখে গোপনে হাসতাম। কিন্তু সব দিন হাসতে পারতাম না। এক একদিন বাবা এমন অধৈর্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন যে, আমরা চমকে উঠতাম, সামান্য ভুলও বাবা সহ্য করতে চাইতেন না ; তেড়ে ফুঁড়ে এমন চেঁচিয়ে উঠতেন যে, আমরা ছোটরা ভয়ে চোখ বুজে ফেলতাম। বাবা দাদাদের গাল পাড়তেন, অলস অপদার্থ শূয়ার বলে। কোন কোন দিন ভীষণ রেগে তিনি উঠে যেতেন। দুটো চড়-চাপড় কি অন্য শাস্তি দেওয়ার থেকেও সেটা ছিল বেশী সাংঘাতিক ; কারণ সে চাপা রাগ গোটা পরিবারের উপরে ভীষণ লাঞ্ছনা হয়ে নেমে আসত।

'কিন্তু হামলাটা শেষ অব্দি গিয়ে পড়ত কেনা গোলামদের ওপরে। সেকালে ভূমিদাস, ক্রীতদাসদের মানুষ মনে করা হত না। তারা গরু গাধারও অধম ছিল। অবশ্য বাবা যে সব দিনই গোমড়া-মুখো হয়ে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলতেন তা নয়, সপ্তাহের কোন কোন দিন আমরা ছুটিও পেতাম। সেদিন বাবা পড়তেন আমরা শুনতাম। আবার ছুটিছাটার দিনে বিশেষ করে খ্রীষ্টমাসের সময়ে বাবা সকলকে নিয়ে তাস খেলতেও বসতেন। সেগুলি ছিল আমাদের সব চেয়ে মজার দিন। সে-সব দিনে ফিওদরের দৌরাত্ম্য সব থেকে বেড়ে যেত। সে ছিল দুষ্টু বুদ্ধিতে পাকা। তাস খেলার সময় সে হরদম চুরি করে ঠকাত আর ধরা পড়ে গিয়ে বেদম হাসত।

'আমাদের খাওয়ার সময় ছিল রাত ন'টা। খেয়ে উঠে আমরা ভাই-বোনেরা বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা করতাম তারপর বাবা-মার থেকে বিদায় নিয়ে শুয়ে পড়তাম গিয়ে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি বলেছেন, বিছানায় গা দিলে ঘুমিয়ে পড়তে কারো দেরি হত না। কেবল তিনিই কিছুক্ষণের জন্যে জেগে থাকতেন। একটু আগে মেরী মায়ের সামনে তিনি যে প্রার্থনা করে এসেছেন, তাই তাঁর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে বাজত কিছুক্ষণ, শেষে তন্দ্রার মধ্যে মা মেরীর রূপের সঙ্গে প্রার্থনার স্বর একাকার হয়ে যেত তাঁর।

তিন

যৌবনে দস্তয়েফ্‌স্কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সে তাঁর যুক্তি-বুদ্ধিতে পড়াশোনা চিন্তা-তর্কের শান পড়েছিল বলে। কিন্তু সে শান-পালিশ তাঁর যুক্তি বুদ্ধিকে যতই ক্ষুরধার করুক শৈশবে অজ্ঞাতসারে অর্জিত ঈশ্বর-বিশ্বাসকে তা শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারে নি। তাঁর তীক্ষ্ণধার যুক্তি বুদ্ধির আড়ালে গোপনে শৈশবের সে ঈশ্বর বিশ্বাস সারা জীবন তাঁকে ছায়ার মতন অনুসরণ করেছে। তিনি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে ক্রমাগত দুলেছেন, আর সন্দেহের যন্ত্রণায় কেবলই কষ্ট পেয়েছেন।

তিন বছর বয়স তাঁর তখন। একদিন নার্স তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে এল, মেরী মায়ের বিগ্রহের সামনে জানু নত করে বসিয়ে দিলে তাঁকে। তখন বসবার ঘরে অনেক লোক। তার মধ্যে নার্স তাকে মৃদুস্বরে বললে,—বল, আমি তোমার ওপরে আমার সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ করছি, ওগো মা মেরী, তোমার পক্ষচ্ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে রক্ষা কর।

সেদিন থেকে প্রতিদিন এ-প্রার্থনা করে এসেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, সারা জীবন এ-প্রার্থনায় সংলগ্ন থেকেছেন। যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন তিনি, যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাঁর মনে সংশয় জেগেছে, তখনও এ-প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন নি। কেন-না, ততদিনে তাঁর মৃত মা ও মেরী একাকার হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে, একের ভালবাসা অন্যকে সমর্পণ করে ফেলেছেন। এই মাতৃ-প্রার্থনা নিজের সন্তানদেরও তাই তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 'জাপিস্‌কি ইজ মিওর্‌ৎভোগো দোমা' (মৃত্যুপুরীর স্মৃতিচারণ) উপন্যাসে সাইবেরিয়ার জেলের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—'শীতের শেষে বরফ গলে পথ তৈরি হলে আমরা, কয়েদীরা চার্চে গিয়ে যখন নতজানু হয়ে উপাসনায় বসতাম, আমার মন সুদূর অতীতে চলে যেত, সেই শৈশবকালে চলে যেতাম আমি। মনে পড়ত বসবার ঘর, আমার প্রার্থনার স্বর। মনে পড়ত গাঁয়ের চার্চ, সাধারণ মানুষের ভিড়। তারা পেছনে হটে গিয়ে সামরিক পুরুষদের জন্যে পথ করে দিত। ভদ্রলোক দেখলে কিংবা চকমকে পোশাক-পরা কোন ভক্তিমতী এলে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াত। মনে হত এই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতের চার্চে প্রার্থনার তুলনায় সে-দিনের প্রার্থনায় আন্তরিকতা ছিল বেশী গভীর, শরণাগতি ছিল বেশী ঐকান্তিক।' এ উক্তি একটা স্বীকৃতিও বটে। শৈশবের আন্তরিকতা ও শরণাগতি তখন আর নেই যেন একথাই বলতে চেয়েছেন তিনি।

শৈশবে অজান্তে যেমন তাঁর মনে ঈশ্বরভক্তি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তাঁর নার্স ও মা, তেমনি কৈশোরে তাঁর বাপ ও মায়ের সম্পর্ক তাঁর মনে বপণ করে দিয়েছিল ভালবাসা এবং ঘৃণা। তাঁর চেতনায় ঘৃণার উৎস তাঁর বাবা। অথচ ডাক্তার তাঁর ছেলেমেয়েদের অত্যধিক ভালবাসতেন। স্বল্প আয় তবু কিঞ্চিৎ খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয় করবার দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকত ডাক্তারের। তাই বলে সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় কখনো তিনি সঙ্কোচ করেন নি। শুধু স্কুলে পাঠিয়ে আর বাড়িতে মাস্টার রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন না, নিজেও তাদের রোজ যত্ন করে পড়াতেন। শুধু তাই না, সেই বালকবয়সেই যে সমকালের সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে ফিওদরের পরিচয় ঘটেছিল সে-ও পিতারই সাহিত্য এবং ইতিহাস প্রীতির জন্যে। তথাপি পিতার ভাগ্যে পাওনা হয়েছিল পুত্রের ঘৃণা। কেন-না তারা কেবল পিতার হুমকি হুংকারটাই দেখেছে, তার অন্তরালে যে মমতার প্রস্রবণ সে তাদের সে বয়সে চোখে পড়ে নি। চোখে পড়েছে প্রচণ্ড রাগ। রাগের চোটে কেনা গোলামদের পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছেন চাবুক মেরে, লাথি মেরে পাঁজরা ভেঙে দিয়েছেন। সেকালে এটাই ছিল রেওয়াজ। মনিবের যেখানকার যত অসন্তোষ ক্ষোভ ব্যর্থতার ঝাল ঝাড়া হত তাদের পিঠে। সে দৃশ্য ঘৃণা নয়, ভয়েরই উদ্রেক করত শিশুদের মনে। ঘৃণার কারণ ঘটত অন্য দৃশ্যে।

ডাক্তারের জীবনে ক্ষোভ ছিল একটাই। একটা অসন্তোষই তাঁর জীবনের সব সুখ কুরে কুরে খেত। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। দেশ তাঁর প্রতি বেইমানি করেছে। তিনি ভীষণ যুদ্ধে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আহত সৈনিকের সেবা করেছেন। যুদ্ধকালীন সমস্ত সময়টা তিনি অগ্রবর্তী ক্যাম্পে থেকেছেন। কখনো ভয়ে পালান নি, কি পেছনের ক্যাম্পে আশ্রয় চান নি। তাঁর সে-সাহস সে-ঐকান্তিক সেবার মূল্য তিনি পেলেন না। রাজার খেতাব দূরে থাক চিকিৎসা-বিদ্যার নৈপুণ্যের জন্যে বিভাগীয় পুরস্কারও জোটে নি তাঁর কপালে। তিনি একটা দাতব্য হাসপাতালের বহির্বিভাগে স্ত্রী-রোগের প্রধান চিকিৎসক হয়েই থাকলেন। তাঁকে উচ্চতর আর কোন পদ দেওয়া হল না। সে-পদ অযোগ্য এবং নবাগতরা কেবল মুরুব্বির জোরে দখল করে নিচ্ছে। তাঁকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে আর সকলে। এ কী অবিচার—এ কী বেইমানি। চোদ্দটা মানুষের ঠাসাঠাসিতে রুদ্ধশ্বাস হাসপাতালের কোয়ারটারে এক একদিন এই ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়তেন তিনি। শেষে এক সময়ে সব ক্রোধ সব ক্ষোভ সংসারের বিশৃংখলার প্রতি

খড়্গের মত উদ্যত হয়ে উঠত। ছেলেমেয়েরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, দাসদাসীরা লুকিয়ে পড়ত দরজার আড়ালে রান্না ঘরে। কেবল স্ত্রী সেই ক্ষোভ সেই ক্রোধ সহ্য করতেন বসে বসে আর নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতেন।

এ-সব দৃশ্যই ফিওদরের মনে পিতার প্রতি ঘৃণার কারণ হয়ে উঠত। তিনি এ-সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পিতার প্রতি ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে মায়ের প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে যেতেন। মায়ের জন্যে তাঁর মন ভালবাসায় ভরে উঠত। পিতার হুংকার হুমকি অসন্তুষ্ট বিষোদ্‌গারই তাঁর কাছ থেকে সন্তানদের দূরে ঠেলে দিয়েছিল, তাদের করে তুলেছিল মায়ের নিকটতম, ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কটাও হার্দ্য ছিল না। সুখী দম্পতি বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না তাঁরা। তাঁরা ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর মানুষ। দারোভোয়ের এক চাষা দানিয়েল মাকারোফ একদিন বলেছিল—'আমাদের মনিব ছিলেন ভারি রুক্ষ, আদ্যোপান্ত খারাপ মানুষ। কিন্তু আমাদের মা-ঠাকরুনের কোন তুলনা হয় না। তাঁর মতন দয়ার শরীর আমরা আর দেখি নি।' আর এক চাষী-বউ আবদোতিয়া স্পিবিতোনোভা বলেছিল, 'আমাদের মনিব চাইতেন জ্যান্ত চাষাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে কিন্তু বেচারা ভালমানুষ মা-ঠাকরুন আমাদের জন্যে হাউহাউ করে কাঁদতেন, আর কেবল মনিবকে বলতেন, যীশুর দোহাই ওদের এমন করে মেরো না। এমন করে মেরো না। তখন মনিব ক্ষেপে উঠে বলতেন, তোমার ত সাহস কম না, আমার কাজে বাগড়া দিতে আস। বলে মা-ঠাকরুনকে টেনে নিয়ে ঘরে শিকল এঁটে রাখতেন।'

ডাক্তারের কাছে ভূমিদাসরা পশুর সামিল হলেও মারিয়া ফিওদোরোভনার কাছে তারা ছিল সন্তানতুল্য। ১৮৩৫-এর মে মাসে তিনি স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখছেন,…"তুমি রাগ করো না। ভূমিদাসরা পুষ্টির অভাবে দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে। ওদের দেখলে মায়া হয়। তাই কিছু ওট্‌স ওদের বিলিয়ে দিয়েছি।" এ চিঠির আর এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের গরু ঘোড়াগুলিও দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে।"

সে চিঠির উত্তরে ডাক্তার লিখেছিলেন, "…ওদের লাই দিয়ে মাথায় তুলো না। গোলাম লাই পেলে ক্ষেতে আর ফসল ফলবে না। গরু ঘোড়া শুকিয়ে মরবে। ওদের বেত মেরে সজুত রাখতে হয় নইলে আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না। গোয়ালের মেয়েটার গাফিলতি বেড়ে গেছে। ওকে বেত মারা দরকার।

একজনকে বেত মারলে সে স্বদ্ধ আর পাঁচজন সাবধান হয়। শুনলাম খারলাসকা কাজকর্মে ফাঁকি দিচ্ছে। তা যদি হয়, ওকে সাবধান করে দিও। দরকার হলে বেত মেরো।"

একটা চিঠিতে কতবার বেত মারার কথা লেখা হয়েছে, এর থেকেই বোঝা যায় ডাক্তার কী নির্দয় ছিলেন। একজন হৃদয়বতী আর একজন নিষ্ঠুর হলে কি সুখী জীবন গড়ে ওঠে! ওঁদের জীবন সুখের হয় নি। প্রভু আর সেবাদাসীর সম্পর্কের মধ্যে স্বস্তি থাকতে পারে কিন্তু মাধুর্য থাকে না। এই আদর্শ মহিলা স্বামীকে সর্বতোভাবে সেবা করতে চেয়ে তাঁর সব মর্জি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে শেষমেশ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। তাতেও সন্তুষ্ট নন স্বামী, তিনি বরং আরও অসন্তুষ্ট ঈর্ষান্বিত সন্দিগ্ধ।

সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে গ্রীষ্মের সময়টা মারিয়া ফিওদোরাভনা দারো-ভোয়েতে গিয়ে থাকতেন। তখন স্বামীর সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত। সে-সব চিঠিগুলিই তাঁদের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের দর্পণ হয়ে আছে।

১৮৩৫-এর ২৩ মে ডাক্তার লিখলেন, "তোমার বুকে ব্যথা। তুমি ক্ষয় রোগে ভুগছ আর রোগটাকে বাগে আনতে কেবল মিষ্টি খাচ্ছ। ঈশ্বর জানেন এ-রোগ তোমার কেন হল। এর আগের বারের গর্ভাবস্থায়ও ত তোমার এ-রোগ ছিল না। এবার কেন হয়েছে? তুমি জারাইস্ক্-এ লোক পাঠিয়ে ম্যাগনেসিয়া আনিয়ে নাও। ওটাই তোমার অসুখে সব চেয়ে ভাল কাজ দেবে। এ-সঙ্গে আমি তোমাকে কিছু মিষ্টি পাঠালাম। ভয় হচ্ছে পথে বৃষ্টি হলে মিষ্টিগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।"

চিঠি পড়লেই বোঝা যায় ডাক্তার যেন অজ্ঞতার ভান করছেন কিংবা স্ত্রীর রোগের জন্যে আর কাউকে দায়ী করে নিজে নির্দোষ থাকতে চাইছেন। স্ত্রীর প্রতি ডাক্তারের যে আদৌ কোন মমতা বা বিশ্বাস ছিল না, তাঁর অসুস্থ সন্দেহবাই যে কত নিচু স্তরে নেমে গিয়েছিল, স্ত্রীর বেদনাবিদ্ধ উত্তরেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ফিওদোরোভনা লিখছেন, "......তুমি আমাকে গালমন্দ করেছ। আগেকার গর্ভ অবস্থার সময়গুলিতে আমার ক্ষয় রোগ ছিল না। এবার কেন হয়েছে? আমার ওপরে এ-জন্যে তোমার রাগ। তোমার চিঠি পড়ে মনে হল তুমি আবার অন্যায় সন্দেহে ভুগতে শুরু করেছ। এ কিন্তু আমাদের দু'জনের পক্ষেই বিপজ্জনক। আমি স্বয়ং ঈশ্বরের নামে, স্বর্গ মর্ত্য, আমার ছেলেমেয়ে সুখ

সংসার ও আমার জীবনের নামে শপথ করে বলছি—সতী ও বিশ্বস্ত থাকার যে প্রতিশ্রুতি বিয়ের দিন আমি তোমাকে দিয়েছি, সে বিশ্বাস ও সততার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে আমি কখনোই অপরাধী নই, কখনো হব না। প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি, আমার গর্ভে এই এখন যে সন্তান এও তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততারই ফলশ্রুতি। এ আমাদের মধ্যেকার পবিত্র প্রণয়ের দৃঢ়তর সপ্তম বন্ধন। যে বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়েছি সেই বিয়ের দিনে, সেই দুরন্ত ভালবাসা, সেই নির্দোষ ও পবিত্র ভালবাসা আমার তরফ থেকে এতটুকু কলুষিত হয় নি। তার তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায় নি।

"কোন দিন শপথ করে এসব কথা বলি নি। বলতে হবে তাও জানতাম না। এখন আশা করি—মুখ ফুটে পরম যন্ত্রণায় যে শপথ আমি করলাম তাতে তুমি সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হবে। ঈশ্বরের নামে সন্তানের নামে দিব্যি দিয়ে কিছু বলা অন্যায়। এতে নিজেকেই অসম্মান করা হয়। বিবাহিত জীবনে পনের বছর পরে বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শপথ করা ত আরো লজ্জার আরো ঘৃণার। তাছাড়া শপথ করছিই বা কার কাছে? তুমি ত আগে ভাগেই একটা মিথ্যা ধারণা করে বসে আছ। আমার কথা শোনারই তোমার মন নেই, শপথেই বা কান দেবে কেন? তবু আজ আমি দিব্যি করছি, দিব্যি করছি এই ভেবে যে, হয়ত এতে করে তোমার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হবে, তুমি শান্তি পাবে, তাছাড়া আমার এখনকার যে অবস্থা তাতে আমার দিব্যিতে তোমার আস্থা আসবে বলে আমার বিশ্বাস। কেন-না, কোন স্ত্রীই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঈশ্বরের নামে মিথ্যে দিব্যি কাটতে সাহস পায় না, তুমি জান। যে কোন সময়ে আমাকে এখন ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের দরবারে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সন্তান প্রসবের সময় নারীর যে কী সংকটকাল এ কে না জানে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া এ সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় নাকি? সুতরাং তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর দিব্যি কেটে অবশেষে আমি ঈশ্বরেরই শরণ নিলাম। ঈশ্বরই সব সময় আমাকে রক্ষা করে এসেছেন। শক্তি জুগিয়ে এসেছেন। তিনিই আমার দুঃখের পরম আশ্রয়। আজ হোক কাল হোক একদিন ঈশ্বর আমার ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনায় সাড়া দেবেনই। তখন তাঁর পূণ্য নিঃশ্বাসে তোমার অন্ধকার মনের গোপন সন্দেহ দূর হবে। তিনি আমার নির্মল আত্মাকে তোমার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন।"

চিঠি পেয়ে ডাক্তারের বুঝি চৈতন্যোদয় হয়েছিল, তাঁর হঠকারিতা বুঝি

বুঝতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে শান্ত করতে তাই আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি, লিখলেন, "আমি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় আর অবিবেচনায় নাস্তানাবুদ হয়ে মরছি। আমার এই জেরবার অবস্থায় সংসারের সবাইকে মনে হয়েছে বিশ্বাসঘাতক শঠ প্রবঞ্চক শয়তান, তোমাকেও আমি তার থেকে বাদ দিই নি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

আহত অসন্তুষ্ট স্ত্রীর তাতে মনের জ্বালা জুড়ালো না। তিনি জবাব দিলেন, "তুমি তোমার অসুস্থ মনের নোংরা ঈর্ষার বিষে আমার জীবনও জেরবার করে দিয়েছ। তুমি জান, তোমার প্রতি সরকারের অবিচারের কথা চিন্তা করে আমি কতখানি দুঃখিত। তোমার হতাশ বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করে এখন আমার মন আরও বিমর্ষ কাতর হয়ে উঠেছে, কারণ, তুমি আমাকেও তোমার শত্রুদের সামিল করে তুলেছ। ঈশ্বর জানেন, কেমন করে তোমার মাথায় এমন একটা নিদারুণ মিথ্যা বিশ্বাস বাসা বাঁধতে পারল।···তোমার ভালবাসায় আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু দিনে দিনে তোমার প্রতি আমার প্রেম ক্রমশ গভীরতর হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সে তোমার চোখে পড়ছে না দেখে আমার বুক কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে। আমার ভালবাসা ত বুঝছই না, বরং নীচ সন্দেহে তোমার মন কানায় কানায় ভরে উঠছে।······সময়ের কঠিন হাত লেগে লেগে ইতি-মধ্যেই আমার মুখ বিবর্ণ হলুদ হয়ে উঠেছে, বলি পড়েছে কপালে গালে। আমার যৌবনোচ্ছল সুখী মন মলিন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। আমি কী এ-জন্যেই বেঁচে ছিলাম এত দিন? এই কী আমার জীবনধারণের পুরস্কার? তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসার প্রতিদান? হাঁ, যদি আমার বিবেক নির্মল না থেকে থাকে, যদি আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে থাকি ত আমার জীবন যেন শোচনীয় কষ্টে নষ্ট হয়ে যায়।" পত্র শেষ করলেন এই বলে, "আমি তোমাকে অভিসম্পাত করছি নে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, উপরন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে পূজা করি। হে বন্ধু, আমার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে আমি তোমার অংশভাক হতে চাই। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, প্রিয়, আমার ঈশ্বর। একটা ছোট্ট চিরকুটে এ-পত্র লিখছি, যেন তুমি ছাড়া এ পত্র আর কেউ না পড়তে পারে। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার দিব্যি আমার বর্তমান অবস্থা ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না। কেন না, আমি বহু দিন আগেই আমার অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কোন কিছুতেই আজ আর আমার দুঃখ নেই।"

বিয়ের পনর বছর পরে ওই হল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চেহারা। ততদিনে স্বামীর আর বুঝতে বাকি নেই, তিনি একজন ব্যর্থ মানুষ। অথচ জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর পরিবার ও পরিবেশের বিরুদ্ধে কী বিদ্রোহই না করেছিলেন। সম্পদ ও সম্মানের কী দুরন্ত উচ্চাশা নিয়েই না তিনি অপরিচিত নির্বান্ধব বিদেশে ছুটে এসেছিলেন। কী কঠিন শ্রমে ও কষ্টেই না তিনি বিদ্যা লাভ করেছেন। রক্তাক্ত যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃসাহসের কী অগ্নিপরীক্ষাই না তিনি দিয়েছেন। কিন্তু এত শত করেও শেষমেশ তিনি দেখলেন—তিনি একজন ব্যর্থ মানুষ। মর্যাদার সব পদগুলি তাঁর পরে এসে তাঁর আগে দখল করে বসল অন্যে। প্রতিযোগিতায় হেরে হেরে তিনি সকলের পিছে পড়ে থাকলেন। আর ক্ষোভে হতাশায় ঘৃণায় তামাম দুনিয়াটাকেই বিশ্বাসঘাতক নেমকহারাম বলে গাল পেড়ে থুতু ছিটোতে থাকলেন। নিজের স্ত্রীকেও রেহাই দিলেন না।

তাঁর পরম অহংকারের আকাঙ্ক্ষা ছিল, যুদ্ধ-ফেরত এত বড় বীর ডাক্তারকে জার ডেকে খেতাব দেবেন। সরকাব থেকে সর্বোচ্চপদের সম্মান পাবেন তিনি। দেশের মানুষ নতজানু হয়ে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানাবে। অথচ তার কিছুই ঘটল না। কেন ঘটল না একবারও তিনি ভেবে দেখলেন না। আত্মসমালোচনা করলেন না। খেতাব, সম্মান ও উচ্চপদের জন্যে যে নিজের কৃতিত্বের শক্তিতে সকলকে ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়, জারের দরবারে ধর্না দিতে হয়, একটা প্রতিপত্তির পরিবেশ তৈরি করতে হয়, সে-সব কথা একবারও তিনি চিন্তা করলেন না; কিংবা চিন্তা করলেও খোসামোদের সে রাস্তায় যেতে অসম্মান বোধ করলেন। অভিমানে অচল থেকে কেবল অন্ধকার মনের মধ্যে পুষতে থাকলেন ঘৃণা, ক্রোধ, অসন্তোষ; সবাইকে অবিশ্বাসী অবিবেচক স্বার্থপর হীন ভাবতে থাকলেন। সাধ্বী স্ত্রীকেও সে ক্ষুব্ধ ব্যর্থতার শিকার হতে হল। বেচারী স্বামীর সন্দেহের কাঁটার আঘাতে, ক্ষয়রোগের কষ্টে জর্জরিত থেকে সন্তানধারণের ধকল বয়ে চললেন। ২৫ জুলাই (১৮৩৫) আলেকসান্দ্রার জন্ম হয়। আর তাঁর স্বাস্থ্যও একেবারে ভেঙে পড়ে, তখন তিনি শয্যাগ্রহণ করেন।

দস্তয়েফ্‌স্কির বয়স তখন বছর চোদ্দ, বাপ-মায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের চেহারাটা চিনবার পক্ষে যথেষ্ট বয়স। তা ছাড়া অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিলেন বলে ও পরের মন বুঝবার চেতনা অল্প বয়স থেকেই খুব প্রখর ছিল বলে, পরিবারের অন্য সকলের থেকে তাকেই ঘটনাগুলি বেশী বিচলিত করত। সন্দেহ নেই, দস্তয়েফ্‌স্কির সেই বিচলিত মনের মাটিতে বাবা বুনলেন ঘৃণার বীজ, মা

ভালবাসার। দুর্বল অসহায় শয্যাগত মায়ের প্রতি বাবার ব্যবহার তাঁর প্রতি দস্তয়েফ্স্কির মন অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। অন্যপক্ষে মায়ের জন্য তাঁর মন ভালবাসায় ও করুণায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু তাতে করে প্রমাণ হয় না দস্তয়েফ্স্কি ইদিপাস-কম্প্লেকস-এর রোগী ছিলেন। তাঁর মৃগী রোগেরও হেতু ইদিপাস-কম্প্লেকস নয়।

ফ্রয়েড বলেন, ইদিপাস-কমপ্লেকসকে মন থেকে তাড়ানোর একটা সচেতন প্রচেষ্টা ছিল দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে কিন্তু তাড়াতে, তার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি বলেই তাঁর স্নায়ু বিকার ঘটেছিল যার ফলশ্রুতি মৃগী রোগ।

মৃগীর আক্রমণের অব্যবহিত আগে দস্তয়েফ্স্কি ক্ষণেকের একটা প্রবল অপরাধ বোধে পীড়িত বোধ করতেন। তাঁর মনে হত যেন তিনি সত্যই একটা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক পরিপূর্ণ সুখে ভরে উঠত তাঁর মন, তার পরেই সব ভুলে গভীর অচেতনতার মধ্যে ডুবে যেতেন। দস্তয়েফ্স্কির ওই স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়েছেন ফ্রয়েড। বলেছেন, পিতাকে হত্যা করবার একটা গোপন ইচ্ছা ছিল দস্তয়েফ্স্কির মনে। সে ইচ্ছাটাই ছিল তাঁর পাপবোধ। সে পাপবোধ থেকে মুক্তি পেতেই তাঁর এই মৃগীর ব্যামো। ফ্রয়েডের এ ব্যাখ্যা ধোপে টেকে না। কেন না পিতার মৃত্যুর অনেক বছর পরে মৃগী রোগের প্রথম আক্রমণ হয় তাঁর। পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গে তখন তিনি বন্দী। ফ্রয়েডেরও অবশ্য দোষ নেই দস্তয়েফ্স্কির মেয়ের রচনার যে লাইনটির ওপরে তিনি তাঁর তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটি ভুল। দস্তয়েফ্স্কির মেয়ে লিখেছিলেন: "আমাদের পরিবারের মত অনুসারে ঠাকুর্দার খুন হবার খবর শুনেই বাবা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সেই থেকেই তাঁর মৃগী রোগের শুরু।" কিন্তু তাঁদের পরিবারের ডাক্তার ওই বিবৃতির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি এক সময়ে কয়েক বছর দস্তয়েফ্স্কিরও চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তর্কে কাজ কি! দস্তয়েফ্স্কি নিজেই বলেছেন পিতার অ্যাণ্ড পল-এ বন্দী অবস্থায় প্রথম মৃগীর আক্রমণ হয় তাঁর।

এ যদি ইদিপাস-কমপ্লেকস নয়, ত মৃগীর ব্যামোটা এলো কোথা থেকে। তারও জবাব আমরা জানি। এ মৃগী রোগ তাঁদের বংশগত। ডাক্তার বেদম মদ খেতেন এবং ডিলিরিয়াম ট্রিমেনস-এ ভুগতেন। তা ছাড়া দস্তয়েফ্স্কির এক খুড়ো আর দুই ভাইও মারা যায় ডিপসোম্যানিয়া রোগে। দস্তয়েফ্স্কির যে ছেলেটি তিন বছর বয়সে মারা গেছে তারও হয়েছিল ওই রোগ। ওই রোগই দস্তয়েফ্স্কির বেলা দেখা দিয়েছে এপিলেপসির আকারে।

মায়ের প্রতি অবিচারের জন্য হঠকারী বাবার প্রতি দস্তয়েফ্‌স্কির ঘৃণা জন্মেছিল কিন্তু সে ঘৃণা যে প্রতিশোধ নেবার অক্ষম ইচ্ছায় বধাভিলাষী হয়ে ওঠে নি বরং অসহায় অদূরদর্শী মানুষটির প্রতি সহানুভূতিতেই রূপান্তরিত হয়েছিল তার প্রমাণ একখানা চিঠি। দস্তয়েফ্‌স্কি যে তাঁর বাবার দোষগুলিই শুধু নয় গুণগুলিও দেখেছেন সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখন চিঠিখানার কথা বলি। দস্তয়েফ্‌স্কির তখন রাশিয়া জোড়া নাম। তখন নানা মানুষ তাঁকে উপদেশ চেয়ে চিঠি লেখে। এক উৎপীড়িতা স্ত্রীও প্রতিকারের উপায় জানতে চেয়ে চিঠি লেখে তাঁর কাছে। তার উত্তরে ওই চিঠি লিখেছিলেন তিনি: "স্বামীর প্রতি সহৃদয় হও। তোমার সন্তানদের বুঝতে দাও তুমি দয়ালু। অন্যের পরামর্শে নয়, তারা নিজেরাই যেন সেটা অনুভব করতে পারে। এবং তোমার স্বামীকে বুঝতে দাও যে, তুমি সব সময় তার প্রতি ক্ষমাশীল। স্বামীর ওপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করে নিজে সহিষ্ণু হয়ে তাকে দয়ালু হতে শেখাও। তা যদি পার ত তোমার নিষ্ঠুর পুরুষ তোমাকে শ্রদ্ধা করবে সারা জীবন। অনুক্ষণ তার বোধের মধ্যে তোমার জন্যে একটি ভালবাসার আশ্রয় থাকবে। এ ছাড়া, এর বেশী, তুমি আর কী করতে পারো? বস্তুত এটাই সব থেকে বড় কাজ। একাজের মধ্যে দিয়েই পিতামাতা সন্তানের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হয়ে ওঠে! তারা নিজেরা সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ স্নেহশীল হয়ে উঠতে প্রেরণা পায়। আর সর্বোপরি কথা হল, তুমি ক্ষমাশীল হলে আজ হোক কাল হোক তোমার স্বামীও ক্ষমাশীল দয়ালু হতে বাধ্য। তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

দস্তয়েফ্‌স্কি নিজের মায়ের প্রতি পিতার দুর্বিনীত ব্যবহার ও পিতার প্রতি মায়ের বিনীত আচরণ দেখে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, জনৈক মায়ের কাছে ১৮৭৮-র ওই চিঠি তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে এ চিঠির মধ্যেও ইদিপাস-কমপ্লেকস ধরা পড়ে। তাঁদের চোখে ও চিঠির মধ্যেও আছে মায়ের প্রতি ভালবাসা ও পিতার প্রতি অক্ষম ঘৃণা। ইদিপাস-কমপ্লেকস-এর একটা শারীরবৃত্তিক পরিণাম থাকে। ফ্রয়েড সে পরিণামকে বলেছেন তাঁর স্নায়ু রোগ ও মৃগী। কিন্তু এ দুটোই যে দস্তয়েফ্‌স্কির বংশগত রোগ তার প্রমাণ আমরা পূর্বে পেয়েছি।

সৃষ্টির পেছনের কাম-তাড়না প্রতীক ফ্রয়েডের এ কথা যদি মেনেও নিই তবু বলব শিল্পীমানসে মানবীয় সমস্তবৃত্তির যৌগিক অনুভূতি আছে, তার মধ্যে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে, তা কেবল সেক্স-কমপ্লেক্স দিয়ে বিচার করা যায় না।

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বহু ধাতুর সংমিশ্রণে গড়া এক অসামান্য জটিল পদ্ধতি। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে তাঁর মনে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বিরোধ বিদ্রোহ, কখনো রাজদ্রোহিতা কখনো রাজানুগত্য, কখনো জাতীয়তাবাদ কখনো আন্তর্জাতিকতা, কখনো আস্তিক কখনো নৈরাজ্যবাদী আবার কখনো পৌরোহিত্য প্রথার সমর্থক, কখনো বোধ-নির্ভর কখনো যুক্তিবাদী দুই মেরুতে দ্বিখণ্ডিত এই মানুষটির বৌদ্ধিক, আদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে যদি ফ্রয়েডের একটি স্থূল ডায়োগ্‌নসিসের মধ্যে ধরে রাখি ত দস্তয়েফ্‌স্কির অলোকসামান্য অন্তর্দৃষ্টিকেই অসম্মান করা হবে। ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের দল মানুষ দস্তয়েফ্‌স্কিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, শিল্পী দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁদের নাগালের বহু ঊর্ধ্বে দুর্লভই থেকে গিয়েছেন। তাঁরা বুঝতে চান নি অলীক কল্পনা আর উদ্ভাবনীচিন্তা এক বস্তু নয়। অলীক কল্পনা গূঢ়ৈষণার (কমপ্লেকস-এর) দাস। যে বাসনা পূর্ণ হয় নি দিবা-স্বপ্নে ও কল্পনায় তা পূর্ণ করে গূঢ়ৈষণায় পীড়িত মানুষ। এ আবেশ (অবসেশন) থেকে পীড়িত কখনো নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। দস্তয়েফ্‌স্কির কী এ দশা ঘটেছিল কখনো ? না। তিনি কখনো অলীক কল্পনার বেড়াজালে ঘেরা থেকে মাথা খুঁড়ে মরেন নি। তিনি তাঁর অপূর্ণ বাসনার কল্পনাকে উদ্ভাবনী চিন্তায় পরিণত করতে পেরেছেন। তাঁর সৃজনশীল কল্পনা আবেশের সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে সৃষ্টির নির্বাধ ক্ষেত্রে মুক্তি পেয়েছে। তিনি তাঁর আপন বোধকে সকল কালের সকল দেশের সার্বজনিক বোধে উত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছেন। এ যিনি পারেন তাঁকে কি গূঢ়ৈষণার রোগী বলব ?

স্বীকার করি বাসনার অতৃপ্তিই শিল্পের প্রেরণা। কিন্তু সে মোটর গাড়িতে ব্যাটারির অধিক নয়। এঞ্জিনকে স্টার্ট দিয়েই তার প্রয়োজন শেষ। এঞ্জিন তখন নিজের জোরে গাড়িকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, ব্যাটারি নিষ্ক্রিয় পড়ে থাকে এক ধারে। অথবা অতৃপ্ত বাসনাকে বলতে পারি তৈরি হওয়ার পথে একটা বাড়ির গায়ে ঠেকানো বাঁশের মই-মাঁচা-সিঁড়ি। বাড়ি তৈরি শেষ হলে ওগুলি আবর্জনা হয়ে যায়, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় সেগুলিকে তখন। কিন্তু ওই ব্যাটারি আর বাঁশের মই-মাঁচা-সিঁড়ি যেমন এঞ্জিনে স্টার্ট দিতে, বাড়ি তৈরি করতে অপরিহার্য, তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর গূঢ়ৈষণা ও অতৃপ্ত বাসনা। শিল্পীর বোধকে অনুক্ষণ ওই এষণা ও বাসনাগুলি উত্তপ্ত উত্তেজিত রাখে। সে উত্তাপ ও উত্তেজনাকে শিল্পের মধ্যে মুক্তি দিতে তখন অস্থির হয় শিল্পী। এটাই শিল্পের জন্মকথা। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত

বোধকে তাঁর শিল্পের মাধ্যমে সার্বজনিকতায় উত্তীর্ণ করে দিয়েই যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠেন।

যে সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে পারেন না এবং তাকে পারেন না সার্বজনিক করতে, তাঁর সাহিত্য কখনো কালের ধোপে টেকে না। দস্তয়েফ্‌স্কি কেন চিরকালের আধুনিক তার উত্তরও এখানেই। এবং ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে সেটাই চরম প্রতিবাদ—প্রতিভা এবং রোগীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি ডাক্তার ফ্রয়েড।

চার

বাবাকে দস্তয়েফ্‌স্কি ঘৃণা করতেন; কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি কখনো। তাঁকে তলিয়ে বুঝতেই বরং চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টার ফলে এ-ধরণের মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিরই সঞ্চার হয়েছিল……। পিতা সম্পর্কে সেই সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ১৮৩৮-এর একখানা চিঠিতে। দস্তয়েফ্‌স্কি তখন পিতার্সবুর্গে আরমি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন আর মিখাইল রেভাল-এর এঞ্জিনিয়ারিং একাডেমিতে। দাদাকে এক চিঠিতে দস্তয়েফ্‌স্কি লিখেছেন, "আহ্‌, কী বিয়োগান্ত নাটক বাবার জীবন! তিনি দুর্ভাগ্যের মার যে কত সহ্য করেছেন তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। তাঁকে শান্তি দিতে সান্ত্বনা দিতে কিছু করতে পারছি না বলে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু কী জান, বাবা পঞ্চাশটা বছর বেঁচে থেকেও দুনিয়াটাকে চিনলেন না। তিরিশ বছর আগে তাঁর যে ধারণা ছিল মানুষ সম্বন্ধে, এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও সেই ধারণা নিয়েই বসে আছেন তিনি। অজ্ঞতার কি শান্তি! কিন্তু অজ্ঞতা তাঁকে বড্ড বেশী হতাশ করেছে। আসলে মনে হয় এ-ই যেন আমাদের সকলেরই সাধারণ ভাগ্য।"

দস্তয়েফ্‌স্কি এ-চিঠি যখন লিখেছেন তার আগেই ডাক্তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি তখন তার খেত-খামার দেখাশোনা করছেন, আর মদ মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে উঠেছেন। সত্যি, ডাক্তারের হাত ফস্‌কে সাফল্যের জীবন তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।

ডাক্তারের মতন মানুষ যারা ব্যর্থজীবনের ভারে পঙ্গু হয়ে অবশেষে মদ ও মেয়েমানুষের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছে, তাঁর বাবা ও মামার মতন সেই সব অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের নিয়েই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

পরিণত জীবনেও সেই সব চরিত্রই বারে বারে তাঁর শিল্পমানসকে প্রভাবিত করেছে, স্বাভাবিক। মানুষের ওপরে শৈশব ও কৈশোরের প্রভাব স্বতঃই গভীর ছাপ রেখে যায়।

তিন কামরার ছোট্ট একটা কোয়ারটারে কঠোর শাসন ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে শৈশবের তেরোটা বছর বাড়ির মানুষগুলির মুখ দেখে দেখেই কেটেছে দস্তয়েফ্‌স্কির।

ছোটরাও কখনো কখনো একলা হতে চায়, একলা বসে আপন মনে বিড়বিড় করতে ভালবাসে। আবার হাত পা ছুড়ে ছুটতে চায়, খেলতে চায়। উজ্জ্বল রৌদ্রে সবুজ মাঠে নীল আকাশের নিচে মুক্তি চায়। কিন্তু ফিওদর দস্তয়েফ্‌স্কি ও তাঁর ভাইবোনদের ভাগ্যে সে-সব দুর্লভ ছিল। শীতের দিনে কষ্টটা ছিল সব চেয়ে বেশী। তখন তিনখানা ঘরের বন্ধ দেয়ালের মধ্যে সবাইকে বন্দী হয়ে থাকতে হত। মুক্তি মিলত গ্রীষ্মে। পুনরায় বরফ পড়ার আগে অব্দি বাইরে একটু হাত পা ছড়িয়ে বসা যেত কি মনের সুখে খানিকটা ছুটোছুটি করা যেত। কিন্তু বিধিনিষেধের সীমা তখনও পার হওয়া যেত না। অভিভাবক মতন কেউ সঙ্গে না থাকলে বেরোবার উপায় ছিল না। বেরোলে বিপদ ছিল। ডাক্তার ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত দিতেন না। দেওয়ার দরকার হত না। তাঁর কঠোর স্বর নির্মম ভ্রূ-ভঙ্গীতে ছেলেমেয়েদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসত। তারা কথা ভুলে যেত। তাদের গলা শুকিয়ে উঠত।

ডাক্তারের একটা নিদারুণ আগ্রহ ছিল ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা—দুই অর্থেই, বিদ্যায় এবং আচার-আচরণে। ডাক্তার মুখ বুজে থাকলেও পূর্বপুরুষের গ্লানি তাঁকে যে অহরহ দগ্ধ করছে, টের পাওয়া যেত। ডাক্তারী পাশ করার পরেই বংশপরিচয়ের সরকারী খাতায় তিনি 'সম্ভ্রান্ত (noble) পরিবারের সন্তান' কথাটি লেখেন। বংশপরিচয়ের দলিল দস্তাবেজ চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন—ও-সব কে আর যত্ন করে রাখে, কোথায় কবে হারিয়ে গেছে মনেও নেই। সসম্মানে উত্তীর্ণ একজন ডাক্তার তদুপরি এক মহাযুদ্ধের পদস্থ সৈনিক বলে কি সরকারী কি বেসরকারী কোন তরফ থেকেই দলিল দাখিলের প্রশ্ন ওঠে নি। বিশিষ্ট ব্যক্তিটির মুখের কথাকেই সকলে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। তবু সত্য গোপনের যন্ত্রণা ভুলতে পারেন নি ডাক্তার, তাই সন্তানদের বিদ্যায় ও প্রতিষ্ঠায় সম্ভ্রান্ত করে নিজের মিথ্যা ভাষণকে সত্য করে তুলতে চেয়েছেন। মিখাইল ও ফিওদর বড় বলে তাঁর চেষ্টার সব চাপ ওদের ওপরেই এসে পড়ত

বেশী করে। সময় ও সুযোগ করে গ্রীষ্মের বিকেলে ওদের নিয়ে তিনি নিজেই বেড়াতে বেরোতেন। আর শিক্ষণীয় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো স্থূল সূক্ষ্ম ও সমকোণের বৈশিষ্ট্য, সরল ও বক্ররেখার বৈচিত্র্য, ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ ইত্যাদির জ্যামিতিক তাৎপর্য বোঝাতেন। কখনো শোনাতেন ইতিহাস। রাশিয়ার সঙ্গে নাপোলিওঁ-র রক্তাক্ত যুদ্ধে রাশিয়ার জয়ের কথা বলতে বলতে গর্বে তাঁর কণ্ঠ গম্ভীর হত। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কথায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগমুক্ত থাকার উপায় ব্যাখ্যা করতে করতে নিয়মানুবর্তিতার ওপরে প্রবল কণ্ঠে জোর দিতেন।

গ্রীষ্মের সময়ে রোগীরা এসে হাসপাতালের মাঠে জড় হত। তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও আসত। ফিওদর তাঁর ভাই-বোনদের নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে চাইত। ফিওদর চাইত তাদের পরিচয় জানতে, আলাপ করতে, বন্ধু হতে। কিন্তু পিতার শাসনে নিরস্ত হয়ে থাকতে হত সকলকে। বাইরের কারো সঙ্গে মেলামেশা করার অধিকার ছিল না তাদের, বিশেষ করে বস্তির মানুষদের সঙ্গে। পিতার রক্তচক্ষু শাসন নিঃসঙ্গ করে রাখত সকলকে। তারা দূর থেকে সমবয়সীদের দেখত আর নিঃশ্বাস ফেলত। তারপর ফিরে আসত নিজের মানুষদের মধ্যে। নিত্য দেখা একঘেয়ে মুখগুলিকেই বার বার করে দেখত। এই একঘেয়েমি দূর হত ছুটিছাটায় এবং সপ্তাহের দু'একটা দিনে যখন ডাক্তার হাতের কাজ সরিয়ে রেখে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এসে বসতেন। সেদিন আর পাঠ্যপুস্তক নয় তাঁর হাতে থাকত ইতিহাস গল্প উপন্যাস কবিতার বই।

সেকালের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা রেওয়াজ ছিল পরিবারের সকলে সন্ধ্যার সময় এক ঘরে জড় হতেন। সেখানে একজন কোন একখানা বই বড় গলা করে পড়তেন আর সকলে শুনতেন। ডাক্তারও সে রেওয়াজের অনুরাগী ছিলেন কিংবা সম্ভ্রান্ত প্রমাণ করতে সে রেওয়াজ অনুকরণ করতেন। এ অনুরাগ বা অনুকরণের পেছনে অবশ্য কিছু সাহিত্য প্রীতিও ছিল। দেশপ্রেমমূলক আবেগ-প্রবণ রম্য উপন্যাস তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ফিওদরের বাবা-মাও সে-সব সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। লেখকদের মধ্যে নিকোলাই কারামজিন, আলেকসান্দার ঝুকোফ্‌স্কি তখন রাশিয়ার সাহিত্য-পাঠকদের খুব প্রিয়। কবি ঔপন্যাসিক ও ইতিহাস লেখক কারামজিন তাঁদের মধ্যে সেরা। তাঁর 'রুশ পথিকের চিঠি', 'পশ্চিম য়ুরোপ ভ্রমণের ডায়েরি', 'রুশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস' ডাক্তারের কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে ওই

সব বই থেকে গল্প কাহিনী শোনাতেন। সে আসরে ফিওদরই ছিলেন মুগ্ধ শ্রোতা। সেদিন তাঁর মুগ্ধ মনে কারামজিন যে দাগ কেটে দিয়েছিল, কোনদিন তা মোছে নি, আবছা হয় নি। বস্তুত কারামজিনের চিন্তাই ফিওদর দস্তয়েফ্স্কির রাজনৈতিক চেতনার ভিত গড়ে দিয়েছিল।

'সঙ্কীর্ণ জাতীয় সংস্কার-মুক্ত' 'বিশ্ব-মানুষ'-এর বোধ নিয়ে কারামজিন য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ফিরে এলেন তিনি আর বিশ্ব-মানুষ, কসমোপলিটান নন, একজন জাতীয়তাবাদী রুশ দেশপ্রেমিক। কারামজিন তাঁর 'রুশ পথিকের পত্র'তে লিখেছেন—'আমার দেশ, আমি তোমার জন্যে গর্ব বোধ করি। আমি অবশেষে রাশিয়ায় ফিরে এসেছি। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হব।' তিনি দেশে ফিরতে পেরে এত খুশী হয়েছেন যে, লিখছেন—'আমি পথ-চলতি মানুষদের থামিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি কেবল মাতৃভাষা শোনার জন্যে।'

কারামজিন তাঁর বিখ্যাত বই 'রুশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, 'পশ্চিম য়ুরোপের চিন্তার সংক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়া একটা কঠিন বাধার দেওয়াল।' তিনি পশ্চিম য়ুরোপের অবক্ষয়ের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের পতনের তুলনা করেছেন।

এইসব তুলনামূলক বিচার ও আত্মবিশ্লেষণ এবং বিশেষ করে তাঁর 'মুমূর্ষু রোম' দস্তয়েফ্স্কির মনে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল। তিনি পিতার্সবুর্গে থাকাকালীন প্রথম দশ বছর ফ্রান্সের ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজমের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বটে কিন্তু জীবনের শেষ অধ্যায়ে কারামজিনের দীর্ঘ ছায়ার নিচেই ফিরে এসেছেন আবার করে।

কারামজিনের ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত যেমন তেমনি তার উপন্যাসও বিশেষ করে তখনকার জনপ্রিয় বই 'অভাগী লিজা' দস্তয়েফ্স্কির তরুণ রোমান্টিক অনুভাবনাকে খুবই উৎসাহিত করেছিল।

ডাক্তার বই পড়তে পড়তে মাঝে মধ্যে থেমে যেতেন। ছেলেমেয়েদের মনে বিষয়টা ভাল করে দাগ কেটে দেওয়ার জন্যে পড়ে-আসা পাতাগুলি সংক্ষেপে সরল ভাষায় আবার করে বলে যেতেন এবং পড়া শেষ হলে তাঁর মূল তাৎপর্য ও নীতিশিক্ষার দিকটা ব্যাখ্যা করতেন। এ-ভাবে টিকা ভাষ্যসমেত কাহিনী শোনার ফলে দস্তয়েফ্স্কির শিল্পবোধ প্রখর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য এর কুফল বশত প্রতিভা উন্মেষের প্রথম অধ্যায়ে তাঁর রচনায় পরকীয় শিল্পরীতির ছাপও

পড়েছিল স্পষ্ট ভাবে। যেমন 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে। কারামজিনের 'অভাগী লিজা'র নায়ক এরাসটাসের সঙ্গে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের নায়ক আলিওশার চরিত্রের বহিরঙ্গে পার্থক্য সামান্য। কিন্তু যেখানে জীবন-জিজ্ঞাসার চরম প্রশ্ন, সেখানে দু'জনে দারুণ পৃথক। কারামাজিন আত্মসমর্পণ করেছেন সেন্টিমেন্টাল স্কুলের কাছে। 'অভাগী লিজা'র নায়ক এরাসটাস নিষ্পাপ যুবতী লিজার দেহ ও মনের চরম ক্ষতি করেছে। শেষে উচ্ছিষ্টের মতন তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে রেখে এক ধনী বিধবা রমণীকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছে। তবু কারামাজিন এরাসটাসের কোন দোষ দেখেন নি, কেননা, তাঁর মতে পৃথিবীতে অনেক অপ্রীতিকর ও অন্যায় কার্য ঘটে; সে সকল কার্য যেহেতু নিয়তি কিংবা ঈশ্বরের প্ররোচনায় ঘটে, অতএব মানুষকে দোষী করে লাভ নেই; ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে সে-সবকে অন্ধবিশ্বাসে মেনে নেওয়াই শান্তি। এখানেই দস্তয়েফ্স্কির ঘোরতর আপত্তি। দস্তয়েফ্স্কি বলেন, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী; তার কৃতকর্মের দায় তাকেই বহন করতে হবে এবং তদ্দ্বারাই সে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে। কাহিনীকে এই নূতন তত্ত্বের পথে মোড় ফিরিয়ে দিয়েই দস্তয়েফ্স্তি সহসা তাঁর সমকালকে অতিক্রম করে আসেন। বিশ্বের তাবৎ সাহিত্য-রসিক ও দার্শনিক তাঁর দিকে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকান। সে ১৮৪৫-এর পরের কথা।

এখন তিনি লাতিন শেখেন ফ্রেঞ্চ পড়েন অঙ্ক কষেন স্কুলের পাঠ তৈরি হলে বাবার কাছে শোনেন কবিতা গল্প ইতিহাস। এ সব শেষ হলেও সময় থাকে; তখন কোয়ারটারের সামনের চত্বরে ছুটোছুটি করেন। দূরে সমবয়সী দরিদ্র প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন না, নিষেধের প্রাচীরের গায়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে আসেন। বালক ফিওদর বাইরের সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে না পেরে ঘরের মানুষগুলিকে বহুবার পড়া বইয়ের মতন বারবার উলটে পালটে দেখেন।

এই মানুষগুলি আর কোয়ার্টারের ছোট ছোট ঘর তাঁর উপন্যাসে নানা ভাবে নানা চেহারায় ঘুরে ফিরে বারে বারে এসেছে! তাঁর বাবা-মা-ভাই-বোন দাসদাসী কেউ বড় একটা বাদ যায় নি। এমন কি মেরী মায়ের মূর্তি, তাঁর সামনেকার মোমের পলকা-প্রদীপ, দরদালানে এসে পোষা কুকুরের মতন পড়ে-থাকা পড়ন্ত বিকালের রোদটুকুও তিনি ভুলতে পারেন নি। তাঁর প্রথম দিককার কতকগুলি কাহিনী ও শেষদিককার বিখ্যাত উপন্যাসগুলির অনেক বেপথুমুহূর্ত

উন্মোচিত হয়েছে ওই পড়ন্ত বেলার আলোয় কিংবা মোমবাতির নরম শিখার সামনে।

'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' (কারামাজোভ ভাইরা) উপন্যাসে আলিওশার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে একটি শান্ত গ্রীষ্মের সন্ধ্যা : একটি খোলা জানলা ; পড়ন্ত বেলার দিঘল একফালি রোদ। ঘরের কোণে দেবীমূর্তি। তাঁর সামনে মোমের প্রদীপ—মা নতজানু হয়ে বসে আছেন মূর্তির সামনে : এ দৃশ্যই ত দস্তয়েফ্‌স্কি নিত্য দেখেছেন মারিন্‌স্কায়া হাসপাতালের কোয়ারটারে। 'গোসপোতিন প্রোখারচিন' (শ্রী প্রোখারচিন) গল্পেরও এক দৃশ্যে সেই মোমের বাতি। বাতিটি পুড়তে পুড়তে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তারই থর থর নরম আলোয় দেখা যাচ্ছে : হাড় কিপটে মানুষটা মরে পড়ে আছে বিছানায়। একদল ভিখিরী তার বিছানা বালিশ উলটে পালটে, জিনিসপত্র হাটকে ঘেঁটে খুঁজছে তার লুকোনো সোনাদানা টাকাকড়ি। তাঁর প্রথম বয়সের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস 'নেতোচকা নেজভানোভা'-তে একজায়গায় মোমবাতির গা বেয়ে চর্বি গলে গলে পড়ছে। শিখা কাঁপছে থরথরিয়ে। ভয়ে দুঃখে মূক মেয়ে সেই আলোয় অপলক তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে : তার মাথাপাগল বাপ তার সদ্য মৃত মায়ের শরীরের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে প্রাণপণে বেহালা বাজাচ্ছে। 'জাপিস্‌কি ইজ মিওর্‌ৎভোগোদোমা' (মৃত্যুপুরীর স্মৃতি)-তেও সেই চর্বির বাতি। তবে এখানে তা লণ্ঠনের মধ্যে, কাচে ঘেরা। তার কম্পিত শিখার আলোয় দস্তয়েফ্‌স্কি দেখছেন কয়েদীদের মুখ। হাওয়ায় শিখা প্রবল হয়ে জ্বলে উঠলে চোখে পড়ে মুখগুলি, নিবু নিবু হয়ে এলে আবছায়ায় মিশে যায়। আলো-আঁধারির এই লুকোচুরির মধ্যে কখনো দৃশ্যমান কখনো অদৃশ্য মুখগুলি তাঁকে নিদারুণ ভাবে মনে করিয়ে দেয় কী ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে তিনি পড়েছেন। 'নোটস ফ্রম দি ডার্ক সেলার'-এও জ্বলছে এক মোমের বাতি। সে আলোয় নায়ক তার হাড়জ্বালানো বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া দেখছে গণিকার মুচড়ে মুচড়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে। গণিকা তাকিয়ে আছে নায়কের দিকে। নায়কের মুখে আধ-পাগলা মানুষের একচিলতে নিরর্থক হাসি ঝুলে আছে। 'প্রেস্তুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' (পাপ ও শাস্তি) উপন্যাসের নায়ক রাসকলনিকফ্‌ও মোমের থরথরে আলোতে প্রথম দেখতে পায় মিসেস মারমেলাদফ্‌-এর উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠা মুখ। সেই একই নিঃশেষ হয়ে আসা মোমের আলোতে বেশ্যা সোনিয়া খুনী রাসকলনিকফ্‌কে

পড়ে শোনায় বাইবেলের গল্প লাজারাসের পুনরুত্থান। 'দ্য ডেভিলস' উপন্যাসের ভেরখোফেন্‌স্কিও সেই কম্পিত মোমের শিখাতেই আত্মহত্যার আগে কিরিলফ্‌-এর শক্ত ঋজু শরীরটা দেখছে।

নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতাও উপস্থাপিত দেখি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদনিয়ে লিয়ুদি-'তে' (অভাজন) 'আহ্‌, শরৎ! শরৎ কী সুন্দর! আমি শরৎকাল বড় ভালবাসি।'

ডাক্তার যখন শ'খানেক ভূমিদাস সহ তুলার দুটি গ্রাম দারোভোয়ে আর চেরমোশনিয়া কেনেন দস্তয়েফ্‌স্কির বয়স তখন বছর দশ। সেই থেকে মা বেঁচে থাকা অব্দি মায়ের সঙ্গে গ্রীষ্ম কাটত তাঁর ওই গ্রামে। তখনকার অভিজ্ঞতাই লিখছেন তিনি—'তখন আর আমার বয়স কত, এতটুকুন ছোট্ট ছেলে আমি তখন, তবু কী প্রবল অনুভূতি ছিল আমার। শরৎ-সকাল থেকে শরৎ-সন্ধ্যা আমাকে বেশী আকর্ষণ করত। মনে পড়ে আমাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে পাহাড়ের কিনারে একটি লেক ছিল। চোখ বুজলে এখনো যেন দেখতে পাই তার স্ফটিকস্বচ্ছ উজ্জ্বল কাচমণি জল। যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, স্তব্ধ হয়ে যেত গাছ-গাছালির পাতার শব্দ, লেকের জলেও আর ঢেউ থাকত না। লেকের জল তখন যেন আয়না—তেমনি নির্মল ঠাণ্ডা। তখন ঘাসের ওপরে শিশির জমতে শুরু করত। গরু, ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরত রাখাল। লেকের পারে চাষীদের কুঁড়ে ঘরে আলো ঝিক্‌মিক্‌ করত। আমি নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে লেকের পারে বসতাম। বসে তাকিয়ে থাকতাম জলের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সময়ের হিসেব ভুলে যেতাম। জেলেরা লেকের ধারে তাদের ছাউনিতে আগুন জ্বালত। তার উজ্জ্বল শিখার প্রতিবিম্ব লেকের জলে ভেসে ভেসে অনেক দূর চলে আসত। আকাশ তখন গাঢ় নীল, শীতল, তার কিনারে মেঘের লাল মিনার। ক্রমশ সে মিনারের রং মলিন হতে হতে অন্ধকারে মুছে গেলে চাঁদ উঠত। তখন শান্ত বাতাসের শরীরে ধাক্কা খেয়ে তুচ্ছ শব্দও স্পষ্ট শোনা যেত। কোথায় একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল, কোথায় একটা পাখি ডানা ঝাপটাল, কোথায় একটা মাছ জলের উপরে ঘাই দিল—কিছুই কান কসকে যেত না। নীল জলের উপরে ক্রমশ সাদা কুয়াসার স্বচ্ছ আবরণ জমত। দূরের জিনিস ঢেকে যেত অন্ধকারে। মনে হত কুয়াসা যেন সব গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু নিকটের সব কিছু তখনও স্পষ্ট যেন কেউ কুয়াসার গায়ে বাটালি দিয়ে খোদাই করে রেখেছে।

পাড়, নৌকো, দ্বীপ, অকেজো পিঁপে, উইলো গাছ, গাছের ভাঙ্গা ডাল তার হলুদ পাতা দেখতে কিছু বাকি থাকত না। সব সঙ্গী চলে গেলে তখনও যে একলা পানকৌড়িটি জলের মধ্যে ডুবত আর ভাসত, তাকেও আমি দেখতে পেতাম, তার গলার স্বর শুনতে পেতাম, কুয়াসার মধ্যে তার মিলিয়ে যাওয়া আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠা অলৌকিক লাগত, আশ্চর্য মনে হত……'

শুধু লেক না—দারোভোয়ে-র খেত-খামার, গাঁয়ের মেয়ে, তাদের গান, খেলা; শীতের প্রতীক্ষা; শীত এলে সব গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া; পাইন অরণ্যের কালো রং, কুয়াসার মধ্যে দিয়ে তাদের বীভৎস অসুর মতন দৃশ্য ফিওদরের মন ভোলাত। যখন সঙ্গে কেউ থাকত, ফিওদর ক্রমশ অজ্ঞাতসারে তাদের পেছনে পড়ে একলা হয়ে যেতেন। চারদিকের বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হয়ে তাঁর খেয়াল থাকত না, তিনি পেছনে পড়ে একলা হয়ে গেছেন। হঠাৎ নিজেকে একলা দেখে চমকে উঠতেন, ভয় পেতেন—এই বুঝি গাছের কোটর থেকে হাত বাড়িয়ে ধরল তাঁকে কোন সাংঘাতিক জন্তু কিংবা হঠাৎ ঝড় উঠলে—শুকনো পাতা উড়িয়ে, ডালপালা ভেঙে প্রবল বাতাস ছুটলে - গাছের আশ্রয় থেকে তাড়া খেয়ে পাখিরা আকাশে ডানা ঝাপটাতে থাকে, তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে আর ভয়ে শিটিয়ে ওঠেন ফিওদর; তখন কে যেন তাঁর কানে কানে বলে ওঠে দৌড়ও ছেলে, দৌড়তে থাক, সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটবে। সেই ফিসফিস শব্দে ফিওদরের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ হয়, তিনি প্রাণপণে ছুটতে থাকেন। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরতে দম ফুরিয়ে যায় কিন্তু ঘরের ভিতরে পা রাখলে আর ভয় থাকে না। তখন সব ঘরে আলো। সবার মুখে হাসি। সকলেই নিশ্চিন্ত।

এগারো-তেরোর এই স্মৃতি তিনি চুয়ান্নতেও ভোলেন নি। ১৮৭৬-এ তাঁর লেখকের ডায়েরিতে লিখেছেন—'গ্রীষ্মের খটখটে উজ্জ্বল রোদের দিন অথচ দুরন্ত বাতাসে শরীরের শীতবোধটা একেবারে যায় না; তবু ভাল লাগে।……আমি শস্য মাড়াইয়ের উঠোন পেরিয়ে পাহাড়ী নালার দিকে যাই, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নালা পেরিয়ে ওপারের বনে ঢুকি। অদূরে হয়ত তখন আমাদের কোন দাস চাষ করছে। আমি আমাদের সব ভূমিদাসদেরই চিনি কিন্তু তখন আমার নজর অন্যত্র। আমি তখন হেজেল গাছের ডাল ভেঙে ব্যাঙ তাড়াচ্ছি…বোলতা ফড়িং রংবেরংয়ের পোকা ধরছি, আমার মনোযোগ কাড়তে কেউ কম যায় না। আমার মনে ধরলেই পোকা

ধরে পকেটে পুরি। লাল হলুদ টিকটিকিও আমার বেজায় পছন্দ। কিন্তু সাপ। ভাবতেই আমার গা কাঁটা দেয়। মা পই পই করে বারণ করে, বনবাদাড়ে যাস নে বড্ড সাপের ভয় এ-দিকটায়। তা মা'র যত ভয় আমার তত না। তাছাড়া দেখেছি এখানে পোকা মাকড় ব্যাঙ টিকটিকির ছড়াছড়ি হলেও সাপ কদাচিৎ দেখা যায়। আমি পোকা টিকটিকি দেখতে দেখতে এগোই। এখানে ব্যাঙের ছাতা বেশী নেই। ব্যাঙের ছাতা পেতে হলে যেতে হয় সেই বার্চ-এর বনে।

সেদিন আমি সেদিকেই যাচ্ছিলাম কি বুনো বেরী আর ব্যাঙের ছাতা আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—ও দুটোই আমাকে লোভাত সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তাই বা কি করে বলি, মৌমাছি আর নানান জাতের পাখি, সজারু আর কাঠবেড়ালী পচা পাতার সোঁদাগন্ধ কি না আমার ভাল লাগত, আমাকে টানত। এই যে এতকাল পরে লিখছি, এখনও যেন বার্চ বনের গন্ধ পাচ্ছি নাকে--এ-সব দৃশ্যের স্মৃতি সারা জীবনে কেউ ভোলে না। সেদিন হঠাৎ সমস্ত বন স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই নৈঃশব্দের মধ্যে আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'নেকড়ে'! 'নেকড়ে'! আমি ভীষণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলাম। প্রবল ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকলাম। বন থেকে বেরিয়ে খেতের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম চাষী মারিয়ার কোলে। বুড়ো মারিয়া আমাকে কোলের মধ্যে সাপটে ধরে রাখল। আমাকে সান্ত্বনা দিল। আমার ভয় দূর করতে কত করল; যেন আমি তার ছেলে। আমি যদি তার সত্যিকার ছেলে হতাম ত এর চেয়ে বেশী উজ্জ্বল মমতার চোখে সে আমার দিকে তাকাতে পারত না।......'

যে কাল্পনিক ভয় শৈশবে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল সারা জীবনই সে ভয় তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। হঠাৎ হঠাৎ কী এক ভয়ে তিনি শিটিয়ে উঠতেন, তাঁকে বিপর্যস্ত করে ফেলত। কিন্তু এখানে এই ডায়েরির পাতায় সে ভয়ের কথা না, দারোভোয়ে-র অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যও না, তিনি অন্য কথা বলতে চেয়েছেন। দস্তয়েফ্স্কির বাবা কোনদিন ওই চাষীর মতন তাঁকে বুকে টেনে আদর করেন নি, কি অমন স্নেহের চোখে তাকান নি বলেই চুয়ান্ন বছর বয়সেও সেদিনের অনুভূতিটি তাঁর মনে টাটকা তাজা থেকেছে। কাঁচা পাকা চুল ঘন কালো দাড়ি সুঠাম সুপুরুষ বুড়ো মারিয়াকে, তার আদরকে, ভুলতে পারেন নি তিনি। ভুলতে না পারার আর এক কারণ, এইসব সরল সুন্দর সহজ মানুষরাই ছিল তাঁর বাবার

ভূমিদাস। কারণে অকারণে এদের ওপরে তিনি নৃশংস অত্যাচার করতেন। মা বাধা দিতে চাইলে তাঁকে তিনি ঘরে শিকল এঁটে রাখতেন। সামন্ত প্রভুদের এই নৃশংসতার ওপরে সেই শৈশবেই দস্তয়েফ্‌স্কির মনে অসন্তোষ জন্মেছিল। সেই অসন্তোষ মমতার প্রস্রবণ হয়ে নেমে এসেছিল এইসব অপমানিত ও লাঞ্ছিত মানুষদের ওপরে। সারা জীবন তিনি এদের ভালবেসেছেন। এরা অজ্ঞ অশিক্ষিত ক্রীতদাস কিন্তু এদের হৃদয়টি বড় মমতা-কোমল, বড় পবিত্র মধুর। এই মমতা-কোমল পবিত্র হৃদয়ের মানুষগুলিকে ভালবেসেই তিনি নির্বাসনের চরম দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। এইসব অপমানিত মনুষ্যত্বের মুক্তিই ছিল তাঁর স্বপ্ন, সাধনা।

পাঁচ

শৈশবে যে ধারণা ও বিশ্বাসগুলি মানুষের মনে অজ্ঞাতসারে দাগ রেখে যায় পরিণত বয়সে সেগুলিই জীবন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গী নির্দিষ্ট করে—যাঁরা এ তত্ত্বে বিশ্বাসী দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনী তাঁদের নিঃসন্দেহে অনুসন্ধিৎসু করবে।

শহরের মানুষ দস্তয়েফ্‌স্কি জন্মেছেন শহরে, বড় হয়েছেন শহরে, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সারা জীবন তিনি 'শহুরে'ই থেকে গেছেন—তাঁর সমগ্র সৃষ্টিই শহরকেন্দ্রিক। অথচ মজা এই, এগার থেকে তের বছর বয়স অব্দি মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে থেকেও এবং সে স্মৃতি সারাজীবন বহন করেও কখনো তিনি প্রকৃতির শিল্পী হতে পারেন নি। তুর্গেনেভ্ তলস্তয়ের মধ্যে আমরা প্রকৃতির যে বিশাল পটভূমি পাই, দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এমন কি ভবঘুরে গোর্কির মধ্যে রুশ শহরতলির যে পরিবেশের প্রভাব দেখি, দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে তারও একান্ত অভাব লক্ষ্য করবার মতন। শৈশবের নানা স্মৃতি তাঁর রচনায় উঁকি দিয়ে গিয়েছে সত্য, তবু তার উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতির স্থান বড় নগণ্য। কলমের দ্রুত টানে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমি কখনোই প্রখর হয়ে উঠে পাঠককে ঘটনা বা চরিত্র থেকে অন্যমনস্ক করে না। শীতের তুষার, গ্রীষ্মের ঘাম, নোংরা রাস্তা, কাদা কি ধুলো, কুঁড়ে কি চিলেকোঠা বর্ণনায় কেউই কোথাও পৃথক দৃশ্য হয়ে ওঠে নি। সমস্তই চরিত্র বা ঘটনার অঙ্গ ও অংশ হয়ে গিয়েছে। তাঁর এক উপন্যাসের নায়ক বলেছিল, ছোট্ট ঘরে থাকতে থাকতে চিন্তার, দৃষ্টির বিস্তারও ছোট হয়ে আসে, সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। দস্তয়েফ্‌স্কির নিজেরই তাই হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের

লক্ষ্যই ছিল যেন এক অসহ্য বন্দীদশা সৃষ্টি করা। উদার অনন্তবিসারী দৃশ্যের থেকে তিনি দৃষ্টি গুটিয়ে এনেছেন। মানুষের বুকে তার অন্তর্দাহের কেন্দ্রে এনে সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। পৃথিবীর সব সেরা-লেখকদের মধ্যে একটা দার্শনিক নির্লিপ্ততা দেখা যায়। কিন্তু দস্তয়েফ্স্কির যেন সেই অনাসক্তির বিরুদ্ধেই কঠিন জেহাদ। অথবা তিনি নিজে যে আত্মিক যন্ত্রণার শিকার তাঁর উপন্যাসের কুশীলবরাও তাঁর সমকালের সেই যন্ত্রণারই সমান অংশীদার বলে নিজেকে কখনো তাদের থেকে পৃথক করতে পারেন নি তিনি কি শহর জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী তিনি ও তাঁর নায়ক-নায়িকারা সকলেই একই সমাজ ও সময়ের অসহায় আহত মানুষ বলে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত হওয়ার উপায় ছিল না তাঁর।

জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রতিশ্রুত দস্তয়েফ্স্কি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই তাঁর প্রতিভাকে সব সময় নিযুক্ত রেখেছিলেন। মানুষের মনের ভিতরকার জগৎটাকে উন্মোচন করতে মগ্ন শিল্পী প্রায়শই বাইরের জগৎটাকে ভুলে থেকেছেন। বাহিঃপ্রকৃতি থেকে অন্তঃপ্রকৃতিই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছে। এ আকর্ষণ তাঁর বালককালেই অনুভব করেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি।

দারোভোয়ের খামার বাড়িতে একটা ছেলে তাঁর সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে কেবল তার কাণ্ড দেখতেন। নিষ্ঠুরতায় তার জুড়ি ছিল না। হত্যার মধ্যে যে একটা তীব্র সুখ আছে ওই বয়সে সেই তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। দস্তয়েফ্স্কি তাঁর 'লেখকের ডায়েরি'তে উল্লেখ করেছেন, 'আমাদেরই এক ভূমিদাসের ছেলে সে। পাখি হোক কি কোন জন্তু, সুযোগ পেলে তার ওপরে অমানুষিক অত্যাচার চালাতে তার যেন তৃপ্তির অবধি থাকত না। আমাদের খাওয়ার জন্যে যখনই মুর্গি মারার দরকার হত সে ছুটে এসে আগবাড়িয়ে দাঁড়াত। আমার মনে আছে, কেমন দুরন্ত আগ্রহে সে আমাদের শস্য-মাড়াইয়ের ঘরের খুঁটি বেয়ে বেয়ে চালে উঠে যেত আর কোথায় চটক পাখির বাসা আছে খুঁজত। পেলে পরম আনন্দে সে-বাসা ভেঙে পাখির ছানা টেনে বের করত। মুচ মুচ করে তাদের ডানা ভাঙত, কচি কচি ঘাড়গুলিকে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলত।' কৌতূহলবশত কিংবা হত্যার স্পৃহা সংক্রামক বলে দস্তয়েফ্স্কিও মাঝে মধ্যে এ হত্যার খেলায় যোগ দিতেন। সে স্বীকৃতি তুর্গেনৃয়েফকে লেখা একখানা চিঠিতে আছে: তখন দস্তয়েফ্স্কি বিখ্যাত লোক, তুর্গেনৃয়েফকে লিখেছিলেন, "তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ—পারীতে যখন

ত্রোপমানকে খুনী সাব্যস্ত করে জনতার মাঝখানে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তুমি মুখ ফিরিয়ে থেকেছো। অথচ অন্যত্র ঘটছে বলে মুখ বুজে অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে থাকার এক্তিয়ার নেই মানুষের। যখন প্রতিবাদ করা মনুষ্যত্বের কর্তব্য, তখন আশ্চর্য তুমি কিনা বিনা প্রতিবাদে খোলা চোখে বিবর্ণ মুখে দেখে গেলে, একটা মানুষের মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হল, যেমন আমরা ছোটবেলায় চটক পাখির মাথা ছিঁড়ে ফেলতাম।"

ছেলেবেলার সেই হত্যার খেলার মধ্যে দিয়ে পরবর্তী কালে তাঁর যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার উল্লেখ পাই 'নেতোচকা নেজভানোভা' উপন্যাসে।—সেখানে একজায়গায় তিনি লিখেছেন—'প্রত্যেক ধরনের অত্যাচারের মধ্যেই একটা তীব্র সুখানুভব আছে আর তারই অনুষঙ্গী হয়ে আছে একটা অনুতাপ ও মায়া এবং আপন মনুষ্যত্বহীনতার গ্লানি।' একেই আবার তাঁর বিখ্যাত গল্প 'সোন স্মেশ্নোগো চেলোভেকা' (এক উপহাসিত মানুষের স্বপ্ন)-তে বলেছেন, 'নিষ্ঠুর যৌনবাসনা (ধর্ষকাম)। এই ধর্ষকামের প্রতি পৃথিবীর প্রায় সব মানুষেরই একটা ঝোঁক আছে। আর এই ধর্ষকামই মানুষের সকল 'পাপের' একমাত্র উৎস।'

কিন্তু 'কাম' সম্পর্কে দস্তয়েফ্‌স্কির অভিজ্ঞতা প্রথম কবে হয়েছিল কেউ জানে না। আন্দ্রেই-র স্মৃতিচারণে পাই, মা বাবা ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণের দিকে কড়া নজর রাখতেন। বিশেষ করে ফিওদর ও মিখাইল বড় হয়েছে বলে তাদের ওপরে চোখটা সতর্ক থাকত বেশী। বাবা কি মা একলা কখনো ছেড়ে দিতেন না তাদের। যেখানেই যাক বড়রা কেউ সঙ্গে থাকবেই। বাবার চোখে যদৃচ্ছা চলাফেরাটা ছিল একটা অমার্জনীয় বেয়াদপি। তারা যখন স্যুচার্ড-এর বোর্ডিং-এ থেকে পড়ত তখনও ডাক্তারের হুকুম ছিল বাড়ির গাড়িতে তারা যাবে, সপ্তাহান্তে যখন আসবে, বাড়ির গাড়ি গিয়েই তাদের নিয়ে আসবে।

এ বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল হত দারোভোয়েতে গেলে। সেখানে ছোট বোন ভারভারার সাথী সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সে সুযোগে তিনি নারী-শরীর সম্পর্কে কৌতূহল মিটিয়েছেন বলে কোন কোন জীবনীকার দাবি করেন, অথবা সেই মেয়েদের মধ্যে ঘুরে তাঁর মনের মধ্যে একটা চাপা বাসনা জেগে থাকবে যে-অপূর্ণ ক্ষুধা তিনি মিটিয়েছেন কল্পনায়, উপন্যাসের কাহিনীতে যার ফলশ্রুতি 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত', 'পাপ

ও শাস্তি' এবং 'শয়তান' উপন্যাসের কতকগুলি সাবধানী কলমের লেখা দ্বিধাগ্রস্ত পাতা।

বাড়িতে সমবয়সীদের আনাগোনা ডাক্তার পছন্দ করতেন না। এমন কি ওঁরা যখন বোর্ডিং-স্কুলে পড়ছে তখনও কোন সহপাঠীর বাড়ি যাওয়া কি তাদের কাউকে বাড়ি নিয়ে আসার অনুমতি ছিল না। একমাত্র মায়ের বন্ধুর ছেলে বলে ভানিচকা য়ুমনোভ আসতে পেত বাড়িতে, হামেশাই আসত। সে ছিল স্টেট সেকেনডারি স্কুলের ছাত্র। ওই স্কুলটা ছিল ডাক্তারের দু' চক্ষের বিষ। প্রথমত ওই স্কুলের মাস্টাররা পড়ানোর চাইতে বেত মারতে বেশী ভালবাসে যেটা ডাক্তারের ছোটবেলা থেকেই না-পছন্দ। দ্বিতীয়ত তাঁর ভয় ছিল ওই স্কুলের বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে তার ছেলেরাও খারাপ হয়ে যাবে। তবু যে তিনি য়ুমনোভকে বাড়িতে ঢুকতে দিতেন সে নিতান্তই স্ত্রীর খাতিরে। য়ুমনোভ যে শুধু মিখাইল-এর চেয়েও বয়সে কিছু বড় ছিল তাই নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাও ছিল বেশী। সে গোপনে মিখাইল ও ফিওদরকে বই সরবরাহ করত। সে বইয়ের অধিকাংশই থাকত আধুনিক গল্প উপন্যাস কাব্য আর সাহিত্য সম্পর্কে রসালো গুজব গুঞ্জন। ডাক্তার যাঁকে সব চেয়ে ছেবলা আর অশ্লীল লেখক বলে ঘৃণা করতেন সেই গোগোলের বইও ফিওদরের হাতে প্রথম আসে ওই য়ুমনোভ-এর হাত দিয়ে। তা ছাড়া আরও অনেক 'নিষিদ্ধ' বইয়ের স্বাদ পান ফিওদর ওর কাছ থেকেই। ওর কাছ থেকেই তিনি 'কাম' সম্পর্কে পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করেন কি না, খুব স্পষ্ট নয়। তবে 'দ্য ডেভিল' উপন্যাস লিখবার সময়কার খসড়ার খাতায় স্থানে স্থানে য়ুমনোভ-এর নাম থাকার জন্যে অনেকে অনুমান করেন, স্কুলের বখাটে ছেলের যে চরিত্র ওই বইতে তিনি তুলে ধরেছেন তা য়ুমনোভ-এরই ছায়ায় ছায়ায় আঁকা। য়ুমনোভ যদি মিখাইল ও ফিওদরকে তার যৌন-জীবনের গল্প না-ই বলবে ত ফিওদর লিখলেন কি করে—'য়ুমনোভ বন্ধ দরজার চাবির ফুটো দিয়ে ঘরের ভিতরের নিরাবরণ মেয়েদের দেখত'। 'সে এক বিকলাঙ্গের ওপরেও অত্যাচার করতে চেয়েছিল', লিখেছেন তিনি।

দস্তয়েফ্স্কির কাহিনীগুলি সবই কপোল-কল্পনা নয়। তাঁর সব কাহিনীর মূলেই আছে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা-পরীক্ষিত বোধ ও ঘটনা। 'ব্রাতিয়া কারামাজোভ'-এর লিসাভেতাও তাঁর নিজের চোখে দেখা মেয়ে। তাঁদের দারোভোয়ের গ্রামে ছিল একটি জড়-বুদ্ধি যুবতী। দস্তয়েফ্স্কি

যখন তাকে দেখেছেন তখন তার বয়স কুড়ি কি পঁচিশ। কোথা থেকে এল, কার মেয়ে কেউ জানত না। তাকে সবাই ডাকত আগ্রাভেনা বলে। সে সারা বছর মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াত, কেবল প্রবল তুষারপাত শুরু হলে কেউ তাকে জোর করে ধরে এনে ঘরে আটকে রাখত। সে এক রকম কথাই বলত না কারো সঙ্গে। কথা বলতে বাধ্য হলে অত্যন্ত অনিচ্ছায় কথা বলত আর সে কথারও কোন মাথা মুণ্ডু থাকত না, অসংলগ্ন অবান্তর কিছু বলে যেতো। তার সেই আবোল-তাবোল কথাবার্তা থেকে গ্রামের মানুষ এটুকুই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে, তার একটি বাচ্চা ছিল কোথায় হারিয়ে গেছে, সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসল ব্যাপার হল এই মেয়েটা জন্ম-জড় হলেও তার ওপর অত্যাচার হয়েছিল, তাতে করে সে মা হয়। সন্তান হয়ে বাঁচে নি বেশী দিন। তাকে না জানিয়েই অন্যরা শিশুটিকে কবর দিয়ে দিয়েছিল। দস্তয়েফ্স্কির ছেলেবেলায় দেখা সেই আগ্রাভেনা উপন্যাসে লিসাভেতা হয়ে এসেছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, য়ুমনোভ থেকে দস্তয়েফ্স্কি কাম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শুধু য়ুমনোভ কেন, চেরমাক স্কুলের ছেলেরাও এ জ্ঞান দিতে পারে তাঁকে। কেন না, দস্তয়েফ্স্কি যখন 'এক মহাপাতকের জীবনী' ও 'দ্য ডেভিল'-এর খসড়া করেছেন তখনকার ডায়েরির কোণে কোণে স্যচারড আর চেরমাক-এর উল্লেখ দেখা যায়। যেন চেরমাক-এর কথাটাই তিনি বেশী করে মনে রেখেছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন '…বাবা খারাপ স্কুল সম্পর্কে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন অথচ তিনি জানতেন না চেরমাক-এ আমরা কী সাংঘাতিক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। দাদা কয়েকদিনের মধ্যেই পুরোনো ছেলেদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পেরেছিল কিন্তু আমি কিছুতেই পারি নি, ছেলেগুলির কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে আসত।"

চেরমাক-এ ভর্তি হওয়ার আগে অব্দি দস্তয়েফ্স্কি বাড়িতেই মানুষ। বাড়ি ছাড়া আর কিছু জানতেন না। চেরমাক-এ এসে সহসা তিনি শ'খানেক সমবয়সীর মধ্যে পড়ে গেলেন। অপরিচিত মুখ, অপরিচিত আচার ব্যবহার, অপরিচিত হৈ-হুল্লোড় চিৎকার। এর কিছুর সঙ্গেই তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এতকাল বাড়িতে যা জেনেছেন শুনেছেন শিখেছেন তার সঙ্গে এখানকার সামান্য মিলও নেই। সবই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন, বিপরীত। বিব্রত বিপন্ন দস্তয়েফ্স্কি ভেবেছেন, বুঝি একেই বলে নরক গুলজার। বাড়িতে হয়ত

কখনো ক্ষুধা ভুগতে হয়েছে, শীত সহ্য করতে হয়েছে। হয়ত বাবার কাছ থেকে যে প্রাণ ঢালা স্নেহ-মমতা আশা করেছেন তা পান নি কিন্তু তবু সেটা বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি নিজের আনন্দে থাকতে পেরেছেন, তাঁকে বিব্রত বিপন্ন করতে কেউ ছিল না। নিজের জনের মধ্যে থাকার নিরাপত্তা-বোধ ও সুখ ছিল। কিন্তু এখানে, এই বোর্ডিং-এ!—কর্তাব্যক্তিরা সব সময় পেঁচা-মুখো, ভ্রূ কুঁচকেই আছেন। একটা মিষ্টি কথা সামান্য সহানুভূতি আশা করা দূরে থাক তাঁরা আশেপাশে কোথাও আছেন ভাবতেই বুকের মধ্যে রক্ত ভয়ে দাপাতে থাকে। আর মাস্টার মশাইরা? তাঁরা কর্তাদের চেয়েও কড়া। যেমন কড়া মাস্টার তেমনি কঠিন পাঠ্য বিষয়। আবার দরদালানগুলিও তেমনি লম্বা, এখান থেকে ওইখান পর্যন্ত। ছোট্ট ফিওদর ছোট্ট আর সংকীর্ণ ফ্ল্যাট-বাড়ি থেকে এই বিস্তীর্ণ পরিবেশের মধ্যে পড়ে যেন বারে বারে হারিয়ে ফেলছিলেন নিজেকে। তার ওপরে জুটেছে রাজ্যের যত বখাটে বদমাস গুণ্ডা ছেলের দল—নিষ্ঠুর আর নির্মম। যেন হৃদয় বলে কোন পদার্থ ওদের মধ্যে নেই যেন ওদের বাপ মা নেই, কোন কালেও ছিল না। বাড়িতে তিনি শিখেছেন, মিথ্যে কথা বলা অপরাধ, অন্যের মনে আঘাত দেওয়া অন্যায়; কিন্তু এখানে দেখছেন, প্রত্যেকে মিথ্যে বলে ঠকায়, অকারণ অপরের মনে আঘাত দেয়। দেখে তাঁর ভয় করে, তিনি শিউরে ওঠেন।

একটি নূতন ছেলে বাড়ি থেকে হঠাৎ বোর্ডিং-এ এসে বাড়ির জন্যে উতলা হয়ে উঠেছিল, কেঁদে ছিল, তাইতেই ওই বদমাস ছেলেগুলির মেজাজ খারাপ হল, কেন না, তাতে করে নাকি সহপাঠিদের 'অসম্মান' হয়েছে। সবাই মিলে শুধু সেই অপরাধে তাকে টিটকিরি দিতে থাকল, বিদ্রূপ উপহাস করতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত সে টিটকিরি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক পরিণত হল হস্তক্ষেপে—কেউ চুল ধরে টানছে, কেউ কলম দিয়ে খোঁচাচ্ছে, কেউ নাক মলে দিচ্ছে, কেউ কান। তারপর নির্দয় প্রহার চলতে থাকল। সব সময় পুরোনোরা সবাই মিলে নূতনদের ওপরে এই হামলা চালাচ্ছে। প্রয়োজনে না, রাগ হয়ে না। অকারণে ঠাণ্ডা মাথায় কেবল মজা করার জন্যে এই নৃশংস অত্যাচারের ধূম পড়ে।

নিজের কৈশোর-অভিজ্ঞতা বলতে বলতে তিনি স্মৃতি-চারণের এক জায়গায় এসে লিখছেন: 'আরও অনেক স্কুলের আমার বয়সী অসহায় ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি জেনেছিলাম, কী জঘন্য অপরাধই না অনুষ্ঠিত হয় আমাদের স্কুলগুলিতে। সত্যি, জঘন্য অপরাধ ছাড়া কী! কোন ছেলে

যদি বোকার মতন কিছু করে ফেলে কি কারো নামে নালিশ করে বসে ত আর রক্ষে নেই, প্রচণ্ড মার খেয়ে তাকে মরণাপন্ন হতে হবে। (অনেক ক্ষেত্রে মরেও গেছে আমি জানি)। সবাই মিলে একজনকে মারলে যে কী পরিণাম হয়, না জেনে, না ভেবেই মারতে থাকে। যার গায় হাত তোলে না, মারের হাত থেকে রেহাই দেয় যাকে, অপছন্দ সে ছেলেরও রক্ষে নেই, প্রাণে মরে না বটে চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে সে চিরদিনের জন্য মনের দিক থেকে পঙ্গু হয়ে যায়। দিনের পর দিন শুধু দূর থেকে আঙুল বাড়িয়ে তাকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুড়ে দিয়ে তার এমন শোচনীয় অবস্থা করে তোলে যে, তারপরে আর তার পক্ষে বেশী দিন সুস্থ স্বাভাবিক থাকা সম্ভব হয় না। সে মানসিক ভারসাম্য হারায়। পাগল হয় কিংবা আত্মহত্যা করে।

'চোখের সামনে এসব দেখেও আঙুলটি তোলেন না কর্তৃপক্ষ। এমনই হৃদয়হীন এমনই নির্বিকার তাঁরা। আমার সেই কিশোর বয়সে আমি একটি ভাল মাস্টার দেখেছি বলে মনে করতে পারছি নে। অবশ্য ভাল বলতে যা বোঝায় তেমন মাস্টার আজও কোথাও আছে কি না আমার সন্দেহ। তাঁরা যেন সবাই সরকারী চাকরে। মাসকাবারি মাইনেটার জন্যেই তাঁদের সব মন পড়ে থাকে।

'ছেলেরা, যারা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে বাপ মা বাড়ির জন্যে কাঁদে, বিমর্ষ হয়ে থাকে, তারা অধিকাংশই পরবর্তী জীবনে নানা যোগ্যতার পরিচয় দেয়, তাদের মধ্যে থেকেই পরবর্তী কালের প্রতিভাবান, সফল মানুষ বেরিয়ে আসে। আর যে সব ছেলেরা বোর্ডিংএ এসেই বাপ মা বাড়ি ঘর ভুলে যায়, দুদিনের মধ্যেই পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে মস্তান হয়ে ওঠে, দেখা গেছে, তাদের মধ্যে প্রতিভা বড় থাকে না। তারা সেই বয়স থেকেই মিথ্যাকথা, ছলচাতুরি শেখে, লোক ঠকানো বুদ্ধি আয়ত্ত করে। পরবর্তী কালে সেই হয় তাদের জীবন-ধারণের পেশা কিংবা সমাজের উঁচুতে ওঠার সিঁড়ি।'

দস্তয়েফ্স্কি তাঁর জীবনীকার স্ত্রাখফকে লিখেছিলেন, "ওদের নোংরা ঠাট্টা বিদ্রূপ আমার আদৌ সহ্য হত না, আমি অপদার্থ ছেলেগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতাম।"

বোর্ডিং-স্কুলের মাস্টারদের মধ্যে একজনই মাত্র প্রিয় ছিল দস্তয়েফ্স্কির।

তিনি জাতে ছিলেন জর্মন। নাম গোয়েরিং। তাঁকে দস্তয়েফ্স্কি সারা জীবনে ভোলেন নি। কারণ পুসকিনকে তিনিই ঘনিষ্টভাবে পরিচয় করিয়ে দেন দস্তয়েফ্স্কির সঙ্গে। বাড়িতে পুসকিনের আদর ছিল না। ডাক্তার তাঁকে আধুনিক কবি বলে নস্যাৎ করে দিতেন, কবি বলেই পাত্তা দিতেন না। এটা অদৃষ্টের এক ব্যঙ্গ যে, স্বদেশের মহাকবির সঙ্গে দস্তয়েফ্স্কির পরিচয় ঘটে এক বিদেশীর মারফৎ। রুশ ভাষার অক্ষম উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে পুসকিনকে তুলে ধরেন জর্মন শিক্ষক। দস্তয়েফ্স্কি তাতেই মুগ্ধ, তাতেই তাঁর চেতনা বিলোপ। তাতেই তিনি পুসকিনের অন্ধ ভক্ত হয়ে ওঠেন। এই জর্মন শিক্ষক সগর্বে বলতেন, 'মহাকবি আমাকে বড্ড স্নেহ করেন। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর কবিতা জর্মন ভাষায় তর্জমা করার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে।'

জীবনের শেষ দিন অব্দি পুসকিন ছিলেন দস্তয়েফ্স্কির প্রিয়তম কবি। শুধু পুসকিন না কবি শিলারও। কবি শিলারের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে এই জর্মন শিক্ষকেরই আগ্রহে। এই দুই মহান কবির কাছেই দস্তয়েফ্স্কি নানা ভাবে অনেকখানি ঋণী। সংস্কারমুক্ত স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষা পেয়েছেন তিনি পুসকিনের কাছে আর শিলারের কাছে পেয়েছেন পরম সংকটের মধ্যেও দুরূহ সংকল্প নিয়ে বেঁচে থাকার সাহস। তদর্থে দু'জনই তাঁর গুরু। সারা জীবন দু'জনকেই তিনি সমভাবে স্মরণ করেছেন।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, ছোটবেলায় যেমন তিনি খেলার সাথী পান নি, যৌবনেও তেমনি বন্ধু বলতে কেউ ছিল না তাঁর। এই নিঃসঙ্গতা যেমন তাঁর জীবনে, তেমনি তাঁর রচনায়ও স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। অথচ তাঁর শৈশব কাল নিঃসঙ্গ কেটেছে বললে অদ্ভুত শোনাবে কেন না ভাইয়ে বোনে তাঁরা ছিলেন সাতজন; তিন ঘরের ফ্ল্যাটে আরও সাতটি প্রাণী বাস করত। আসলে দস্তয়েফ্স্কি-পরিবারটাই ছিল নিঃসঙ্গ। এঁদের কোন সামাজিক জীবন ছিল না। এঁদের সুখ দুঃখ ক্রিয়া-কাণ্ড সবই ছিল ছোট্ট সংসারটিকে বেষ্টন করে; তার বাইরে এঁরা চিনতেন কেবল মামাকে আর মেসোকে। মেসো ছিলেন খুব বড়লোক। ধনী বলেই ডাক্তার তাঁকে ঈর্ষা করতেন ঘৃণা করতেন। অবশ্য একবার নিদারুণ আগুনে দারোভোয়ের গোটা গ্রাম ছাই হয়ে যাওয়াতে ভায়রা-ভাইয়ের কাছ থেকে একটা মোটা টাকা ধার করতে হয়েছিল ডাক্তারকে। বুঝি টাকা ধার করতে হয়েছিল বলেই ঘৃণাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক সেটা জানতেন বলে কোন দিন এ বাড়িতে আসতেন না। আসত দস্তয়েফ্স্কির

মামা। গরীব মানুষ, বয়সে যুবক, এক ব্যবসায়ীর ঘরে অল্প মাইনের চাকরে। প্রায়ই সে আসত। সে এলে বাড়িতে বেশ চমৎকার একটা আবহাওয়া তৈরি হত। মামা খুব ভাল গিটার বাজাত, তার একটা গীটার-ই থাকত এ বাড়িতে। দস্তয়েফ্‌স্কির মা-ও ভাল গীটার বাজাতে জানতেন। মামা এলে তাই একটা গানের আসর বসত। মামা বাজাত গীটার সঙ্গে গুনগুনিয়ে লোকগীতি গাইত, মা তার সঙ্গে সঙ্গত করতেন। তারই কয়েকটা গান 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এ উদ্ধৃতও করেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ওঁরা সকলেই জানতেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক টান আছে বলেই মামা হামেশা আসে তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু না। একদিন আবিষ্কার হল মামার মতলব। মায়ের একটি যুবতী ঝি ছিল। মামা তার হাতে একটা চিঠি পাচার করতেই মা ধরে ফেললেন। বাবাও বাড়ি ছিলেন। স্পর্ধা দেখে তিনি ত অগ্নিশর্মা। মামাকে কয়েকটা চড় মেরে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন বাবা। তারপরে মামা আর কোন দিন এ-মুখো হয় নি। আন্দ্রেই-এর এই স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়, বাইরের সঙ্গে তাঁদের সংক্ষিপ্ত সামাজিক সম্পর্কের বাঁধনটুকু এভাবেই একে একে ছিন্ন হয়ে গেছে।

বিচ্ছিন্ন-সমাজ এই পরিবারের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে দস্তয়েফ্‌স্কির মন কখনো বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ না হলে তিনি কাউকেই আপন ভাবতে পারতেন না। বন্ধু মানে ভাই কি তার থেকেও বেশী কিছু হওয়া চাই। বন্ধু ভাইয়ের মতন না হলে তাঁকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে না স্কুলে না কলেজে না কর্মজীবনে কোথাও তিনি কারো সঙ্গে সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতে পারেন নি। সমাজের পাঁচজন সাথী বা সমধর্মীর মধ্যে কেউ বন্ধু বা প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে নি তাঁর। কাউকেই সস্নেহে বুকের কাছে টানতে পারেন নি তিনি। নিজ গুণে যারা তাঁর নিকটবর্তী হয়েছে আপন দোষে তিনি তাদের থেকে দূরে থেকে গেছেন, ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেও আপন হতে পারেন নি কারো, আপন করতে পারেন নি কাউকে। অকৃপণ ভালবাসা দেওয়ার বাসনা এবং অনুরূপ ভালবাসা পাওয়ার দাবি তাঁর এমনই তীব্র ছিল যে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কখনো বাস্তব হওয়ার কথা নয়। ফলে পদে পদে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে, বন্ধু শত্রু হয়েছে। চিরদিনের জন্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে এক একজনের সঙ্গে।

এ অপূর্ণতা দস্তয়েফ্‌স্কির শিল্পেও সমান ভাবে প্রকট দেখি। অবশ্য এ অপূর্ণতা তাঁর শিল্পকে পঙ্গু করার চেয়ে বরং তার মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চার করেছে।

তাঁর উপন্যাসে আগন্তুক আনুষঙ্গিক চরিত্র বিরল। হঠাৎ একটি চরিত্র এল এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসম্পূর্ণ পরিচয় রেখে চলে গেল, এমন হয় না দস্তয়েফ্‌স্কির কাহিনীতে। তাঁর কোন চরিত্রই ঘটনার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায় না।

আনুষঙ্গিক চরিত্রের এত অভাব পৃথিবীর সেরা লেখকদের মধ্যে একমাত্র দস্তয়েফ্‌স্কিতেই দেখি, আর কেউ-ই এত স্বল্প সংখ্যক চরিত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁর সমগ্র রচনার কলেবর নিঃসন্দেহে বিরাট কিন্তু সে তুলনায় চরিত্রের সংখ্যা নগণ্য। সেই নগণ্য ক'টি চরিত্রই অসামান্য হতে পেরেছে যেহেতু নিঃসঙ্গ জীবনের অখণ্ড একাকীত্বের মধ্যে আপন মনের সমস্ত মাধুরী ও বেদনা মিশিয়ে তিনি দীর্ঘদিন বসে তাদের তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই গড়ে তোলার কারিগরি এক অপার বিস্ময়ের ব্যাপার। এমন সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিশক্তি ছিল বলেই তিনি মাত্র কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে বিশ্বের তাবৎ মানুষকে ধরতে পেরেছেন—গোষ্পদে বিশাল আকাশ ধরা পড়ার মতন অলৌকিক কাণ্ড। স্মরণ করুন 'হিউম্যান কমিডি' বলতে বালজাককে আনতে হয়েছিল আড়াই হাজার চরিত্র।

দস্তয়েফ্‌স্কির দৃষ্টি গভীর ছিল—অতলস্পর্শী; কিন্তু বিস্তার ছিল না আদৌ। বিস্তারের অভাব, এই সংকীর্ণতা, আপনার মধ্যে এই সীমিত হয়ে থাকা তাই বলে রুশ জাতীয়-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করলে ভুল হবে। যে মসকোআ শহরে জন্মেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, জীবনের চোদ্দটা বছর কাটিয়েছেন, সে-শহর পুসকিনেরও। পুসকিনও এখানেই জন্মেছেন, বড় হয়েছেন। শুধু পুসকিন কেন, মনীষী, নাট্যকার, জার-স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অন্যতম যোদ্ধা, গ্রিবয়েদফ্‌-এরও জন্মস্থান মসকোআ। তাঁরও কৈশোর কেটেছে এখানে। তবু পুসকিন গ্রিবয়েদফ্‌-এর মসকোআ আর দস্তয়েফ্‌স্কির মসকোআ এক নয়। পুসকিন জন্মেছেন ১৭৯৯-এ আর গ্রিবয়েদফ্‌ ১৭৯৫-এ। দস্তয়েফ্‌স্কির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কি তবে মসকোআর চরিত্র পালটে গিয়েছিল? তাও না। আসলে হাসপাতালের গণ্ডীর মধ্যে সংকীর্ণ কোয়ারটারে দস্তয়েফ্‌স্কি-পরিবার যে নগণ্য দৈন্যের জীবন-যাপন করত, তার বাইরে আরও একটা সমাজ ও সম্প্রদায় ছিল; বেপরোয়া বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যাদের জীবন পরম নিশ্চিন্তে কাটত। পুসকিন ও গ্রিবয়েদফ্‌-এর সে-বনেদী সমাজে রাজকীয় খানাপিনার সঙ্গে চলত ঐশ্বর্য-সম্পদের বে-একক্তিয়ার ছিনিমিনি খেলা। একই কালের হলেও এটাকে সমাজের দুটো স্তর বলা ঠিক হবে না, বলা উচিত অতীত ও বর্তমান

নামধেয় এক ইতিহাসেরই দুই ভিন্ন অধ্যায়। দস্তয়েফ্স্কির সমকালীন, তুরগেন্য়েফ, সলতিকফ্ এমন কি তাঁর সাত বছরের ছোট তলসতয়-এরও জীবনের মূল জড়িয়েছিল ওই অতীতের সঙ্গে, তাঁরা ছিলেন য়্যারিসটোক্র্যাসী ও ভূমিদাসতন্ত্রের আমলের একক্তিয়ার ভুক্ত। চেখফ-এর আগে পর্যন্ত উনিশ শতকের সমস্ত রুশ-লেখকরাই ছিলেন অতীতের জঠরে লালিত সন্তান, রুশ-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একমাত্র দস্তয়েফ্স্কিই তার ব্যতিক্রম। তুরগেন্য়েফ ও তলসতয়ের মধ্যবর্তী হয়েও তিনিই ছিলেন যেমন জন্মসূত্রে তেমনি শিল্প-ভাবনায় ও জীবন-যাপনে সর্বতোভাবে আধুনিক। দস্তয়েফ্স্কি-পরিবার সরকারী নথিতে 'নোবল্' বলে স্বীকৃতি-ভুক্ত থাকলেও সামাজিক জীবনে তাঁরা পশ্চিম য়ুরোপের মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্তরেরই ছিলেন। দস্তয়েফ্স্কির সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার এটাই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। শিল্পে মননধর্মীতার ব্যতিক্রমের উৎসও এখানেই।

ছয়

১৮৩৫-এর জুলাইয়ে তাঁর শেষ সন্তানটি প্রসব করে মারিয়া ফিওদরোভনা শয্যাগত হন। মারিয়া গোড়া থেকেই কৃশকায় ও পলকা স্বাস্থ্যের মানুষ ছিলেন ; তার ওপরে পুনঃপুন সন্তানধারণ করে শরীর ক্রমাগত ভেঙে পড়ছিল--এবার তাঁকে চরম রোগে ধরল। রোগের লক্ষণ অনেক আগে থেকেই শরীরে প্রকাশ পেয়েছিল, তখন গ্রাহ্য করেন নি কিংবা স্বামীর প্রতি অভিমানবশে শরীরের প্রতি নজর দেন নি আদৌ। ফলত মাত্র চৌতিরিশ বছর বয়সে সংসারের সমস্ত সুখ শান্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে শয্যাশায়ী হতে হল। অসহায় অসুস্থ মায়ের জন্যে ভালবাসা করুণা ও কাতরতা তিলে তিলে ভোগ করার ফলে দস্তয়েফ্স্কির ব্যক্তিত্বের ভিতরে তার প্রভাব চিরদিনের জন্যে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। স্যুচার্ডে যখন পড়তেন, যখন বাড়ি থেকেই স্কুলে যাতায়াত করতেন, তখন মাকে নিত্য চোখের সামনে দেখতে পাওয়ার সান্ত্বনা ছিল। চেরমাক-এর বোর্ডিং-এ এসে সে সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হলেন দস্তয়েফ্স্কি। অপরিচিত ও প্রতিকূল পরিবেশে নিঃসঙ্গতার মধ্যে মায়ের জন্যে তাঁর মন আরও বেশী করে কাতর হয়ে পড়েছিল। সে কাতরতা বারেবারে আকুল হয়ে উঠত তাঁর চিঠির ভাষায়।

একখানা চিঠির নমুনা দিই : "ডার্লিং মা-মা, তুমি যখন আমাদের ছেড়ে দারোভোয়েতে গেলে তখন কি যে ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। কেবলই তোমার

কথা মনে পড়েছে আর মনটা হু হু করে উঠেছে। এখনও যখনই তোমার কথা ভাবি মন খারাপ হয়ে যায়; বড় দুঃখী মনে হয় নিজেকে। মাগো মনটা দুঃখে এমন ভারী হয়ে ওঠে যে, কিছুতে সে ভার ঝেড়ে ফেলতে পারি নে। আহ্‌ তুমি যদি জানতে তোমাকে কাছে পাবার জন্যে আমার মন কী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কী ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখতে। আমার আর তর সইছে না মা। এক্ষুনি তোমার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে করছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুস্থ রাখুন।"

এই একখানির মতন প্রত্যেকখানি চিঠি মায়ের জন্যে তাঁর ব্যাকুল কাতরতায় ভরে থাকত। ফিওদর আর মিখাইল বোর্ডিং-এ, ডাক্তার রোগী আর রোজগার নিয়ে ব্যস্ত; মাকে দেখাশোনা করতে কাছে শুধু থাকে আন্দ্রেই। তাঁর স্মৃতিচারণে পাই, '......আলেকসান্দ্রা যখন গর্ভে তখনই তাঁর যক্ষ্মা রোগ শুরু হয় তবু কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। ভীষণভাবে শরীর ভেঙে পড়ল ১৮৩৬-এর হেমন্তে। তখন অতি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন মা। এমন দুর্বল যে চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াতেও কষ্ট হত তাঁর। মায়ের খুব ঘন দিঘল চুল ছিল; সেই সুন্দর চুলে বিশ্রী জট পাকিয়ে উঠছে বলে শেষে ছোট করে ফেলতে হল। শয্যাগত হলেও এতদিন মা তবু ওঠানামা করতে পারছিলেন, '৩৭ সাল পড়তে না পড়তে সে সামর্থ্যও হারালেন মা, সব সময় আচ্ছন্নের মতন পড়ে থাকেন কেবল। সে আচ্ছন্নভাব বেড়ে বেড়ে অচৈতন্য অবস্থায় নেমে এল। দুই দাদাও চলে এল বোর্ডিং থেকে। আমরা ভাই-বোনরা মায়ের কাছ ছাড়া হই নে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মা চোখ মেলেন না। কথা বলেন না। আমাদের অসহ্য কষ্ট লাগে। হঠাৎ ২৭ ফেব্রুআরির সকাল বেলা মা চোখ খুললেন কথা বলতে থাকলেন, যেন সুস্থ স্বাভাবিক—আমাদের সে কী আনন্দ! কিন্তু তাঁর কথা শুনে বুঝতে বাকি রইল না, এ আনন্দ ক্ষণিকের। তিনি মা মেরীর মূর্তি চাইলেন। এনে দিলে প্রণাম করলেন। আমাদের সকলকে একে একে আশীর্বাদ করলেন। সবশেষে বাবার কথা বললেন মা, শেষ নমস্কার জানালেন তাঁকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলেন। আমরা সকলে হাহাকার করে কেঁদে উঠলাম।'

দস্তয়েফ্‌স্কির সংবেদনশীল মন থেকে সে হাহাকারের ধ্বনি কোনদিন মেলায় নি। তাঁর শিল্পমানসে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা, দুর্বলের প্রতি করুণার উৎস এই হাহাকার।'

মায়ের মৃত্যু-শোকের সঙ্গে আর একটি শোক এসে যুক্ত হয়েছিল দস্তয়েফ্স্কির মনে। সে পুসকিনের মৃত্যু-শোক। বড় আশা ছিল একদিন কবিগুরুকে নিজের চোখে দেখবেন, তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বসবেন। সে আশায় ছাই দিয়ে শত্রুরা তাঁকে ষড়যন্ত্র করে খুন করল—দস্তয়েফ্স্কি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। পুসকিন মারা গিয়েছিলেন তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগেই (১০ ফেব্রুআরি) দস্তয়েফ্স্কি তাঁর দাদাকে বলেছিলেন, পুসকিনের মৃত্যু-সংবাদটা যদি আমি আগে পেতাম ত বাবার থেকে অনুমতি নিয়ে আমি শোক-চিহ্ন ধারণ করতাম।

এক যোগে দুইটি আঘাত বুকে করে তাঁর জীবনের একটি অধ্যায়—তাঁর মসকোআর জীবন, কৈশোর জীবন শেষ হল।

১৮৩৭-এর মে মাসে দস্তয়েফ্স্কি পিতার্সবুর্গে এলেন। চেরমাক-এর পরে আর্মি এনজিনিয়ারিং কলেজ—স্ত্রী বেঁচে থাকতেই ডাক্তার মিখাইল আর ফিওদরের ভাগ্য নির্দিষ্ট করে ফেলেছিলেন। নিজে সামরিক ডাক্তার ছিলেন, ঐতিহ্য অনুসরণ করে ছেলেরা সামরিক এনজিনিয়ার হবে পিতার এ-ভাবনা স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেদের যে এতে প্রবল অনীহা আপত্তি তা আর তিনি জানলেন না, জানতে চাইলেনও না, কেন না, ছেলেদের আবার ভিন্ন মত থাকবে কেন, পিতার ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা, এইটেই তিনি জানেন। কিন্তু ছেলেদের জানতে বাকি ছিল না ঠাকুর্দার বিরুদ্ধে কী ভীষণ বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁদের পিতা। অথচ সে উদাহরণ সামনে রেখে বিদ্রোহ করা দূরে থাক তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁদের অনিচ্ছার কথাটাও তাঁরা একবার মুখ খুলে উচ্চারণ করতে পারলেন না। সমাজ-জীবন থেকে দূরে একলা পরিবারের মধ্যে কঠোর শাসনে মানুষ হওয়ায় এ-কুফল সারা জীবন ভুগেছেন দস্তয়েফ্স্কি। অনিচ্ছায় অনেক অপ্রিয় কাজ করেছেন। সবলে যেখানে দাবি করা উচিত, নীরবে সেখানে স্বত্বত্যাগ করেছেন। অন্যের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে না পারার লজ্জায় নিজেকেই বারবার পীড়িত অসুস্থ করে তুলেছেন।

এবারও মুখ ফুটে যখন প্রতিবাদ করতে পারলেন না তখন সে অক্ষমতায় নিজেকেই রুগ্ন করে ফেললেন দস্তয়েফ্স্কি, তাঁর এমনই সর্দিকাশি হল যে সে আর সারতে চায় না। কাশতে কাশতে গলা বসে গেল, কোন ওষুধেই ফল হল না। অবশেষে ডাক্তার বললেন, 'ওই ভাঙাগলা নিয়েই চল, বায়ু পরিবর্তন হলেই অসুখ সেরে যাবে।' কিন্তু সারল না। দস্তয়েফ্স্কির গলার স্বর সারা জীবনের জন্যে সেই ভাঙাই থেকে গেল আর থেকে গেল খরচ করার অনভিজ্ঞতা

সারা জীবন। আন্দ্রেই তাঁর স্মৃতিচারণে বলছেন, 'আমার এমন একটা উপলক্ষও মনে পড়ছে না যখন বাবা কি মা দাদাদের হাতে পয়সা তুলে দিয়েছেন। আমার যতদূর বিশ্বাস টাকাকড়ির চেহারা তাঁরা প্রথম চিনলেন বাবা যখন তাঁদের পিতার্সবুর্গে একলা রেখে এলেন।

উনচল্লিশ বছর পরে এ-দিনটির কথা স্মরণ করে দস্তয়েফ্স্কি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'বাবার সঙ্গে পিতার্সবুর্গে যাত্রার সারা পথটা আমি আর দাদা নূতন জীবনের স্বপ্নে ডুবেছিলাম। আমাদের চোখ ভরেছিল এক মহৎ ও সুন্দর জীবনের ছবি। আমরা আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ছিলাম। আমরা জানতাম আর্মি এনজিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে অতঃপর আমাদের অঙ্ক নিয়ে পড়ে থাকতে হবে; তবু কবি আর কবিতার স্বপ্ন আমরা কিছুতে ভুলতে পারছিলাম না। দাদা কবিতা লিখত। সারা পথে দাদা তিন চারটে কবিতা লিখে ফেলেছিল আর আমি মনের মধ্যে একটা উপন্যাসের খসড়া লিখছিলাম আর মুছছিলাম।'

কোন শুভ কর্মের আগে দস্তয়েফ্স্কি-পরিবারের রীতি ছিল প্রার্থনানুষ্ঠান করা। এবারও করা হল। পাদ্রী বারশেভ এলেন। বাইবেল পাঠ হল। 'এ যাত্রা শুভ হোক্' প্রার্থনা করলেন তিনি। ছেলেদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু পাদ্রীর আশীর্বাদ পিতার মঙ্গল কামনা ব্যর্থ করে দিয়ে পথের মাঝখানেই ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েফ্স্কির নিয়তি তাঁর জন্যে আর এক ভাগ্যের সূচনা করলেন। যার ফলশ্রুতি রাজদ্রোহ—মৃত্যুদণ্ড—বধ্যভূমি থেকে সাইবেরিয়ায় মৃত্যুপুরীর ভয়ংকরতার মধ্যে নির্বাসন।

'পাপ ও শাস্তি' উপন্যাসে এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে দস্তয়েফ্স্কি লিখেছিলেন, 'আমার প্রথম ব্যক্তিগত অসম্মান। একটা ঘোড়া। একজন রাজকর্মচারী।' যে ঘটনাটি দেখে দস্তয়েফ্স্কির মনে হয়েছিল ওটা তাঁর প্রথম ব্যক্তিগত অসম্মান তার আনুপূর্বিক উল্লেখ আছে তাঁর 'লেখকের ডায়েরি'তে। তিনি লিখছেন: 'ঘটনাটি ঘটেছিল অনেক অনেক দিন আগে সেই ১৮৩৭ সালে। তখন আমার বয়েস পনর (বস্তুত তখন তিনি ষোল বছরের ছেলে)। বাবার সঙ্গে দাদা আর আমি পিতার্সবুর্গে আসছিলাম। বাবা আমাদের আর্মি এনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিতে নিয়ে আসছিলেন। তখন মে মাস। খুব গরম। যেন পথে পোসটিং স্টেশনে ঘোড়া বদলাতে না হয়, আমরা

ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিলাম। আর প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে দু'তিন ঘণ্টার জন্যে থেমে ঘোড়াগুলিকে জিরোতে দিয়ে নিজেরাও একটু জিরিয়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছিলাম। এক সপ্তাহের রাস্তা। ঘোড়া তিনটাকে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম না দিলে এত পথ চলবে কি করে?

'একদিন বিকেলে আমরা একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সুন্দর একটি সরাইখানা দেখতে পেয়ে আমরা নেমে পড়লাম। আমরা কিছু খেয়ে নেব। ঘোড়াগুলিকেও দানাপানি দিতে হবে। আমি এসে সরাইখানার জানলার সামনে দাঁড়িয়েছি, চোখে পড়ল সরাইখানার উল্টো দিকে একটা পোসটিং স্টেশন। হঠাৎ জার সরকারের সংবাদ-বাহকের গাড়ি এসে থামল সেখানে। সরকারী পোশাক ও তকমা আঁটা বেশ গাট্টাগোট্টা লম্বা-চওড়া একটা জোয়ান লোক লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। ছুটে গিয়ে স্টেশনের ভিতরে ঢুকল এবং তক্ষুনি বেরিয়ে এল, বুঝি এক পলক দেরি না করে এক গ্লাস ভোদকা এক নিঃশ্বাসে গিলে এসেছে। মনে আছে, আমাদের কোচমান বলেছিল, 'সরকারের এই লোকগুলি প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে নেমে এক গ্লাস করে ভোদকা খায়'। সত্যি, খেতেও হয়, নয় ত অত কিল ঘুষি মারার ধকল যেন ওই শরীরেও সইবে না।

'প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে এরা গাড়ি বদল করে। নূতন ঘোড়া আর কোচমান নেয়। লোকটা স্টেশন ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নূতন আর একখানা তিন ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে এল। কোচমানের বাক্সে বসে আছে বিশ বাইশ বছরের এক তাগড়া জোয়ান চাষার ছেলে। গাড়িটা দরজায় এসে দাঁড়াতেই লোকটা লাফ দিয়ে উঠে বসল খোলা গাড়িতে। হেলান দিয়ে এক কোণায় বসল। সেই চাষার ছেলেও চাবুক হেঁকেছে তখন ঘোড়ার পিঠে। চাবুক খেয়ে ঘোড়া তিনটে তখন চলতে শুরু করেছে, তখনও ছুটছে না। তখন পেছন থেকে সেই লোকটা খাড়া হয়ে উঠে বিন্দুমাত্র সতর্ক করে না দিয়ে চাষার পিঠে দারুণ এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে আবার যথারীতি হেলান দিয়ে বসল। ঘুষি খেয়ে চাষার ছেলে উবুড় হয়ে পড়েছিল সামনের দিকে; কিন্তু বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে সেও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে প্রাণপণ চাবুক বসিয়ে দিলে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করল।—মারের চোটে যেমন করে ঘোড়া ছোটে। তবু লোকটা আবার সোজা হয়ে বসল আবার শূন্যে বদ্ধমুষ্টি উঁচিয়ে চাষার ছেলের ঘাড়ে কিল বসিয়ে দিলে আর একটা। আবার একটা। আবার, আবার,

চাষার ঘাড়ে পিঠে যেমন প্রচণ্ড কিল ঘুষি পড়ে চাষার হাতের কড়া চাবুক তেমনি ঘোড়ার পিঠে সপাঙ্‌ সপাঙ্‌ আছাড় খায়। কিন্তু পেছনের লোকটার যেন শ্রান্তি ক্লান্তি নেই। হাতের মুঠোও ব্যথা করে না। সে ক্রমাগত বদ্ধমুষ্টি শূন্যে তুলছে আর নির্মম বেগে হাতুড়ির মতন সেই বদ্ধমুষ্টি চাষার পিঠে ফেলছে। ঘোড়ার পিঠে চাষার চাবুকও পড়ছে সমান উৎসাহে, সমান বেগে। ঘোড়া ছুটছে, প্রাণের দায়ে ছুটছে পড়ি কি মরি করে। যে কোন সময় ঘোড়া তিনটে পা মুড়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে, মরতে পারে—তবু ছুটছে, ছুটতে হবে। এমন বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে ঘোড়া তবু যেন তৃপ্তি নেই নিষ্ঠুর মানুষটার। তার শক্তমুষ্টি ক্রমাগত প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে নেমে আসছে। বৃষ্টির মতন ঝরছে চাষার পিঠে কিল আর ঘুষি। যতদূর চোখ যায় দেখলাম। থামতে দেখলাম না মানুষটাকে একবারও। মানুষটা যেন অসুর। অবশ হয় না, থামতে জানে না। মানুষটা পাগল?

'‘না এটাই নিয়ম’। আমাদের কোচমান বলেছে আমাকে। এটাই চলে আসছে শ’ শ’ বছর ধরে। এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। কোন-দিন বুঝি এ রীতির পরিবর্তন ঘটবে না। প্রায় সব সমস্ত কোরিয়াররাই এ স্বভাবের। সরকারী তথ্য তমসুক সংবাদ চিঠি নিয়ে এই মানুষগুলি গাড়িতে ওঠে। আর এই অমানুষিক মার দিতে দিতে সমস্ত পথ পার হয়। আর মার দিতে দিতে ক্লান্ত হয় নির্জীব হয় বলে প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে এসে গাড়ি বদলের অবসরে এক গ্লাস করে ভোদকা খেয়ে নেয়। প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে বুঝি এজন্যেই গাড়ি কোচমান বদলেরও দরকার হয়; নয়ত এত মার এত চাবুক একটা কোচমান তিনটে ঘোড়া দীর্ঘ সমস্তটা পথ একলা সইবে কি করে?

'এই মানুষগুলির চরিত্র অদ্ভুত। পোসটিং স্টেশন এসে পড়েছে দেখলে কিংবা গ্রামের মধ্যে দিয়ে পার হওয়ার সময় এদের ঘুষি মারার বহর যেন বেড়ে যায়। যেন গ্রামের মানুষদের দেখায়, ‘দেখ, আমি কী ভীষণ তেজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছি, আমি কী এক জাঁদরেল পুরুষ’।

'আমাদের কোচমান বলেছিল, ‘এরকম লাগাতার ঘুষি খেয়ে একবার আমার পিঠে এমন ব্যথা হয়েছিল যে পুরো একটা মাস আমি নড়তে চড়তে পারি নি’।

'কোরিয়াররা এমন নিষ্ঠুর মার দেয় বলেই, ওই মার সহ্য করতে পারবে

এমন তাগড়া জোয়ান যুবক চাষাদের কোচমান দেয় পোসটিং স্টেশন থেকে। যখন সেই ছেলে বাড়ি ফিরে আসে সকলে দেখে হাসে, শুধোয়, 'হাঁ গা, কেমন খাতির পিরিত করল কোরিয়ারমশাই তোমাকে, বেশ আদর সোহাগ পেয়েছ নিশ্চয়' ? সেই ঠাট্টা তামাশার শোধটা ছেলে মেটায় তখন তার বউয়ের পিঠের ওপরে। ঘোড়ার পিঠে শোধ তোলার পরে যেটুকু জ্বালা আরও থেকে যায়, তার সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের বিদ্রূপ মিশে তাকে আরও যতখানি উত্তেজিত করে, নিষ্ফল আক্রোশের সেই সবখানি ঝাল ঝাড়ে সে তার বউয়ের পিঠে। তার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় বউ কাণ্ডটা দেখেছে সন্দেহে রাগটা বউয়ের ওপরেও হয়! বেচারি বউ!

'সেদিন থেকে এ দৃশ্য ক্রমাগত আমাকে খুঁড়ছিল।' দস্তয়েফ্‌স্কি লিখছেন, 'প্রথমে আমার সব রাগ অসন্তোষ ফুঁসে উঠেছিল জার সম্রাটের ওপরে। পরে এই রোষ অসন্তোষই আমাকে নূতন এক রাজনৈতিক চিন্তায় পৌঁছে দেয়।'

অর্থাৎ এই আবহমান কাল থেকে চলে-আসা নিষ্ঠুর ঘটনার দৃশ্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা হয়ে ষোল বছরের কিশোর ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েফ্‌স্কির তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে দিয়েছিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আর সব থেকে ভিন্ন নূতন এক বোধের জন্ম হয়েছিল তাঁর মধ্যে ; যদিও তখনই তিনি তার সম্যক তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন নি। যখন বুঝলেন তখন তার জন্যে তাঁকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল।

এ-সময়কার আর একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা তরুণ রোমান্টিক কবি শিদ্‌লফ্‌স্কির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এ-মানুষটি দস্তয়েফ্‌স্কির সাহিত্য-কর্মের ওপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'-র একটি চরিত্রে এই কবিকে দস্তয়েফ্‌স্কি অমর করে রেখেছেন।

পিতার্সবুর্গে এসে ডাক্তার তাঁর ছেলেদের নিয়ে উঠেছিলেন এক সরাইখানায়। তেইশ বছরের তরুণ কবি ইভান শিদ্‌লফ্‌স্কি তখন সেখানে। সেই বয়সেই কবি তখন দেহের ক্ষুধা ও আত্মার পিপাসার মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে নিদারুণ দহনে জ্বলছিলেন। অবশ্য সে জ্বালার খবর প্রথম পরিচয়েই দস্তয়েফ্‌স্কির জানার কথা নয়। তবু অজ্ঞাতসারে দু'জন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যেন এক মাহেন্দ্রক্ষণে ক্ষণকালের জন্যে দেখা হয়ে গিয়েছিল চিরকালের এক প্রিয়জনের সঙ্গে।

শিদ্‌লফ্‌স্কির সাহিত্য-ভাবনা ও জীবন-চিন্তা দস্তয়েফ্‌স্কিকে চমকে দিয়েছিল

কেন না ওই বয়সেই দস্তয়েফ্‌স্কিও জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে অনুরূপ রোমান্টিক অনুভাবনার শরিক ছিলেন; কিন্তু আকর্ষণের সেইটেই একমাত্র কারণ ছিল না; অন্যতম কারণ ছিল দু'জনের আত্মিক গঠনের সাদৃশ্য। সেই সাদৃশ্যের আকর্ষণেই দস্তয়েফ্‌স্কি বারবার ছুটে গেছেন শিদ্‌লফ্‌স্কির কাছে।

দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা হয় তখন তিনি সরকারের দফ্‌তরে সামান্য মাইনের এক অসন্তুষ্ট কনিষ্ঠ কেরানী। অল্প দিনের মধ্যেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে-চাকরি ছেড়ে দেন তিনি, সংসারের প্রতি বিমুখ ঈশ্বরস্পৃহ হয়ে ওঠেন। কঁহা কঁহা মুলুক ঘুরে বেড়ান কেউ জানে না। যখনই দস্তয়েফ্‌স্কি সন্ধান পান, ছুটে যান সেই সংসার-বিরাগী ছিন্নবাস পরিব্রাজকের কাছে। ১৮৭৩ সালে তরুণ দার্শনিক ভ্লাদিমির সোলোভিয়ফ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে দস্তয়েফ্‌স্কি বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখে একটি মানুষের কথা আমার বড় বেশী মনে পড়ে। আমার তরুণ বয়সের ওপরে তাঁর প্রভাবের অবধি ছিল না। তোমাকে দেখতেও ঠিক তাঁর মতন। কখনো কখনো আমার মনে হয় ইভান শিদ্‌লফ্‌স্কি যেন তোমার শরীরে রূপান্তরিত হয়েছেন। ওই সময়ের এক চিঠিতে দাদাকে লিখেছিলেন, "যখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সহজে ছাড়ি নি তাঁকে। সারা সকাল কিংবা সারা সন্ধ্যে আমি ওঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আহ্‌, কি পবিত্র কি সরল-হৃদয় মানুষটি! মনে প্রাণে এমন সৎ আমি দ্বিতীয় আর একজনকে মাত্র দেখেছি— সে আমার তরুণ দার্শনিক বন্ধু ভ্লাদিমির সোলোভিয়ফ্‌"।

সাত

সরাইখানা থেকে ফিওদর আর মিখাইল এসে উঠলেন কোরোনাদ কোসতোমারোভ-এর স্কুল-বোর্ডিং-এ। আর্মি এনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের শেষ পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব শেষ করতে হবে এখানে। দু'ভাই এই প্রথম নির্বান্ধব পৃথিবীতে একলা হলেন, ডাক্তার তাঁদের বোর্ডিং-এ রেখে ফিরে গেলেন মসকোআতে। বাবার সঙ্গে সেই তাঁদের জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি। আকাদামীর প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হল সেপটেমবরে, ১৮৩৮এর জানুআরিতে ফিওদর এসে ভর্তি হলেন আর্মি এনজিনিয়ারিং-এ। মিখাইলকে তাঁরা নিলেন না। শারীরিক অযোগ্যতার অজুহাতে বাতিল হলেন তিনি, চলে গেলেন ভিন শহর রেভাল-এ, এনজিনিয়ারিং আকাদামীতে পড়তে। এভাবে ভাইয়ে ভাইয়েও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বড় অসহায় নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। নির্বান্ধব দেশে এতদিন তবু দাদা ছিলেন পাশে, তিনিও চলে গেলেন রেভাল-এ। বাবা আরও দূরে। মা ত একেবারে নাগালের বাইরে। প্রিয়জন বলতে কেউ নেই ধারে কাছে। যারা তাঁর চারধারে জটলা করছে, ঘোট পাকাচ্ছে, হৈ চৈ করছে তাদের দিকে তাকিয়ে বারে বারে শিউরে ওঠেন শক্ত গড়নের বিবর্ণ হলুদ-রং অপটু তরুণ আত্ম-কেন্দ্রিক দস্তয়েফ্‌স্কি। নাচে যোগ দেন না। অবসর-যাপনের হাল্কা দিকগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে চলেন। রুদ্ধ-বাতাস অন্ধকার ঘরের কোণে চর্বির বাতির সামনে বসে কখনো লেখেন, কখনো পড়েন, কখনো অস্থির অসহিষ্ণু মন নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন। কদাচিৎ কখনো সমধর্মী বন্ধু পেলে মানুষের বেঁচে থাকা নিয়ে নানা জটিল সমস্যার প্রশ্ন তোলেন। এনজিনিয়ারিং কলেজের ওপরে ঘৃণা বাড়তে থাকে ক্রমশ। দাদাকে লেখেন, "আমার সব যাক। সব কিছু থেকে বঞ্চিত করা হোক আমাকে। কেবল আমার শিলার থাক, থাক পুসকিন···আমি সব ভুলে তাঁদের নিয়ে মগ্ন থাকব। আমার আত্মা যদি ক্ষুধার্ত থাকে ত কী হবে আমার সম্মান সম্পদ চাকরির মর্যাদায়।"

গোড়া থেকেই অসন্তোষ ছিল। এনজিনিয়ারিং কলেজে পড়তে হলে বস্তাপচা অংক জ্যামিতি নিয়ে, ড্রইং ডিজাইন নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। মন যখন কবিতায় নাটকে গল্পে রোমাঞ্চকর নানা কল্পনার অভিসারে মগ্ন, তখন অনিচ্ছার ওইসব পাঠ্য কার ভাল লাগে! কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি—আমি পড়া ছেড়ে দেব, আমি সাহিত্য করব। কেবল নিজের মনে ফোঁসেন তিনি, অক্ষম আক্রোশে নিজের মধ্যেই জ্বলতে থাকেন। তবু যদি সহপাঠীদের সঙ্গটা তাঁর ভাল লাগত!

বিশ বছর পরে, সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে ফিরে এসে, তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এনজিনিয়ারিং কলেজের স্মৃতি মনে পড়লে আজও আমি শিউরে উঠি। কী সব দৃষ্টান্তই না আমি দেখেছি সেখানে।" তিনি বিবরণ দিচ্ছেন, সামরিক বিভাগের একটা মর্যাদার চাকরিই ছিল সকলের লোভনীয় লক্ষ্য। তার জন্যে তারা যে-কোন হীন অবমাননা হাসিমুখে সইতে পারত। সইতে পারত বুটের লাথি, বেতের বাড়ি, টেবিলের তলায় কোমর ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে থাকার শাস্তি। কোন কিছুতে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারত না। জীবনের ওই একমাত্র লক্ষ্য—গাড়ি বাড়ি নারী ও পদমর্যাদার জন্যে নিজেকে যে ভাবে তৈরি করা দরকার সকলেই সেভাবে আপদমস্তক প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। তা

হোক, যার জন্যে যে তৈরি হয়েছে, সে তা করুক, তাই বলে 'মানুষ' হওয়া কী নিষিদ্ধ? আমি এখানে মানুষ দেখি নি। কেবল মানুষের মুখোশ-পরা অমানুষেরা ঘিরে থাকত আমাকে। আমি তাদের কারুর মতন নই বলে করুণা করত তারা। করুক, কিন্তু উপহাস ঘৃণা আর নির্মম ব্যবহার আমার আদৌ সহ্য হত না। তাদের ওপরে নিদারুণ তিক্ততায় ভরে উঠত আমার মন। আমি নির্লিপ্ত অবহেলায় তাদের কাছ থেকে সরে থাকতাম। ভীষণ অহংকারে সব থেকে আলাদা হয়ে নিজের মধ্যে চলে যেতাম। আহত ভীরু পশুর মতন হিংস্রতায় আমার বুক ভরে থাকত। আমি প্রবল যন্ত্রণায় পুড়তাম। তারা আমার চেহারার নিন্দে করত। আমার হেঁড়ে গলার অনুকরণ করে আমাকে উত্তেজিত করত। তবু ওদের দেখে আমার করুণা হত। কী তুচ্ছ গাল-গল্পে খেলায়, কী নোংরা আচরণে চিন্তায় তারা ডুবে আছে। ছিঃ, আমি কেন ওদের মতন হব? অহংকার হত আমার। আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিতাম। আমি অসাধারণ এই অভিযোগে ওদের ঘৃণা আমার প্রতি যত সোচ্চার হত, সামান্য বলে ওদের প্রতি আমার তাচ্ছিল্য তত প্রবল হত। কিন্তু ক্রমশ তারা যখন টের পেল, আমি যেসব বই পড়ি তারা তা পড়তে পারে না, যেসব বিষয় অনায়াসে বুঝি তারা তা কস্মিনকালেও শোনে নি—তারা আমার দিকে নীরব ক্রোধে তাকিয়ে থাকত, আমাকে সমীহ করত। আমি যে সর্বাংশে তাদের বড় বুঝে গিয়ে তারা অবশেষে আমাকে বিদ্রূপ করা বন্ধ করল; কিন্তু আমি তত দিনে জেনে গিয়েছিলাম, হয় এখানে থেকে তাদের মতন 'অমানুষ' হতে হবে নয়ত এখানকার জীবন থেকে পালাতে হবে, 'মানুষ' হতে হবে।'

কিন্তু তখনও জানেন না পালাবেন কোথায়, কী করবেন অন্য কোথাও গিয়ে। এই বিপন্ন বিরক্ত জীবনের আর এক জ্বালা অর্থের অনটন। বাবা ছেলেদের পিতার্সবুর্গে রেখে যাবার সময় পই পই করে সাবধান করে গেছেন, মাসে মাসে যে টাকা পাঠাবেন তিনি তাই দিয়েই পুরোমাস চালাতে হবে। তিনি গরীব, তাঁর অর্থের বড় অভাব। চাইলেই টাকা পাবে অত টাকা তাঁর নেই। তাই বুঝে সমঝে খরচ করবে। প্রত্যেকটি খরচের হিসেব রাখবে, টাকা চাইবার সময় খরচের হিসেবটি সঙ্গে পাঠাবে।

অথচ যে মাসোহারায় পুরোমাস চলে না তার আবার হিসেব রাখবেন কী! তা ছাড়া হিসেব রাখতে, হিসেব করে খরচ করতে কোনদিন শেখেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি। মসকোআ থাকতে ডাক্তার কোনদিন ছেলেদের হাতে একটা পয়সা

তুলে দেন নি। পকেটে পয়সা থাকলে মনের অবস্থা কী হয় তাই তাঁরা জানতেন না তখন। পিতার্সবুর্গে এসে প্রথম দস্তয়েফ্‌স্কি হাতে পয়সা পেলেন, নিজের হাতে খরচ করার স্বাধীনতা পেলেন ; কিন্তু সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা ছিল না বলে পাঁচ টাকায় যেখানে চলে, সেখানে দশ টাকা খরচ করে বসেন। কেউ ধার চাইলে বিমুখ করতে পারেন না। ধার শোধ না দিলে তাগাদা দিতে পারেন না। তদুপরি বই কেনার নেশা। অতএব পকেট সব সময় গড়ের মাঠ। মাস কাবারের দিকে যত এগিয়ে আসে দুর্দশা তত বাড়ে। জামা জুতো নোংরা হয়, সাফ করার পয়সা থাকে না, এমনকি এক কাপ চা জোটে না এমন অবস্থা হয় তখন। তখন সব অসন্তোষ ক্রোধ ঘৃণা বাবার বিরুদ্ধে পুঞ্জ হয়ে ওঠে। অথচ চিঠি যখন লেখেন, বিনয়ের অবতার। চিঠি আরম্ভ হত, 'আমার পরম প্রিয় বাবা' বলে আর শেষ হত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানিয়ে। মাঝখানে অভাবের ফিরিস্তি দিয়ে টাকা চাওয়া হত। টাকার প্রয়োজনে ছাড়া চিঠি লেখার কোন তাগিদ ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির। আর টাকার প্রয়োজন হলেই তখন বাবার জন্যে যত দুশ্চিন্তা এবং ভক্তিশ্রদ্ধা উথলে উঠত।

নিজের এই মিথ্যাচার নিজেই আবার স্বীকার করেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ১৮৭৩-এর 'নাগরিক' কাগজে এক প্রবন্ধে লিখেছেন···'দুনিয়ার সব মানুষ, মায় রাশিয়ার মানুষ সুদ্ধ সবাই মিথ্যেবাদী আমিও এর থেকে বাদ যাই নে।···আর এই মিথ্যাচারের কারণ শ্রোতাদের তৃপ্তি দেওয়া, তাদের মনে এক প্রিয়বোধের সৃষ্টি করে সুখী করা।'

কিন্তু বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলে চিঠি দেওয়ার পেছনে তাকে সুখী করার কোন চেষ্টা ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির ; বরং লক্ষ্য থাকত কটু বাক্য বলে, কি ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার।

একবার এক চিঠিতে সরাসরি একশ রুবল চেয়ে পাঠালেন। অজুহাত দিলেন, '···ওই টাকা পেলে আমি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করতে পারব। অতএব পাশ করব নিশ্চয়। কিন্তু টাকা যদি না দাও, এবার আমাকে এ-ক্লাশেই থাকতে হবে। আমার অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু থাকলে, বুঝতেই পারছ, পড়ার খরচ আরও এক বছর বেশী চালাতে হবে তোমাকে।'

এ কথাটা ডাহা মিথ্যে কেন না যে কলেজে তাঁর আদৌ পড়ার ইচ্ছে নেই সেখানে একটা বছর-বেশী পড়তে হবে সে তার পক্ষে রীতিমত একটা কঠিন শাস্তির ব্যাপার। তিনি চাইছেন, যেন তেন উপায়ে এ-পরিবেশ থেকে অব্যাহতি ;

আর সে অব্যাহতি পেতে হলে, তিনি জানতেন, নিয়মিত পাশ করে যাওয়াই সোজা পথ। পাশ করলে অফিসার হবেন। কোয়ার্টার পাবেন। সেইভাবে মুক্তি মিলবে তাঁর।

অথচ মুক্তির সুযোগ নিজেই এক বছর পিছিয়ে দিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কেন না পাঠ্য-বিষয়ে আদৌ তিনি মনোযোগ দিতে পারতেন না। বাস্তুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, ভূগোল, ফলিত জ্যামিতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি কোন একটা বিষয়ের প্রতিও তাঁর একরত্তি আগ্রহ আকর্ষণ ছিল না।

দস্তয়েফ্‌স্কির আর এক গাত্রদাহ ছিল জারের এক সামরিক বিধান। পথে কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে দেখলে সে অধস্তন অফিসার হোক কি সাধারণ ক্যাডেট হোক তাকে এটেনশন-এ দাঁড়াতে হবে; তারপর ওভার কোটের বোতাম খুলে জামার কাঁধের প্লেটে আঁকা ব্যাজ দেখাতে হবে এবং ট্রিকর্ন হ্যাট স্পর্শ করে স্যালুট করতে হবে। রাস্তায় যত অফিসারের সঙ্গে দেখা হবে প্রত্যেকের সামনে প্রত্যেকবার এই দাস্যবৃত্তির পুনরাবৃত্তি চলবে। সব চেয়ে বিপত্তি ঘটে নেভ্‌স্কি এভেন্যু দিয়ে হাঁটতে হলে। প্রতি দু' তিন মিনিটে একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হবেই সেখানে।

মিখাইলের চিঠিতে দস্তয়েফ্‌স্কির এ অসন্তোষের খবর জানতে পেরে ডাক্তার লিখেছিলেন, "ওকে তার উর্ধ্বতন অফিসারের জায়গায় কল্পনা করতে বলো, তখন নিশ্চয় পদে পদে ওই রকম স্যালুট পেতে তার গর্ববোধ হবে। তাছাড়া তাকে আরও বলো, যে হুকুম তামিল করতে শেখে না সে হুকুম দিতেও জানবে না কোনদিন।"

এনজিনিয়ারিং পাঠ্য-বিষয়গুলি শক্ত ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সেগুলি আয়ত্ত করা দস্তয়েফ্‌স্কির পক্ষে কঠিন ছিল না। তাঁর পরীক্ষা-পাশে বাদ সেধেছিল তাঁর সাহিত্যের নেশা। সে নেশায় মেতে থেকে পরীক্ষার পড়া তৈরি করার মতন জরুরী কাজটাতেও যথোচিত মনোযোগ দেন নি তিনি। এ-কথাটা মিখাইলের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন মিখাইলের বন্ধু ডাঃ রাইজেনকাম্প। মিখাইলের এই জর্মন বন্ধু রেভাল থেকে এসেছিলেন পিতার্সবুর্গে। এসে দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি মিখাইলকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারমর্ম এই: 'তোমার সাহিত্য-পাগল ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। যতক্ষণ ছিল কেবল সাহিত্যের কথা শুনেছি তার কাছে। পুসকিনের 'ইজিপশিয়ান নাইটস্‌', স্কট থেকে ঝুখফ্‌স্কির অনুবাদ 'সেণ্ট জনস ইভ' আবৃত্তি করে শোনাল।

নিজে যে-সব রচনা লিখেছে, দেখাল, পড়ে শোনাল। সাহিত্য নিয়েই সব সময়টা কাটাল আমার সঙ্গে···বলল, 'সে কবিতা দারুণ ভালবাসে কিন্তু লিখতে পারে না, ধৈর্যে কুলোয় না। কলম ধরে বসে ছন্দ মিল ইত্যাদির জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না সে। তার মাথায় ভাব আসে জলের ফোয়ারার মতন'।'

যাঁর মাথায় ভাবের এমন প্রবল চাপ এবং যা সর্বদাই ফোয়ারার মতন তীব্র বেগে বেরিয়ে আসতে চায় তাঁর পক্ষে সৈন্যবিভাগের নীরস পড়ায় মন দেওয়া কঠিন বই কি!

এ-হেন মানুষ যাঁর পাঠ্য থেকে অ-পাঠ্যে মনোযোগ বেশী তাঁকে সহপাঠীরা সৃষ্টি-ছাড়া মানুষ মনে করলে অবাক হবার কিছু নেই। তারা সবাই দস্তয়েফ্স্কিকে ফোতিয়ুস বলে ডাকত। পূর্বকালে পিতার স্পাস্কি নামে এক পাদ্রী ছিল। সে সন্ত ফোতিয়ুস-এর নামে নিজের নাম রাখে এবং সাধু সেজে প্রচার কার্যে নেমে যায়। সে নিজেকে ঈশ্বরের সৈনিক মনে করত, বলত, চার্চ এবং পিতৃভূমি উদ্ধার করার জন্যে সে জন্মেছে। বস্তুত দস্তয়েফ্স্কির কথাবার্তা ও লেখাটেকা দেখে সেই নকল ফোতিয়ুসের কথাই মনে পড়েছে তাদের। ষোল-সতর বছরের ছেলে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা সমস্যা নিয়ে ভাবে ত সমবয়সীদের কাছে ওই রকম ঠাট্টাই কুড়োতে হয় তাকে।

পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি অনীহা, সহপাঠীদের প্রতি ঘৃণা, সামরিক শৃংখলার প্রতি অবজ্ঞা কলেজের প্রথম বছর দস্তয়েফ্স্কির মনটাকে খুব বিক্ষিপ্ত রেখেছিল। এ-ঘোর আস্তে আস্তে কেটে এসেছে তাঁর দ্বিতীয় বছরে। তখন সহপাঠীরা তাঁকে তাদের থেকে দূরে থাকতেই দিয়েছিল। মাঝে মধ্যে তাঁর মহৎ চিন্তার প্রতি কটাক্ষ করে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিত, তার বেশী এগোত না। তাঁকে নির্বিঘ্নে একলা থাকতে দিত।

দস্তয়েফ্স্কির সময় গ্রিগোরোভিচ পুরোনো ছাত্র। অফিসার্স ট্রেনিং নিচ্ছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে নবাগত ছাত্রদের প্রতি আর্মি এনজিনিয়ারিং কলেজের ট্রেনারদের বর্বরোচিত ব্যবহারের নিন্দা করে বলেছেন, 'এসব দেখে দস্তয়েফ্স্কির মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর ক্রোধের আর এক কারণ ছিল সহপাঠীদের নোংরা গান গাল-গল্প। এ-সব তিনি সহ্য করতে পারতেন না বলেই দূরে সরে থাকতেন। না নাচ, না খেলাধুলো—কিছুতেই যোগ দিতেন না। অবসর পেলেই বই নিয়ে বসতেন। খুঁজে পেতে একটা জায়গাও পেয়ে গিয়েছিলেন ভাল। চার নম্বর ডরমিটরির লম্বা হলের এক কোণে এক জন মানুষ

বসে পড়তে লিখতে পারে এমন একটি খোপ ছিল। তার একটা জানালাও ছিল। সে জানলা দিয়ে নদীর দিক থেকে প্রবল হাওয়া আসত। ক্লাশ করার ফাঁকে ফাঁকে কি বিশ্রামের অবসরে এমন কি ছুটিছাটার দিনেও তাঁকে খুঁজতে হত না, সবাই জানত ওইখানে তাঁকে পাওয়া যাবে।

'এবং পাওয়া যেত—সারা কলেজে তাঁর মাত্র গুটি তিন চার বন্ধু ছিল যাদের সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর মনের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন—দেখা যেত হয় তিনি বন্ধুদের কারো সঙ্গে কথা বলছেন অথবা পড়ছেন।'

'কখনো কখনো তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখতাম, বিষণ্ণ মুখে পায়চারি করতেন তখন'—লিখেছেন তাঁর সহপাঠী ক্রতোফ্‌স্কি, 'সব সময় দস্তয়েফ্‌স্কি গম্ভীর হয়ে থাকতেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'পুঁথি-পত্রের মধ্যে এমন মগ্ন মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি,' লিখেছেন আর এক সহপাঠী সাভেল্‌য়েফ, 'পড়তে বা লিখতে থাকলে তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না, তাঁর চারপাশে কী ঘটছে কিছুই তিনি জানতেন না। কেবল ধ্যান ভাঙত বাতি নিভানোর ঘন্টি বাজিয়ে ঘন্টিওলা যখন ডরমিটরির মধ্যে দিয়ে চলে যেত। কিন্তু আমি অনেক গভীর রাতেও মাঝে মাঝে তাঁকে জেগে থাকতে দেখেছি। ডরমিটরির ছাত্রদের বাতি নিভে গেলে তারপরেও একটা সরকারী বাতি জ্বলত মাঝখানে, সারারাত জ্বলত। সেই দূরের বাতির মৃদু আলোতে দেখতাম তখনও তিনি পড়ছেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'রাত্রির এই শান্ত পরিবেশ আর এই মৃদু আলো মনোযোগ দিয়ে কাজ করার পক্ষে খুব অনুকূল।' জীবনের শেষ দিন অব্দি এই রাত-জেগে লেখবার অভ্যাস থেকে গিয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির।

ওই ডরমিটরির প্রতিকূল পরিবেশে বসে দস্তয়েফ্‌স্কি কী লিখতেন কী পড়তেন, কোন্ ভাবনা তাঁকে সব ভুলিয়ে রাখত, শিদ্‌লফ্‌স্কির সঙ্গে এক দিনের এক সাক্ষাৎকারের রেকর্ড থেকেই আমরা তা জানতে পারি।

দীর্ঘ এক বছর পরে হঠাৎ একখানা চিঠি পেলেন তিনি: "আমি পিতার্সবুর্গে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। মিখাইল এখানে থাকলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো।" শহরতলির একটা ঠিকানা দিয়ে শিদ্‌লফ্‌স্কি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি পেয়ে অস্থির দস্তয়েফ্‌স্কির রাত পোহানোর তর সইল না। তিনি ডরমিটরির তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর চোখ এড়িয়ে বরফপড়া শীতের মধ্যেই রাত্রির রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

কত কথা মনে পড়তে থাকল তাঁর। দাদাকে লিখেছিলেন শিদ্‌লফ্‌স্কি,

'মহাকবির লক্ষণ কী জান? তাঁকে ধুলোয় ফেলে দিয়ে টানো, তাঁকে কাদায় ফেলে দিয়ে মাড়াও, তাঁকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দাও, তাঁর আত্মা কখনো আত্মসমর্পণ করবে না। তিনি সর্বদা সত্যসন্ধী, নিত্য ন্যায়পরায়ণ। প্রেরণার দেবদূত তাঁকে জীবনের অন্ধকার থেকে নিরাপদে আলোকিত অমরত্বের দিকে বয়ে নিয়ে যায়।' এই বিশ্বাসের পরিবেশে ও সাহচর্যে দস্তয়েফ্স্কির জীবনের রোমান্টিক অধ্যায়ের সূচনা। শিদ্লফ্স্কি তাঁকে নূতন আদর্শবাদে দীক্ষা দেন শেক্সপীয়র, শিলার, হফ্মান, বালজাকের মাধ্যমে। সেই দীক্ষায় দীক্ষিত শিক্ষায় শিক্ষিত দস্তয়েফ্স্কির সাধনা ডরমিটরির মলিন আলোর নিচে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিল।

চলতে চলতে শিদ্লফ্স্কির মূর্তি ভেসে ওঠে চোখের সামনে—সদা-উৎসুক একখানি শুষ্ক শীর্ণ মুখ—যেন মানুষটির উপোসে দিন কাটে; কিন্তু যখন কথা বলেন, আলোচনা করেন জর্জ সাঁদ ও গোগোল নিয়ে, ঈশ্বর ও রাশিয়া নিয়ে, তখন যেন আর এক মূর্তি হয়ে যান, প্রাণপূর্ণ দেখায় তখন চেহারা, জ্বলজ্বল করতে থাকে দুই চোখের তারা—যেন এক অলৌকিক আলোর শিখা হয়ে ওঠে দৃষ্টির প্রদীপ। এক অ-দৃষ্টের স্বপ্নে মগ্ন-চৈতন্য হয়ে যান যেন তখন। আহ্, কোথায় গেল সেই দিনগুলি, কত দূরে। ছোট্ট আলোচনা-চক্রটি ভেঙে গেছে। মিখাইল এখন রেভাল-এ। শিদ্লফ্স্কি তাঁর কেরানীর সামান্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাশিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রামে গ্রামে প্রচার করে ফিরছেন তাঁর উপলব্ধির কথা, উত্তর খুঁজছেন নিজের প্রশ্নের, সংশয়ের নিরসন চাইছেন। পত্র লেখেন মাঝে মাঝে, কখনো কোন গ্রাম থেকে কখনো কোন মঠে বসে। একদা যিনি দেহের ক্ষুধা আর আত্মার পিপাসা মিটাতে জীবনের দুই প্রান্তে পেণ্ডুলামের মতন দুলতেন তিনি সব ছেড়ে হলেন বৈরাগী। এক বছর আগে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে কাজান ক্যাথিড্রেলের চাতালে। দস্তয়েফ্স্কি এসে দেখেন, রাজ্যের ভিখিরী ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে আছে চারধারে তার মধ্যে একটা থামের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন শিদ্লফ্স্কি। পরনে ছেঁড়া নোঙরা পায়জামা, গায়ে চাষীর কোর্তা, শীর্ণ শরীর, শুকনো মুখ চোখে সেই সেদিনের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষণ্ন ছায়া। আজ আবার তাঁকে কি চেহারায় দেখবেন কে জানে।

দস্তয়েফ্স্কি অনেক হেঁটে অনেক খুঁজে শেষে অনেক কালের পুরোনো এক জীর্ণ বাড়ির চার তলায় এসে পেলেন তাঁকে। দরজার সমুখেই দেখা। শিদ্লফ্স্কি

ত্ব'হাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। ক্ষণকাল আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকলেন, তারপর মুখোমুখি হলেন ত্ব'জন, শিদ্‌লফ্স্কি ডাকলেন—

'এস, ঘরে এসে বসবে এস।'

'দাঁড়াও তোমাকে একবার ভাল করে দেখি': দস্তয়েফ্স্কি দেখলেন, শিদ্‌লফ্স্কি আগের থেকে আরও রোগা হয়েছেন। আরও বয়স্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। এখন শুষ্ক শীর্ণ মুখে কেবল চোখ ত্বটোই আরো বেশী করে জ্বল জ্বল করছে। পোশাকের ত্বরবস্থা সেই আগেকার মতনই।

শিদ্‌লফ্স্কি তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন ঘরে। নড়বড়ে খাটে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখ এবার কী রাজার হালে আছি, আস্ত একখানা ঘরে থাকছি। হাঁক দিলেই চা আসছে, খাবার আসছে। বলেই উঠে বাইরে এসে কাকে হাঁক দিয়ে ত্বটো চায়ের অর্ডার দিলেন তারপরে এসে জাঁকিয়ে বসলেন দস্তয়েফ্স্কির পাশে, এক বছরের রোজনামচা শোনাতে লাগলেন।

নানা গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন অনেকদিন। কিছুদিন মঠে থেকেছেন, আশা, যদি সেখানকার নিয়ম-শৃংখলা তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসে পৌছানোর চেষ্টায় কিছু সামর্থ্য যোগান দেয়। কিন্তু কিছু হল না, 'আমার যন্ত্রণা দেখে মোহন্ত বললেন, যাও পথে বেরিয়ে পড়, পথের কষ্ট আর অভিজ্ঞতাই তোমার সাধনার পক্ষে দরকার।'

ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে এক সময়ে তাঁরা সাহিত্য-বিষয়ে এলেন—পুসকিন শিলার নিয়ে আলোচনা, পরে তাঁদের কবিতা থেকে আবৃত্তি হল। শেষমেশ দস্তয়েফ্স্কি আসল কথায় এলেন, 'চিঠিতে লিখেছ আমাকে তোমার জরুরী দরকার, কেন, এবার বল।'

একটা ছেঁড়া থলি থেকে একতাড়া কাগজ বের করে শিদ্‌লফ্স্কি বললেন, 'এই যে দেখ, রুশচার্চ-এর ওপরে আমি একটা ইতিহাস লিখছি। এ-ইতিহাস লিখতে লিখতেই হয়ত আমার চোখের কুয়াসা কাটবে।'

দস্তয়েফ্স্কি কাগজের তাড়া ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোন্ এক গ্রাম থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে মনে নেই, তাতে লিখেছিলে, "খ্রীষ্টত্ব ভর করে আছে প্রায়শ্চিত্তের ওপরে। ওটাই হচ্ছে কেন্দ্র বিন্দু।" কথাটার মানে কী আমাকে বোঝাও। ধর খৃষ্ট যখন ক্যালভ্যারিতে যাচ্ছিলেন তখন যদি তাঁকে কোন প্রতিপত্তিশালী রোমান ভদ্রলোক বাধা দিতেন, ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার পরিণাম থেকে রক্ষা করতেন, তাহলে তখনও কী মানুষজাতিকে অনন্তকাল দণ্ড ভোগের পাত্র হতে হত? বল, উত্তর দাও।'

শিদ্‌লফ্‌স্কি পাশ কাটাতে চাইলেন, 'আচ্ছা বলতে পারো, দু'জন রুশী একত্র হলেই ঈশ্বর মনুষ্যত্ব ইত্যাদি চিরন্তন বিষয় নিয়ে তর্কে মেতে ওঠে কেন? বছর খানেক পরে আমাদের দেখা, দেখ, দেখা হতে না হতে আমরা ওই সব ব্যাপার নিয়ে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।'

'উহুঁ ওসব ছেঁদো কথায় ভুলব না, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।' দস্তয়েফ্‌স্কি গম্ভীর গলায় বললেন।

শিদ্‌লফ্‌স্কি এবার উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকবার পায়চারি করে দস্তয়েফ্‌স্কির সামনে এসে থেমে বললেন, 'যীশু আবির্ভূত হয়েছিলেন শুধু এ-জন্যেই, সকলের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন বলে। এবং যে ভাবেই হোক প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতেনই। এর অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। কেন উপায় ছিল না, আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। এটা ঘটবেই তাই ঘটেছে আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি।' তিনি চিন্তিত মনে আবার পায়চারি করতে থাকলেন।

'আমরা যদি না বুঝি, না ব্যাখ্যা করতে পারি, তবু কী আমরা পাপী হব?' প্রশ্ন করে দস্তয়েফ্‌স্কি শিদ্‌লফ্‌স্কির দিকে তাকালেন, তাঁর মনে পড়ল, আজ না এর আগেও বহু দিন এ ধরনের বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে তর্ক হয়েছে, তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি, বিশ্বাসের কোন অবলম্বনই হাতের কাছে পান নি তাঁরা।

হঠাৎ থেমে শিদ্‌লফ্‌স্কি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ধর, ঈশ্বর মানুষের কল্পনার আবিষ্কার, তাহলে মানুষই বিশ্বসংসারের প্রভু ত? চমৎকার কথা, মেনে নিলাম, কিন্তু ঈশ্বরই যদি না থাকেন মানুষ তবে কেমন করে সৎ হবে বল? মানুষ তখন কাকে প্রেম করবে? কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে? কার প্রার্থনা করবে, গুণগান গাইবে?'

'মানুষ তখন নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে বাঁচবে,' দস্তয়েফ্‌স্কি বলে উঠলেন, 'সে ভালবাসবে স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্রকে, সে তারই গুণগান করবে।'

'কিন্তু তুমি যদি অমরত্বে বিশ্বাস নষ্ট করে দাও,' শিদ্‌লফ্‌স্কি উত্তর দিলেন, 'ত প্রেম প্রভৃতি সমস্ত জীবন্ত শক্তির উৎস যে শুকিয়ে যাবে।'

'না, না,' স্বর দৃঢ় হল দস্তয়েফ্‌স্কির, 'প্রেমই মানুষকে অমরত্বে বিশ্বাসী করেছে, বিশ্বাসী রাখবে।'

শিদ্‌লফ্‌স্কি মৃদু হেসে বললেন, 'আর সেই সক্রিয় প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বরের

অস্তিত্ব আছে জেনো। তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীকে সক্রিয় প্রেম দিয়ে প্রীত কর, তার মধ্যেই তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব টের পাবে। তুমি প্রেমের মধ্যে যতই আত্মবিস্মৃত হতে থাকবে ততই ঈশ্বর তোমার কাছে বাস্তব হয়ে উঠবেন। তখন তুমি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। সংশয় আর তোমার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

'হাঁ, যদি কেউ ওই ভাব আঁকড়ে থাকতে পারে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব হবে? সন্দেহটাকে ত কেউ বেছে নেয় না, নেয় কি? হয় আমরা বিশ্বাস করব, নয় সন্দেহ করব। আমি ত এই বুঝি।'

'তার মানে?'

'ঈশ্বরে বিশ্বাস কোন ইচ্ছার ব্যাপার নয়। আমাদের চিন্তাভাবনাগুলি আমাদের চাকর না; ইচ্ছা করলেই মনের মধ্যে এগুলির আসা যাওয়া আমরা বন্ধ করতে পারি না। চিন্তা ভাবনার সময় সেগুলিকে সৎ অসৎ বলেও চিহ্নিত করা যায় না—মানে সেগুলি সৎও নয় অসৎও নয়, বাস্তব। পরে যখন আমরা সেগুলি অন্যের কাছে প্রকাশ করি তখনই তা সৎ কিংবা অসৎ চেহারা নেয়।'

'অতশত বুঝি নে। ফিওদর মিখাইলোভিচ, আমার কথা হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন। সুতরাং নিজের পাপের জন্যে ত বটেই, সকলের পাপের জন্যেও আমরা সকলে দায়ী। মানুষ যখন এ-সত্য উপলব্ধি করে তখনই স্বর্গের রাজ্য তার জন্যে অবারিত হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমি সকলের পাপের জন্যে দায়ী হব? কেমন করে হব?'

'বুঝতে পারছ না, কেন না, বিশ্বসুদ্ধ মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে অন্য রকম ভেবে এসেছে বলে। বুঝতে পারছ না, কেন না, আমরা যে মিথ্যে বলি সে মিথ্যা আর এক জন বলুক তাই আমরা চাই বলে।'

'থামো ইভান নিকোলায়েভিচ, শোন, তোমাকে একটা ঘটনা বলি, কালই চোখের ওপরে দেখেছি কাণ্ডটা। একটা চাষার ঘোড়া কাদায় পড়ে গিয়েছিল আর চাষাটা তাকে প্রাণপণে চাবকাচ্ছিল। অনেকগুলি লোক জড় হয়েছিল সেখানে। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'মার, কষে মার, চোখে নাকে মার। খুব কষে চোখে নাকে মারলে বেটা ঠিক উঠে দাঁড়াবে।' বলতে পারো, কেন ঈশ্বর এটা সমর্থন করছেন? কেন এমন নৃশংস অত্যাচার করা হবে ঘোড়াটার ওপরে? ঘোড়া মেরে পাপ করে তারই প্রায়শ্চিত্তের দামে অক্ষয়

স্বর্গলাভ করব, বলে? তাই কি ওই মূঢ় মূক চোখে এমন নির্মম মার মারতে হবে? এটা কি একটা অমানুষিক বর্বরতার কাজ না? ঈশ্বর নাকি পরম দয়ালু। সত্যি যদি তিনি তাই, যদি তিনি ক্ষমাশীল ত কেন তিনি মানুষকে পাপে প্রবৃত্তি দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের দাবি করেন?'

শিদ্‌লফ্‌স্কি বললেন, 'আমিও ত তাই ভাবি। কেন তিনি আমাদের এমন সংশয়ের মধ্যে ফেলেছেন, কেন তিনি সব কিছু সরল স্বচ্ছ করে দিচ্ছেন না?'

'সত্যি তাঁর নামে কত পাপ ঘটছে; তিনি সবই জানেন ত কেন তিনি আগে থেকে কথা বলছেন না? একটা কথা, তাঁর মুখনিঃসৃত একটি মাত্র বাক্যে অনন্ত জীবনের সকল তর্ক থেমে যেত, তিনি একটি মাত্র বাক্যে সব জটিলতার অবসান ঘটিয়ে দিতে পারতেন।'

'সেখানেই ত রহস্য; ভয়ংকর রহস্য সেখানে,' শিদ্‌লফ্‌স্কির স্বর কেঁপে উঠে থেমে গেল। দু'হাত শূন্যে তুলে বললেন, 'দয়া করে আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর: প্রত্যেকটি মানুষ নিজের জীবনের সমস্ত সাফল্যকে একলা ভোগ করতে চায়। এ-ভাবে মানুষের ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হয়ে গেছে তারা। তারা নিজ নিজ ভাগের জিনিস আর সকল থেকে আড়ালে টেনে এনে লুকিয়ে রাখছে। সমস্ত ধন-সম্পদ একলা জড় করে ভাবছে আর সকল থেকে আমি বেশী নিরাপদ, বেশী সুরক্ষিত। সে বুঝছে না, যত সে সঞ্চয় করছে তত সে আত্মনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ সে নিজের ওপরে ছাড়া আর কারো ওপরে নির্ভর করতে পারছে না। সে আর কারো ওপরে ভর না করার, ভরসা না করার অভ্যাসেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর সমগ্র থেকে এভাবে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন একলা করে ফেলেছে। ফলত সে হারাই হারাই ভয়ে সব সময় কাঁটা হয়ে থাকছে—এই বুঝি ধন গেল, মান গেল, পরম যত্নের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হল। আর সেই ভয়ের কাছে সব শান্তি সব সুখ অঞ্জলি দিচ্ছে। কিন্তু নিদারুণ সংশয়ে সে যতই সাবধান হোক শেষমেশ একদিন সে দেখবে, বিচ্ছিন্ন একলা হয়ে যাওয়ার কী ভীষণ বিপদ, কী কঠিন যন্ত্রণা। সেই পরম লাঞ্ছনার দিনেই স্বর্গের সিংহদ্বার খুলে যাবে। ঈশ্বর-পুত্র দর্শন দেবেন সেদিন। সেদিনের প্রতীক্ষায় প্রত্যেক সচেতন মানুষকে কাজ করে যেতে হবে। সে যদি একলাও হয়, তার যদি দোসর না জোটে ত একলাই অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে হবে তাকে—আত্ম-কেন্দ্রিক অস্মিতার বেড়া ভেঙ্গে নিঃসঙ্গ মানুষদের বের করে নিয়ে আসতে হবে,

প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদের। সে মহান আদর্শ যাতে না নষ্ট হয়ে যায়, সে চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করতে হবে সচেতন মানুষকে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বিনীত হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি, না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

'ধাৎ, ক্ষমার কী আছে, ক্ষমা করার কী হল!' শিদ্‌লফ্‌স্কি হেসে ফেললেন। তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ফিওদর মিখাইলোভিচ, তোমার সঙ্গে আর হয়ত আমার দেখা হবে না, আমি তীর্থভ্রমণে বেরুচ্ছি।'

'তাই যাও,' দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'তীর্থের পথেই হয় ত উত্তর রয়েছে। তুমি উত্তর পাবে।'

আট

বিশ্ব রহস্যের মূলে পৌছতে তীর্থের পথে যাত্রা করলেন শিদ্‌লফ্‌স্কি আর মানুষের অন্তর রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে বদ্ধ পরিকর দস্তয়েফ্‌স্কি ফিরে এলেন ডরমিটরির নির্জন কোণে। এখানে তিনি পদার্থবিদ্যা, বাস্তবিদ্যা, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, প্রতিরক্ষার নীরস বিষয় পড়েন আর মনের মধ্যে অস্থির হয়ে দিন গোণেন কবে সামরিক কাজ থেকে মুক্তি পাবেন, নিজের সাধনায় অখণ্ড মনোনিবেশ করতে পারবেন তিনি। তবু সাধনায় যতি পড়ে না তাঁর। সকল কাজের মধ্যেও নিজের কাজের জন্যে সময় করে নেন; অবসর আর ঘুম অবান্তর হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। এ-সময়ে দাদাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"জীবনের অর্থ খুঁজছি আমি, এ-পথে আমি এগিয়ে চলেছি। আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। মানুষ এক জটিল রহস্য, এ-রহস্যের আবরণ খুলে ফেলতে হবে। তার জন্যে যদি গোটা জীবনও কেটে যায়, মনে করো না জীবনটা বৃথা কাজে ব্যয় হয়ে গেল। এই রহস্যের সমাধানই আমার সাধনা, কেন না আমি 'মানুষ' হয়ে উঠতে চাই।"

এ সময়ে হঠাৎ সেই মর্মান্তিক খবর এসে হাজির। ক্যাপ্টেন রোসেন ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'তোমার বাবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে পনর দিনের ছুটি দিলাম। তুমি এক্ষুনি দেশে চলে যাও।'

প্রত্যেক পোসটিং স্টেশনে গাড়ি বদল করে যেতে তিনদিন কেটে যাবে, ততদিনে কী তিনি গিয়ে বাবাকে দেখতে পাবেন? অ্যাকসিডেন্ট-এর বেশী আর কিছুই বললেন না ক্যাপটেন। নিশ্চয় সাংঘাতিক কোন দুর্ঘটনা। বাবা

কী তবে মরে গেছে ? কথাটা মনে হতেই বরফ জলের একটা তীব্র ঠাণ্ডা স্রোত যেন বয়ে গেল তাঁর শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে। দস্তয়েফ্‌স্কি শিউরে উঠলেন।

তাঁদের পিতার্সবুর্গে রেখে বাবা চলে এলেন মসকোআয়, এসেই চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। চলে গেলেন দারোভোয়ে-তে। 'দারোভোয়ে' একটা অকল্যাণের শব্দ হয়ে তাঁর বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ল। তিনি গাড়ির গদিতে এলিয়ে পড়লেন, তাঁর বুজন্ত চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের অচৈতন্য হয়ে পড়ার দৃশ্য। সে তার দশ এগারো বছর বয়সের কথা। সব কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে এবার শেষবারের মতন গ্রামখানা ঘুরে এসে বাবা টাকা মিটিয়ে দিয়ে দলিল দস্তাবেজ করে গ্রামখানা কিনে নেবেন। একটা শুভদিন দেখে বাবা রওনা হয়ে গেলেন। আমরা ভাই-বোন-মা সকলে ড্রইং-রুমে বসে আছি। বাবা বেরিয়ে যাবার অল্প পরেই আবার শুনি ক্ষুরের শব্দ, চাকার শব্দ। মা চমকে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা দেখি বাবা গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। বাবা ছুটে ঘরের মধ্যে এলে মা বিবর্ণ মুখে শুধোলেন—'কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে ?'

'কাগজপত্র ফেলে গেছি।' বাবা ড্রয়ার খুলতে খুলতে জবাব দিলেন।

মা বললেন—'আজ আর যেয়ে কাজ নেই তা হলে, আজ থাক, আর একটা ভাল দিন দেখে যেও।'

'যত্তসব কুসংস্কার', বলে বাবা যেমন এসেছিলেন চলে গেলেন।

'এ জমি কিনে আমাদের মঙ্গল হবে না।' বলে মা কেমন তরাসে অস্থির হয়ে উঠলেন। বসতে গিয়েও আর বসতে পারলেন না, মেঝেতেই গড়িয়ে পড়লেন।

মা'র সে অমঙ্গল আশংকা বছর না ঘুরতেই সত্যি হয়েছিল। গ্রীষ্ম শুরু হলেই আমরা সব দারোভোয়ে যাব তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমরা ভাইবোনেরা বাবা মাকে ঘিরে বসে পরিকল্পনা শুনছি। এমন সময় আমাদের ভেজানো দরজা আস্তে খুলে গেল, তাকিয়ে দেখি দরজার ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নফর গ্রিগরি ভাশিল্‌য়েফ। ওর ওপরেই আমাদের দারোভোয়ের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনার ভার সঁপে দিয়েছিলেন বাবা। এ-দায়িত্ব পেয়ে সে নিজেকে ম্যানেজার মনে করত আর সব সময় য়ুরোপিয়ান পোশাক পরে ফিটফাট থাকত। কিন্তু এখন একি দেখি, পরনে চাষার পোষাক, পায়ে চাষার জুতো, সর্বাঙ্গে ধুলো, সে যেন সেই দারোভোয়ে থেকে এখান অব্দি দৌড়ে এসেছে। দৌড়ে এসেছে বলেই কি কথা বলতে পারছে না ? দম নিচ্ছে ?

নিশ্চুপ লোকটার ধুলিধুসর শুকনো চেহারা দেখে বাবা আঁৎকে উঠলেন। মাকে বললেন, 'দেখ দেখ ওর চেহারা দেখ।'

'কি হয়েছে রে তোর ?' বাবা গ্রিগরির দিকে তাকালেন আবার।

'গোটা দারোভোয়ে গ্রামখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাবু' বলে বুড়ো মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠল। তার কান্না কমলে জানা গেল আরখিপ নামে একটা চাষার সাধ হয়েছিল শূয়ার পুড়িয়ে খাবে। নিজের কুঁড়ের উঠোনে সেই শূয়ার পোড়াতে গিয়েই এই বিপত্তি। ওর উঠোনের পাশে ছিল খড়ের গাদা। শূয়ার পোড়ানোর আগুন কেমন করে গিয়ে সেই খড়ের গাদায় পড়েছিল। তারপরে আর কি! সে খড়ের গাদার আগুন লেলিহান শিখা হয়ে তামাম গ্রামটা গ্রাস করে ফেললে। ঘর বলতে দারোভোয়-তে আর কিছু রইল না। আগুনের ভুক্তাবশিষ্ট শুধু ছাইয়ের গাদা ছড়িয়ে থাকল চারদিকে। আমাদের মধ্যবিত্তের সামান্য রোজগারের ওপরে সে যে কী বিপুল অপচয়ের চাপ, ভেবে বাবা মা শুকনো হয়ে গেলেন। পরিণামে এক গাদা ঋণ হল আর হল স্বজন বিচ্ছেদ।

আরও ছোটখাটো দুর্ঘটনা অনেক গেছে, এবারকার দুর্ঘটনায় কী বাবা নিজে গেলেন! এই কী মায়ের সেদিনকার সেই চরম অমঙ্গল আশংকা ? দস্তয়েফ্স্কির দু'চোখ ভরে জল নেমে এল। এই বাবাকে তিনি ঘৃণা করতেন তাঁদের ভীষণ শাসনের মধ্যে রাখতেন বলে, মাকে অবহেলা করতেন বলে, পিতার্সবুর্গে তাঁর হাতখরচা পাঠানোর বেলা হাজার কৈফিয়ৎ চাইতেন বলে—আজ এখন সেই সমস্ত ঘৃণা অসন্তোষ জ্বালা অনুশোচনায় গলে গলে চোখের জল হয়ে নামতে থাকল। মনের মধ্যে নতজানু হয়ে বলতে থাকলেন, '...বাবা, তুমি তোমার এই অপদার্থ ছেলের অপরাধ ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।'

অনুশোচনা আর যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে তিনদিনের রাস্তা পার হয়ে এসে দস্তয়েফ্স্কি যখন তাঁর খামারবাড়িতে পা রাখলেন তখন চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়ি শূন্য, খামারের কোথাও জন-মনুষ্যের চিহ্ন নেই।

দারোভোয়ের সব ভূমিদাস কি দেশ ছেড়ে চলে গেছে ? নাকি অন্য কোনখানে দুর্ঘটনায় বিপন্ন মনিবকে ঘিরে বসে আছে সকলে!

তিনি এক নফরের দরজায় ঘা মারলেন, দরজা হাট খুলে গেল। কেউ ঘরের মধ্যে নেই, পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন অন্যান্য ঘরগুলি থেকে বেরিয়ে মেয়েরা ছুটে পালাচ্ছে। একটা ঘর থেকে মাথা বের করেছিল মারিয়া

সেময়েনোভনা। তাঁরা মস্‌কোআ থাকতে এই মেয়ে তাঁদের রেঁধে খাওয়াত। এখন বয়স হয়েছে, কানে কম শোনে, চোখেও ভাল দেখতে পায় না।

দস্তয়েফ্‌স্কি ছুটে এসে তার ঘরে ঢুকলেন, 'মাসকা, তোরা এমন পালিয়ে থাকছিস কেন, পালিয়ে যাচ্ছিস্ কেন? বাবা কোথায়, কী হয়েছে তাঁর? খামারে একটাও পুরুষ নেই কেন, কোথায় গেছে তারা সব?'

কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'ব্যাপার কী? আমার বাবা কোথায়?'

ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে মাসকা, তার ভীত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে; বলল, 'আমি এ সবের কিছু জানি নে বাবু, তুমি গ্রিগরিকে শুধোও।'

'কি জান না তুমি?' দস্তয়েফ্‌স্কি তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, 'বাবা কোথায়? বল, তুমি সব জান, কী হয়েছে, কী?'

'বটে, খেলা হচ্ছে আমার সঙ্গে!' কর্তা তাঁর লোহার কাঁটা জড়ানো কাঁচা চামড়ার চাবুক হাতে নিয়ে বেরোলেন চেরমোশনিয়ের দিকে। জানো বাবু, তোমাদের কোচমান ডেভিড···ব্যাটা সব জানতো তবু কর্তাকে সে গাড়িতে করে নিয়ে গেল সেখানে।

কর্তা গিয়ে দেখেন চাষারা সব হাওয়া খাচ্ছে, গুল ঝাড়ছে। 'কাজে বেরোও নি কেন তোমরা?' জানতে চাইলেন কর্তা।

ভাশিলি বললে, 'আমাদের অসুখ করেছে।'

'অসুখ করেছে? দাঁড়াও দাওয়াই দিচ্ছি', বলে তিনি যেই চাবুক তুলেছেন, সবাই ছুটে গিয়ে রাস্তা থেকে উঠোনে জড় হল। কর্তা তাদের তাড়া করে যেতেই ভাশিলি লাফিয়ে পড়ে হাত ধরে ফেলল তাঁর। অন্যরা সব ভয় পেয়ে গেছল, ভাশিলি গাল পেড়ে তাদের তাতিয়ে তুলতে তারাও এসে চেপে ধরল কর্তাকে। ডেভিড পালিয়ে চলে গেল। বাধা দিল না।

'ওরা তাঁকে খুন করেছে।'

'কী বলছ তুমি, মাসকা?'

'খুন করে এটাকে তারা একটা দুর্ঘটনার চেহারা দিতে চেয়েছিল।' ফিসফিস করে উঠল মাসকা। 'তারা ওঁকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে খুন করেছে। কর্তা মদ খাচ্ছিলেন, এনতার মদ খাচ্ছিলেন দিন পনর কুড়ি ধরে। সেই সুযোগে ওরা কাজকর্মে গাফিলতি শুরু করে দিলে। একদিন ত তাঁর সামনে দিয়ে হাসতে হাসতেই চলে গেল নফর ক্ষেদোতে। তাতে ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন কর্তা।

তাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন। আর গাফিলতির জন্যে সকলের সাজা হবে, জানিয়ে দিলেন। তাইতেই জোট বেঁধেছিল সকলে। একদিন কর্তা বলে পাঠালেন, 'আজ সকাল থেকে সবাই মিলে ক্ষেতে সার ফেলবে।' কিন্তু কেউ এল না। বলে পাঠালে অসুখ করেছে।

'ভাশিলি চেঁচিয়ে বলতে থাকল, 'দেখো রক্ত বেরোয় না যেন। গায়ে যেন মারের দাগ থাকে না।' তারা কর্তাকে চিৎ করে ফেলে ছুরি দিয়ে দাঁত ফাঁক করে এক বোতল মদ ঢেলে দিলে গলায়। ধস্তাধস্তি করে করে কর্তা ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছিলেন, এক বোতল মদ পেটে যেতে এবার মরার মতন পড়ে রইলেন। ইগোর তার তলপেটে লাথি মারতে যাচ্ছিল, ভাশিলি বাধা দিলে, ইগোর তখন তার কোষ দুটোকে প্রাণপণে মুচড়ে পিষে দিলে। তারপর সেখান থেকে অচৈতন্য মানুষটাকে গাড়িতে করে এনে পথের ধারের বড় ওক গাছটার তলায় ফেলে মুখের ওপরে গাড়ির গদি চাপা দিয়ে রেখে গেছে। গাছে ছিল একটা রাক্ষুসে দাঁড় কাক। কাকটা খুবলে খুবলে তাঁর গালের মাংস খেয়ে নিয়েছে। তবু তার পরেও কর্তা কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন। মরে গেলে তারা ইওসিফ পাদ্রীকে নিয়ে এল। তারা তার কাছে একটা দুর্ঘটনার গল্প বানিয়ে বলল। কর্তাকে কবর দেওয়া হলে আলিওনা তোমার বোনদের নিয়ে চলে গেছে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি সম্মোহিতের মতন শুনছিলেন। এখন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়লেন। দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।......

একে একে উঠোনে জড় হচ্ছিল ভূমিদাসের দল। সাড়া পেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ থমথমে, চোখ লাল, চোখের জলে গাল তখনও ভিজে। ভূমিদাসরা নতজানু হয়ে তাকে আনুগত্য জানাল। দস্তয়েফ্‌স্কি একে একে সকলের মুখের দিকে তাকালেন—এরা সব বাবার ভূমিদাসের দল, কেনা গোলাম। মুখ থেকে ভুর ভুর করে ভোদকার গন্ধ বেরুচ্ছে তাদের।

দাঁতে দাঁত চেপে দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'বাবার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমি ছুটে এসেছি। কী ঘটেছিল বল ?'

ভূমিদাসরা আবার নতজানু হয়ে আনুগত্য জানাল, গ্রিগরি বলল, 'বাবু, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে, এ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না।'

'সত্যি তাই, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে বলুন ?' সাভেলি বলল। দস্তয়েফ্‌স্কির চোখে ভেসে উঠল বাবার অচৈতন্য শরীর, গাছের তলায়

পড়ে আছে। একটা দাঁড় কাক খুবলে খুবলে তাঁর গালের মাংস খাচ্ছে। তিনি শিউরে উঠলেন।

'সত্যি কথা বল, কী হয়েছিল বাবার?' দস্তয়েফ্স্কি চিৎকার করে উঠলেন।

সাভেলি আর গ্রিগরি মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ক্ষণকাল তাদের মুখে কথা ফুটল না। শেষে ঢোক গিলে সাভেলি বলল, 'হঠাৎ কর্তা গিয়ে ঢুকেছিলেন চেরমোশন্‌য়ের বনে। কে তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বন থেকে গাছ কেটে নিচ্ছে কারা। আসলে তিনি বলেছিলেন, গাছ কেটে বনের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা বানাতে। সে হুকুম তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমাদের কথা তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না, ভীষণ রেগে গেলেন আমাদের ওপরে। 'তামাম বনটাই কেটে ফেলেছিস হারামজাদারা', বলে গাল পাড়তে পাড়তে তিনি সারা বনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে টিলার ওপরে উঠতে গেলেন। সাংঘাতিক গরম পড়েছিল সেদিন, আর কদিন ধরে ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে কর্তার শরীরটাও দুর্বল হয়েছিল, তিনি টিলার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। পাথরে কেটে গিয়ে গালে গর্ত হয়ে গেল। নীল হয়ে গেলেন কর্তা। আমরা তাঁকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলেছি। পাদ্রীকে ডেকে নিয়ে আসার আগেই তিনি মারা গেছেন।'

'মিথ্যে কথা', দস্তয়েফ্স্কি ক্ষোভে দুঃখে চেঁচিয়ে উঠলেন আবার, 'তোরা তাঁকে খুন করেছিস। আমি সব শুনেছি, তোরা বর্বরের মতন অত্যাচার করেছিস তাঁর ওপরে।'

'যেই যা বলুক। আমরা আপনাকে সত্য ঘটনা বললাম।' বলে সাভেলি আবার নতজানু হয়ে আনুগত্য জানাল। সঙ্গে অন্যান্যরাও নতজানু হল।

—'না না না, তোরা সত্যি কথা বলিস নি।' রাগে কাঁপছেন তখন দস্তয়েফ্স্কি।

'তবে সত্যি কথা শুনুন,' গ্রিগরি এগিয়ে এল, 'কেনা গোলাম বলে গরু ঘোড়ার মতন ব্যবহার চিরদিন কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না বাবু। তাঁর ওই কাঁটাওলা চাবুকটা সব সময় তিনি আমাদের দিকে উঁচিয়েই রাখতেন। অকারণে কি যে কোন তুচ্ছ কারণে ওই চাবুক মেরে আমাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলতেন। খামারের ছাদ ধসে পড়ল একদিন খুঁটি পচে গেছে বলে; সেই অপরাধে খামারের একটা নফরকে কর্তা শুধু চাবকে চাবকে মেরে ফেললেন। চাবুক মারাই যেন তাঁর একটা মজা ছিল। তিনি চাবুক হাতে ঘুরে বেড়াতেন। কার পিঠে চাবুক পড়বে ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকতাম। খরার জন্যে ফসল

হল না। লাগাও চাবুক। গরুতে দুধ দিচ্ছে না, লাগাও চাবুক। বউর জন্যে ওষুধ আনতে হাসপাতালে গেছে কাজে আসতে পারে নি, মারলেন এক চাবুক। আমরা এতটা কাল শুধু চাবুক খেয়ে এসেছি বাবু—আমরা কেনা গোলাম তাই বলে কি আমরা মানুষ না, আমরা কি শুধু চাবুক খেয়ে মরব ?"

'মরবি, তোরা সব মরবি, তোরা হিংস্র জানোয়ার, মৃত্যুই তোদের শাস্তি।" দস্তয়েফ্স্কি তারস্বরে বললেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। 'তোরা আমার চোখের সমুখ থেকে যা, সরে যা তোরা।' দস্তয়েফ্স্কি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'বাবু চেরমোশনিয়েতে পুলিশ এসেছে আজ সকালে। পুলিশ আপনার এখানে আসবে এখন—এ কথাটাই জানাতে এসেছিলাম আমরা।'

'কী বলেছিস তাকে তোরা ?'

'কর্তার মৃগী রোগ ছিল তার ওপরে অতিরিক্ত মদ খেতেন, তাতে করেই মরেছেন কর্তা।' আমরা সবাই এ-কথা বলেছি পুলিশকে।

কুর্নিশ করতে করতে ভূমিদাসরা পায়ে পায়ে কিছু দূর পিছু হটে একে একে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে শূন্য উঠোনে দাঁড়িয়ে দস্তয়েফ্স্কি অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধ না ক্ষমা ? প্রতিশোধ না ক্ষমা ?

তিনি যদি অভিযোগ দায়ের করেন, জারের পুলিশ দুই গাঁয়ের সব কটা ভূমিদাসকে ধরে নিয়ে সাইবেরিয়ায় চালান দেবে। ওরা পচবে সাইবেরিয়ায় আর এখানে তাঁদের সাত ভাই-বোনের এই সম্পত্তি পতিত পড়ে থাকবে। কার লাভ তাতে ? প্রতিশোধ নিলে কী বাবাকে ফিরে পাব, খেতে ফসল ফলাতে নূতন ভূমিদাস পাবো ? না, প্রতিশোধে উভয়ের ক্ষতি। ক্ষমায় সকলের লাভ। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অভিশাপে যারা আত্মবিক্রয় করে আজ ভূমিদাস হয়েছে, তারা তাই বলে গরু ঘোড়া নয়, তারাও মানুষ। অত্যাচারে অত্যাচারে আজ তারা পশু হয়ে গেছে, ভালবাসা পেলে আবার তারা মানুষ হবে ? কিন্তু এই ভূমিদাসতন্ত্রের অভিশাপ থেকে কী তারা কখনো মুক্তি পাবে ? তাদের কি কেউ ভালবেসে মানুষ হতে দেবে ? চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। রাজ-সওয়ারীর বদ্ধমুষ্টি হাতুড়ির মতন শূন্যে উঠছে আর কোচমানের পিঠে নেমে আসছে অনর্গল অনবরত বৃষ্টির মতন। যেন ঐ ক্রীতদাস কোচমানের পিঠটা কিল ঘুষি খাওয়ার জন্যেই তৈরি।

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন, পুলিশ এলে বললেন, 'আমার কোন নালিশ নেই কারো বিরুদ্ধে। বাবার মৃগী রোগ ছিল, অতিরিক্ত মদ্যপান করার ফলে সে-রোগ বেড়ে গিয়েছিল, ওতেই তিনি মারা গেছেন।'

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, 'কিন্তু আমি জানি আপনার বাবাকে খুন করা হয়েছে, আমার হাতে প্রমাণ আছে।'

'অথচ আমি জানি আমার বাবা মৃগী রোগে মারা গেছেন।"

'আপনি যদি অপরাধীদের শাস্তি দিতে না চান, আমি কী করতে পারি? শুধু এটুকু বলতে পারি, এদের লাই দিতে নেই। এরা প্রশ্রয় পেলে একদিন আপনাকেও আপনার বাবার মতন খুন করবে।'

'কিন্তু আপনি কি জানেন, আমার বাবাকে ঠিক কে কে খুন করেছে?'

'না।'

'তবে ত আপনি দুই গাঁয়ের সব মানুষকেই ধরে নিয়ে জেলে পুরবেন।'

'এ ষড়যন্ত্রে প্রত্যেকটি ভূমিদাসের সায় ছিল।'

'আমি বিশ্বাস করি নে।'

পুলিশ সার্জেন্টকে বিদায় দিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি উঠে দাঁড়ালেন।

এখানে আর তিনি থাকবেন না। এখানে আর তাঁর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না।

দস্তয়েফ্‌স্কি অভিযোগ দায়ের করলেন না বটে তবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়লেন না। পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি তদন্ত চালালেন কিন্তু ফল ফলল না। মুঠো মুঠো মিষ্টি খাইয়েও বাচ্চাদের থেকে একটা কথা বের করা গেল না। চাবুকের চোটে পিঠের চামড়া ফেটে গেল, বয়স্করা তবু কেউ স্বীকারোক্তি করলে না। শেষে ম্যাজিস্ট্রেট হাল ছেড়ে দিলেন।

ওই সময়ে হামেশাই ভূস্বামীরা তাঁদের ভূমিদাসদের হাতে খুন হচ্ছিলেন। কিন্তু জার সরকারের আদেশে সে-খুনের খবর কোন খবরের কাগজে বেরোনোর উপায় ছিল না। এমন কি আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠিতে তার উল্লেখ থাকলে সরকার থেকে সে চিঠি চেপে দেওয়া হত। এ-জন্যেই ডাক্তার দস্তয়েফ্‌স্কির মৃত্যুর বিশদ বিবরণও চাপা পড়ে গিয়েছিল। জানা যায় নি কী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে ডাক্তারের শোচনীয় মৃত্যু হল; কী কারণে কেঁচোর মতন মেরুদণ্ডহীন ভূমিদাসরা সাপের মতন ফুঁসে উঠতে পারল, এমন নৃশংসভাবে খুন করতে পারল মনিবকে।

এক সূত্রে প্রকাশ, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ডাক্তার যখন স্থায়ীভাবে দারোভোয়েতে বসবাস করতে এলেন তখন মসকোআ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর যুবতী ঝি কাতারিনা আলেকসান্দ্রভ্‌নাকে। তার সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীর মতন বাস করছিলেন। সেই সুবাদে আলেকসান্দ্রভ্‌নার মামা এফিম মাক্‌সিমফ্‌ চেয়েছিল ডাক্তারের ওপর কর্তাগিরি করতে। ডাক্তার তা সহ্য করেন নি। সেই রাগে মাকসিমফ্‌ ডাক্তারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল খামারের ভূমিদাসদের। তারই ফলশ্রুতি এই খুন।

নয়

পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ধনী মাসি কুমানিনার মধ্যস্থতায় ছোট বোন ভারভারার বিয়ে হয়ে গেল পিতার কারেপিন-এর সঙ্গে। বিপত্নীক এই সচ্ছল ভদ্রলোক ছিলেন সরকারী দফতরের এক উচ্চপদের কর্মচারী। বয়স ছেচল্লিশ, তার আবার একটি চার বছরের মেয়েও ছিল। এ ধরনের বিয়ে তখনকার রুশ সমাজের সকল স্তরেরই স্বাভাবিক ঘটনা, তবু দস্তয়েফ্‌স্কি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সতের বছরের মেয়ের যদি তার তিনগুণ বয়সের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয় ত সে মেয়ে যে সুখী হতে পারে না দস্তয়েফ্‌স্কি তা তাঁর মায়ের কষ্ট দেখেই বুঝেছিলেন। তবু ধনী মাসির মুখের ওপরে প্রতিবাদ করতে পারেন নি কেন না তাঁদের নাবালক সম্পত্তির একজন অছি দরকার আর বিয়ের সূত্রে কারেপিন হবে সেই আছি। তখন তাঁদের ভূসম্পত্তিই দস্তয়েফ্‌স্কির একমাত্র আর্থিক উৎস। অতএব একান্ত অনিচ্ছায়ও দস্তয়েফ্‌স্কি এ-বিয়েতে মত দিয়েছিলেন। শেষমেশ যখন সেই আর্থিক উৎসের মুখ এই কারেপিনের জন্যেই শুকিয়ে গেল, দস্তয়েফ্‌স্কি তার ওপরে ভীষণ চটে গেলেন এবং অনন্যোপায় ক্রোধে তার শোধ নিতে একখানা উপন্যাস লিখলেন 'খ্রীষ্টমাস গাছ ও একটি বিবাহ'। রচনা-শৈলীতে সুন্দর এ-উপন্যাসের নায়ক জুলিয়ান মাসতাকোভিচ-এর চরিত্রে তিনি কারেপিনের এমন বিছ্‌ছিরি রূপ দিলেন যে যারা কারেপিনকে জানত সকলেই দস্তয়েফ্‌স্কিকে গালমন্দ করলেন কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির ওই এক আনন্দ তিনি মানুষটির ওপরে তাঁর রাগের ঝাল মিটাতে পেরেছেন।

অথচ মানুষটি কারেপিন খারাপ ছিল না। মাত্র তিন বছরে, ১৮৪১ থেকে

১৮৪৪-এর মধ্যে কারেপিন তাঁকে যত টাকা দিয়েছে, বাপ বেঁচে থাকলে সে-টাকা তিনি সারা জীবনেও পেতেন না। হাতে মুঠো মুঠো টাকা পাওয়ার ফলে উড়নচণ্ডী মানুষটি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। পকেট ভর্তি টাকা মুহূর্তে তছনছ করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। ফলে রুটির দোকানে ধার, মুদির দোকানে ধার, দর্জির দোকানে ধার, সুদখোরের কাছে ধার—সেই সচ্ছলতার দিনেও তিনি ধারে ধারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। দু ঘরের এক ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। তার একটা ঘর গরম রাখার পয়সাও জুটত না তাঁর। টেবিলে, টানায়, বিছানার ওপরে যেখানে-সেখানে টাকা রাখতেন আর হারাতেন, জুয়া খেলে খোয়াতেন, বন্ধুদের খাইয়ে ওড়াতেন, হাত পাতলে কি ভিখিরী, কি বন্ধু কাউকেই বিমুখ করতে পারতেন না, জিনিস-পত্র কিনতে গেলে দোকানদাররাও তাঁকে প্রাণপণে ঠকাত। তাঁর চাকর তাঁর পয়সায় একটা ধোপানীকে পুষত, ধোপানীর পরিবারের খরচ চালাত। শুধু শুকনো রুটি ও চায়ের ওপরে কয়েকদিন চালিয়ে শেষে অনন্যোপায় হয়ে একবার তিনি দুশ' রুবল ধার করেছিলেন শতকরা পঞ্চাশ সুদে। ১৮৪৪ সালে অবশেষে তিনি তাঁর সম্পত্তির অংশ বেচে দিলেন এক হাজার সিলভার রুবলে। তার থেকে পাঁচশ নিলেন একবারে, বাকি পাঁচ শ' দফায় দফায়।

টাকা পয়সা খরচ করার বেলায় তিনি অবিবেকী এবং হঠকারী হলেও সময় নষ্ট করার বেলায় তার বিবেচনা ও কৃপণতার অবধি ছিল না। ফলে ধাপে ধাপে প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৪৩-এ তিনি মিনিস্ট্রি অব ওয়ার ডিপার্টমেন্টের একজন লেফ্‌টেন্যান্ট এনজিনিয়ার। ডরমিটরি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আলাদা নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকতে পারছেন। সময় পাচ্ছেন এখন অনেক। আর সেই অবসর সময়ে গোগ্রাসে গিলছেন সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্য। লামার্তিন, ভিকতর য়ুগো, ফ্রেদেরিক সোলিয়ে, পল দ্য কোক শেষ করেছেন; স্বদেশের পুসকিন থেকে গোগোল পর্যন্ত বাদ দেন নি কাউকে। বিশেষ করে গোগোলকে তিনি পুনঃপুন পড়েছেন, গোগোল থেকে তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্তও বলতে পারেন তখন। ফলত তাঁর এই হয়ে-ওঠার-কালের সম্পূর্ণ অধ্যায়টি গোগোলের প্রভাবেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কি রচনা-রীতিতে, কি শিল্প-শৈলীতে এ-সময়কার দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে আমরা যেন নূতন আর একজন গোগোলকেই দেখতে পাই অথচ স্বতন্ত্র আর এক অন্তঃসারের মধ্যে অনাস্বাদিত অন্য রসের আবেদনেরও অভাব নেই। গোগোল অথচ গোগোল নয়; নূতন আর এক শক্তির আবির্ভাবের সূচনায় সচকিত করে মানুষকে।

নিদারুণ অর্থকষ্ট, ধনী হওয়ার স্বপ্ন এবং রাতারাতি লেখক হিসাবে পরিচিত হওয়ার আশা দস্তয়েফ্স্কিকে এ-সময়ে রুশ-সাহিত্যের এক নূতন ধারার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল। রুশ-সাহিত্যে এ ধারাটি শুরু হয়েছে সেই ১৮৩০ থেকে। সেই থেকেই সাহিত্য বিলাসের প্রকরণ থেকে ব্যবসায়ের উপকরণ হয়ে উঠছিল। দশ বছরের মধ্যেই সে-উপকরণ এখন ব্যবসায়িক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আমদানির উৎসে পরিণত হয়েছে। রুশ-সাহিত্য-পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে তখন। তখন নিত্য নূতন মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতন। যা বেরুচ্ছে তাই কিনছে মানুষ। কেবল মৌলিক রচনার জন্যেই নয়, অনুবাদের জন্যেও মানুষ স্বচ্ছন্দে পয়সা দিচ্ছে। হঠাৎ যেন রুশ পাঠকের ক্ষুধা বেড়ে গেছে খুব, নানা রসের বই শুধু নয়, নানা দেশের বই পড়ার ঝোঁক এসেছে। য়ুরোপের নাম-করা লেখকদের বই অনুবাদ হয়ে বেরুলে হু হু করে কেটে যাচ্ছে। প্রকাশকরা দুহাতে পয়সা লুটছে। দেখে দেখে দস্তয়েফ্স্কিরও লোভ হল—এই মওকায় তিনিই বা কেন পিছু পয়সা করে নেবেন না ?

বালজাকের মতন দস্তয়েফ্স্কির মাথায়ও চাপল প্রকাশক হওয়ার খেয়াল। বালজাকের মতনই অপরিণামদর্শী ও অনভিজ্ঞ দস্তয়েফ্স্কি কাগজ কলম নিয়ে অঙ্ক কষলেন কিছু দিন। কী ভাবে ক'দিনে লক্ষপতি হওয়া যায় কাগজে কলমে তা আবিষ্কারও করে ফেললেন। মিখাইলকে চিঠি লিখে শিলারের বই অনুবাদ করালেন, নিজে করলেন বালজাকের একখানা বই।

কিন্তু কাগজে কলমে অঙ্ক কষে লাভ বের করা এক জিনিস আর ব্যবসায়ে টাকা ফেলে মুনাফা লুটে আনা অন্য। প্রথমত যত টাকা মূলধন নিয়ে বইয়ের কারবারে নামা দরকার সে টাকা তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত ছিল না অভিজ্ঞতা। তদুপরি টাকা খরচ করার বুদ্ধির ছিল একান্ত অভাব। ফলে মূলধন সুদ্ধ মুনাফার স্বপ্ন দুদিনেই কর্পূরের মতন উবে গেল। নিঃস্ব দস্তয়েফ্স্কি আরো নিঃস্ব হলেন, ঋণের বোঝা আরও খানিকটা ভারী হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও বিরক্তিকর মনে হতে থাকল আসন্ন ফাইনাল এনজিনিয়ারিং পরীক্ষা, চাকরির একঘেয়েমিটা ত আছেই। অনুবাদে হাত দিয়ে সাহিত্যের নেশায় এমন পেয়ে বসল যে, চাকরি আর পরীক্ষাকে মনে হতে থাকল পচা আলুর মতন জঘন্য। অথচ তক্ষনি চাকরি ছাড়তেও পারেন না। ধড়ে প্রাণ রাখতে ওই এখন একমাত্র সম্বল, ঋণ সমুদ্রে একগাছি খড়।

তখনই ঘটল সেই নাটকীয় ঘটনা।

১৮৪৪-এর সেপটেমবর। অফিসের দরজায় পা দিতেই একজন সার্জেন্ট এসে সেলাম ঠুকে সামনে দাঁড়াল, 'লেফ্‌টেন্যান্ট, এক্ষুনি আপনাকে জেনারেল সিভেদ্‌লফ দেখা করতে বলেছেন।'

এক্ষুনি ? কি ব্যাপার ? স্বগতোক্তি করে দস্তয়েফ্‌স্কি নিজের দফতরে না ঢুকে জেনারেলের অফিসের দিকে পা বাড়ালেন।

সিভেদ্‌লফ গভীর মনোনিবেশে একটা ফাইল পড়ছিলেন। একটা মানুষ যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই যেন তিনি জানেন না, লক্ষ্য করেন নি।

সব রাশিয়ান অফিসারদের ওই এক কায়দা, দর বাড়ানোর কায়দা, মানুষকে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখে পদমর্যাদার অহংকার দেখানো—দস্তয়েফ্‌স্কি বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকোলেন।

অবশেষে সিভেদ্‌লফ চোখ তুললেন, 'লেফ্‌টেন্যান্ট দস্তয়েফ্‌স্কি, মহামান্য জার তোমার কাছে আরও বেশী আনুগত্য আশা করে।'

কথাটার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অনুমান করতে করতে দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দিলেন, 'হাঁ, জেনারেল।'

'সে আনুগত্য দেখানোর একটা মস্ত সুযোগ এসেছে তোমার। প্রত্যেক জুনিয়ার অফিসারকেই প্রভিনসে যেতে হয় আর গেলেই কপাল খুলে যায়, প্রমোশন পায় সে। মানে বোঝ তার ? বাড়ি গাড়ি নারী মোটা টাকা আর প্রচুর অবসর। আমি তোমাকে সেই প্রমোশনের পথ করে দিচ্ছি, তোমাকে ট্রানসফার করে দিচ্ছি ক্রাসনোয়েতে।"

ক্রাসনোয়ে, দিগন্ত বিস্তৃত গহিন অরণ্য আর তুষার মরুভূমির মাঝখানে ওই ছোট্ট শহরে! ও মৃত্যু কাকে বলে! চমকে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি; পিতার্সবুর্গকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকা মানে মরে থাকা। বললেন, 'উঁহু ক্রাসনোয়েতে যাব না আমি।'

'তার মানে ? ভুলে যেও না, এ আমার জেনারেল সিভেদ্‌লফ-এর আদেশ।'

'তা হলে আমাকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে জেনারেল।'

'চাকরি ছাড়ার হুমকি দেখিয়ে জেনারেল সিভেদ্‌লফ-এর আদেশ পালটানো যায় না। সামরিক বিভাগ থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে তুমি মহামান্য জারের কাছে আবেদন করতে পার। যাও।' মুখে চোখে পদমর্যাদার মুখোশ এঁটে আবার তিনি ফাইলের মধ্যে মন দিলেন।

যথারীতি পদত্যাগপত্র পেশ করে দস্তয়েফ্‌স্কি বেরিয়ে এলেন। সোজা

ডাকঘরে এসে তখনই চিঠি লিখলেন দাদাকে, "সেনা বিভাগে আমি দীর্ঘ দিন চাকরি করব তার জন্যে ক্রমাগত পরীক্ষা দিয়ে কিনব উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ, কিনব আরাম আয়েস রাজকীয় সম্মান সে মতলব আমার কোন কালেও ছিল না। তবে আর কেন আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়টা ওখানে নষ্ট করব, বলো? তাছাড়া ওরা আমাকে এখন পাঠাতে চেয়েছিল ক্রাসনোয়েতে, পিতার্সবুর্গ ছেড়ে গিয়ে সেখানে আমি বাঁচব কী নিয়ে ভাব একবার!···আমার জন্যে তাই বলে চিন্তার কোন কারণ নেই, দেখো আমি শিগগিরই কিছু আয় করতে পারব, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মতন আয় করতে অসুরের মতন খাটতে হবে জানি, কিন্তু কী করা যাবে বলো? অবশ্য এখন আমি কী করি সেটাই হল প্রশ্ন······"

প্রশ্নটা গুরুতর নিঃসন্দেহে। একমাত্র বাড়িওয়ালারই পাওনা হয়েছে পাঁচশ পঁচিশ রুবল। তাছাড়া, মুদি আছে, দর্জি আছে, আর্দালি, চাকর, বন্ধু-বান্ধব আছে, ঋণের জন্যে হাত পাততে তাঁর আটকায় না কোন কালে—সবার ওপরে আছে সুদখোর এক ব্যাটার কাছে দু শ' রুবল ঋণ। এবং পকেটে একটা কোপেক নেই।

অথচ চেয়েছেন মুক্তি; নিরংকুশ অবসরে সাহিত্য রচনার স্বপ্ন দেখেছেন—সে স্বপ্ন বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে বুঝি ভেঙে যায়। এ দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করবেন এমন একটি হিতৈষী আজ কাছে নেই। সবাই এখন তাঁর শত্রু। ঋণ শোধ করতে না পারার গ্লানি, হীনমন্যতা হয়ে দেখা দেয় তাঁর মধ্যে, যে ঋণ দেয় তাকেই তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেন তখন! মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায় শেষে। কলেজে বেরেঝেদ্‌স্কি ছিল তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। ধনবান পরিবারের এই যুবক তাঁর চিন্তার একমাত্র শরিক ছিল আর্মি এনজিনিয়ারিং কলেজে, তাঁর বহু দুরূহ চিন্তায় অংশ গ্রহণ করেছে সে, এবং ভালবেসে ঋণ দিয়েছে, ফেরৎ পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই দিয়েছে, তবু দস্তয়েফ্‌স্কি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করেছেন একে একে সব পাওনাদার বন্ধুকে। আজ তিনি পিতার্সবুর্গে নির্বাসিত, একলা।

তাই হয়। স্বাধীনতা যাঁদের কাছে নিরাপত্তার চেয়ে দামী তাঁরা এ ভাবেই নিঃস্ব একলা হয়ে যান। দুর্গম পথে তাঁদের দোসর থাকে না কেউ। নয়ত কি দুঃখ ছিল তাঁর। আর দুটো বছরের কোর্স বাকি ছিল। পাশ করে বেরোলেই তিনি হতেন সেনা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার—মেজর জেনারেল। অর্থাৎ পদমর্যাদায় ও অর্থ-কৌলিন্যে সমাজের সেরা শ্রেণীর একজন মান্যবর মানুষ হতে

তাঁর বাধা ছিল না কোন ; কিন্তু সুখের বাঁধা শড়কে চলতে আর শান্তির তোলা জলে স্নান করতে সুখ কোথায় দুর্ধর্ষ পুরুষের। তারা চান অরণ্য-মরু-পর্বত পেরোতে, সমুদ্র সাঁতরাতে। দুঃখ জয় করার দুর্জয় সঙ্কল্পই আসলে প্রতিভা। অথবা দুর্লভ ব্যক্তিত্বের দস্তুরই এই যে, তাঁরা দুঃখের কষ্টিপাথরে নিজেদের অস্তিত্বের যাথার্থ্য যাচাই করতে চান, দুঃখের ভ্রূকুটিকে তাই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। দস্তয়েফ্‌স্কিও করলেন না।

তাই ত পিতার্সবুর্গের রাজপথে একলা ঘুরে বেড়ান অন্যমনস্ক দস্তয়েফ্‌স্কি। বিবর্ণ শুকনো মুখ। কী এক দুরূহ চিন্তার ভারে ন্যুব্জ। ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটিকে দেখে মনে হবে যেন কঠিন কোন কাজে ভয়ংকরভাবে ব্যস্ত অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছেন না, অনুর্বর এক স্বপ্ন-বিলাসী মাত্র তখনও তিনি। কয়েকখানা উপন্যাস লিখেছিলেন কলেজে থাকতে, পছন্দ হয় নি, ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথায় ফেলে দিয়েছেন। এখন নূতন করে আর এক সৃষ্টির কথা ভাবছেন···

ভাবতে ভাবতে পথ চলেন, অন্যমনস্ক চোখে জনতার গতিবিধি দেখেন, বালজাকের কথা মনে পড়ে, কী নির্মম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি তাঁর অমর রচনাগুলি সৃষ্টি করেছেন, দেশ ও কালকে অতিক্রম করে তাঁর চরিত্রগুলি কী অবলীলায়ই না বিশ্ব মানুষের অন্তর স্পর্শ করেছে···তিনিও সেই রকম কিছু লিখবেন, এমন রচনা যা সব দেশের সব মানুষের মন জয় করবে। আপাতত পিতার্সবুর্গকে জয় করতে হবে তাঁর। পিতার্সবুর্গকে তাঁর পদতলে অবনত করবেন। যে তাঁকে এমন বুভুক্ষু করে পথে পথে ঘুরোচ্ছে, তাঁর সৃষ্টির জন্যে তাকে তিনি ক্ষুধার্ত করে তুলবেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা আঁটেন, মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেন।

সারারাত তাঁর রাত্রির হোটেলগুলিতে কাটে। শহরতলির নিচু স্তরের হোটেল—চোর জোচ্চোর বদমাস গাঁটকাটা চোলাইকারবারী চোরা-কারবারী গুণ্ডা বদমাস অসৎচরিত্র মানুষদের মধ্যে বসে তিনি হোটেলের উষ্ণ কোণে রাত কাটান, ঘরে তাঁর আগুন নেই, কাঠ কেনার পয়সা কোথায় ? সব দিন পেটে একটুকরো রুটিও পড়ে না, রুটি কিনবেন কি দিয়ে ?

এমন দুরবস্থার দিনে গ্রিগোরোভিচ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা। দস্তয়েফ্‌স্কির দু বছরের সিনিয়ার এই ছাত্রটিও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসে সাহিত্য রচনায় মন দিয়েছেন। তাঁরও সেই দস্তয়েফ্‌স্কির হাল, কোন দিন খাওয়া জুটছে কোনদিন জুটছে না তবে ইতিমধ্যে দুখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছেন, তাতে যা আসছে তাতেই কোন মতে ধড়ে প্রাণ রাখতে পারছেন।

দস্তয়েফ্স্কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন শুনে তিনি অবাক হলেন, 'কী করবে এখন ঠিক করেছ ?'

'লিখব।'

'আরে, তুমি লেখক ?' কৌতূহলী হয়ে উঠলেন গ্রিগোরোভিচ, 'কোন্ কাগজে লিখছ তুমি ?'

'এখনও কোথাও বেরুচ্ছে না, বেরুলে তখন সবাই 'থ' বনে যাবে, দেখো।"

'এই ত চাই, এ রকম আত্মবিশ্বাসই ত দরকার। জান, আমিও লিখছি, ইতিমধ্যে লিখেও ফেলেছি একখানা বই। আমার বিষয় কী জান, দরিদ্র জনসাধারণ চাষী মজুর বেকার।'

শুনে দস্তয়েফ্স্কি শিউরে উঠলেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল বাল্যে কৈশোরে দেখা মসকোআর শহরতলির সারি সারি বস্তি আর অর্ধ-নগ্ন শীতার্ত মানুষের মুখ। নূতন করে আবার মনে পড়ল পিতার্সবুর্গের কেরানী বন্ধু রাশমিরস্কির হতদরিদ্র জীবন ও তাঁর খুপরির নোংরা পরিবেশ। এদের কথাই ত তিনি ভাবেন সব সময় বললেন, 'বটে ? আমিও ত তাদের নিয়েই লিখব ভেবেছি। সত্য বলতে কি, আমি একটা খসড়াও করে ফেলেছি এর মধ্যে।'

'তাই নাকি, তাহলে আর কি, এস আমরা দুজনে মিলে এই সামন্ততান্ত্রিক বস্তাপচা য়্যারিসটোক্র্যাট সাহিত্যকে উচটে ফেলে দি। রুশ-সাহিত্যে নূতন রক্ত নিয়ে আসি।'

'আমারও তাই ইচ্ছে।'

'তুমি থাক কোথায় ?'

'আমার একটা ফ্ল্যাট আছে ভাই, কিন্তু ভাড়া বাকি পড়ে আছে অনেক, ঘর দুটো বরফের মতন ঠাণ্ডা, গরম করবার কাঠ কেনার পয়সা নেই।'

'আমারও পয়সা নেই, এস দেখি দুই হাতাতে মিলে কী করতে পারি !'

ঠিক হল গ্রিগোরোভিচ উঠে আসবেন দস্তয়েফ্স্কির ফ্ল্যাটে। তাঁর একখানা ঘর ভাড়া নেবেন তিনি।

এক পেয়ালা চা দু পেয়ালায় ভাগ করে তুলে নিলেন দুজনে। পেয়ালায় পেয়ালায় ঠোকাঠুকি করে দস্তয়েফ্স্কি বলে উঠলেন, 'পিতার্সবুর্গ জয় করব এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।'

'আদৌ দুরাশা নয়, ফিওদর, আমরা নূতন প্রভাত আনব রুশ সাহিত্যে, আমরা নবযুগের সৃষ্টি করব।'

পেয়ালায় চুমুক দিলেন দুজনে।

দশ

১৮৪৪-এর অকটোবরে দস্তয়েফ্‌স্কি দাদাকে লিখলেন, 'আর অনুবাদ নয়, আমি এবার মৌলিক রচনায় হাত দিয়েছি। পুরোনো সব লেখা নষ্ট করে ফেলেছি। নূতন করে হাত দিয়েছি নূতন লেখায়। ইতিমধ্যেই একটা উপন্যাসের খসড়া শেষ করে ফেলেছি। চূড়ান্ত সংশোধন চলছে এখন।...না, কারো ফরমাশ খাটছি না; জীবনে কখনো ফরমাশি লেখা লিখব না, কারো তাগিদেও না। নিজের প্রেরণায় লিখে যাচ্ছি, তাই লিখব সারা জীবন...আমি আমার রচনাকে নিখুঁত করতে চাই, তাই বার বার লিখছি, লিখছি আর কাটছি। 'মন্দ না', 'মাঝারি' এসব চলনসই কোন রচনায় আমি সন্তুষ্ট নই। আমি লিখব শ্রেষ্ঠ লেখা, শ্রেষ্ঠ রচনা ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই। দেখ না পুসকিন আর গোগোলকেই দেখ, তাঁরাও অনেক কিছু লেখেন নি তাঁদের সৃষ্টি অল্প এক মুঠো, অথচ সেই এক মুঠোই যেন সোনার মুঠো। তাই না আজ তাঁরা তাঁদের সমাধির ওপরে অমরত্বের মিনার উঠবে এ আশা করতে পারেন। বলতে পারো, কেন ছাপা পাতার এক পাতা লেখার জন্যে আজ গোগোল পাচ্ছেন এক হাজার রুপোর রুবল ? আর পুসকিনের কথা মনে আছে ? তিনি টাকা পেতেন লাইন গুনে, প্রতি লাইনের জন্যে একটি গিনি। কিন্তু তাঁদের খ্যাতি, বিশেষ করে গোগোলের খ্যাতি এসেছে দারিদ্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াই করার পরে। রাফেলের কথা ভাব, একখানা ছবি তিনি বছরাধিক কাল বসে আঁকতেন ; তাই না সে দিনে দিনে মহান সৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছে।...'

দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে সেই সব দৃষ্টান্ত! তিলে তিলে তিনি তাঁর রচনাকে তিলোত্তমা করেছেন বসে বসে। দারিদ্র্যের চাবুক খেয়ে কোণ ঠাসা দস্তয়েফ্‌স্কি অর্থ উপায়ের আর কোন পথ না পেয়ে ঠাণ্ডা ঘরে নিজেকে অষ্ট প্রহর বন্দী রেখে সাধনা করে চলেছেন শিল্পের। তাঁর প্রথম উপন্যাসের জন্মের আঁতুড় ঘরে আগুন নেই, আসবাব নেই, কয়েকটি মোম কিছু কাগজ শীতে অসাড় তিনি অমরত্বের স্বপ্নে মগ্ন। ভূমিষ্ঠ হচ্ছে সেই বিখ্যাত উপন্যাস 'বেদনিয়ে লিয়ুদি' বাংলায় যার অনুবাদ হয়েছে 'অভাজন' নামে।

১৮৪৪-এর সেপটেমবরেই যে উপন্যাস লেখা শেষ করে ফেলেছিলেন ১৮৪৫-এর মার্চ-এও তার ওপরে কাটাকুটি চলেছে তাঁর। এবার তিনি কাটাকুটির শেষে পাকা করে লিখছেন নূতন কাগজে। লিখতে লিখতে দিন আর রাত্রির ভেদ ভুলে গেছেন।

বাতাসে থর থর কাঁপছে মোমের ক্ষীণ শিখা। দস্তয়েফ্‌স্কি উপুড় হয়ে আছেন লেখার ওপরে। গ্রিগোরোভিচ ঘরে ঢুকে অবাক, 'এখনও লিখছ কিওদর? ক'টা বাজে জান?' গ্রিগোরোভিচ জানলা খুলে পর্দা সরিয়ে দিলেন। সকাল বেলার আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। কলম রেখে দস্তয়েফ্‌স্কি আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন।

'তামাক-টামাক থাকে ত দাও ভাই, আমারটা ফুরিয়ে গেছে সেই মধ্য রাতে।'

'তুমি আজ তিন দিন ঘরের বার হচ্ছ না। না, চার দিন, জানো?'

দস্তয়েফ্‌স্কি হাসলেন, 'মনে আছে গত শনিবার তুমি আমাকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলে।'

'আর দশ মিনিট যেতে না যেতে তুমি ছুটে চলে এসেছিলে, রাস্তার খোলা হাওয়া তোমার অসহ্য লাগছিল।' গ্রিগোরোভিচ তাঁর তামাকের থলে এগিয়ে দিলেন।

টেবিলের ওপরে বই পত্রিকা কাগজের ডাঁই তার ওপরে তামাকের ছাইয়ের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে থেকে সগু লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি তুলে নিলেন গ্রিগোরোভিচ: 'আজ তুমি আমাকে তোমার উপন্যাস পড়তে দেবে?'

'না না ভাই শেষ করতে দাও, একবারে শেষ করেই তোমাকে পড়তে দেব। ব্যস্ত হয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি কেড়ে নিলেন কাগজগুলি।'

'তুমি কতবার করে লিখবে হে? গত মাসেই ত নূতন করে লিখে শেষ করলে, না?'

দস্তয়েফ্‌স্কি হাসলেন, 'তারপরেও কত কাটলাম কত জুড়লাম। কিন্তু এবার আর না। যোগ বিয়োগ যা করার সব শেষ। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখো চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু দ্মিত্রি ভাশিলিয়েভিচ এ-উপন্যাস যদি না উৎরোয়, না ভাল লাগে কারো, নির্ঘাৎ দেখো, আমি নেভার জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছি।'

'তার আগেই আমরা উপোসে মরব।' গ্রিগোরোভিচ হেসে দস্তয়েফ্‌স্কির কাঁধে হাত রাখলেন। ভগ্নীপতি দয়া করে যখন যেমন পাঠায় আর গ্রিগোরোভিচ কাগজে লিখে মাঝে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ যা রোজগার করে দুজনের তাতে রুটি কফি মোম আর কাগজ কিনতে ফুরিয়ে যায়।

রুটির বেশী পেটে কিছু পড়ে না, আর সে রুটিও সব দিন জোটে না। মাসের শেষে অনেক দিন শুধু কফি গিলে কাটাতে হয়। মুদি দয়া করে ধারে রুটি দিলে তবে খাওয়া হয়। কিন্তু অমরত্বের স্বপ্নে মগ্ন দস্তয়েফ্‌স্কির ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নেই।

সেদিন মে মাসের বিকেলে সোফার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে গ্রিগোরোভিচ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দস্তয়েফ্স্কি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

গ্রিগোরোভিচ কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন—'সেনসরের দাপটে আজ কাল আর কাগজে কিছু থাকে না। বস ফিওদর, কাল দেখা হয়েছিল 'গেজেট'-এর সম্পাদকের সঙ্গে। বললে, 'দ্মিত্রি জানো আমরা আর ফ্রেঞ্চ রিভলিয়ুশনের আগে গ্রেট কথাটা বসাতে পারব না। জারের ফরমান জারি হয়েছে।'

'তা হলে আমার 'বেদনিয়ে লিয়ুদি' (অভাজন) উপন্যাসকেই বা ওরা কী ভাবে নেবে কে জানে।'

'ওই তোমার উপন্যাসের নাম, 'বেদনিয়ে লিয়ুদি'? শেষ করেছ তা হলে?' গ্রিগোরোভিচ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'আচ্ছা এর মধ্যে কি শিলারের প্রভাব-ট্রভাব আছে, তুমি বলেছিলে অবশ্য একেবারে আনকোরা আইডিয়ার রচনা, তবু আমার সন্দেহ, তুমি যে আবার শিলারের ভক্ত কিনা!'

'রাবিশ', দস্তয়েফ্স্কি হেসে উঠলেন, 'ওঁর কিচ্ছু পাবে না এতে। সে জামানা খতম করে দেব আমরা। আমরা সাহিত্যে নূতন মানুষ, নূতন চেতনা আনব, নূতন কালের সূচনা হবে আমাদের হাতে। আমাদের উপন্যাসে আলালের ঘরের দুলাল নীলরক্তের মানুষ আর নায়ক হবে না। তোমার ভাষায় তারা হবে চাষী মজুর বেকার সাধারণ মানুষ। আমার এ-উপন্যাসের নায়কও একজন সাধারণ মানুষ, দরিদ্র কেরানী। শুধু তাই না, ঐতিহ্য ভেঙে আমি নায়ককে করেছি বিগত যৌবন সাতচল্লিশ বছরের এক পুরুষ। তাও দেখতে সুপুরুষ কি শক্ত সমর্থও নয়। তার মাথায় চুল নেই, চোখের দৃষ্টি দুর্বল, একটুতে ঠাণ্ডা লাগে ইত্যাদি। গল্পের কালও বর্তমান, স্থান এই পিতার্সবুর্গ। তোমার কি বার্শমিরস্কিকে মনে আছে, সেই কেরানী ভদ্রলোক, যাকে পোগোদিন এখানে নিয়ে এসেছিল কয়েক বার? আমি তার আস্তানায় দু'তিন দিন গেছি। ওখানে যেতে রীতিমত মনের জোর দরকার, বেশ হিম্মত না থাকলে বাড়ির ওই পেছনের সিঁড়ি বেয়ে এক ধাপও উঠতে পারবে না কেউ। ভয়ে গা কাঁটা দেবে এই বুঝি ফসকে পড়ে গেলাম। পাকানো সিঁড়ি। তার ধাপগুলি কোনটা ভেঙে ঝুলছে, কোনটা বেঁকে দুমড়ে আছে। দেয়ালটা এমন আঠার মতন চটচটে যে তুমি হাত দিলে হাত আটকে থাকবে। আর সিঁড়ির গোড়ায় চারধারে কী নেই!

ভাঙা ট্রাংক সুটকেস পুরোনো চেয়ার পেকিং বাক্স খড় ছেঁড়া নোংরা নেকড়া ডিমের খোসা মাছের আঁশ তার ওপরে সব সময় মাছি ভনভন করছে। ওইখানে ওই সিঁড়ির শেষে একজনের একটা রান্নাঘরের খানিকটা পার্টিশান তুলে আলাদা করে একটা খুপরি করা হয়েছে। ওইখানে থাকে বাশমিরস্কি, ওটাই আমার উপন্যাসের নায়ক দেভুশ্‌কিন-এর আস্তানা। ওখানে লম্বালম্বি ওপরে নিচে আরও কয়েকটা ওই রকম খুপরি আছে। কারোরই পার্টিশানের দেওয়াল শিলিং অব্দি উঁচু নয়, দেখতে পাবে সব সময় দড়িতে ঝুলছে যত রকমারি পুরোনো জামা কামিজ পোশাক। আর কোন্‌ ঘরে কখন কী রান্না হচ্ছে টের পাবে—কখনো পচা মাছ ভাজা হচ্ছে, কখনো মাংসের ছাঁট সেদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেক খুপরিতে বাসাড়ে। দু'একজন কোনটাতে, কোনটাতে চারজন অব্দি। রাতদিন ওঠা নামা করছে লোক, যাওয়া আসা করছে। কেউ মুখ ধুচ্ছে কেউ কাপড় কাচছে—অর্থাৎ জায়গাটি সব সময় সরগরম। কিন্তু মানুষগুলি ওখানকার কেউ মন্দ নয়। সবাই ভদ্র ঘরের, সবাই লেখাপড়া জানা।

দেভুশ্‌কিন এক যুবতীর প্রেমে পড়েছে। যুবতীর নাম ভারেনকা। সেও গরীব। দেভুশ্‌কিনের ঘরের উল্টো দিকে উঠোন পেরিয়ে যে বাড়ি তার জানলায় তাকালে যুবতীকে দেখতে পায় সে। দুজনে দেখা সাক্ষাৎ করতে চায়, কথাবার্তা বলতে চায় কিন্তু কানাকানির ভয়ে সাহস পায় না। তাই চিঠি চালাচালি করে।

হ্যাঁ, আমার গল্পের থীম ভালবাসাই বটে ত বড় ভীরু বড় স্বপ্নিল বড় অসুখী সে ভালবাসা। আমার এই বয়স্ক গৃহমুখী নায়ক আদৌ রোমান্টিক নয়। অপটু ভয়-তরাসে মানুষটি নানা বাধা প্রতিকূলতার কষ্টে ভোগে। দরিদ্র ত বটেই কিন্তু দারিদ্র্য ঢাকবার মিথ্যে চেষ্টা নেই; তাই যুবতীর চিত্ত জয় করতে সে অক্ষম বলে তার মধ্যে ভয়ানক নৈরাশ্য। সে যুবতীটির অর্থ-কষ্টের জন্যে দুঃখিত। তাকে সে সাহায্য করতে চায়। তাই করতে সে নিজেকে সর্ব রকমে বঞ্চিত করে সঞ্চয় করে ও সে সঞ্চয়ের সব—সমস্ত ব্যয় করে তার জন্যে; এমন কি তার জন্যে সে সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। ছেঁড়া জামা কাপড়ের দিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই—মূল্যবান পোশাক ফুল সে উপহার পাঠায় যুবতীকে। নিজেকে সে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করে প্রত্যাশাহীন এই অ-সম ভালবাসার মধ্যেই সুখী হতে চায়। এই দারিদ্র্যপীড়িত শূন্যতার মধ্যেও সে যে যুবতীকে ভালবেসে পরম সুখী তাকে তাই বোঝাতে চায়। কিন্তু যুবতীকে দেভুশ্‌কিন বেশী দিন ভুলিয়ে রাখতে পারে না। একদিন ভারেনকা বুঝতে পারে তার মিথ্যার আবরণে

ঢাকা নির্মম দারিদ্র্যের কষ্ট, তার ত্যাগ আত্মবঞ্চনা। ভারেনকা অবশেষে স্থির করে—ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে ওর জীবনকে সহজ হবার সুযোগ দেবে, ওর এই ত্যাগের কষ্ট থেকে ওকে মুক্তি দেবে। ভারেনকার নিজেরও চেষ্টা ছিল তার এই দারিদ্র্যের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার। এই দুই তাগিদে সে শেষমেশ একটি সচ্ছল পুরুষকে বিয়ে করল। পুরুষটিকে সে ভালবাসতে পারে নি। বরং ভয় করত তাকে। যা হোক ভারেনকার বিয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেভুশ্‌কিনের স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে পড়ে থাকল পিতার্সবুর্গের সাধারণ মানুষের নিয়তি আঁকড়ে ভগ্ন-মন নিঃসঙ্গ হয়ে।

'বাঃ চমৎকার ত! পড় দেখি, পড়। পড়ে শোনাও আমাকে উপন্যাসটা।' উৎসাহে উদ্বাহু হয়ে উঠলেন গ্রিগোরোভিচ।

অগত্যা অতিশয় সংকোচে দস্তয়েফ্‌স্কি পড়তে শুরু করলেন। কয়েক পাতা পড়া হতেই লাফিয়ে উঠলেন গ্রিগোরোভিচ। 'আর পড়তে হবে না, ওটা তুমি আমার হাতে দাও। আমি এক্ষুনি নেক্রাসফ্‌-এর কাছে নিয়ে যাব। এই বিখ্যাত তরুণ কবির নাম শুনেছ ত, সাহিত্যের বাজারে ওর খুব প্রভাব। সে দিয়ে এলে যে-কোন নামকরা পত্রিকা লুফে নিয়ে ছাপবে তোমার লেখা। চাই কি সে নিজেও এ লেখা ছাপতে পারে। তার নিজের কাগজ আছে।'

তবু দস্তয়েফ্‌স্কি পাণ্ডুলিপি হাতে করে চুপ করে আছেন দেখে তিনি নিজেই হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিলেন পাণ্ডুলিপি। একটা খবরের কাগজে সেটা মুড়ে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

স্তব্ধ মূক হয়ে বসে থাকলেন দ্বিধা পীড়িত দস্তয়েফ্‌স্কি। তাঁর হৃদপিণ্ডের দরজায় রক্ত এসে সমুদ্র-ঢেউয়ের মতন আছড়ে আছড়ে পড়ছে আর তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন বারবার। কিন্তু এত ভয় পাওয়ার, এত অস্থির হয়ে ওঠার কিছু ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির ; অবশ্য তাঁর অতি-প্রত্যাশার স্বপ্ন সত্যি হতে যে আর দেরি নেই তখনই বা তিনি তা জানবেন কেমন করে!

দস্তয়েফ্‌স্কি যখন অস্থির বুক আর শূন্য মন নিয়ে অন্ধকার ঘরে বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন তখন শহরের আর এক প্রান্তে আলোকিত এক ঘরে তাঁর পাণ্ডুলিপির ওপরে উপুড় হয়ে আছেন রুদ্ধশ্বাস দুই মুগ্ধ মানুষ—গ্রিগোরোভিচ আর নেক্রাসফ্‌।

'আমি ত নিয়ে গেলাম তোমার পাণ্ডুলিপি,' গ্রিগোরোভিচ পরে সেই ঐতিহাসিক উপন্যাস-পাঠের বর্ণনা দিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে, 'নেক্রাসফ্‌ বললে, 'এনেছ যখন দাও, দেখি পড়ে, আমাদের 'হোম এনালস'-এ চলবে কি না

পাঁচ দশ পাতা পড়লেই বুঝতে পারব।' সেই পাঁচ দশ পাতা পড়তে বসেই কেমন করে গোটা উপন্যাসটাই পড়া হয়ে গেল শোন, দশ পাতা শেষ করে নেক্রাসফ্‌ বললে, 'না হে এ ত সাধারণ মনে হচ্ছে না, আরও দশ পাতা পড়ি এস।' সে দশ পাতাও যখন পড়া হল, নেক্রাসফ্‌ বললে, 'না গ্রিগোরোভিচ, থামা যাচ্ছে না, আরও খানিকটা পড়া যাক, এবার তুমি পড়।' তখন আমি পড়তে শুরু করলাম। আমি খানিকটা পড়ি, নেক্রাসফ্‌ খানিকটা পড়ে এই করে করে নেক্রাসফ্‌ এসেছে সেই ছাত্রটির মৃত্যুর জায়গাটায়—বাপ তখন ছেলের কফিনের পেছনে পেছনে ছুটছে—নেক্রাসফ্‌ এখানে এসে থেমে গেল। কান্নায় তার গলা বুজে গেছে তখন। তখন আমি পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে পড়তে লাগলাম। হঠাৎ নেক্রাসফ্‌ পাণ্ডুলিপির ওপরে ঘুষি মেরে বলে উঠল, 'হারামজাদা নরকে যাক' তোমাকে উদ্দেশ করেই উত্তেজিত নেক্রাসফ্‌-এর এই পরম প্রশংসার উক্তি, বুঝলে ফিওদর। নেক্রাসফ্‌ আর আবেগ চেপে রাখতে পারছিল না। শেষ অংশটা পড়ছিলাম আমি, যেখানে বুড়ো দেভুশ্‌কিন ভারেনকার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে সেখানে এসে আমিও কেঁদে ফেললাম। চেয়ে দেখি নেক্রাসফ্‌-এর চোখেও জল।

'পড়া শেষ হতেই নেক্রাসফ্‌ উঠে দাঁড়াল, 'চল, আর এক মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না। এক্ষুনি আমরা দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে যাব।'

'কিন্তু, সে ত এখন ঘুমোচ্ছে '

'জানি, রাত চারটায় কেউ জেগে বসে থাকে না। চল, আমরা তাকে ডেকে তুলব। এটা ঘুমের চেয়ে বড়! অনেক অনেক বড়!'

'সেই শেষ রাত্তিরে আমরা এসে তোমার ঘরের কড়া নাড়লাম। তোমাকে জাগালাম। দরজা খুলে আমার পাশে একজন অপরিচিত মানুষ দেখে তুমি বিবর্ণ হয়ে গেলে। অচেনা মানুষ দেখে তুমি যে এমন ভয় পাও আমার জানা ছিল না। তাছাড়া ঘুমের জন্যেই হয়ত তোমার বুদ্ধি তখন ভোঁতা মেরে গিয়েছিল। সে যখন তোমাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছিল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি গৌরব বোধ করছি। তুমি এক মহান প্রতিভা, পিতার্সবুর্গের গৌরব।' তখন তুমি একটা কথাও বল নি। এমন কি তারপরও না। সে যখন রুশ-সাহিত্য ও তোমার সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা করছিল তখনও তোমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। কথা ফোটে নি যখন সে বলল, এ পাণ্ডুলিপি নিয়ে এখনই আমি যাচ্ছি বেলিন্‌স্কির কাছে। রুশ-সাহিত্যের বাঘ, বিখ্যাত

সমালোচক, দেখো তাকে কেমন অবাক করে দিই, তাকে বলব, গোগোলের যা বেস্ট এখানে তার সবটুকু আছে গোগোলের যা নেই এখানে তাও পাবে। এ লেখক জানে, কেমন করে পদদলিত লাঞ্ছিত দরিদ্রের মূক বুকের যন্ত্রণা সাহিত্যে মুখর করে তুলতে হয়।' তখনও তোমার শূন্য দৃষ্টি, মুখে কথাটি নেই।'

শুনে দস্তয়েফ্‌স্কি বলেছিলেন—'কী বলব ভাই, তখন কেবল মনে হয়েছিল, আমি একটা স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্নে একটা নাটক দেখছি।'

সত্যি নাটকীয় দ্রুতগতিতেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল। যেদিন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর ফ্ল্যাটের অংশীদার করে নিয়ে এলেন গ্রিগোরোভিচকে সেদিন এক কাপ চা দুভাগ করে খেতে খেতে দস্তয়েফ্‌স্কি পিতার্সবুর্গ জয়ের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। সে যে এত সত্বর সত্য হবে, না ভেবেছেন গ্রিগোরোভিচ, না আশা করেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। অথচ সেই অপ্রত্যাশিতই সত্য হল, নেক্রাসফ্‌ আর বেলিন্‌স্কিকে মুখপাত্র করে পিতার্সবুর্গ নতজানু হয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিলে।

বেলিন্‌স্কির হাতে তখন রুশ-সাহিত্যের উত্থান পতন, বেলিন্‌স্কির হাতে তখন খ্যাতির সনদ। তিনি যাঁকে শিরোপা দেন তাঁকে মাথায় করে নেয় পিতার্সবুর্গ, তার জন্যে পিতার্সবুর্গের সম্ভ্রান্ত গৃহের দরজা সসম্ভ্রমে খুলে যায়। তাঁকে স্বাগত জানাতে সমবেত হয় সম্ভ্রান্ত সকল নারী পুরুষ।

অথচ তখনও বই হয়ে বেরোয় নি 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি'; বেলিন্‌স্কি তখন কেবল তার পাণ্ডুলিপি পড়েছেন, আর সেই পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, 'চোখে জল আসে অথচ মুখে হাসি ফোটে, হাসতে গিয়ে পাঠকের বুক মুচড়ে ওঠে—এ কী দক্ষতা, এ কী প্রতিভা।'

সেই মুগ্ধ প্রশংসার উক্তি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরিচিত নাম সহসা পরিচিত জনতার সরণিতে এসে উপস্থিত হল, ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে—বৈঠকখানা থেকে অন্তঃপুরে। যাঁকে কেউ চেনে না দেখে নি কখনো, তাঁর নামটি মুখস্থ হয়ে গেল সকলের।

বই বেরোল সঙ্গে সঙ্গেই, ১৮৪৬-এর জানুআরিতে, তারপর···

তারপর সময়ের সরণি বেয়ে খ্যাতির চাকা ঘুরতে থাকল বনবনিয়ে। নেক্রাসফ্‌, বেলিন্‌স্কি, তুর্গেন্‌য়েফ্‌, ইভান পানায়েফ্‌, প্রিন্স ওদোয়েফ্‌স্কি—বন্ধুর সংখ্যা স্তাবকের সংখ্যা বাড়তে থাকল মুহূর্তে মুহূর্তে।

এগার

"মিখাইল তুমি এখানে নেই। থাকলে নিজের চোখে দেখতে সব, নিজের কানে শুনতে। এসব লিখে জানাতে হচ্ছে তোমাকে কিন্তু লিখে কি সব জানানো যায় ?" লেখেন দস্তয়েফ্‌স্কি। দাদাকে এ দুর্লভ সৌভাগ্যের অংশীদার করতে না পারলে ভাল লাগছে না তাঁর।

"দাদা, আমার বিশ্বাস হয় না এর চেয়ে বেশী খ্যাতি আর কোন দিন আমি পাব। আমার সম্পর্কে এখানকার মানুষের অশ্রুতপূর্ব শ্রদ্ধা। তারা সবাই আমাকে চিনতে চায়, আমার সম্পর্কে জানতে চায়। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে আমার কাছে। ছাত্র শিক্ষক সাহিত্যিক শিল্পী ধনী সম্ভ্রান্ত-মানুষ সকলে আমার সম্পর্কে উদ্‌গ্রীব উৎসুক। 'কোথায় গেলে দস্তয়েফ্‌স্কিকে ধরতে পারি বলুন ত ?' উৎকণ্ঠার প্রশ্ন প্রতিষ্ঠাবান মানুষদের মুখে। আমাকে আদর আপ্যায়নে প্রসন্ন করে তারা ধন্য হতে চায়। আমার সামনে সবাই এমন ব্যবহার করে যেন আমি একটা অলৌকিক কিছু, একটা বিস্ময়ের মূর্তি। আমি মুখ খুলেছি, কিছু বলেছি কি অমনি আগুনের মতন সে-খবর ছড়িয়ে পড়ছে সারা পিতার্সবুর্গ—দস্তয়েফ্‌স্কি এ কথা বলছেন, দস্তয়েফ্‌স্কি ওই রকম ভাবছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি ছাড়া কথা নেই কারো মুখে। তুর্গেনিয়েফ্‌ আমার পেছনে ছায়ার মতন ঘুরছে; বেলিন্‌স্কি তাই দেখে বলছে, ও তোমার প্রেমে পড়ে গেছে, ফিওদর। সত্যি তুর্গেনিয়েফ মানুষটি বড় ভাল। ধনী সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিমান যুবক, দেখতেও সুন্দর। আমার হাতে টাকাকড়ি নেই। এখন ভাল পোশাক-আসাক দরকার, পকেটে পয়সা থাকা দরকার অথচ আমি শূন্য-থলি। 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি' এখনও সেনসর বোর্ডের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। অবশ্য ইতিমধ্যে নেক্রাসফ্‌-এর কাগজের জন্যে লিখে আমি একশ' পঁচিশ রুবল পেয়েছি। আমি আর একখানা উপন্যাসে হাত দিয়েছি। ছোট উপন্যাস কিন্তু সে আমার 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি' থেকে অনেক ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস। উপন্যাসের নাম দিয়েছি 'দ্‌ভোইনিক' (প্রতিরূপ)।"

এ-চিঠি অবশ্য বই বেরোনোর অব্যবহিত আগে লেখা। বই বেরোনোর পরে লেখা চিঠিখানাও ওই রকমই তবে তাতে উচ্ছ্বাস আরও বেশী, খ্যাতির অহংকারে সে চিঠির ভাষা আরো প্রগলভ, আরও প্রখর। স্বাভাবিক। পঁচিশ বছর বয়সের পক্ষে এত খ্যাতি সহজ মনে নেওয়া কঠিন, হজম করা শক্ত। 'রুশ-সাহিত্যের ইতিহাসে একখানা বই লিখে এত অল্প বয়েসে খ্যাতির এমন উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠার নজির আর নেই।' লিখেছিলেন বেলিন্‌স্কি; কিন্তু লেখেন নি,

এমন সর্বনাশের নজিরও নেই। দস্তয়েফ্স্কির সর্বনাশটা ডেকে এনেছিলেন বেলিন্স্কি নিজেই। প্রশংসায় প্রশংসায় দস্তয়েফ্স্কির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দিয়েছিলেন তুর্গেন্য়েফ্, নেক্রাসফ্ও।

সন্দেহটা যে দস্তয়েফ্স্কির মনেও জাগে নি তা নয়। তিনি দাদাকে লিখেছিলেন, "আমার ওপরে ওরা যে খ্যাতি চাপিয়ে দিয়েছে তা খুব খাঁটি কিনা আমার সন্দেহ আছে। কতদিন এটা চলবে আমি জানি নে—দারিদ্র্যের তাড়না, নির্দিষ্ট সময়ে লেখা শেষ করে দেওয়ার চাপ সহ্য হচ্ছে না—আহ্ আমি যদি একটু বিশ্রাম পেতাম, একটু বিশ্রাম!"

বিশ্রাম নেই। লিখতে হয়, ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, সম্ভ্রান্ত ধনীদের ভোজসভায় যেতে হয়। অথচ এর কিছুই তাঁর এখন ভাল লাগছে না। তাঁর সত্তার এক অংশ বার বার বেঁকে বসছে, বিদ্রোহ করছে। আর এক অংশ উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—নিজের মধ্যেকার এই দ্বিধাবিভক্ত সত্তার দ্বন্দ্বই কি কম কষ্ট দিচ্ছে তাঁকে। তা ছাড়া সেই ভয়, হঠাৎ হঠাৎ কানের ভিতরে কানে একটা ভয় ফিসফিসিয়ে ওঠে, তখন শিরদাঁড়া শিরশির করতে থাকে, বুকের মধ্যে বাজতে থাকে ঘণ্টা কাঁসর—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটেন ফিওদর। নিরাপদ আশ্রয়ের বুকে যতক্ষণ না গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছেন ছুটতে থাকেন। শৈশবে এ-ঘটনা বার বার ঘটেছে। তারপরেও এ-ভয় তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি—অপরিচিত মুখ অপরিচিত পরিবেশ বার বার তাঁকে ভয় দেখিয়েছে। কি বোর্ডিং-স্কুলে কি আর্মি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি যে সবার থেকে দূরে একলা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন সেও এই ভয়ে—অপরিচিত স্থান অপরিচিত জন-জনতা দেখলেই তাঁর মনে হয় এরই মধ্যে থেকে একটা ভয় হঠাৎ এসে তাঁকে আক্রমণ করবে, আঘাত করবে। তিনি তাই দূরে সরে থাকতে চান, দূরে সরে যান। দূরে সেই একলাতেও তাঁর ভয়, তাই বন্ধু খোঁজেন। মনের মতন মানুষ পেলে আঁকড়ে ধরেন।

ওই দ্বিধাবিভক্ত সত্তার কষ্ট আর ওই অলীক ভয়ের বিভীষিকা এই আকস্মিক খ্যাতির পর্বে তাঁকে বড় বেশী নিগ্রহ করছিল। এ-পর্বে এ বিড়ম্বনার শুরু হল যেদিন গ্রিগোরোভিচ তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন নেক্রাসফ্-এর কাছে। একলা ঘরের অন্ধকারে দ্বিধায় পীড়িত অলীক ভয়ে আড়ষ্ট দস্তয়েফ্স্কি চুপ করে বসে গ্রিগোরোভিচ-এর ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন কি? তাঁর পরবর্তীকালের এক প্রণয়িনী লেখিকা শ্রীমতী সোফিয়া কোভালেভ্স্কায়া তাঁর

স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'সেদিন একলা ঘরে ফিওদর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন নি, ছট্‌ফট্ করে উঠে পড়েছেন, কেউ কেউ বলেন, তিনি তাঁর কয়েকজন তরুণ সাহিত্যরসিক বন্ধুর আড্ডায় গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা সকলে মিলে গোগোল পড়েছেন। হয়ত পড়েছেন কিন্তু সারারাত নয়। বেশীক্ষণও নয়। তখন তাঁর যে মনের অবস্থা তাতে সাহিত্য-পাঠে মনোযোগ থাকার কথাও নয়, ফিওদরের নিজের মুখের স্বীকৃতি, সেই ঐতিহাসিক মে-র রাত্রি তিনি কাটিয়েছেন বারবণিতার ঘরে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'সে রাত আমি সস্তা আর নোংরা মেয়েমানুষের সঙ্গে জঘন্য লম্পটের মতন কাটিয়েছি, তৃপ্তি পাই নি তৃপ্তি চাইও-নি, আমি শুধু আমার উদ্বেগ ভুলতে চেয়েছিলাম। মে-মাসের শুক্লা রাতের পিতার্সবুর্গ এমনিতেই আমার স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে টাল-মাটাল করে দেয়, আমি বিমর্ষ হয়ে যাই—একটা অসুস্থ কামনার তাড়না আমাকে পাগল করে। সেদিন এ-অবস্থাটা আমাকে আরও বেশী করে পেয়ে বসেছিল।...'

উন্মত্তের মতন ভোগ করে উদ্বেগ দূর করতে গিয়ে আরও বেশী উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তি নিয়ে ফিওদর বাড়ি ফিরেছেন রাত চারটায়। তার অল্প পরেই দরজার কড়া নড়ে উঠেছে। গ্রিগোরোভিচ নেক্রাসফ্‌কে নিয়ে এসেছেন। অপরিচিত মানুষটিকে দেখে সেই পুরনো ভয় তাঁকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। নেক্রাসফ্-এর উত্তপ্ত প্রশংসার উত্তরে তিনি সময়োচিত সৌজন্যের একটা বাক্যও তাই উচ্চারণ করতে পারেন নি। কি নারী কি পুরুষ, বুদ্ধিজীবী অপরিচিত মানুষ হলেই তাকে তিনি ভয় করতেন। পুরুষকে তাঁর ভয় ছিল, এই বুঝি সে তাঁকে ঈর্ষা করল ঘৃণা করল তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল। তিনি তাই এড়িয়ে চলতে চাইতেন অপরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরুষদের। তাদের সান্নিধ্যে এসে আড়ষ্ট হয়ে যেতেন, অস্বস্তি বোধ করতেন।

আর অপরিচিত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের এড়িয়ে চলতে চাইতেন কেন তার স্বীকারোক্তি লিখেছেন তিনি তাঁর 'বেলিয়ে নোচি' (শুক্লারাত) উপন্যাসে (১৮৪৮)। এখানে এক যুবকের চরিত্রে তিনি তাঁর নারী-ভীরুতার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।—যুবকটি রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত আর ভালবাসা পাওয়ার, ভালবাসা দেওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখত। বুকে বুক মুখে মুখ রাখার যাবতীয় প্রণয় ঘটনা ঘটত তার কল্পনায়, বাস্তব জীবনে সে ছিল ভীরু আর নিঃসঙ্গ। 'সত্যি বলতে কি কোন যুবতীর সামনাসামনি হতে আমার রীতিমত ভয় করত। আমি তাদের কোন প্রয়োজনেরই যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি,

আমি তাদের সঙ্গে সাহচর্যে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার একলা জীবন, নিঃসঙ্গতাই এর জন্যে দায়ী ছিল ··তাদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, কেমন ব্যবহার করতে হয় তাও অব্দি আমি জানতাম না।' (নায়কের জবানীতে দস্তয়েফ্‌স্কির নিজের কথা।)···একদিন এক রাস্তায় মোড়ে যুবকটির সঙ্গে নাসতেন্‌কা নামে একটি যুবতীর পরিচয় হল। যুবতী সুন্দরী ও সহিষ্ণু, তাই যুবকটি সাহস করে তাকে তার স্বপ্নের কথা বলতে পারল, বলতে পারল তার ভালবাসা পাওয়া ও দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা। যুবতী মনোযোগ দিয়ে শুনল সব, শেষে বলল, সে-ও একজনকে ভালবাসে। শুনে তবুও পিতার্সবুর্গের এই স্বপ্নবিলাসী যুবক ক্রমশ তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলল। কিন্তু সে প্রাণপণ ভালবাসার আবর্তের মধ্যে তাকে টেনে আনতে চাইল না যুবক বরং নিজের ভালবাসা অস্বীকার করল সে, যুবতীর জন্যে যেন তার কোন টান নেই এমন ভাব করল এবং বুকের মধ্যে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার তুষের আগুন গোপন করে যুবতীকে মুক্তি দিয়ে সরে দাঁড়াল যাতে করে যুবতী তার প্রার্থীতের কাছে অনায়াসে যেতে পারে।

ভালবাসার জনকে জয় করে আনবার প্রখর পুরুষকার ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে। তিনি ব্যর্থ ভালবাসার দুঃখ বইতে, ত্যাগ স্বীকার করতেই যেন ভালবাসতেন। তাঁর রচনার মধ্যেও আমরা তাই দেখি। —ভালবেসে, সে ভালবাসা গোপন করে, ভালবাসার জনকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে হাহাকারের সুখের মধ্যে শান্তি খুঁজছে নায়ক। ওরফে দস্তয়েফ্‌স্কি।

আগেই বলেছি 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি'র সাফল্য যাদুমন্ত্রের মতন পিতার্সবুর্গের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মানুষের ঘরের দরজা দস্তয়েফ্‌স্কির জন্যে অবারিত করে দিয়েছিল। ধনী-জমিদার এবং সাহিত্যরসিক ইভান পানায়েফ্‌-এর গৃহেও তাঁর সেই সূত্রেই প্রবেশাধিকার। নেক্রাসফ্‌ আর ইভান পানায়েফ্‌ মিলে একটা পত্রিকা চালাতেন তখন, সে উপলক্ষে সমকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের প্রায়ই বৈঠক বসত ইভান পানায়েফ্‌-এর বাড়িতে। এখানে দস্তয়েফ্‌স্কির পরিচয় হয় ইভান পানায়েফ-এর স্ত্রী শ্রীমতী আফদোতিয়া পানায়েভার সঙ্গে। সুলেখিকা হিসেবে সাহিত্যরসিক মহলে তখন তাঁর বেশ নাম। কিন্তু সাহিত্য নয় শ্রীমতী পানায়েভার যৌবনই মুগ্ধ করেছিল দস্তয়েফ্‌স্কিকে। প্রথম সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই মিখাইলকে লিখেছিলেন, "আমার মনে হচ্ছে যেন আমি শ্রীমতী পানায়েভার প্রেমে পড়ে গেছি। সে একাধারে বুদ্ধিমতী ও রূপসী। অধিকন্তু

বন্ধুবৎসল। সর্বোপরি তার ব্যবহারে মিথ্যে সংকোচের বালাই নেই। আমার সময়টা খুব আনন্দে কাটছে।"

ছোটখাটো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা এই প্রগলভা যুবতীর বাইশ বছরের অনিন্দ্য তনু-দেহে জীবন্ত একখানি মুখ—দেখে মনে হত যেন সব সময় চকমক করছে : তাঁর সুবিন্যস্ত দাঁতের শুভ্রতা, বাদামী-রং-চোখের দীপ্তি, টানটান মসৃণ ত্বকের উদ্ভাস, হার ও ইয়াররিং-এর মুক্তো থেকে ঠিকরোনো আলো ইত্যাদি সব মিলিয়ে যেন সব সময় এক মোহিনী-লাবণ্যের আবেশ ছড়াচ্ছে তাঁর শরীর। সে শরীরে লেসের পাড় বসানো সূক্ষ্ম পোশাকের রমণীয়তা তাঁর সে লাবণ্যের আবেশকে যেন আরো রহস্যময় করে তুলত। বড় বেশী লোভনীয় দেখাত তাঁকে। দেখে দস্তয়েফ্‌স্কি প্রথম-দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়ে যাবেন, স্বাভাবিক। প্রথম কটাক্ষেই তাঁকে সম্পূর্ণ জয় করে নেবেন শ্রীমতী পানায়েভা, আশ্চর্য কী। জয় করতে কাউকে অবশিষ্ট রাখেন নি তিনি। নেক্রাসফ্‌, তুর্গেন্‌য়েফ বেলিন্‌স্কি—তাঁর রূপে মুগ্ধ ছিলেন সকলেই।

কারোর বয়েসই তখনও দুইয়ের দশক পার হয় নি। দস্তয়েফ্‌স্কি আর নেক্রাসফ্‌-এর বয়েস তখন পঁচিশ, গ্রিগোরোভিচ-এর ছাব্বিশ আর তুর্গেন্‌য়েফ-এর সাতাশ। এঁদের মধ্যে বেলিন্‌স্কির বয়েসই একটু যা বেশী। তিনি তখন তেত্রিশ পেরিয়ে গেছেন। এবং সেই অল্প বয়সেই সমালোচনার ক্ষেত্রে অশেষ কীর্তি রেখে বছর তিন পরে মারা যান তিনি। বেলিন্‌স্কি অবশ্য পানায়েভাকে কখনো প্রণয়িণী হিসেবে পেতে চান নি, যাঁরা চেয়েছিলেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে নেক্রাসফ্‌ ছিলেন অতিশয় সোচ্চার। পানায়েভা সম্পর্কে তাঁর মনের কথা তিনি লুকোতেন না কখনো। ফলে দস্তয়েফ্‌স্কিকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। দু বছরের মধ্যেই নেক্রাসফ্‌ তাঁর প্রণয়ীর আসন দখল করে বসেছিলেন। এই পিছিয়ে আসার কারণ নেক্রাসফ্‌-এর আক্রমণাত্মক মনোভাব শুধু নয়, দস্তয়েফ্‌স্কির নিজেরও দুর্বলতা।

মিখাইল তাঁর দাদা হলেও বয়সে এক বছরের মাত্র ব্যবধান বলে তাঁদের মধ্যে সমবয়সীর সমঝোতা গড়ে উঠতে বাধা ঘটে নি। দস্তয়েফ্‌স্কির কোন যথার্থ বন্ধু ছিল না। বন্ধুহীন দস্তয়েফ্‌স্কির সে অভাব মিখাইলই পূরণ করেছিলেন। শৈশবের একমাত্র খেলার সাথী আর পড়ার সাথী মিখাইল যৌবনে তাঁর গোপন চিন্তারও সাক্ষী ছিলেন। তাঁর কাছে দস্তয়েফ্‌স্কি কোন কথাই লুকোতেন না, তাঁকে সব কথা না জানাতে পারলে তিনি স্বস্তি পেতেন না। শ্রীমতী

পানায়েভাকে ভালবেসে তাঁর যে কী যন্ত্রণা সে কথা জানাতেও তিনি দ্বিধা করলেন না, দেরি করলেন না। পানায়েভার সঙ্গে দেখা হওয়ার তিন মাস বাদে ১৮৪৬-এর ১ ফেবরুআরি তিনি লিখলেন, "পানায়েভার প্রেমে ভীষণভাবে মজে গেছি। প্রাণপণে চেষ্টা করছি নিজেকে সংযত করতে, খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার স্বাস্থ্য ভয়ানক ভেঙে পড়েছে। আমার স্নায়ুগুলিই অসুস্থ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ভয় হচ্ছে স্নায়ু-রোগের আক্রমণে আমার না 'ব্রেন-ফিবার' হয়ে যায়।"

দস্তয়েফ্‌স্কির তখনকার এই স্নায়ু বৈকল্যের কারণ তাঁর ভালবাসার তীব্রতা ও ভালবাসাজনিত প্রবল উৎকণ্ঠা। ভালবাসার প্রতিদান না পাওয়ার অসম্মান তাঁকে খুব কাতর করে ফেলেছিল। তিনি কিছু দিন যেতে না যেতেই বুঝতে পেরেছিলেন পানায়েভার ভালবাসা তিনি পাবেন না। তাঁর এই ঐকান্তিক প্রেম বিফলে যাবে—তাঁর এ-সন্দেহের কারণও ছিল অতিশয় স্পষ্ট এবং কারণও তাঁর নিজেরই প্রকৃতিজাত।

শ্রীমতী পানায়েভা তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন: '......উদ্ধত যৌবনের জন্যেই হয়ত দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর মনোভাব গোপন রাখতে পারতেন না। তাঁর কথাবার্তায় আচার-আচরণে তাঁর খ্যাতির অহংকার বে-আবরু হয়ে পড়ত। লেখক হিসেবে তাঁর যে অসাধারণ প্রতিভা সে কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করতেন না। অন্যের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ত ছিলই দস্তয়েফ্‌স্কির, তার ওপরে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের প্রখর দীপ্তিতে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে; চতুর্দিক থেকে প্রশংসার হাততালি তাঁকে সিক্ত আপ্লুত করে দিয়েছে, তাঁকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে; ফলত তিনি তাঁর সমকালীন তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর অহংকার কখনো গোপন রাখতে পারেন নি কি চান নি; কিন্তু আমাদের সাহিত্যের আড্ডায় যে-হেতু সকলেই ছিল সমবয়সী, তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষ, তাঁর একটু সতর্ক সাবধান হওয়া উচিত ছিল অথচ দস্তয়েফ্‌স্কি সাবধান হন নি। বরং ইচ্ছে করেই যেন তিনি নিরস্ত্র নিরাবরণ হয়েই মল্লভূমিতে নেমে আসতেন, ভাবখানা এই আমি প্রতিভায় তোমাদের সকলের থেকে অনেক অনেক বড়, তোমরা কী করতে পার কর। এই স্পর্ধার বিরুদ্ধেই বুঝি সকলে একযোগে জেহাদ ঘোষণা করে বসল। কঠিন ব্যঙ্গ কৌতুকের তীক্ষ্ণ খোঁচায় তাঁর অহংকারকে জর্জরিত করতে থাকল। এ ব্যাপারে তুর্গেনিয়েফ্‌ই ছিলেন সব চেয়ে ধারাল সব চেয়ে ঝাঁঝাল,—যেন বোলতার হুল। তিনি দস্তয়েফ্‌স্কিকে নাস্তানাবুদ করবার মতলব এঁটেই সব

সময় তাঁকে তর্কের মধ্যে টেনে আনতেন আর প্রতি কথায় শ্লেষ আর বিদ্রূপ ছড়িয়ে তাঁকে ক্রমাগত রাগিয়ে তুলতেন। রাগ হতে হতে শেষমেশ আর দস্তয়েফ্‌স্কির কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। তিনি যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে ফেলতেন। উলটো-পালটা যা মুখে আসত বলে বসতেন। সেই সব অবাস্তব অসম্ভব বক্তব্যকে যখন আর যুক্তি দিয়ে খাড়া করতে পারতেন না, সকলে মিলে তখন তাঁকে দুয়ো দিত। ······ক্রমে দস্তয়েফ্‌স্কির মনে এক দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল, এরা কেউই তাঁর মিত্র নয়। সকলেই তাঁকে ঈর্ষা করে। তাঁর প্রতিভাকে খাটো করতে চায়। তাঁর সোজা কথাকে বাঁকা অর্থে ধরে নিয়ে তাই তাঁরা তাঁকে এমন করে প্রকাশ্যে অপমান করতে চায়। অতঃপর বদ্ধমূল বিদ্বেষে ফুটতে ফুটতে আসতেন দস্তয়েফ্‌স্কি; যে বিষ-বাষ্পে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল দু-চারটা কঠিন বাক্যবিনিময়ের পরেই তিনি রেগে উঠে সে বিষ নিঃশেষে ঢেলে দিতেন যাঁরা তাঁকে ঈর্ষা করতেন তাঁদের উপরে। এ-ভাবে সকলের সঙ্গে তার মনোমালিন্য দ্রুত বেড়ে উঠছিল, ব্যবধান বাড়ছিল ক্রমাগত। অসুস্থ বলে, স্নায়ু-প্রধান মাথা গরম মানুষ বলেও কেউ তাঁকে এতটুকু সহ্য করতে, মানিয়ে নিতে চাইছিলেন না বরং তারা তাঁর ওপরে আরও বেশী রুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন, তাঁকে দাগা দিতে ভোগা দিতে তাদেরও জেদ ক্রমশই আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছিল।'

এই আড্ডার সকলের ওপরে দস্তয়েফ্‌স্কির ক্রোধ ক্ষোভ বল্গাহীন এমন উচ্চণ্ড হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটত এমন একজন রমণীর সামনে যাঁকে তিনি মনে মনে তার যৌবনের প্রথম ঐকান্তিক প্রেম উপহার দিয়েছিলেন অথচ যার বিনিময়ে তিনি প্রেম নয় কেবল অনুকম্পাই কুড়িয়েছেন।

তাঁর চোখের ওপরে শ্রীমতী পানায়েভাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলছিলেন নেক্রাসফ্‌। প্রথম যৌবনের প্রথম ভালবাসার এই ব্যর্থতা, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর কাছে এই হীন পরাজয় দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভয়ানক বিভ্রান্ত বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁকে করে তুলে ছিল নারী-বিদ্বেষী। মিথাইলের বন্ধু জর্মন ডাক্তার রায়েজেন কাম্প বলেছেন, দস্তয়েফ্‌স্কির এ নারীদ্বেষ আসলে নারীর প্রতি ঔদাসীন্য নয় বরং ওটা প্রবল কামবৃত্তিরই একটা মুখোশ।

দস্তয়েফ্‌স্কির এ-কামবৃত্তি ছিল দ্বিমুখী। কামবৃত্তির এই দ্বৈত চরিত্রের জন্যেই তাঁর প্রকৃতিতে এত বিপরীতের সমন্বয় ঘটেছিল। কখনো তিনি নম্র ভদ্র বিনয়ী বন্ধু-বৎসল যেন এক ক্ষমাসুন্দর সাধু, কখনো আবার ঠিক তার বিপরীত ক্রুর ক্রোধী হঠকারী যেন এক সমাজবিরোধী জঘন্য মানুষ।

মৃগী রোগের মূলে থাকে দুটি বোধের সংঘাত। দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে প্রবল কামবৃত্তি ও দুরন্ত আদর্শবাদ—এ দুই বৃত্তি একযোগে কাজ করতে চেয়ে তাঁর মনের মধ্যে ক্রমাগত যে সংঘর্ষ ঘটাত তারই ফলে দস্তয়েফ্স্কির স্নায়ু দুর্বল অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

দ্বিধায় আশংকায় হতাশায় দস্তয়েফ্স্কি সুলভ নারীর শরীরে ক্ষণকালের আত্মবিস্মৃতি খুঁজতে গিয়েছিলেন; সে নেশা বাড়িয়ে দিল শ্রীমতী পানায়েভার প্রেমে ব্যর্থতা। একটি নির্মল প্রেমের কুঁড়ি ফুটতে না ফুটতে এসে ছিটকে পড়ল নোংরা পাঁকে। এবং তখনই দস্তয়েফ্স্কির আহত চেতনায় তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হল একটি বোধ, ভাড়াটে শরীরে শরীরের ক্ষুধা মেটে আত্মা উপবাসী থেকে যায়—দেহের তৃপ্তি আর ভালবাসার আনন্দ দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। ভালবাসার জনের শরীরে রাগমোচনই পরম সুখের স্বর্গ। সেই প্রথম যৌবনে দস্তয়েফ্স্কি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন অথচ সে স্বর্গ-সুখ তাঁর অনায়ত্ত দুর্লভই থেকে গিয়েছিল। 'শুকাবাত'-এর স্বপ্ন-বিলাসী যুবকের কাছে শ্রীমতী পানায়েভা অধরা দূরের নক্ষত্র হয়েই থাকলেন, তার শরীরের স্বর্গে আশ্রয় না পেয়ে তিনি সেই ক্ষুধা মিটাতে ছুটে গেলেন শহরতলির আস্তাকুঁড়ে সুলভ সুন্দরীদের শরীরে। জর্মন ও বলটিক সাগর তীরের রমণীরাই ওখানে দস্তয়েফ্স্কির ছিল সব থেকে প্রিয়; কিন্তু তাদের দাম ও দেমাকও ছিল সব থেকে বেশী। সে প্রতুল দামের দেমাক কিনতে দরিদ্র দস্তয়েফ্স্কিকে ক্রমাগত হাত পাততে হত বন্ধুদের কাছে। 'বেদ্নিয়ে লিয়ুদি'-র অশেষ খ্যাতি হলেও সে খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল বুদ্ধিজীবী মহলে, বিশাল পাঠক-সমাজের কানে তখনও ব্যাপক হয়ে পৌঁছয় নি; তাই বই খুব বিক্রি হত না, দারিদ্র্য ঘুচত না দস্তয়েফ্স্কির। দু হাতে তাই তাঁকে লিখতে হত। লেখার বাবদ অগ্রিম টাকা নিতে হত—নেক্রাসফ্-এর কাছ থেকেও ইতিমধ্যে তিনি দেড় শ' রুবল ধার নিয়ে বসে আছেন। এ-সব ধার-দেনা আর নৈশ-অভিসারের কাহিনী বন্ধু-মহলে ছড়িয়ে পড়তে বাকি ছিল না। এ-সব কাহিনী তিল থেকে তাল হয়ে উঠত তুর্গেন্য়েফ্-এর মুখে। সাহিত্যের আসরে আড্ডায় বন্ধুদের সামনে তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে তিনি এইসব কাহিনী নিয়ে মর্মান্তিক কটাক্ষ করতেন দস্তয়েফ্স্কিকে। তাঁকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে রাগিয়ে দিয়ে মজা লুটতেন।

অথচ তুর্গেন্য়েফ্ যে মিথ্যে বলতেন না দস্তয়েফ্স্কির নিজের হাতে মিখাইলকে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ তিনি লিখেছিলেন—"আমি এমনই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে

পড়েছি যে, এখন আর আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারছি না।...আমার স্নায়ুগুলি সব এলোমেলো বিশৃংখল হয়ে গেছে।"

দস্তয়েফ্‌স্কিকে এ সময়ে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তারা বলেছেন, তাঁর এ-সময়কার যৌনজীবন অত্যন্ত কদর্য ছিল। ভগ্ন-স্বাস্থ্য আত্ম-সচেতন এবং বিষাদপীড়িত মানুষটি স্নায়ুবিকারবশত কখনো কখনো স্বাভাবিক যৌন ভোগেও অক্ষম হয়ে পড়তেন, তখন কামবৃত্তির মধ্যে বিকৃতিও যুক্ত হয়েছে। যার ইঙ্গিত আমরা পাই তুর্গেন্‌য়েফ্‌-এর সেই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে—'দস্তয়েফ্‌স্কি দ্য সাদ্‌ অব রাশিয়া।'

এ সময় থেকেই দস্তয়েফ্‌স্কিকে জুয়ার নেশায় প্রবলভাবে পেয়ে বসে। ঋণ ও দারিদ্র্যের চাপ এবং সহজে সচ্ছল হওয়ার লোভ তাকে জুয়াড়ী করে তুলেছিল।

বারো

১৮৪৭-৪৮-এর মধ্যেকার সময়ে দুটি ঘটনা দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনে কঠিন সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথম মার খেলেন শ্রীমতী পানায়েভার কাছে, তাকে ভালবেসে ব্যর্থ হয়ে। তিনি যে পানায়েভাকে ভালবাসেন এ-কথাটা পর্যন্ত তাঁকে বলতে দস্তয়েফ্‌স্কির সাহসে কুলোয় নি—তার কেবলই মনে হয়েছে, এ বড় বেখাপ্পা অসম্ভব প্রস্তাব। তাই তাঁকে বুকে পাষাণ বেঁধে দেখতে হয়েছে পানায়েভার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুদের প্রেম। —প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু যাঁরা সবসময় তাঁকে হাস্যাস্পদ করতে কোমর বেঁধে আছে। তুর্গেন্‌য়েফ্‌ তাঁর পেছনে ফিঙের মতন লেগেই থাকতেন। ফলত তুর্গেন্‌য়েফ্‌-এর ওপরে দস্তয়েফ্‌স্কির মন এমনই বিষিয়ে উঠেছিল যে, তাদের মধ্যেকার মনোমালিন্য সারা জীবনেও আর ঘোচে নি।

দ্বিতীয় মার দিল তাঁকে তাঁর নিয়তি। তাঁর ভাগ্যের চাকা তখন দুর্দিনের দিকে মোড় ঘুরল। তাঁর 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি'-র সাফল্যের উত্তেজনায় ভাটা পড়ে এল তখন। তখন বেরিয়েছে তাঁর 'দ্‌ভোইনিক' (প্রতিরূপ) উপন্যাস। দস্তয়েফ্‌স্কির বড় প্রত্যাশা ছিল বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি'-র চেয়েও বেশী প্রশংসা পাবে এ-বই। ভাষা গদ্য-কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, বক্তব্যেও ছিল এক অনাস্বাদিত রসের ভিয়েন। জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবের মর্মান্তিক সংঘাতের ওপরে উপস্থাপনা করে অস্তিত্ব সম্পর্কে এক গভীর কথা বলতে চেয়েছিলেন

তিনি এ-বইতে। কিন্তু, না সাহিত্যরসিক, না সমালোচক কেউ-ই বইখানা পড়ে প্রসন্ন হলেন না। 'দ্ভোইনিক' তাঁদের কাছে এমন নিম্ন-মানের বই বলে মনে হয়েছিল যে তাঁরা দস্তয়েফ্স্কির প্রতিভাকে এক আকস্মিকতার স্ফুলিঙ্গের অধিক মর্যাদা দিতে চাইলেন না। অবশ্য বেলিন্স্কি তখনও মুখ খোলেন নি, অন্তত কাগজে-কলমে কিছু লেখেন নি তখনও। বেলিন্স্কির এ-নীরবতায় দস্তয়েফ্স্কি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন কেন না 'বেদ্নিয়ে লিয়ুদি-র মতন বছরাধিক কাল বসে পরম যত্নে বইখানাকে লেখার বাসনা ছিল তাঁর ; কেবল বেলিন্স্কির তাগিদেই অতি দ্রুত শেষ করতে হল বইখানা। এ-সময়ে লেখা অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত বইগুলির ভাগ্যেও জুটল অনুরূপ নিন্দা। তাঁর 'খোজিয়াইকা' (বাড়িওলি) বইখানাকে বেলিন্স্কি এমন তুড়ে গালাগালি করলেন যেন বইখানাকে তাঁর চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না।

মিখাইল জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ব্যাপার, হঠাৎ তোমার বন্ধুরা তোমার ওপরে এমন খাপ্পা হয়ে উঠলেন কেন ?'

'স্বার্থপর বজ্জাৎ' দস্তয়েফ্স্কি ক্ষেপে উঠলেন, 'ওরা চায় আমি ওদের 'সমকাল' কাগজেই শুধু লিখি। কেন আমি ক্রায়েফ্স্কির কাগজেও লিখছি এই তাদের রাগ।'

'তবে তাই লেখ না কেন ? ওদের হাতেই যখন সাহিত্যের বাজার তখন ওখানে লেখাই তোমার উচিত।'

'অসম্ভব, আমি পারব না। ক্রাইয়েফ্স্কির কাগজে না লিখে আমার উপায় নেই। ওর কাছ থেকে আমি এক কাড়ি টাকা ধার করে বসে আছি। আমি যে ওর কাছে আমাকে বন্ধক রেখেছি। আমি এখন ওর দাস। আমাকে ওর কাগজে লিখতেই হবে।'

দস্তয়েফ্স্কি লিখে চলেছেন। সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে তাঁর সংকল্প ছিল অল্প লিখবেন, অনেকদিন বসে যত্ন করে লিখবেন। সেই অল্প লেখাই অমর হয়ে থাকবে এই ছিল তাঁর শিল্প-প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বিড়ম্বিত ভাগ্য কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে সাহিত্যের ক্রীতদাস করে ফেলল। এখন তাঁকে উর্ধ্বশ্বাসে লিখতে হচ্ছে। কলমে যা আসে তাই লিখতে হচ্ছে। ফলত নৈরাশ্য জমছে মনের মধ্যে, নৈরাশ্য থেকে ক্রোধ। নিজের ওপরে রেগে অন্যের ওপরে ক্ষেপে উঠছেন বারবার। তাঁর বিরুদ্ধে সকলেই ষড়যন্ত্র করছে এ-সন্দেহে সব সময় তিনি অসহিষ্ণু অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। সেই অসন্তুষ্ট মনের অসহিষ্ণু রচনা স্বভাবতই তাঁর প্রতিশ্রুতির অনুকূল হচ্ছিল না। কেবল 'বেলিয়ে নোচি' (শুক্লারাত)

আর 'নেতোচকা নেজ্ভানোভা' তাঁর হৃতগৌরব কিছুটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল কিন্তু সে খ্যাতি ভোগ করার জন্যে তিনি আর তখন পিতার্সবুর্গে নেই—সেণ্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গে বসে তখন তিনি আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের দিন গুনছেন।

কিন্তু সে ১৮৪৮-এর পরের কথা। তার আগে থেকেই দুর্দিনের ঝড়ে ভীষণ নাজেহাল হচ্ছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ক্রমাগত বেসামাল হয়ে পড়ছিলেন। আঘাতে আঘাতে এমনই অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে উঠছিলেন যে, কখনো রুদ্ররোষে ফুঁসে উঠে চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমি আমার প্রতিভার প্রতাপে রুশ-সাহিত্যকে চিরকাল শাসন করব।' কখনো বিষাদ-পীড়িত হয়ে মলিন কণ্ঠে বলছিলেন, 'আমি এক জঘন্য পাপী, আমার অশেষ দোষ, আমার অহংকারের অবধি নেই, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষারও না।'

এই যখন মানসিক অবস্থা দস্তয়েফ্‌স্কির, তখন ঘটল সেই চরম ঘটনা। প্রিন্স ওদোয়েফ্‌স্কির বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল। প্রিন্সেসের 'নাম দিন'-এর ভোজসভায় সে-দিন নিমন্ত্রিত ছিলেন নেক্রাসফ্‌, তুর্গেন্‌য়েফ্‌, বেলিন্‌স্কি দস্তয়েফ্‌স্কি প্রভৃতি যত সাহিত্যরথী ও কবি লেখকের দল, তা ছাড়া পিতার্সবুর্গের যত সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলা। মনের মধ্যে রাজ্যের অসন্তোষ আর অসহিষ্ণুতার জ্বালা নিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি যখন ওদোয়েফ্‌স্কির প্রাসাদে এলেন তখন পুষ্পে আলোকমালায় অপরূপ প্রাসাদের বিস্তার্ণ হল জমজমাট। সৌন্দর্যের আর ঐশ্বর্যের হাট বসিয়েছেন রূপসীরা আর তাঁদের ঘিরে সান্ধ্যপোশাকে কালো ভোমরার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন সম্ভ্রান্ত পুরুষরা—নাচের আসর শুরু হয়ে গিয়েছে।

দূরে এক ধারে দাঁড়িয়ে নেক্রাসফ্‌ আর তুর্গেন্‌য়েফ্‌ গল্প করছিলেন। দরজার ফ্রেমে দস্তয়েফ্‌স্কির ওপরে চোখ পড়তেই সেদিকে কটাক্ষ করে নেক্রাসফ্‌ বলে উঠলেন, 'ওই আসছে আমাদের 'অমর' সাহিত্যিক।'

গোলগাল সুন্দর চেহারার মানুষ তুর্গেন্‌য়েফ্‌। ধারাল নাকের ওপরে মূল্যবান চশমা তাঁর ব্যক্তিত্বকে সব সময় প্রখর করে রাখে কিন্তু তাঁর চোখ জোড়া অন্য রকম—ঈষৎ সবুজ বাদামী বর্ণের চোখের তারা কী এক বিষাদে কিছুটা ম্লান থাকে সব সময়। কেবল কৌতুকে কলহে যখন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে স্বর, তখন ওই চোখের বর্ণ বদলায়, আলো জ্বলে। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখে এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ, 'কায়দা মতন পেলে ওকে নিয়ে রগড় করা যাবে-খন।' বলে দুজনে অন্যত্র সরে গেলেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি একলা একগাদা অপরিচিত মানুষের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু

খাচ্ছিলেন। অবশ্য ওদাইয়েফ্‌স্কি রয়েছেন পাশে। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দরজায় পা দিতে দেখেই তিনি এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরেছিলেন। এখন উপস্থিত সকলের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু প্রিন্স কী বলছিলেন কিছুই কানে যাচ্ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির। কিছুক্ষণ তাঁর চোখ তুটো যেন মেঝেয় এঁটে রইল। নড়াতে সরাতে পারছিলেন না। হাত তুটোকে কি করবেন তাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন না নূতন সান্ধ্যপোশাকে তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছিল কোটের পেছনটা যেন বড় বেশী লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, অত্যন্ত বেঢপ বিশ্রী দেখাচ্ছে কোটটা। তাঁর উঁচু ফলস কলারটাও যেন বড় বেশী উঁচু হয়ে আছে, যেন এখন আরও উঁচুতে উঠে আসছে; এক্ষুনি তু দিক থেকে হাঁ হয়ে হাট খুলে যাবে, যেমন পববার সময় কয়েক বার খুলে গেছল। এতগুলি লোকের কাছে হাস্যকর ক্লাউন হওয়ার জন্যে কেন যে তিনি এলেন, ভাবছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি—'কেন অপমানিত হতে এলাম?'

এদিকে ওদোয়েফ্‌স্কি পরিচয় করিয়ে দিতেই একে একে সকলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যন্ত্রের মতন দস্তয়েফ্‌স্কি 'হ্যাণ্ডসেক' করে যাচ্ছেন; কী বলছেন তাঁরা, কী জবাব দিচ্ছেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। চোখ চাইতেই কুয়াসা দেখছেন। ব্লটিং পেপারে আঁকা ধ্যাবড়া ছবির মিছিল দেখছেন কেবল। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা এনজিনের মতন শব্দ করছে। হঠাৎ একটা ঝাপসা স্বপ্ন ভেসে উঠল চোখের সামনে—তিনি যেন বেরেসিনার যুদ্ধ জয় করে ফিরেছেন, তাঁর অধীন সমস্ত সেনাবাহিনী তাদের বিজয়ী সেনাপতিকে দেখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁকে রাজকীয় অভিবাদন জানাচ্ছে। হঠাৎ আবার স্বপ্নের দৃশ্য পালটে গেল, যেন তিনি সম্রাট, তাঁকে উপলক্ষ করে চতুর্দিকে আলোর মালা জ্বলে উঠেছে, নাচগান হচ্ছে, বাজনা বাজছে। তাঁকে ঘিরে শ্রদ্ধায় বিনয়ে ভয়ে সকলে অবনত হয়ে আছে। পরক্ষণেই সে স্বপ্নও তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ল, বিদ্যুৎ আলোর মতন মিলিয়ে গেল। ধাতস্থ হতেই মনে পড়ল তিনি ওদোয়েফ্‌স্কির প্রাসাদে উৎসবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢোক গিললেন দস্তয়েফ্‌স্কি, চোখ পিটপিট করলেন কয়েকবার, মনকে প্রবোধ দিলেন, কিছু না, কিছু হয় নি, যাই বলে থাকি, করে থাকি, তা যতই খারাপ হোক, অসভ্যের মতন হোক আমি গ্রাহ্য করি নে। এঁরা আমাকে যাই ভাবুক, কিছু এসে যায় না। এঁদের সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না অতএব লজ্জা কিসের?

কিন্তু ওদোয়েফ্‌স্কি তাঁকে রক্ষা করে চলেছেন, যখনই দেখছেন দস্তয়েফ্‌স্কি

কিছু বলতে পারছেন না, কি অসংলগ্ন বলছেন, ওদোয়েফ্‌স্কি কথা জুগিয়ে দিচ্ছেন অথবা নিজেই বলছেন দস্তয়েফ্‌স্কির হয়ে।

এমন বিপদে দস্তয়েফ্‌স্কির বুকে জল এল নেক্রাসফ্‌কে দেখে। নেক্রাসফ্‌ যেন উদ্ধার করলেন তাঁকে, যেন তাঁকে উদ্ধার করতেই এসেছিলেন। উচ্ছল কথাবার্তায় হাস্যে কৌতুকে হালকা করে দিলেন পরিবেশ। দস্তয়েফ্‌স্কি এতক্ষণে স্বস্তি পেলেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল তাঁর, চারদিকে তাকাতে পারছেন তিনি তখন। স্বচ্ছ চোখে দেখতে পাচ্ছেন সব। নেক্রাসফ্‌ এগিয়ে গিয়ে তরুণ লেখক আলেকসাণ্ডার হেরজেনের সঙ্গে গল্পে মজেছেন তখন। দূরে তুর্গেনিয়েফ্‌ ইভান পানায়েফ্‌-এর সঙ্গে কি নিয়ে তুমুল হাসাহাসি করছেন। শ্রীমতী পানায়েভা কাছে পিঠে নেই কেন ভাবলেন দস্তয়েফ্‌স্কি ; ঠিক তখনই প্রিন্সেসের সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলেন পানায়েভা। ফরাসী ফ্যাশানের লো-কাট পোশাকে পানায়েভাকে মারাত্মক দেখাচ্ছিল। কাঁধ ও বুকের অনেকখানি উন্মুক্ত, কম্বুকণ্ঠ কোমরের নিচে পৃথুল জঘন-দৃশ্য চোখ আটকে রাখতে চায় তবু চোখ ফেরালেন দস্তয়েফ্‌স্কি, জোর করেই চোখ রাখলেন অন্য দৃশ্যে। অভিমানে বুক ভরে উঠল তাঁর। চতুরা রমণী তাঁকে একসঙ্গে নিকটে টানে আবার দূরে ঠেলে দেয়। নাকি এ আমার ভীরুতা, সাহস করে দাবি জানালে সে জোর করে ফেরাতে পারত না। ভাবেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তক্ষুনি এক জেদে ভরে ওঠে মন : 'বন্ধুদের সঙ্গে নারী নিয়ে প্রতিযোগিতা করব না। আমার প্রতিযোগিতা সাহিত্য নিয়ে, আমি সবাইকে ছাড়িয়ে সবাইকে হারিয়ে এগিয়ে চলে যাব। আমি সকলের নাগালের বাইরে, সকলের উঁচুতে থাকব।' কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁর শরীরে যথেষ্ট বল সঞ্চার করতে পারছে না। পানায়েভার সান্নিধ্য তাঁর অবশ স্নায়ুতে অসহ্য দাহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি পালাতে চান। কিন্তু পালাতে পারলেন না। আফদোতিয়া পানাইয়েভা নিঃশব্দে একটা মর্মান্তিক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর। বললেন, 'আজ তুমি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছ ফিওদর। আজ তোমার ওপরেই চোখ সকলের।'

পানায়েভার শরীরের গন্ধে, তাঁর আনগ্ন কাঁধ ও বুকের মসৃণ ত্বকের ঔজ্জ্বল্যে চেতনায় যেন তন্দ্রা নেমে আসতে চাইছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। তাঁর মনের মধ্যে যেন স্থান কালের পরিমিতি সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। সেই সংকটে তাঁকে উদ্ধার করলেন মিয়েন্‌দ্রফ্‌।

'মাদাম পানায়েভা, আসুন এক রাউণ্ড নাচ হয়ে যাক, বলরুমে ওয়ালজ শুরু হয়ে গেছে।'

দস্তয়েফ্‌স্কিকে একটা মারাত্মক কটাক্ষ হেনে পানায়েভা চলে গেলেন মিয়েন্‌দ্রফ্‌-এর সঙ্গে। দস্তয়েফ্‌স্কি একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আবার একলা হয়ে পড়লেন তিনি। দেখলেন দূরে নেক্রাসফ্‌ ইভান পানায়েফ্‌ ও কয়েকজন তরুণ কবি জড় হয়ে খুব হাত পা ছুঁড়ে শরীর দুলিয়ে কথা বলে চলেছেন। ওদিকেই পা বাড়িয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, কিন্তু দু পা এগিয়েই থামতে হল তাঁকে। এক কোণে কয়েকজন অপরিচিত তরুণ জড় হয়েছে। তাঁর সম্পর্কেই কথা বলছে তারা। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

একজন শুধোলো, 'দস্তয়েফ্‌স্কি সম্পর্কে শেষ ছড়াটা কিরে ?'

'তুই এখনো শুনিস নি ?

রুশ-সাহিত্যের নাকের ডগায়
দস্তয়েফ্‌স্কি ফিওদর
একটা পাকা ব্রণ যেন
করছে কেবল চড়চড়।'

ছড়া কাটা শেষ হতে না হতে সকলের মধ্যে উচ্চকণ্ঠের হাস্যরোল পড়ে গেল একটা।

'এই শুনেছিস ?' হাস্যরোল থামিয়ে দিয়ে একজন বলে উঠল, 'দস্তয়েফ্‌স্কি পাবলিশারের কাছে বায়না ধরেছেন, তাঁর 'দ্‌ভোইনিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সোনালি পাড় বসানো কভারে মুড়ে বের করতে হবে।'

আর একজন বলল, 'ওই বইটা সম্পর্কে বেলিন্‌স্কি কী বলেছে জানিস, ট্র্যা—শ, একদম ভূষি মাল। আমি ভুল ঘোড়ায় বাজি রেখেছিলাম, পেতলকে সোনা মনে করেছিলাম আমি।'

বটে! দস্তয়েফ্‌স্কি তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। আর তাঁকে বেলিন্‌স্কি বলেছে কিনা বইটা এখনো পড়ে উঠতে পারে নি সে। কী বজ্জাৎ মানুষটা। এই মানুষটাই কিনা একদিন এক নিশ্বাসে তাঁর 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি' পড়ে ফেলেছিল। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল বইটা পড়ে। সে উচ্ছ্বাসের কথাগুলি এখনও কানে বাজছে তাঁর···'তুমি সরাসরি এসে একেবারে হৃদপিণ্ডে হাত রেখেছ। তুমি একেবারে মৌল সমস্যাটি এনে হাজির করেছ চোখের সামনে। আমরা প্রচারক সমালোচকরা ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ জড়ো করেও সহজে যার ব্যাখ্যা

দিতে পারি নি, তুমি কত অনায়াসে তাই করেছ। মাত্র কয়েকটা আঁচড়ে একটি সার্থক চরিত্র এঁকে তার মধ্যে দিয়ে জীবনের সার সংকলন করে তুলে ধরেছ তুমি। তোমার তুলনা নেই।'

সেই অতুলনীয় প্রশংসার পরে একী জঘন্য নিন্দাবাদ! আর তাও কিনা আড়ালে বসে, পেছনে থেকে! এই অসাক্ষাতের নিন্দাই ত তাঁর নামে ছড়া তৈরির সাহস জুগিয়েছে ছোকরা কবিদের মনে। কোথায় বেলিন্‌স্কি? তাঁকে দেখে নেবেন তিনি, তাঁর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করে তবে অন্য কাজ।

রাগে গজরাতে গজরাতে দস্তয়েফ্‌স্কি বেলিন্‌স্কিকে খুঁজতে থাকলেন। নাচ-ঘর ভোজ-ঘর পেরিয়ে শেষে তাস-ঘরে মিলল তাঁকে। চারজনকে ঘিরে চব্বিশ পঁচিশ জন অতিথি তাস খেলা দেখছেন। তাঁদের ঠেলেঠুলে দস্তয়েফ্‌স্কি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটা লোক অসভ্যের মতন গুঁতোগুঁতি করে এগোচ্ছে দেখে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের মধ্যে অসন্তোষ আপত্তির সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ভদ্রতার অভাবের জন্যে, বিরক্ত করার জন্যে অনেকে ভ্রূ কুঁচকোলেন, সরবে নিন্দাও করলেন অনেকে কিন্তু দৃকপাত করলেন না দস্তয়েফ্‌স্কি, গ্রাহ্য করলেন না। রাগের চোটে তখন লজ্জা ভদ্রতা চুলোয় গেছে তাঁর, গোঁয়ারতুমি বেড়ে গেছে।

কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে এত যে সোরগোল কানের কাছে তবু বেলিন্‌স্কি তাস নিয়েই তন্ময়, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করলে ছাড়বেন কেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তিনি বেলিন্‌স্কির সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কত বড় মূর্খ হলে তবে মানুষ তাস খেলতে পারে, আশ্চর্য! কী মাথা এক এক জনের!'

এত বড় একটা গাল খেয়ে খেলোয়াড়রা হাতের তাস মুঠোয় করে মুখ তুলে তাকালেন। বেলিন্‌স্কিরও হুঁশ্‌ হয়েছে ততক্ষণে। তিনি টেবিলে একটা তাস ফেলতে গিয়ে না ফেলে ফিরে তাকিয়ে দেখেন দস্তয়েফ্‌স্কি। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখে খুশী হয়ে উঠতে গিয়ে মুখ ভার করে ফেললেন বেলিন্‌স্কি, মনে পড়ল, একটু আগে দস্তয়েফ্‌স্কিই তাঁদের গাল পেড়েছে, তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। দাঁতের পাটি শক্ত হল ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল তাঁর। আর তাই দেখে আরও রেগে গেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তাঁর সন্দেহ রইল না, এই কাপুরুষই তাকে তলে তলে নিন্দে করে বেড়াচ্ছে এবং সেই অসাক্ষাতের নিন্দার জন্যে সে এতটুকু লজ্জা বোধ করছে না।

'তা জঘন্য হোক,' দস্তয়েফ্স্কি ক্ষ্যাপা গলায় বলে উঠলেন, 'তবু এই ভোঁতা খেলা ভণ্ডামির চেয়ে ভাল।'

তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে সোরগোল আরও বেড়ে গেছে।

'বেরিয়ে যান মশাই, বেরিয়ে যান ত।' একজনের গলা।

'আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন?' দস্তয়েফ্স্কির গলা।

'কে মশাই আপনি?' একজনের গলা।

'যেই হোন বেরিয়ে যান। এখানে গোলমাল করার জন্যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি।' আর একজনের ভারী গলা।

'মাতাল নাকি লোকটা?' আর একজনের মন্তব্য।

'বের করে দিন না মশাই।' আর একজনের পরামর্শ।

দস্তয়েফ্স্কির মনে হল তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তাঁর মাথা টলছে। রাগে অন্ধকার দেখছেন তিনি। বেলিন্স্কিকে একটা ভীষণ শব্দে গাল দেওয়ার জন্যে মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছেন—যে-কোন একটা শব্দ তা যত নোংরা যত পচা হোক। এখন তিনি বেলিন্স্কিকে যা-তা করে গাল দিতে চান। একটা বস্তির গাল মনে পড়লে তাও তিনি ছুঁড়ে মারবেন তাঁর দিকে।

এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। যে শব্দটা একটু আগে তাঁকেই বলছিল ছোকরা কবিরা তিনি তাই উচ্চারণ করলেন, 'ব্র-অ-ণ-অ…ব্র-ণ… হয়ত দস্তয়েফ্স্কি বলতে চেয়েছিলেন, 'বেলিন্স্কি, সাহিত্যের নাকের ডগায় তুমি একটি ব্রণ'। কিংবা ওই রকমই আর কিছু; কিন্তু ব্রণ শব্দটার বেশী আর কিছু তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে না……তিনি তোতলাচ্ছেন।

'কী বলছে লোকটা?' একজনের গলা।

'শোনার কী দরকার, ঠেলে বের করে দাও না।' আর একজনের গলা।

ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে বেলিন্স্কি উঠবেন, উঠে দস্তয়েফ্স্কিকে সামলাবেন, শান্ত করবেন তখন দুয়োরে দেখেন তুর্গেনিয়েফ্-এর সুন্দর মুখখানা উঁকি মেরেছে। এবং তক্ষুনি তুর্গেনিয়েফ্ ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর পেছনে পানায়েভা তাঁর পাশে তরুণ সমালোচক আন্নেন্কফ্। তুর্গেনিয়েফ্-এর দৃষ্টি দস্তয়েফ্স্কির দিকে। তিনি এসেই তাঁর এক বগলে হাত ঢুকিয়ে দিলেন আর এক বগলে হাত ঢুকোলেন পানায়েভা। এখানকার নাটকীয় ঘটনার কোন গন্ধই তাঁদের নাকে গেল না; তাঁরা দস্তয়েফ্স্কি বাধা দেবার আগেই তাঁকে বগলদাবা করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ছাড় না ভাই, ছাড়,' দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর হাত তুর্গেন্যেফ্‌-এর বগল থেকে টেনে বের করতে চাইলেন।

আরও শক্ত করে ধরে তুর্গেন্যেফ্‌ বললেন,' 'ছাড়ব সেই যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে, তুমি আমাদের কম ভুগিয়েছ! তোমাকে চারধারে খুঁজে খুঁজে আমরা হাল্লাক হয়ে গেছি, আর তুমি কিনা এখানে লুকিয়ে বসে দিব্বি তাস খেলা দেখছ?'

দস্তয়েফ্‌স্কিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে বিদ্ধ করে পানায়েভা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় প্রতিভা আর সৌন্দর্যের মিলন ঘটবে এখানে।'

'কি বলছ কী তোমরা আমি কিছু বুঝছি নে।' চাপা ক্রোধের জ্বালায় এখন দস্তয়েফ্‌স্কি শরীরে অস্থিরতা বোধ করছিলেন, 'আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও, কী হচ্ছে কী?' ভ্রূ কুঁচকোলেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

'তোমার ভাগ্য খুলে গেছে ফিওদর,' তুর্গেন্যেফ্‌ বললেন, 'ল্য সোনিয়াভানা এখানে এসেছেন। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমরা তাঁকে কথা দিয়েছি, তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে হাজির করব।'

কেমন চমকে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, সারা শরীরে কেঁপে উঠলেন, তাঁদের দুজনের ডানার ওপরে ঝুলে পড়লেন তিনি, শিশুর মতন মাথা দোলাতে দোলাতে আপত্তি করতে থাকলেন, 'না ন্‌-না, এখন নয়, এখন থাক।'

ল্য সেনিয়াভানা পিতার্সবুর্গের শৌখিন রমণীকুলের তিলোত্তমা। এই পরমাসুন্দরীর রূপে স্বয়ং জার পর্যন্ত মুগ্ধ। তাঁর লোভ বার বার হাত বাড়িয়ে ভীরুর মতন ফিরে ফিরে গেছে। রূপসীর কুহকের কাছে সম্রাটের প্রতাপ অবলুণ্ঠিত হয়েছে বারবার।

'না ন্‌-না, এখন না,' দস্তয়েফ্‌স্কি তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন।

এখন তাঁর মন অস্থির, এখন তাঁর মেজাজ ভাল নয়। এখন ওই ঐতিহাসিক রূপের সামনে দাঁড়ানোর অবস্থা না তাঁর। তিনি তুর্গেন্যেফ্‌ আর পানায়েভার বাঁধন ছাড়িয়ে পালাতে চাইলেন।

'পালাবে কি হে, ওই ত তিনি এসে পড়েছেন।' বললেন তুর্গেন্যেফ্‌।

সত্যি, তাঁর সামনে ভুবনমোহিনী হাসি ঠোঁটে করে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ রূপসী। ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে তিনি সকৌতুকে দেখেছেন দস্তয়েফ্‌স্কিকে।

তাঁকে নিয়ে ছড়ার বিদ্রূপ, ভীরু বেলিন্‌স্কির নিন্দা, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ, ক্রোধের বশে বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার অবশেষে এই পিতার্সবুর্গ-সুন্দরী

সন্দর্শন·········সব সমস্ত ব্যাপারটা এমন দ্রুত ঘটল যে দস্তয়েফ্স্কির দুর্বল বিপর্যস্ত স্নায়ুর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। যে মুহূর্তে তিনি সুঠাম এক বঙ্কিম গ্রীবার ওপর অনিন্দ্য একখানি মুখ ও দুটি আয়ত চোখ দেখলেন, চোখাচোখি হল যে মুহূর্তে, যে মুহূর্তে দস্তয়েফ্স্কিকে দেখে বিস্ময়ে ল্য সেনিয়াভানার ভ্রূ-তির্যক হয়ে কপালে উঠল, দস্তয়েফ্স্কির মনে হল উৎসব-বাড়ির সব আলো নিভে গিয়ে চারধারে গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে।

মাথা ঘুরে গেছে দস্তয়েফ্স্কির। সে ঘুরন্ত মাথায় যেন পায়ের তলার মেঝেটা এসে প্রবল ধাক্কা দিলে তাঁকে। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। কুয়াসাচ্ছন্ন চোখের পর্দায় ভেসে উঠল একটা রঙিন সিলিং বিচিত্র বর্ণে আঁকা তিনটি নিরাবরণ নারী কয়েকটা মাছ একটা চাকা। কী দেখছেন, কেন দেখছেন, এ দৃশ্যের অর্থ কী কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর বিভ্রান্ত চোখের ওপরে সেই দৃশ্যের মধ্যে ফুটে উঠল তখন ওদোয়েফ্স্কির মুখ। তাঁর হাতে জলের গ্লাস। শুধোলেন, 'এখন কেমন বোধ করছ ফিওদর, আর একটু জল খাবে, আর একটু জল দেব ?'

'কি হয়েছিল আমার ?'

'তুমি ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিলে।'

দস্তয়েফ্স্কি আস্তে আস্তে সোফার ওপরে সোজা হয়ে বসলেন। চারদিকে কৌতূহলী নারী পুরুষের ভিড়। সকলের মুখেই বাঁকা হাসি। তুর্গেন্যেফ্ আর নেক্রাসফ্ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাঁদের পেছনে পানায়েভা। পানায়েভার শুধু চোখ দুটি দেখতে পেলেন দস্তয়েফ্স্কি। তাঁর চোখ দুটো যেন কৌতুকে কৌতূহলে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দস্তয়েফ্স্কির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পানায়েভা মাথা সরিয়ে নিলেন। দস্তয়েফ্স্কির মনে হল যেন পানায়েভা মাথা সরিয়ে নিতে নিতে খুক্খুক্ করে হেসে উঠেছে।

লজ্জায় আত্মধিক্কারে দস্তয়েফ্স্কির মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি দুর্বল পায়ে ভর করে কোন মতে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমাকে···আমি ক্ষমা চাইছি।' ওদোয়েফ্স্কিকে নমস্কার জানিয়ে আর মুহূর্ত দেরি করলেন না দস্তয়েফ্স্কি, তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন।

পরবর্তী জীবনে দস্তয়েফ্স্কি যে মৃগী রোগের যন্ত্রণায় ক্রমাগত ভুগেছেন, অনেকের মতে এই তার প্রথম, এই তার সূচনা। কেউ কেউ আপত্তি করে বলেন, এর সঙ্গে সে মৃগী রোগের কোন সম্পর্ক নেই।

সেদিনের ঘটনার পর থেকে দস্তয়েফ্‌স্কি সাহিত্যের আসর, আড্ডা, ভোজসভার নিমন্ত্রণ—এক কথায় পিতার্সবুর্গের সম্ভ্রান্ত সমাজের সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দূরে সরে এলেন তিনি। তখন তিনি নেমে এলেন অন্ধকার আর এক পৃথিবীতে। এখানে চোর-জোচ্চোর-বদমাস-মাতালের ভিড়, এখানে নারী মানে নরম মাংস, জীবন মানে বঞ্চনা আর আত্মহনন। এখানে তাঁর বন্ধু জুটেছিল একজন, নাম কুলিকফ্‌, বয়স বছর পঁচিশ, দাগী আসামী, কয়েকবার জেল-খাটা এই মানুষটি নিচের তলার পৃথিবীর অনেক অপকীর্তির নাটের গুরু।

কিন্তু তাই বলে দস্তয়েফ্‌স্কি যে নিরাশার অন্ধকারে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিলেন তা নয়। সেই দুঃসময়েও তিনি তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।—'একদিন আমি সবাইকে ছাড়িয়ে সবাইকে হারিয়ে সকলের উঁচুতে উঠব, এ প্রতিশ্রুতি সব সময় তাঁর বুকে অনির্বাণ জ্বলত। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রেরণায় তাঁর কলম তখনও অব্যাহত গতিতে চলত। অবশ্য মিখাইলকে লেখা চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেন, "কিছুকাল যাবৎ আমি মর্মান্তিক নৈরাশ্যে ভুগছি। নৈরাশ্যবশত আমি ভীষণ পাপে ডুবে যাচ্ছি…।" তাঁর পাপাচরণের স্বীকৃতি বার বার আত্মধিক্কার আর অনুশোচনায় করুণ হয়ে উঠেছে চিঠিগুলিতে। তিনি যেন প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যেই নিজের দুর্বলতা অবিমৃষ্যকারিতা অকপটে তুলে ধরেছেন চিঠিতে ও তাঁর রচনাগুলিতে।

ওদোয়েফ্‌স্কির ভোজবাড়িতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসে দস্তয়েফ্‌স্কির অবস্থা কী করুণ হয়ে উঠেছিল বেলিন্‌স্কির সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যেও তা সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে উঠেছে। মন্তব্যটি শ্রীমতী পানায়েভা উদ্ধৃত করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে, '…দস্তয়েফ্‌স্কির মনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কারণ তাঁর দুর্বল স্নায়ুর ওপরে প্রচণ্ড আঘাত। হতভাগা ছেলেটাকে জীবন বড় নির্মম ভাবে পীড়ন করছে। আমাদের এখনকার জীবনের যা হাল তাতে একটা মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে ষাঁড়ের স্নায়ু দরকার। এ অবস্থার যদি ভালোর দিকে কোন পরিবর্তন না ঘটে ত আমাদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ে ভুগতে হবে।'

বোঝা যাচ্ছে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা ইতিমধ্যেই তাঁকে পাগল বলে ঠাউরে নিয়েছেন কিংবা পাগল ও প্রতিভার মধ্যে পার্থক্য তখনও ধরতে পারেন নি তাঁরা। বেলিন্‌স্কির কথাতেই সেটা বোঝা যাচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, 'ছেলেটার জন্যে দুঃখ হয়। বুদ্ধিটুদ্ধি ছিল। ঘষলে মাজলে হত। কিন্তু না, সে আগে

ভাগেই নিজেকে একটা প্রতিভা বলে মনে করে বসে আছে। ওর যা দরকার সে হল চিকিৎসা। ওর মস্তিষ্কের রোগ সারানো দরকার আগে।'

অবশ্য দস্তয়েফ্‌স্কি তখন অসুস্থই ছিলেন তবে রোগ মানসিক নয়, শারীরিক। প্রবল মাথা ধরত তখন তাঁর। বুকের মধ্যেটা ক্ষণে ক্ষণে দুর্‌দুর্‌ করে উঠত। নাড়ি চলত অত্যন্ত আস্তে তাও আবার অসম গতিতে। আর এ-সবেরই কারণ ছিল স্নায়বিক। তাঁহার স্নায়ু গোড়া থেকেই দুর্বল ছিল, তাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল অলৌকিক কিছু একটা ঘটার উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। তিনি সব সময় ভাবতেন এমন একটা আকস্মিক কিছু ঘটবে যার ফলে তিনি আবার তাঁর হৃতগৌরব ফিরে পাবেন। হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একটা প্রবল ভয়ও জড়িয়ে থাকত, পাছে তিনি অকৃতকার্য হন, তাঁর সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়, নিন্দা বেড়ে যায় আরো।

এই অনাগত রহস্যময় ভয়ের যন্ত্রণার বর্ণনা আছে তাঁর 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে। বিশ বছর পরে ওই বইতে তিনি তাঁর রহস্যময় ভয়ের স্মৃতি-পরিক্রমা কালে তাঁর এ-সময়কার দুঃখের জীবনটাকে সম্পূর্ণ তুলে ধরেছেন।

১৮৪৮-এর সেই নিদারুণ দিনগুলি তাঁর কী ভাবে কেটেছে সে স্বীকৃতি এবার তার নিজের ভাষার শুনুন; '……আমার নিঃসঙ্গ জীবন কুৎসিত, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। আমি প্রায় পশুর পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলাম। আমি নির্জনে থাকতাম। সকলকে এড়িয়ে চলতাম। কারো সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত আমার ইচ্ছে করত না। আমি আমার নোংরা ঘরের মলিন আলোর মধ্যে সব সময় বন্দী হয়ে থাকতাম।…বাড়িতে বসে আমি অধিকাংশ সময়টাই কাটাতাম বই পড়ে…পড়ার মধ্যে ডুবে থাকলে আমি অনেকটা স্বস্থ বোধ করতাম। অবশ্য পড়তে পড়তে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। আমার ভীষণ আনন্দ হত কিন্তু সে অস্থিরতা ও আনন্দ শেষ অব্দি হয়ে উঠত ভীষণ যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আমি পিতার্সবুর্গের অন্ধকার নিচের তলায় নেমে আসতাম, কুৎসিত ভ্রষ্টাচারে মজে যেতাম। আমার দুর্বল রোগ-দগ্ধ স্নায়ু নিয়ে আমি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতাম। এবং তার পরে যখন অবসন্ন হয়ে পড়তাম আমার আত্মা অনুতাপে মুচড়ে মুচড়ে উঠত, সর্বাঙ্গ মথিত হয়ে আমার চোখে কান্নার বর্ষা নেমে আসত।…লজ্জায় আত্মধিক্কারে ভরে উঠত আমার সত্তা। তবু অনন্যোপায় আমি বারবার সেই পাঁকের মধ্যে নেমে গেছি…কেউ যদি দেখে ফেলে, কারো সঙ্গে যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, আমি অত্যন্ত সন্তর্পণে গা-ঢাকা দিয়ে চলেছি, এত যে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে

উঠেছিলাম তবু লজ্জা কখনো আমার সঙ্গ ছাড়ে নি।…আমি যে-সব জায়গায় যেতাম সেগুলি অতিশয় নিম্নস্তরের ছিল, কেন না আমার যথেষ্ট পয়সা ছিল না অথচ ছিল একরাশ ক্লান্তি। সে অনপনেয় ক্লান্তি দূর করতে দুর্বল অক্ষম স্নায়ু নিয়ে আমি নানা কুৎসিত বিকৃত অভ্যাসের দাসত্ব করেছি। আমি যে বেঁচে আছি সেইটে বোধের ভিতরে তীব্র করে তুলতে নিজেই নানা বিকৃতি আবিষ্কার করেছি আমি।…আমার এই কামুকতা এক সময়ে থিতিয়ে আসত, বিরতি ঘটত, বিরক্তি ধরত এর ওপরে। তখন এ জীবনের প্রতি ঘৃণায় আমার গা বমি বমি করত।……যা হোক এই পাপের সঙ্গে সমঝোতায় আসার আমার একটা নিজস্ব কৌশল ছিল—অর্থাৎ আমি পালিয়ে আসতাম যা কিছু সুন্দর পবিত্র ও মহৎ তার মধ্যে—অবশ্য স্বপ্নে, আমি ছিলাম ঘোরতর স্বপ্নবিলাসী। আমার ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখে আমি তিন মাস অব্দি নিজেকে এই স্বপ্নের মধ্যে মগ্ন রাখতে পেরেছি…।

এই পাপ ও পবিত্রতার মধ্যে দোদুল্যমান দস্তয়েফ্‌স্কির তখন কিছু নূতন বন্ধু জুটে ছিল। তার অন্ধকার জীবনে তারাই ছিল খানিকটা আলোর উদ্ভাস। আর ছিল দু-চারজন সম্পাদক। এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তখনও দস্তয়েফ্‌স্কির অতন্দ্র আলোর তপস্যা বড় বেশী বিঘ্নিত হয় নি। কিছু কিছু ছোট গল্প ছাড়াও তিনি তখন ধারাবাহিক লিখছেন 'নেতোচকা নেজভানোভা। আর 'খোজিয়াইকা' (বাড়িওলি) উপন্যাসে হাত দিয়েছেন।

ওই নূতন বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রাঁসোয়া মারী শার্ল ফুর্যে র-এর অনুগামী য়ুটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট, নাম মিখাইল বুতাশেভিচ্ পেত্রাশেফ্‌স্কি। কখনো কখনো মানুষের জীবনে একটা ক্ষণ আসে যখন এমন একজন মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়, যার প্রভাবে জীবনের গতিটাই পালটে যায় হঠাৎ। নূতন আর এক দিগন্তের দিকে বইতে শুরু করে জীবন-নদী। দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনেরও সেই গতির ধারা নূতন আর এক খাতে বইয়ে দিলেন এই পেত্রাশেফ্‌স্কি।

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর জীবনের নূতন আর এক অধ্যায়ে পা রাখলেন।

তের

রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল মূলত ভূমিদাস প্রথার ওপরে। জাতির জনশক্তিকে নিংড়ে নিঃশেষে শোষণ করে ঐশ্বর্যে ও সম্পদে স্ফীতকায় হচ্ছিল য়্যারিস্টক্র্যাসি। তারই প্রতিভূ জারতন্ত্র তার লৌহদণ্ডের শাসনে মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সংযত নির্বীর্য করে রেখেছিল। রুদ্ধকণ্ঠ সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলিত স্বাধীনতার সে অক্ষম স্বপ্ন মুক্তি-পিপাসুর বুকের মধ্যে তাই নিরন্তর ব্যর্থ ক্রোধে মাথা কুটছিল কেবল। কখনো-সখনো সে ক্রোধ গর্জে ফুঁসে উঠলে জারের নির্মম পেষণে দলিত পিষ্ট হয়ে সাইবেরিয়ার তুষার-দুর্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পচে হেজে মরে যেত। তবু তাদের রক্তের সে স্বপ্নের অমর বীজ নূতন মানুষের বুকে আবার করে অঙ্কুরিত হতে ভয় পেত না। কিন্তু সে অঙ্কুর জারের স্বৈরাচারের প্রখর উত্তাপে ঝলছে গিয়ে দুর্বল অসহায় ও পঙ্গু হয়ে থেকে বুকের পাঁজরার অন্ধকারে কেবল ধুক্‌পুক্‌ করেছে। ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য সে মুমুর্ষু অঙ্কুরের মূলে জল সিঞ্চন করল এবাব। এবার অঙ্কুর থেকে মহীরুহের সম্ভাবনা সূচিত হল। ফ্রান্সের মুক্তি-যুদ্ধে-বিদীর্ণ কামানের ধ্বনিতে জার-সম্রাট প্রথম নিকোলাই-এ সুখনিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। তিনি সতর্ক সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর শাসনের বাঁধন আরও শক্ত করলেন তিনি। তাঁর গুপ্তচরের দল রাশিয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল: আমলাতন্ত্র ভূমিদাসতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতার জগদ্দল পাষাণের ভারে মৃতপ্রায় রাশিয়ার কোথাও প্রাণ-চাঞ্চল্য টের পেলে তক্ষুনি এসে তারা সম্রাটের কর্ণগোচর করবে। তৎসত্ত্বেও সেই নির্যাতিত স্বাধীনতার স্বপ্নাঙ্কুর গোপনে নিভৃতে রুশ-সমাজের মনোভূমিতে শাখায় পল্লবে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করতে থাকল। তার নবাঙ্কুরিত পত্র-পল্লবে তখন মৃদু মর্মর ধ্বনি উঠেছে।

রুশ-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন তিনটে দল। শ্লাভোফিলস আর পশ্চিমীচিন্তায় দীক্ষিতদের মধ্যে তখন তর্ক চলছে: জাতীয় সংস্কৃতির লক্ষ্য কী, কোন্‌ ছাঁচে ঢালা হবে রুশ-জাতির ভাগ্য? ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে যাঁরা মুগ্ধ তাঁরা চান জাতিকে পশ্চিমী সভ্যতার ধাঁচে আধুনিক করে তুলতে। শ্লাভোফিলরা বলেন, 'না, চিন্তায় আচরণে সংস্কৃতিতে এমন কি জীবন-যাপন-পদ্ধতিতেও পশ্চিমী-দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার কোন মিল নেই। দুই চরিত্রে নিদারুণ পার্থক্য। বরং বলা যায় রুশীরাই পশ্চিমীদের উদ্ধার করার জন্যে নূতন জীবনে জেগে উঠবে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার হদিস দেবে নব-জাগ্রত রুশ-জাতি।' আর একদল দার্শনিক

ওই তর্কের মধ্যে না এসে চাইলেন একটা উদারপন্থী চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে—মানুষকে তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই তাঁদের লক্ষ্য।

দস্তয়েফ্‌স্কির 'মানুষের লক্ষ্য' 'প্রেম সৌভ্রাত্র্য ও স্বাধীনতার' স্বপ্ন তাঁকে টেনে এনে ফেললে এই তিন দলের মাঝখানে। মাধ্যম হলেন পেত্রাশেফ্‌স্কি। পেত্রাশেফ্‌স্কির বাড়িতে প্রতি শুক্রবারের জমায়েতে যোগ দিচ্ছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেখানে এলোপাথাড়ি তর্ক হচ্ছে, চা খাওয়া হচ্ছে, শেষে রাত হচ্ছে—বাড়ি ফিরে আসছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। অনেক বন্ধু জুটেছে এখানে তাঁর। তার মধ্যে টাকাওলা আছে অনেকে। ধার করার একটা নূতন এলাকা পেয়ে বর্তে গেছেন তিনি। তিনি এই নূতন আড্ডার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। ভাবপ্রবণ মানুষ, তাতে য়্যাডভেঞ্চার বিলাসী তাই সশস্ত্র বিপ্লব, গোপন ছাপাখানা, প্রচারপত্র ছাপিয়ে কৃষক-মজদুর-বেকারের মধ্যে বিলি করা ইত্যাদি পরিকল্পনায় দস্তয়েফ্‌স্কির উৎসাহের অবধি নেই। সেই উৎসাহের আতিশয্যে দ্যুরফ, স্পেশনিএফ্, পেত্রাশেফ্‌স্কির মতন তিনিও শুক্র-বাসরের এক অগ্রবর্তী নায়ক হয়ে উঠলেন।

বেলিন্‌স্কির সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির মনোমালিন্য ও পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেলেও দস্তয়েফ্‌স্কি চিরকাল বেলিন্‌স্কির রচনার সশ্রদ্ধ পাঠক ছিলেন। বেলিন্‌স্কির চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর বোধ ও ভাবনার সম্পর্ক অনেকখানি ঘনিষ্ঠ ছিল বলে তাঁদের জমায়েতে তিনি বারবার বেলিন্‌স্কির প্রসঙ্গ টেনে এনে কথা বলতেন।

একদিন খুব জোর আলোচনা প্রসঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'বেলিন্‌স্কি আমাকে বলেছিলেন, দেখ ফিওদর, আমাদের দেশের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক কাঠামোটাই এমন যে এখানে মানুষ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে অপরাধ করে। সাধারণ মানুষকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত রেখে য়্যারিস্টক্র্যাটরা তাদের অপরাধ করতে বাধ্য করে। সে যদি সৎ থাকতে চায় ভদ্রজীবন যাপন করতে চায়—আন্তরিকভাবেই চায় তবু সে তা পারে না, সমাজই সে সুযোগ দেয় না তাকে।'

'সমাজের এ পাপচক্র আমরা ভাঙব।' কে একজন বলে উঠতেই সকলে নানাভাবে আলোচনা শুরু করল। ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল আলোচনা। ফ্রান্স, ন্যাপলস্, তুসকানি, অসট্রিয়া প্রভৃতি দেশের গণজাগরণকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রবল উত্তেজনার মধ্যে শুক্র-বাসর ভঙ্গ হল।

দস্তয়েফ্‌স্কিকে কিছু দূর এগিয়ে দিলেন দ্যুরফ, কথায় কথায় বললেন, 'পেত্রাশেফ্‌স্কির বুকের পাটা আছে, যাই বল। সরকারী চাকরে হয়েও সে কিছু পরোয়া করে না। কিন্তু নির্ঘাৎ দেখো একদিন বিপদ বাধিয়ে বসবে।'

'কেন?'

'বারে তুমি জান না, জারের চর নেই কোথায়? আর আমাদের ত কাজের নামে ঢু ঢু কেবল গলাবাজিই সার, আমরা যে কখনো বিপ্লব আনতে পারব না একি জার-সরকার বুঝবে, বল?'

কথাটা দস্তয়েফ্স্কি ভাবতে ভাবতে বাড়ি এলেন। কিন্তু পরবর্তী শুক্র-বাসরে দ্যুরফ-এর কথাটা পেত্রাশেফ্স্কিকে বলতে আর মনে থাকল না তাঁর। সেদিন দলের একমাত্র মহিলা সদস্য সোফিয়াকে নিয়ে খুনসুটি করছিল সকলে।

নারী-মুক্তির প্রসঙ্গ তুলেছিল সোফিয়া। সোফিয়া বহুবল্লভা। 'নারী কারো সম্পত্তি নয়। তার স্বাধীন ইচ্ছার ওপরে ব্যক্তির কোন একতিয়ার থাকবে না,' এই ঘোষণার যোগ্যতা সোফিয়ার ছিল।

কাতেন্‌য়েফ্ রসিকতা করে বললেন, 'বন্ধনহীন প্রেমই তা হলে সুনীতি? বহুভোগ্যা হওয়াটাই তবে বৈপ্লবিক?'

সোফিয়া রসিকতা গ্রাহ্য না করে বললে, 'বন্ধনহীন প্রেম হয় না কখনো, কারণ প্রেমই বন্ধন। একমাত্র বন্ধন যা নারী ও পুরুষকে সোনার সুতোর বেড়ি দিয়ে রাখে। আবার যে-হেতু প্রেম বন্দী হলেই কাতর হয়ে ওঠে, সে মুক্তি খোঁজে। অর্থাৎ বাঁধন ছেঁড়া আর বাঁধন পরাই প্রেমের ধর্ম। প্রেমের এই ধর্ম পালন করার জন্যেই তার স্বাধীনতা চাই। তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে।'

'কিন্তু সে স্বাধীনতা ভোগ করতে চাও ত আগে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াই কর, সোফিয়া। আমরা আগে আমলাতন্ত্র, ভূমিদাসতন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীলতার জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করি তখন অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা পাব আমরা, তখন তোমার প্রেমও দাসত্ব মুক্ত হবে সোফিয়া। নয়ত মুক্ত প্রেমের নামে তোমাকে কেবল পয়সার কাছে নিজেকে বার বার বন্ধক রাখতে হবে।' বললেন পেত্রাশেফ্স্কি।

'তুমি ঠিক বলেছ পেত্রাশেফ্স্কি', কাতেন্‌য়েফ্ মাথা ঝাঁকাল, সোফিয়ার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে বলল, 'ও যেই শুনেছে সম্ব্‌য়েলির কোন্ আত্মীয় মরে তাকে কিছু নগদ টাকার মালিক করে গেছে অমনি সে আমাকে ছেড়ে তার গলায় ঝুলে পড়েছে।'

'তোমার মতন হিংসুটে আমি আর দুটি দেখি নি,' সোফিয়া কাতান্‌য়েফ-এর থুতনিতে একটা ঠোনা মেরে দিলে।

তর্ক বিতর্ক অবশ্য কেবল ফ্রী-লাভ-এই দাঁড়িয়ে থাকে নি। বিষয় থেকে

বিষয়ান্তরে গড়িয়ে চলেছিল। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির মন ছিল না সে দিকে, তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়েছিলেন। আজ স্পেশনিএফ্‌ তাঁকে পাঁচ শ' রুবল ধার দেবে কথা। টাকাটা সবাইর আগোচরে আগে পকেটস্থ করা দরকার। সিঁড়ির মুখে স্পেশ্‌নিএফ্‌কে দেখতে পেয়েই উঠে গিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। দুজনে তখনই একসঙ্গে ফিরে এসে আবার বসেছেন।

পেত্রাশেফ্‌স্কি শুধোলেন, 'তুমি কী বল ফিওদর?' পেত্রাশেফ্‌স্কি লক্ষ্য করেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি কয়েক মিনিটের জন্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

দস্তয়েফ্‌স্কি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'দুঃখিত, আমি শুনতে পাই নি।'

'থাক, আকচারুমফ্‌-এর কথা না শুনলেও চলবে, ওর ইচ্ছে জার থাকবে, তবে তাঁকে শক্ত দড়িতে বেঁধে রাখতে হবে। যাঁকে আমরা উচ্ছেদ করতে চাই তাঁকে আমরা বেঁধে রাখব কোন দুঃখে। যাক্‌ ওসব কথা, এখন শোন, আমাদের প্রথম আন্দোলন হবে ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে। ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ চাই আমরা সর্বাগ্রে।' বললেন দ্যুরফ।

'ভাল। কিন্তু আমার মনে হয় তার আগে সেনসরশিপ-এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করা উচিত। আমরা সবাই জানি বেলিন্‌স্কির ক্ষয় রোগ হয়েছিল। তিনি গত জুন মাসে মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কারণে মনোমালিন্য ছিল তবু কিন্তু আমি তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার একজন শরিক। জার সরকার তাঁর অনেক রচনা বাজেয়াপ্ত করেছেন। বিশেষ করে গোগোলকে লেখা তাঁর খোলা-চিঠি যাতে জনসাধারণের হাতে না পৌছয় তার জন্যে আমলারা সে রচনার শেষ কপি অব্দি নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা সে চিঠিটাই ছাপব, ছেপে গোপনে বিলি করে শুরু করব আমাদের আন্দোলন।' প্রস্তাব রাখলেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

'কিন্তু সে চিঠি আমরা কোথায় পাব?' শুধালেন স্পেশ্‌নিএফ্‌।

'আমার কাছে আছে।' দস্তয়েফ্‌স্কি পকেটে হাত দিলেন।

'পড়ে শোনাও তবে। শুনি আমরা সে চিঠিতে কী আছে।' দ্যুরফ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'পড়ব। বিপ্লব ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের উর্ধ্বে, এ চিঠি পড়ে আমি তা প্রমাণ করব।'

চিঠিতে মৃত্যুপথযাত্রী বেলিন্‌স্কি জার-সরকারের মুখোশ খুলে দিয়ে তার বীভৎস চেহারা তুলে ধরেছেন গোগোলের কাছে। গোগোল তখন ইতালিতে।

কীভাবে জার-সরকার পুলিশ পুরোহিত ভূমিদাস-মালিক ও গুপ্তচরের মাধ্যমে মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা পিষ্ট ধূল্যবলুণ্ঠিত করে দিচ্ছে তার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গোগোলের। 'রাশিয়া একটা দেশ যেখানে 'ব্যক্তির মৌলিক-অধিকার রক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা নিশ্চয়তা নেই। এখানে আছে কেবল বিরাট এক পাপচক্র। আমলারা সব চোর ডাকাত খুনে। যীশু বলেছেন, চাষীরা জমির মালিকদের ভাই। ভাই কি করে ভাইয়ের ভূমিদাস হয়? সুতরাং জমির মালিকের কি উচিত নয় চাষীকে তার শ্রমের ফল ভোগ করবার অধিকার দেওয়া, তাকে দাসত্বের জোয়াল থেকে মুক্তি দেওয়া? এ ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেওয়ার জন্যে চার্চ কিছু করেছে কী? না, রক্ষণশীল চার্চ বরং স্বেচ্ছাচারিতারই পৃষ্ঠপোষকতা করছে, বল ও ভরসা হয়ে উঠেছে মালিকশ্রেণীর।···চার্চ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ঔদরিক গৃধ্নু চাটুকার লজ্জাহীনদের স্পর্ধা আজ সীমাহীন হয়ে উঠেছে···গোগোল আপনি কি জানেন না, চার্চের প্রতি রাশিয়ার মানুষের আজ কী নিদারুণ ঘৃণা!···এ ঘৃণা ক্রমশ সংঘবদ্ধ হচ্ছে, কথা বলতে চাইছে, পারছে না। অত্যাচারের দাপটে তারা সংকুচিত হয়ে আছে। আত্মপ্রকাশের পথ পাচ্ছে না···'

'পাবে, একদিন নিশ্চয় পথ খুঁজে পাবে, প্রবল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে সেদিন।' স্পেশ্‌নিএফ্ চিৎকার করে উঠলেন। চিঠিখানা স্পষ্টতই তাঁকে উত্তেজিত করেছে।

'থাম, শেষ করতে দাও,' দস্তয়েফ্স্কি বললেন বলে আবার পড়তে লাগলেন।

এ অংশের সঙ্গে দস্তয়েফ্স্কির মতের মিল নেই। বেলিন্স্কির সঙ্গে এখানেই তাঁর বিরোধ তবু আর সকলে এ-অংশ লুফে নেবে জেনে তিনি পড়তে লাগলেন।

'রাশিয়ার মানুষ জানে, কেবল সেই মানুষই জেরুসালেম যায় যার মনের মধ্যে যীশু নেই, যে যীশুকে হারিয়ে বসে আছে। অন্যের দুঃখে যে দুঃখ পায়, অন্যের প্রতি অত্যাচার হলে যে যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে ওঠে, তার বুকেই যীশুর বাস। সে মানুষকে যীশুর আশীর্বাদের আশায় তীর্থের পথে পরিব্রাজক হতে হয় না।'

'অপূর্ব অপূর্ব,' একসঙ্গে সকলে বলে উঠল, 'আমরা এটা ছাপব, এটা বিলি করেই আমাদের বৈপ্লবিক কার্যসূচি শুরু হবে, উদ্বোধন হবে আমাদের গোপন ছাপাখানার।'

'তার আগে,' স্পেশ্‌নিএফ্ বললেন, 'প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই কর সকলে—দলের

প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। নেতার আদেশ পালন করব। বিপ্লবের জন্যে খুন করতে খুন হতে পেছ পা হব না।'

স্বাক্ষর করতে কে আর পেছ পা হয়ে গুপ্তচর বলে চিহ্নিত হতে যাবে। সকলেই পরম উৎসাহে প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করল। দস্তয়েফ্‌স্কিও করলেন।

ব্যর্থ নিন্দিত ভ্রষ্ট দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যেও একটা দুর্বার উত্তেজনা এসে গেছে। অন্তত এ-পথে তিনি হৃত গৌরব উদ্ধার করতে পারবেন, অন্তত বিপ্লবী হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম।

একটা নূতন ভাবের আবেগে অস্থির উত্তেজনা নিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি পেত্রাশেফ্‌স্কির বাড়ি থেকে অন্ধকার রাজপথে নেমে এলেন। পকেট ভর্তি টাকা। আজ তাঁর মন ভাল।

অন্ধকার গলির মধ্যে এসে তিনি চমকে উঠলেন, কার পায়ের শব্দ তাঁকে অনুসরণ করছে? মুহূর্ত পরেই কুলিকফ্‌ এসে সামনে দাঁড়াল। 'ভাল আছ ফিওদর?' তার মানে মালকড়ি আছে কি না, থাকে ত বল।

মহান বিপ্লবের ভাবনা আর কুলিকফ্‌কে একসঙ্গে বরদাস্ত করতে পারলেন না দস্তয়েফ্‌স্কি। তিনি বিভ্রান্তের মতন বোবা হয়ে থাকলেন কয়েক পলক।

তাঁর বাড়ির পথ সংক্ষিপ্ত করতে যে রাস্তায় তিনি পা দিয়েছেন তার চার পাশে যারা ভিড় করে থাকে দুটি মানুষকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে এবার তারা এগিয়ে এল। একজন দস্তয়েফ্‌স্কির কোটের হাতায় টান দিলে—

'পাঁচ রুবল, তুমি যা চাইবে যেমন করে চাইবে দেব, এস।'

কুলিকফ্‌ সেই রং-করা মেয়েটাকে হাঁকিয়ে দিলে, বললে, 'এস ফিওদর আজ তোমাকে আমি ভিন্ন স্বাদের মানুষ দেব।'

আজ এ-সব কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু সঙ্গ ও পরিবেশ তাঁকে প্রস্তুত করে তুলতে বেশী সময় নিল না। পাপ ও পবিত্রতার মধ্যেকার ব্যবধান দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে টাকার এপিঠ ওপিঠ।

বছর বারো-তেরোর একটি মেয়ের সামনে এনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলে কুলিকফ্‌। 'হঠাৎ বাপ মরে যেতে সংসার অচল হয়ে পড়েছে তাই মা বাধ্য হয়েছে এই কচি মেয়েটাকে এ-পথে পাঠাতে। ওর নাম নাতাশা। পাঁচ রুবল ছাড় সাঙাৎ। ওর উপকার হবে তুমিও খুশী হবে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি সামান্য দ্বিধা করে কুলিকফ্‌কে পাঁচ রুবলের একটা নোট বের

করে দিলেন। দিতেই হত। ও চাইলে ওকে বিমুখ করার সাধ্য কারো নেই। এটা কুলিকফ্‌ এখন দালালি বাবদ নিলে।

'ওর সঙ্গে তোমার 'হট বাথ'-এ দেখা হবে। চল তার আগে তোমার টাকায় কিছু খানাপিনা করি।'

দস্তয়েফ্‌স্কি মদ ছোঁন না। ওটা তাঁর ধাতে সয় না। কড়া মদ ত কিছুতেই না। হালকা মদ কখনো-সখনো দলে পড়ে বাধ্য হয়ে খান। তিনি খান মাংস-টাংস, চা কিংবা কফি আর মিষ্টি। মিষ্টি তাঁর মায়ের মতন দস্তয়েফ্‌স্কিরও খুব প্রিয়।

ট্যাভার্ন-এর টেবিলে বসে দস্তয়েফ্‌স্কি শুধোলেন, 'তুমি কেন আমার পিছু নিয়েছিলে?'

'তোমার টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়ার জন্যে হয়ত তোমাকে খুন করতাম। নাতাশাকে না চাইলেও হয়ত খুন করে বসতাম তোমাকে। তোমাকে বলতে দোষ নেই, হপ্তাখানেক আগেও আমি একটা লোককে খুন করেছি, পুলিশ টের পেয়ে গেছে ওটা আমারই কীর্তি। এখন ডাল-কুত্তার মতন আমার পেছনে লেগেছে।' বলতে বলতে তার চোখ জ্বলে উঠল। বলল, 'খুব উত্তেজনার মধ্যে আছি। এমন উত্তেজনার মধ্যে থাকলেই মনে হয় আমি বেঁচে আছি।'

ওর একটা কথাও দস্তয়েফ্‌স্কির মিথ্যে মনে হল না। ও সব পারে। ও একটা বুনো জানোয়ার। শুধোলেন, 'তুমি তাঁকে টাকার জন্যে খুন করলে?'

'তোমরা সবাই তাই ভাববে: স্বার্থ ছাড়া কেউ কিছু করে না, খুন ত না-ই। অথচ শুধু ইচ্ছে হয়েছিল তাই খুন করেছি এ তুমি বিশ্বাস করবে, বল?' কুলিকফ্‌ এবার হো হো করে হেসে উঠল। উঠে দাঁড়াল। দস্তয়েফ্‌স্কিকে পৌঁছে দিল একটা দরজার সামনে। সেখানে দরজার মাথায় লেখা রয়েছে: 'হাইজিনিক বাথ'। 'ওখানে নাতাশা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, যাও।' বলে কুলিকফ্‌ বিদায় নিল।

কাকে তিনি টাকা দিলেন, কে এসে তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল কিচ্ছু দেখলেন না তিনি। কোথায় ছিলেন কোথায় এলেন এই ভেবেই স্তম্ভিত হয়ে আছেন তিনি তখন।

নাতাশার সঙ্গে তাঁর সেদিনকার ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন তিনি তাঁর এক উপন্যাসে। ছাপা হবার আগেই অবশ্য সে অংশটা কেটে বাদ দিয়েছেলেন তিনি তবু তাঁর সে কুকীর্তির সাক্ষী ছিল, পেয়েছিলেন তাঁর জীবনীকার স্ত্রাখফ্‌।

তলসতয়কে এক পত্রে তিনি দস্তয়েফ্‌স্কির শিশু-ভোগের সে পাশবিক (!) কাহিনী জানিয়েছিলেন, "পশুর মতন ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির কামক্ষুধা। এবং পশুর যা নেই দস্তয়েফ্‌স্কির তাও ছিল, তাঁর সে ক্ষুধা ছিল বিকৃত।" পত্রের শেষে লিখেছিলেন, "...তবু এ সত্য অপ্রকাশিতই থাক, আমি তাঁর জীবনের সৎ দিকটাই শুধু তুলে ধরব।"

জীবনীকার স্ত্রাখফ্‌ সততার কাজ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেই নিজের নানাবিধ দোষের কথা নানাভাবে কবুল করে গেছেন, অথচ অনায়াসে লুকোতে পারতেন।

বিপ্লবের মহান আদর্শের স্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক দস্তয়েফ্‌স্কি পাঁকের মধ্যে পড়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন অনেক রাতে।

তিনি যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন তখন শুনলেন দূরের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন জানেন না হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ শব্দ শুরু হতেই তিনি উঠে বসলেন।

'ঘুম ভাঙল? বেশ, এবার সেজেগুজে চলুন আমাদের সঙ্গে।'

পুলিশের লোক সারা ঘর ওলট পালট করে কী খুঁজল। কিছু কাগজ-পত্র বই পাণ্ডুলিপি বাণ্ডিল করে নিল। বলল, 'কই তৈরি হয়েছেন, আসুন।'

'কিন্তু আমি কোথায় যাব, কেন যাব?'

'আমার ওপরে হুকুম হয়েছে আপনাকে গুপ্তচর বিভাগের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার। কেন কি বৃত্তান্ত সেখানে গিয়ে শুধোবেন।' সারজেণ্ট জবাব দিল।

১৮৪৯-এর ২৩ এপ্রিল শেষ রাতে পেত্রাশেফ্‌স্কির শুক্র-বাসরের আরও বাইশজনকে গ্রেপ্তার করল জারের পুলিশ। অভিযোগ: তারা জার-সম্রাটকে উচ্ছেদ করার সংকল্পে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

একটা ঘরের মধ্যে সকলকে এনে যখন হাজির করা হল তখন বিস্ময়ে হতবাক সকলে কেবল এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। অবশেষে দ্যুরফ বললেন, 'কেমন বলেছিলাম না বিপদ ঘটাবে পেত্রাশেফ্‌স্কি, দেখ, ঘটল কিনা!'

'ওর দোষ কি?'

'ও ত লোক চেনে না। যাকে পায় তাকেই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে শুক্রবারের সভায়। আন্তোনেলিকে ত ও-ই এনেছে।'

'কে, আন্তোনেলি? আন্তোনেলি স্পাই!!!'

সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল সুন্দর চতুর একটি তরুণ ছাত্রের মুখ। কেউ দাঁতে দাঁত পিষল। কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন ছাড়া আর সকলেরই অল্প বয়েস। কেউ দস্তয়েফ্‌স্কির সমবয়সী, কেউ দু-এক বছরের ছোট কি দু-তিন বছরের বড়। সকলেরই সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আস্তে আস্তে তা ম্লান অন্ধকারে নিভে গেল।

বিচারাধীন আসামী হিসেবে আট মাস দস্তয়েফ্‌স্কি বন্দী ছিলেন সেন্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কিকেই জারের পুলিশ অন্যতম ভয়ংকর মানুষ বলে সন্দেহ করেছিল। এ সন্দেহের কারণ সম্পর্কে স্পেশ্‌নিএফ্‌ বলেছেন: 'দলের অলোচনায় দস্তয়েফ্‌স্কি সব সময়ে যোগ দিতেন না। তিনি কেবল তাঁর পাশের সঙ্গীদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতেন। তাছাড়া তিনি আমাদের সমবয়সী হলেও চেহারায় ব্যবহারে তাঁকে খুব বয়স্ক মনে হত।'

আর একজন মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর ব্যক্তিত্বই জার-পুলিশকে তাঁর দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দৃঢ় সংবদ্ধ মুখ দেখলে মনে হত যেন তিনি একটা অসাধ্য সাধনের সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন। তারপরে যখন তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হয়েছে, ডাকা হয়েছে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে, দুর্বল স্নায়ুর এই মানুষটি তখন আশ্চর্য সংযম ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ, জাতি ও সহকর্মীদের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা সরকারকে পর্যন্ত বিস্মিত সচকিত করেছে।'

সেন্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গ থেকে তিনি আন্দ্রেইকে লিখেছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। আমি অসুখী বটে কিন্তু মুসড়ে পড়ি নি কারণ আমি জানি খুব খারাপেরও একটা ভাল দিক আছে।"

আসলে ধৃত হওয়ার সময় থেকে নির্বাসনের সমস্ত কালটাই ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি অবশিষ্ট জীবন তাঁর ওই সুবর্ণ-সময়ের অহংকার করে গেছেন। সেই চরম দুঃখই যে তাঁকে তাঁর পরম লক্ষ্য 'মনুষ্যত্বে' পৌঁছে দিয়েছিল, তিনি 'রাশিয়ার ঋষি হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সে তাঁর জীবনের নির্বাসনোত্তর অধ্যায়ের কথা, গ্রেপ্তার হয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক যে লাভ হল তারও মূল্য কম নয়। তিনি মুক্তি পেলেন সাহিত্যের দাসত্ব থেকে, ভিক্ষাপাত্র হাতে সম্পাদকদের দোরে দোরে ঘোরার হাত থেকে। পাওনাদারের তাগাদা, পাওনা আদায় না দিলে জেল-খাটানোর হুমকি আর

তাঁকে শুনতে হবে না। শুনতে হবে না তাঁর রচনার নিন্দা। সবচেয়ে যে উপকার হল সেটা তাঁর চরিত্রের: কাম-ক্ষুধা জাগলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকত না, তিনি পশু হয়ে উঠতেন। মিখাইলকে লিখেছিলেন, "আমি সেই পশুর প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছি, একি কম ভাগ্যের কথা।"

কিন্তু সব থেকে মহৎ প্রাপ্তি তাঁর এ-সময়কার উপলব্ধি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি জীবনকে যে-ভাবে অনুভব করতে পেরেছেন সে-ভাবে উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাঁর আর কখনো হত না। জীবনের রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন, নিয়তি এক পরম দুঃখের দিনের আলোতে সে-রহস্যের দ্বার অকস্মাৎ খুলে দিল তাঁর সামনে।

মিখাইলকে লেখা তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠি; "আমি এতটুকু হতাশ হই নি, ভেঙে পড়ি নি। জীবন জীবনই, তা যেখানেই হোক। আসলে জীবন হল আমাদের ভিতরে, আমাদের বাইরেটা জীবন নয়। আমার চার পাশে মানুষ আছে, থাকবে; কিন্তু মানুষের মধ্যে 'মানুষ' হওয়া, এবং আজীবন ও চিরকাল 'মানুষ' হয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষ্য—সে হতাশ হবে না, আত্মসমর্পণ করবে না কোন অবস্থাতেই, সে হোক যত না নিদারুণ যন্ত্রণার পরিস্থিতি, দুঃখের পরিস্থিতি। জীবনের উদ্দেশ্যই তাই। বেঁচে থাকা যে তাতে করেই অর্থপূর্ণ হয় আমি এখন তা উপলব্ধি করছি। এ-উপলব্ধি আজ আমার রক্ত-মাংসের সামিল হয়ে গেছে। সত্য বটে, আমার যে-মস্তিষ্ক সৃষ্টি করছে শিল্পের মহান জগৎ, বাস করছে সেই লোকোত্তর শিল্প পরিবেশে, সে-মস্তিষ্কশাতনের কাজটি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। (কারাভোগের প্রথম তিন-চার মাস দস্তয়েফ্‌স্কিকে বই বা কাগজ দেওয়া হয় নি। শুধু চিঠি লেখার সুযোগ ছাড়া তাঁর সব সুযোগই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।) যা অবশিষ্ট রয়েছে সে আমার কল্পনা শুধু। শুধু আমার স্মৃতি-শক্তি। আমার মনের মধ্যে অনবরত হানা দিচ্ছে কত কথা কত কাহিনী কত উপলব্ধি। এখনও যা আমার অবশিষ্ট আছে—আমার রক্ত-মাংস আমার হৃদয় সে অনুভব করে যাচ্ছে এখন কেবল যন্ত্রণা, দয়া, ক্ষমা—এও ত এক জীবন!···আমি এ-মুহূর্তে অনুভব করছি আমার সেই মানবিক উদারতা যার বলে মানুষ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে। আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমার মধ্যে এখন আর ঘৃণা নেই হিংসা নেই—নেই পরশ্রীকাতরতা।··· আমি উপলব্ধি করতে পারছি: জীবন এক পরম আশীর্বাদ, এক অলৌকিক উপহার, এক অপার সুখ। জীবনের একটি মুহূর্তের অস্তিত্বও যে অনন্ত সুখের

আকর হতে পারে আজ আমার চেয়ে বেশী সে আর কে বুঝবে।...আমার হৃদয় প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছে কত অপরূপ প্রতিমা কত বিচিত্র চরিত্র, তারা সব আমার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে, হ্যাঁ, যদি আমাকে আর লিখতে দেওয়া না হয়, আমি মরব। আমাকে যদি লেখার সুযোগ দেওয়া হয় ত পনর বিশ বছরের কারাদণ্ডও আমি হাসিমুখে মেনে নেব।"

শেষমেশ লিখলেন, "...এ বন্দিজীবন আমার আশীর্বাদ হয়ে এসেছে কেন না সে ইতিমধ্যেই আমার কামুক আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে দিতে পেরেছে। আমার মনের যা কিছু পাপ অপবিত্রতা সব ধুয়ে মুছে গেছে। এখন আর আমি কিছুতেই ভয় পাই নে।..."

এ-রকমের একটা প্রচার শুনা যায়, দস্তয়েফ্স্কিকে মৃত্যুমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হল তখন ভয়ে তাঁর সব চুল মুহূর্তে সাদা হয়ে গিয়েছিল। সে যে কত বড় মিথ্যের প্রচার দস্তয়েফ্স্কির নিজের উক্তিই তার প্রমাণ: 'আমরা পেত্রাশেফ্স্কিপন্থীরা যখন মৃত্যুমঞ্চে দাঁড়ালাম, আমাদের যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হল, আমাদের মনে এতটুকু অনুশোচনা আসে নি। আমি অবশ্য সকলের মনের কথা জানি নে। কিন্তু এটা জোর করে বলতে পারি, সকলে না হোক আমাদের অধিকাংশই মৃত্যুভয়ে প্রাণভিক্ষা চাইতে অপমান বোধ করেছি।'

দস্তয়েফ্স্কিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হলে তাতেও তিনি এতটুকু হৃদয়দৌর্বল্য প্রকাশ করেন নি বরং তাঁর সুদীর্ঘ বিবৃতির ছত্রে ছত্রে দেশপ্রেম, বিশ্বস্ততা ও অকুতোভয় মনোবলই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে বিবৃতি রুশ-সাহিত্যের এক উল্লেখ্য দলিল।

আট মাসের নির্জন কারাবাসের কালে সেন্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গে বসে এত মনোবল সত্ত্বেও তিনি যে কখনো কখনো হতাশায় ভেঙে পড়েন নি তা নয়। তিনি লিখেছেন—"যদি নির্জন বনের মধ্যে কোন মানুষ ঠগীর হাতে বন্দী হয়, ঠগীরা যদি তাকে ক্ষতবিক্ষত করেও দেয়, তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেও ফেলে তখনও সেই মুমূর্ষু মানুষটি আশা রাখে শেষ পর্যন্ত হয়ত সে মুক্তি পাবে, যদি কোনমতে সে একবার নিজেকে বাঁধন আলগা করতে পারে অনায়াসে সে এ বনের পথে পালিয়ে বাঁচতে পারবে।...কিন্তু মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার প্রতীক্ষায় বন্দী কোন মানুষের পক্ষে তেমন আশা করা মিথ্যে। তার পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাকে হয় মৃত্যুদণ্ড নিতে হবে নয় ত সুদীর্ঘকাল নির্মম

নিপীড়ন সহ্য করে যেতে হবে, সে নিপীড়ন মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক। পৃথিবীতে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি কী আছে · সেই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের অপেক্ষায় বসে থেকে মানুষ পাগল হয়ে যাবে না, এ-কথা কেউ বলতে পারে ?···"

যন্ত্রণা, সেই কঠোর কঠিন যন্ত্রণাও ভুগতে হয়েছে দস্তয়েফ্স্কিকে। সেই যন্ত্রণার আঘাতে আঘাতেই জীবন-রহস্যের কালো পর্দা ছিঁড়ে গেছে উন্মোচিত হয়েছে অস্তিত্বের নিগূঢ় অন্তস্তল।

১৮৪৯-এর ২২ ডিসেম্বর সেই অনিশ্চয়তার নির্মম কষ্টের শেষ হল। সেণ্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গ থেকে বন্দীদের নিয়ে আসা হল সেমেনফ্স্কি ময়দানে। সেখানে সদ্য-নির্মিত মৃত্যুমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল সবাইকে, এক ধারে ন'জন আর এক ধারে এগারো জন।

সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ন'জনের নয়, কেবল তিনজনের, দস্তয়েফ্স্কি, দ্যুরফ্ আর গ্রিগোরয়েফ্-এর।

দস্তয়েফ্স্কি তখনও জানতেন না তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। যেন সে সম্বন্ধে চিন্তিতও নন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দ্যুরফ। দস্তয়েফ্স্কি তাঁকে তাঁর সদ্য লেখা 'মালেন্‌কি গেরোই, (ক্ষুদে নায়ক) গল্পের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন ফিস্‌ফিস্ করে।

ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদে ক্লান্ত বিপন্ন দস্তয়েফ্স্কির তখন মর্মান্তিক অবস্থা— হঠাৎ কর্তৃপক্ষ সদয় হলেন তাঁর ওপরে। তাঁকে লেখবার সুযোগ দেওয়া হল। দেওয়া হল কাগজ কলম, কিছু 'নির্দোষ' বই। কাগজ-কলম পেয়ে দস্তয়েফ্স্কির আনন্দের আর সীমা নেই। তিনি ভুলে গেলেন তাঁর ক্লান্তি অবসাদ বিপাক, শারীরিক অসুস্থতাও তুচ্ছ হয়ে গেল। সেণ্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গের অন্ধকার ঠাণ্ডা 'সেল'-এর নির্জনতা মুহূর্তে তিনি কল্পনার মানুষে ভরে তুললেন : তাদের নিয়ে আকাশ-রৌদ্র-মাঠ-ছায়ার ভুবনে পালিয়ে এলেন তিনি। সেখানে নাচ গান হৈ হুল্লোড়, দিয়তাং ভোজ্যতাং রব সব সময়। শুধু খেয়ে খাইয়ে ফুর্তি করে চোদ্দপুরুষের শোষণের সমস্ত সঞ্চয় ফুঁকে দেওয়ার সংকল্প যেন জমিদারবাবুর। এগার বছরের কিশোর ছুটি কাটাতে জমিদারবাবুর গ্রামের বাড়িতে এসে অবাক। আনন্দের এমন বিপুল আয়োজন সে আর দেখে নি কখনো, দেখে নি এমন সুন্দর পল্লী-পরিবেশও। এই মনোরম পটভূমিতেই এক সুন্দরী যুবতী বধূর প্রতি আকৃষ্ট হয় সেই কিশোর নায়ক। সে জানে না ভালবাসা কি, কেন, কেমন; কিন্তু বোধের ভিতরে একটা বোধ, এক রোমাঞ্চকর সুকুমার অনুভূতি কাজ

করতে থাকে। সে অভিভূত হয়। সে-অভিভূত মনের নরম মাটিতে একটি পেলব প্রেম আস্তে অগোচরে ক্রমশ অংকুরিত হতে থাকে। কোন তাড়া নেই, হাঁপাহাঁপি নেই, যেন স্বতঃই স্বচ্ছন্দে সব ঘটছে। অস্বাভাবিক কিছু না, অবাঞ্ছিত কিছু না, সংসারে এই ধরনের ঘটনাগুলি যেমন ভাবে ঘটলে মানুষ বিশ্বাস করে, স্বীকার করে, স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় ঠিক সেই ভাবে নিপুণ কলমের অতি সন্তর্পণ টানে উন্মোচন করেছেন তিনি কিশোরের গভীর গোপন মন—রামধনুর সপ্তরংয়ের বিস্ময় যেন হাতের চেটোয় রেখে সবাইকে দেখিয়েছেন শিশুমনের নিপুণ কারিগর। কোন সর্বনাশা বিপদ কোন নির্মম বিপর্যয়ই যে সত্যিকার শিল্পীকে পর্যুদস্ত করতে পারে না তার প্রমাণ রাখলেন দস্তয়েফ্স্কি। শিদ্‌লফ্স্কি ঠিকই বলেছিলেন, সেই মহাকবি—ধুলোয় ফেলে টানো, কাদায় ফেলে মাড়াও, তাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দাও তিনি কখনোই নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষে করবেন না, আত্মসমর্পণ করবেন না অন্য বিশ্বাসের কাছে। সমর্পিত-প্রাণ কবি শিদ্‌লফ্স্কির সেই আপ্তবাক্য সত্য প্রতিপন্ন করে অকুতোভয় দস্তয়েফ্স্কি মহতী বিনষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পরম নিশ্চিন্তে দ্যুরফকে গল্প শোনাচ্ছেন। হঠাৎ শব্দ হল, "এটেনশন"।

চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দস্তয়েফ্স্কি। দস্তয়েফ্স্কি কাঁপছিলেন ভয়ে, নাকি শীতে? তাঁদের সকলের শরীর থেকে সব শীতবস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, গায়ে শুধু পাতলা শার্ট। বিশ ডিগ্রী ঠাণ্ডার মধ্যে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কাঁপতে হবে না?

একজন সামরিক অফিসার গম্ভীর গলায় দণ্ডাদেশ পড়ে শোনালেন, এই প্রথম দস্তয়েফ্স্কি জানলেন···

'দস্তয়েফ্স্কি ফিওদর মিখাইলোভিচ···রাজদ্রোহের চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার জন্যে এবং গোপন সভায় সাহিত্যিক বেলিন্স্কির চার্চ ও বর্তমান সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ও বিদ্রোহ-সৃষ্টিমূলক নিষিদ্ধ প্রবন্ধ পড়ে শোনানোর অপরাধে মহামান্য জার কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছেন।'

তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না দস্তয়েফ্স্কির, তখনও তাঁর মনে হচ্ছিল তুচ্ছ অপরাধে এমন গুরুতর দণ্ড তাঁর কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু সন্দেহ দূর হল যখন পাদ্রী উঠে এলেন মঞ্চে, আহ্বান জানালেন, 'তোমরা ঈশ্বরের কাছে অপরাধ স্বীকার করে পাপমুক্ত হও।' একজন কেবল স্বীকার-উক্তি করতে এগিয়ে গেলেন আর সকলে পবিত্র ক্রুশচিহ্নে চুমু খেলেন কেবল।

পাদ্রী মঞ্চ থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক সারি সৈনিকের বন্দুক তাঁদের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হল। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছে তখন প্রত্যেকের। অস্থির মনে সময় গুণছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। প্রতিটি পলককে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। 'ফায়ার' কথাটি আর উচ্চারিত হচ্ছে না। তার বদলে মনে হল ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ যেন অতি দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে। কোথা থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে, কেন আসছে? ময়দান জুড়ে মানুষ। অথচ নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। একটা রহস্যময় গাঢ় তিমিরের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে দস্তয়েফ্‌স্কির মনে হল তিনি আর জীবিত নেই। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। সেই মৃত্যুর পরপার থেকে যেন ভেসে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ, টকাটক্‌...টকাটক্‌ · টগবগ্‌...

হঠাৎ মুখের কালো কাপড় সরে গেল। তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয় যেন হল জীবনের। যেন নূতন জীবন পেলেন তাঁরা সকলে।

এক পরিমার্জিত নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক কৌতুকের ওপরে যবনিকা টেনে দিয়েছে সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ। জারের নয়া ফরমান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এসে ঘোষণা করেছে নূতন শাস্তির বার্তা—মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসন।

মানুষের জীবন নিয়ে এ-কী নিষ্ঠুর পরিহাস, ভাবলেন দস্তয়েফ্‌স্কি! ততক্ষণে তাঁদের পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে গুরুভার লৌহশৃঙ্খল। তাঁদের মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।

মৃত্যুমঞ্চ থেকে সাইবেরিয়ার তুষার শীতল মৃত্যুপুরীতে অভিযাত্রা এখন।

শেষবারের মতন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর প্রিয় জন্মভূমির আকাশ অরণ্য সূর্যকিরণ ও স্বদেশের মানুষের দিকে তাকালেন। এত ভাল লাগে নি যেন কোন দিন এই আকাশ অরণ্য আলো, এত প্রিয় মনে হয় নি যেন কোন দিন এই জনতার মুখ। এই প্রথম যেন সত্যকার ভালবাসতে শিখলেন তিনি, এই প্রথম পবিত্র প্রেমে দীক্ষা হল তাঁর। শিদ্‌লফ্‌স্কি বলেছিলেন, এই প্রেমের মধ্যেই নাকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিহিত। দস্তয়েফ্‌স্কির দু' চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি মাথা নত করলেন। পরিচিত পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে চোখের জলে তাঁকে শেষ নমস্কার জানালেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

"···যাঁদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি, যাঁদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে আমার, কিংবা যাঁরা আমার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করে আছেন তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমার প্রতি অসন্তোষ যেন ভুলে যান তাঁরা। আমার মনে এখন আর কোন দ্বেষ কি ঈর্ষা নেই। আজ আমার সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, আজ ইচ্ছে করে, যাঁদের আমি চিনি, যাঁরাই আমার সম্পর্কে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে বুকের মধ্যে টেনে এনে জড়িয়ে ধরি। যাঁদের আমি ভালবেসেছি তাঁদের মৃত্যু হওয়ার আগে আমি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারছি এই আমার সান্ত্বনা।···আমার হৃদয় আজ রক্ত মোক্ষণ করছে ভেবে, আমি সময়ের মূল্য বুঝি নি, কত সময় বৃথা নষ্ট হতে দিয়েছি, কত সামান্য সময়েরই না সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি আমি। জীবন একটা উপহার, জীবন একটা সুখ, এর প্রতিটি মুহূর্তই এক অখণ্ড তৃপ্তির আকর হয়ে উঠতে পারত। তাই বলে আমি নিরাশ হয়েছি মনে করো না। দেখো আমি আমার মনের সামর্থ্য ও আত্মার শুদ্ধতা বজায় রাখতে পারব।" সাইবেরিয়া যাত্রার প্রাক্কালে ওই চিঠি লিখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর দাদা মিখাইলকে।

জার-সম্রাটের ক্রোধ যেন জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছিল সবাইকে। মরে গেলে যারা বেঁচে যেতেন, বেঁচে থেকে তারা জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন, ভোগ করবেন নির্মম মৃত্যু-যন্ত্রণা। রুশ ভাগ্যবিধাতার লিপিতে অদৃষ্ট নির্দিষ্ট হয়ে গেছে সকলের: দলের নেতা পেত্রাশেফ্‌স্কির শাস্তি হল খনির অন্ধকারে সারা জীবনের নির্বাসন, দক্ষিণের খনি অঞ্চলে তিনি তাঁর আয়ু শেষ করবেন কয়লা কেটে, কয়লা বয়ে। স্পেশনিএফ-এরও সেই সাজাই হল। তবে সারা জীবনের জন্যে নয়, খনি-শ্রমিকের কাজ করবেন তিনি দশ বছর। দস্তয়েফ্‌স্কি আর দ্যুরফ্‌-এর ভাগ্যে জুটল সাইবেরিয়ার মৃত্যুপুরী। চার বছর সেখানে শেকল-বাঁধা কয়েদী হয়ে থাকার পর আরও এক বছর সেনা-বাহিনীতে সাধারণ সৈনিকের জীবন কাটাবেন তাঁরা। অন্যান্যদের ভাগ্যেও জুটল অনুরূপ নানা দণ্ড।

বিচারের অপেক্ষায় সেণ্ট পিতার অ্যাণ্ড পল দুর্গের নির্জনে বসে শেষের চার মাসে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন 'মালেন্‌কি গেরোই' (ক্ষুদে নায়ক) আর একখানি উপন্যাস। একখানা নাটকের খসড়াও নাকি করেছিলেন। সাইবেরিয়ার চালান দেবার আগে সে পাণ্ডুলিপিগুলি কেড়ে নিয়েছেন জার-সরকার। অবশ্য তাতে তাঁর বড় বেশী দুঃখ হয় নি, কেন না ততদিনে তিনি জেনে গিয়েছিলেন, যে কোন অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে, তিনি তাঁর মনটাকে সেই ভাবে তৈরি করে তুলেছিলেন। কেবল একটা ভাবনা তাঁর মনটাকে ভার করে রেখেছিল তখন— তিনি শূন্য-হস্ত, তাঁর পকেটে একটা কোপেকও নেই অথচ সাইবেরিয়ার কয়েদখানায় পৌঁছনো অব্দি দীর্ঘ তুষার-দুর্গম রাস্তায় কিছু রাহাখরচ অবশ্যি দরকার। কেবল সরকারী দাক্ষিণ্যের খুদ-কুঁড়োর ওপরে ভরসা করে থাকলে ধড়ে প্রাণ রাখা দায় হবে। তাই শেষ বারের মতন দেখা করতে আসবার সময় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যে দাদাকে চিঠি লিখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সে চিঠিরই খানিকটা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

মিখাইল যখন দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন, সাইবেরিয়ার পথে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতিপর্ব তখন প্রায় শেষ। তখন তাদের পায়ে দশ পাউণ্ড ওজনের শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিকল পরে হাঁটা যায় কিন্তু বড় কষ্ট। সেই নিদারুণ কষ্ট বহন করে দস্তয়েফ্‌স্কি যখন মিখাইলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, মিখাইল আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর দু' গাল বেয়ে জল নেমে এল।

মিখাইলের সঙ্গে গিয়েছিলেন মিলিয়ুকফ্‌। তিনি তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'মিখাইলের চোখে জল বাঁধ মানছিল না ; কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি আশ্চর্য শান্ত, তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, 'তুমি দুঃখ পেও না দাদা, আমি হতাশ হই নি, আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব, সাইবেরিয়ার মতন জেলখানাতেও আমি লিখব, দেখো আমি লেখা ছাড়ব না'।

তিনি কী তখনও জানতেন জারের ক্রোধ কী ভীষণ নরকে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তবু বললেন, 'ইতিমধ্যেই আমি অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে এসেছি, জানি আমি আরও অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করব। দেখো, লিখবার মতন উপকরণের অভাব হবে না আমার।'

কথাটা তিনি অনুমান করে বললেও তার মধ্যে ভুল ছিল না কোন, সত্যি

তাঁর উপকরণের অভাব হয় নি, বরং বলব, এখানকার উপকরণ অভিজ্ঞতাই তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে, দিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সম্পদ ও দার্শনিক দূরদৃষ্টি। কেন না সেখানে এসেই তিনি প্রথম জানলেন, সমাজের শাসনে যারা পোষ মানতে চায় না সেই সব দুর্ধর্ষ মানুষদেরই এখানে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল সেই সব মানুষগুলিকে এই জ্যান্ত কবরে নিষ্ঠুর শাসনে পীড়নে হেজে পচে মরে যেতে দেখে তিনি এই ধারণায়ই পৌঁছেছিলেন যে, মানুষের কোন দোসর নেই, সে একলা, নিঃসঙ্গ। ভাবের আদান-প্রদান করবার ভাষা, হৃদয়ের ভাষা আমাদের জানা নেই বলে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা মৃত। যে-ভাষা জানলে আমরা এই বিচ্ছেদজনিত অবক্ষয়ের মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে পারি সে-ভাষা কই? সকলের জন্যে সেই একটি অবলম্বন কোথাও আছে কিনা খুঁজেছেন তিনি। এক সময়ে সে অক্ষম চেষ্টায় হতাশ হয়ে (ক্রোৎকায়া) 'একটি শান্ত মানুষ'-এর কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে উঠেছেন:

'এ-পৃথিবীর মানুষ নিঃসঙ্গ, এই তার অভিশাপ। 'কোথাও কী একজন জীবন্ত মানুষ দেখেছ!' রুশ-নায়ক চিৎকার করে উঠেছিল। আমিও সেই প্রশ্ন তুলে চেঁচাচ্ছি। আমার চিৎকারে কেউ কান দিচ্ছে না। লোকে বলে, সূর্য পৃথিবীকে প্রাণ দিচ্ছে। সূর্য উঠেছে, সূর্যের দিকে তাকাও। সূর্য কী আসলে মৃত নয়? সব—সমস্তই মৃত। যেদিকে তাকাও মৃতের অস্তিত্ব শুধু। কেবল মানুষ আর তাকে ঘিরে নৈঃশব্দ। 'মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে' কে বলেছে এ-কথা। এ কার নির্দেশ!'

...আসলে দস্তয়েফ্স্কি খুব সূক্ষ্ম তারে সুর বেঁধেছিলেন। ফলে সমকাল তাঁকে বুঝতে পারে নি। কিংবা সত্তার নির্জনে নির্বাসিত মানুষটির একলা মনের ভাষা অপরিচিত ঠেকেছিল সমকালের কানে। তাই 'পাপ ও শাস্তি'-র লেখক মানুষের যে সার্বিক সমস্যার কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাঁর কালের কাছে তা দুরূহ ও দুর্বোধ মনে হয়েছিল। তাঁকে মনুষ্যত্বের প্রবক্তা বলেই তখন তারা সহজে চিহ্নিত করতে পেরেছিল, 'অভাজন' আর 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-দের মুখপাত্র বলেই ভাবতে ভাল লেগেছিল তাদের। 'ইডিয়েট', 'ডেভিলস', 'রঅ যুথ' ও 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর লেখককে ধারণায় ধরতে পারে নি বলে উনবিংশ শতক সে-রচনাগুলিকে আখ্যা দিয়েছিল অবাস্তব ও আজগুবি বলে। একমাত্র বাস্তব ও যথার্থ মনে হত কেবল গোনচায়ফ্, তুর্গেনিয়েফ্ আর তলস্তয়কে। সর্বজনমান্য বিষয়ই ছিল সে দিন তাঁদের বিচরণ ক্ষেত্র। সর্বংসহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

অজ্ঞেয় ও রহস্যময় শৃংখলাকে নত-জানু হয়ে মেনে নিয়ে তাঁরা তখন রচনা করে চলেছেন 'এপিক' আর সেই এপিক-এর বিষম চাপে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নহীন অগণিত বুদ্ধিজীবীর চিন্তা। দস্তয়েফ্‌স্কিই তখন একমাত্র সচেতন বুদ্ধিজীবী যিনি সেই নির্বোধ শাস্ত্রের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদরূপে রুশ-সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হলেন। বললেন:

'অজ্ঞেয় রহস্যময় যে বিশ্ব-শৃংখলাকে (cosmos) তোমরা হাঁটু মুড়ে মেনে নিয়েছ, সে চিরস্থির পরম কিছু নয়, ওই আপাত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-শৃংখলার নিচে নিদারুণ বিশৃংখলা (chaos) চাপা পড়ে আছে। তার বোবা গর্জন শোনা যাচ্ছে। সেখানে আলোড়ন শুরু হয়েছে।'

জীবনের এই চরম অভিজ্ঞতার কথা একদিন শোনাবেন বলেই তাঁকে সেদিন সাইবেরিয়ায় যেতে হয়েছিল।

মিখাইলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে সরকারের শ্লেজ সাইবেরিয়ার পথে রওনা হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন —দ্যুরফ্ আর ইয়াস্ত্রেবেৎস্কি। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা খোলা শ্লেজ আর একজন সৈনিক কোচমান। সকলের জন্যে একজন তদারকী কোরিয়ার।

তারপর আরও চার বছর গেছে। সে চার বছরের প্রতিটি দিন ও রাত্রি গেছে একটানা এক বিভীষিকার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুপুরীর অশেষ ক্লেশের মধ্যে ক্লান্ত অবসন্ন দস্তয়েফ্‌স্কি তখন কাউকেই একটাও চিঠি লেখেন নি, মিখাইলকেও না। চার বছর পরে জেল থেকে বেরিয়েই তিনি সব আগে মিখাইলকে চিঠি লেখেন। সে চিঠিতেই প্রথম রাশিয়ার মানুষ জানতে পারে পিতার্সবুর্গ ছেড়ে যেতে কী মর্মান্তিক বিষাদ পীড়িত করেছিল তাঁকে, কী কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি ওম্স্ক্ পর্যন্ত পৌঁছতে।

"…আমরা যখন রওনা হলাম তখন রাত ঠিক বারোটা, অর্থাৎ খৃস্টমাসের শুভ দিন শুরু হয়েছে তখন। তখন সারা দিনের বিবিধ ঘটনায় আমার মন বিক্ষিপ্ত ছিল। আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত ছিলাম। আমার বুকটা কেমন অবশ লাগছিল। ফলে কোন কষ্ট কোন যন্ত্রণাই তেমন তীব্রভাবে বোধ করছিলাম না আমি। অবশ্য বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে সে অবসাদ অবসন্নতা কাটতে বেশী দেরি হয় নি। আমি ক্রমশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিলাম। নূতন জীবনের পথে প্রতি পদক্ষেপে আমার মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা সঞ্চার হচ্ছিল কিন্তু আত্মহারা

অবস্থা সেটা নয়, আমি বেশ ধাতস্থই ছিলাম। উৎসব-আলোকিত পিতার্সবুর্গের রাস্তা পার হয়ে যেতে যেতে আমি প্রত্যেকটি আনন্দ-মুখর বাড়ির দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকাচ্ছিলাম, আর মনে মনে বিদায় নিচ্ছিলাম প্রত্যেকের কাছ থেকে।

"তুমি যে বাড়িটাতে থাকতে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ল, তুমি বলেছিলে, আজ ক্রায়েফ্‌স্কির ফ্ল্যাটে তোমার নিমন্ত্রণ বউ বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে তুমি যাবে। ক্রায়েফ্‌স্কির বাড়ির সামনে এলে আমার বুকটা তাই অসহ্য কষ্টে মুচড়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন তোমার কাছ থেকে তোমার বউ এমিলা ও বাচ্চাদের কাছ থেকে জন্মের মতন বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।"

শুধু মিখাইল, তার ছেলে মেয়ে বউয়ের কাছ থেকে নয়, সেদিনকার পিতার্সবুর্গের জীবন ও সাহিত্য থেকেও বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সে-বিদায় যে চিরকালের মতন নিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি তার প্রমাণ, তিনি সাইবেরিয়া থেকে ফিরে এসে পুনরায় আর তাঁর পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারেন নি। তাঁর ফেলে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ কোনটাই আর সমাপ্ত হয় নি। এমন কি 'নেতোচকা নেজভানোভা' উপন্যাসখানির শেষ খণ্ডও আর শেষ করেন নি তিনি। যে পিতার্সবুর্গ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন দশ বছর পর ফিরে এসে সে পিতার্সবুর্গকেও আর তিনি ফিরে পান নি।

দশ বছরের পোড়-খাওয়া জীবনে তাঁর শুধু অভিজ্ঞতাই বাড়ে নি, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও পালটে গিয়েছিল—তিনি গোগোল, হফ্‌মান, জর্জ সাদকেও অতিক্রম করে গেছেন ততদিনে, ততদিনে তাঁর অতীত সাহিত্য-কর্মও তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং জীবন-দর্শনের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। সাইবেরিয়ার নির্বাসিত জীবনের নিঃসঙ্গতা আর বহু ও বিচিত্র মানুষের সাহচর্য তাঁকে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলত তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন নিজস্ব এক শিল্প-রীতি। আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন রচনার জন্যে স্বকীয় বিষয়বস্তু। আপন অভিজ্ঞতার মাটিতে সঞ্জাত সে রচনা-শৈলী ও বিষয়বস্তু তাঁর একান্ত নিজস্ব বলে সেখানে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারল না কেউ। অদ্বিতীয় তিনি তাঁর আপন অন্তঃসারের মধ্যে চিরকালের জন্যে অমর হয়ে গেলেন।

মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে অমরত্ব লাভের জন্যে তাঁকে যে কী কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কী কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে, সে তাঁর নির্বাসনোত্তর সমস্ত রচনায় ছড়িয়ে আছে এবং তাঁর দাদাকে লেখা চিঠিতে :

"আমাদের পথ ছিল ইয়ারোস্লাভ হয়ে ওম্‌স্ক। চারটে পোস্টিং স্টেশনে স্লেজ বদল করে পঞ্চাশ মাইলের মাথায় ইচ্‌লুবুর্গের সরাইখানায় এসে পৌঁছলাম সকালবেলায়। কী ক্ষুধা যে পেয়েছিল কী আর বলব! আমরা থালার ওপরে এমন করে উপুড় হয়ে পড়েছিলাম যেন কতকাল কিছু খাই নি কেউ। আট মাস জেল ভোগের পরে এক রাতে পঞ্চাশ মাইল বরফের পথ হাঁকড়ে এসে আমরা এমন খাওয়া খেয়েছিলাম আর এমন তৃপ্তি পেয়েছিলাম যে, সে কথা মনে করে আজও আনন্দে মন ভরে যায়। পেট পুরে খেয়ে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম তবু আমি কথা বলি নি একটাও কিন্তু ড্যুরফ্‌-এর বকবকানির অন্ত ছিল না। সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, যেন থামতে পারছিল না, যেন থামতে চাইছিল না। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল কেবল ইভান ইয়াস্ত্রেম্‌ব্‌স্কির। অধ্যাপক মানুষ। বয়েস তেত্রিশ, পড়াত পলিটিক্যাল ইকোনমি। তার শাস্তি হয়েছিল ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তাকে পাঠানো হবে সাইবেরিয়ারই অন্য এক অঞ্চলের জেলখানায়। বন্ধু-বিচ্ছিন্ন সেই একলা জেল-জীবনের বিভীষিকাই সে দেখছিল কেবল। কেবল ভয়ংকর ভয়ে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল সে।

"এখানে এসেই আমাদের কোরিয়ারটিকে ভালভাবে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। আমরা দেখলাম, বুড়ো মানুষটি ভারী চমৎকার। স্বভাবত সৎ এই মানুষটি আমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু ছিল। অভিজ্ঞতাও ছিল মানুষটির। সরকারী কাজে সারা য়ুরোপটা ঘুরেছে সে। নাম ছিল তার কুজমা প্রোকফ্‌য়েভ। সব আগে সে আমাদের জন্যে যা করল সে হচ্ছে ঢাকা স্লেজের ব্যবস্থা। ওই প্রচণ্ড শীতের রাস্তায় ঢাকা স্লেজ পাওয়া এক দুর্লভ ভাগ্যের ব্যাপার। তার জন্যে কুজমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না।

"......আমাদের রাস্তা মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে কিন্তু কোন মনুষ্যপ্রাণীর দেখা মিলছিল না কোথাও। জনশূন্য সড়ক চলে গেছে নভ্‌গোরোদ ইয়ারোস্লাভ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। মাঝে মধ্যে অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট শহরও পড়ছিল পথে। অবশ্য নামেই শহর আসলে মসকোআর আসেপাশের গ্রামের অধিক কিছু নয়। তখন খৃস্টমাস-এর ছুটি বলে শহরগুলিতে পান-ভোজনের মতন যা-হোক কিছু মিলছিল। সব শহরেই আমরা কিছু খাবার পাচ্ছিলাম, পানীয় পাচ্ছিলাম। আমাদের গায়েও যথেষ্ট গরম পোশাক ছিল তবু আমরা

যেন ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। দশ ঘণ্টা একটানা চলার পথে বার পাঁচ-ছয় মাত্র থেমেছি, স্লেজের বাইরে এসে হাত পা টান করতে পেরেছি, তা ছাড়া সমস্ত সময়টা স্লেজের ভিতরে গুটি সুটি হয়ে থাকতে হয়েছে বলে ঠাণ্ডা যেন আমরা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা হয়েছিল সব থেকে চরম। ঠাণ্ডায় আমি ভিতরে বাইরে এমন জমে গিয়েছিলাম যে গরম ঘরে ঢুকলেও আমার গা গরম হত না। কোন শহরে নেমে যখন গরম ঘরে খেতে ঢুকেছি তখনও মনে হয়েছে যেন আমি স্লেজের ভিতরে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেই বসে আছি। প্রেম জেলার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের ঠাণ্ডা ভোগ করতে হয়েছিল শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রীরও নিচে। অথচ আশ্চর্য পথের এত কষ্ট ধকল সত্ত্বেও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল খুব।

"উরাল পার হওয়ার সময়েই আমাদের কষ্ট হয়েছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক। ভয়ংকর তুষার বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। তখন মাঝে মাঝেই ঘোড়া শুদ্ধু স্লেজ বরফের মধ্যে বসে যাচ্ছিল। সেই ডুবন্ত ঘোড়া আর গাড়ি টেনে তোলার সময় আমাদের নেমে দাঁড়াতে হত যতক্ষণ না কোচমান আর কোরিয়ার মিলে স্লেজ আর ঘোড়াগুলিকে বরফের গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে পারছে। আমরা তখন য়ুরোপ ও এশিয়ার সীমান্তে এসে পড়েছি; আমাদের সামনে সাইবেরিয়া—আমাদের অজানা ভবিষ্যৎ, আর পেছনে ফেলে-আসা অতীত জীবন; ভাবতেই ভয়ানক কষ্টে ভরে উঠেছে বুক, চোখ ভরে জল নেমে এসেছে গালে। এখান থেকে প্রত্যেক পোস্টিং স্টেশনে আমাদের ঘিরে গাঁয়ের মানুষের ভিড় জমত। ওরা শুধু আমাদের দেখতে আসত না, আমাদের কাছে খানা-পিনা বেচতেও আসত। কিন্তু আমরা কয়েদী আমাদের পায়ে শিকল দেখেও তারা নির্লজ্জের মতন এক আনার জিনিস এক টাকা হেঁকে বসত। তবু আমরা কিনতে পেরেছিলাম কেন না, আমাদের খরচের অর্ধেকটা প্রোকফ্য়েভ দিত। নিতে না চাইলেও জোর করে গছিয়ে দিত। ফলে সমগ্র পথ পেট পুরে খেয়েও আমাদের মাথা পিছু মাত্র পনর রুবল করে খরচা পড়ে ছিল।

"আমরা তোবোল্‌স্ক-এ এসে পৌঁছেছি ১১ জানুয়ারি। সেখানে আমাদের তিনজনের গা তল্লাসী করে স্থানীয় জেলের কর্তা আমাদের নিয়ে হাজতে পুরে ফেললে। তল্লাসীর সময় আমাদের টাকাকড়ি যে কটা ছিল সব কেড়ে নিলে। আমরা তোবোল্‌স্ক-এ ছিলাম ছ' দিন। ১৮২৫-এর ডিসেম্বর-অভ্যুত্থানের বন্দীদের স্ত্রীরা আমাদের যে ঐকান্তিক স্নেহে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তার স্মৃতি

আমি কখনো ভুলব না। এই সব নিরপরাধ স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে ভোগ করবার জন্যে তোবোল্‌স্ক-এর বন্দীশিবিরে এসেছিলেন এবং পঁচিশটা বছর ধরে প্রকৃত সহধর্মিণীর মতন সর্বতোভাবে তাঁদের সঙ্গে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে চলেছেন। আশ্চর্য মানুষ এঁরা সব। আমরা সতর্ক পাহারার মধ্যে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খুব অল্প সময়ই আমরা তাঁদের সঙ্গে থাকতে পেরেছিলাম। বিদায় নেওয়ার সময় তাঁরা আমাদের একখানা করে বাইবেল দিয়েছিলেন। একমাত্র বাইবেলেরই ছিল কাতোরগার কয়েদখানায় ঢুকবার নিরঙ্কুশ ছাড়পত্র। সেই বাইবেলের মলাটের মধ্যে লুকিয়ে তাঁরা আমাদের কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। ওম্‌স্ক্‌ এসে কিছু রোজগার করবার আগে অব্দি সেই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। তাঁরা আমাদের কিছু পোশাকও দিয়েছিলেন। অবশেষে আমরা তোবোল্‌স্ক ত্যাগ করলাম, তিন দিনের পথ পেরিয়ে এসে ঢুকলাম জারের যমালয়ে।

"·········এমন একটা জীর্ণ ভগ্ন কাঠের বাড়ি কল্পনা কর," দাদাকে লিখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, "যা এখন আর আদৌ বাসের যোগ্য নয়, যা বহু বছর আগেই ভেঙে ফেলা উচিত ছিল।" সাইবেরিয়ার এই বাড়িই হল জারের সেই কুখ্যাত কয়েদখানা, ওম্‌স্ক্‌ এর কাতোরগা। "গরমের দিনে অসহ্য গুমট, শীতের দিনে নির্মম ঠাণ্ডা। এই বাড়িটার মেঝে পচে গেছে, তার ওপরে এক ইঞ্চি পুরু হয়ে পড়েছে নোংরা। সে এমন পিছল যে সাবধানে পা না ফেললে হড়কে পড়ে যেতে হয়। জানলাগুলি এমন ছোট তাও আবার বরফে এমন করে ঢাকা যে দিনের কোন সময়েই তার আলোতে বই পড়া চলে না। সিলিং থেকে আবার টপটপ করে জল পড়ে, যেদিকে তাকাও জঞ্জাল আর নোংরা জলের স্রোত। ব্যারাকের এ-হেন এক একটা ঘরে আমাদের এমন ঠেসে ঠুসে রাখা হয়েছিল যেন আমরা বরফ-চাপা এক এক বাক্স হেরিং মাছ। ঘরের মধ্যে একটা ঘর গরম করার উনুন ছিল। একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা কাঠের কুঁদা ঢুকিয়ে দেওয়া হত তার মধ্যে কিন্তু তাতে ঘর এতটুকু গরম হত না, এক কণা তুষারও গলত না তাতে; উল্টে দম-বন্ধ করা ধোঁয়ায় ঘর ভরে থাকত সব সময়। এভাবে কাটত গোটা শীতকাল। এখানে এই ঘরের মধ্যেই কয়েদীরা তাদের পোশাক-আসাক কাচত, হাত মুখ ধুত আর সেই জলে থৈ থৈ করতে থাকত সারা ব্যারাক।······সন্ধ্যে থেকে ভোর অব্দি ব্যারাক, তার প্রতিটি ঘর থাকত তালা বন্ধ, বেরোবার উপায় থাকত না বলে বারান্দায় একটা বড় গামলা রাখা হত, তাইতে সবাই রাত-ভোর

প্রকৃতির চাপ মোচন করত। তার গন্ধে ভরে থাকত সারা ব্যারাক, তার থমথমে বাতাস। সেই নোংরা বিষাক্ত বাতাসে নাক মুখ পুড়ত সারারাত। দুর্গন্ধ থাকত প্রত্যেক কয়েদীর গায়েও—যেন শূয়ারের গায়ের গন্ধ। ওরা বলত, 'শূয়ারের মতন আছি তাই শূয়ারের মতন গন্ধ আমাদের গায়ে।'

মিখাইলকে তিনি আর এক পত্রে লিখেছিলেন, "চারটে বছর আমি চৌকিদারের পাহারায় একগাদা মানুষের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে জানোয়ারের মতন বাস করেছি। কখনো কিছুক্ষণের জন্যেও একলা হওয়ার সুযোগ জোটে নি আমার। স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে কখনো-কখনো মানুষের একলা হওয়া দরকার, না হলে, যূথবদ্ধ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হলে, মানুষের প্রতি মানুষ ভীষণ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। এই বাধ্যতামূলক যূথবদ্ধ জীবন বিষের মতন অথবা সংক্রামক ব্যাধির মতন কাজ করে, দেহ মন ভরে তোলে অসহ্য যন্ত্রণায়। আমার সব কষ্টের বড় ছিল এটাই—এই বাধ্য হয়ে যূথবদ্ধ থাকার কষ্টে আমি নির্মমভাবে ভুগেছি চার বছর। এমন সময়ও এসেছে যখন সকলকেই আমার অসহ্য লেগেছে। আমার কাছে থাকা, আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া প্রত্যেকটি মানুষকে আমার বিষ মনে হয়েছে, নিদারুণ ঘৃণায় আমি তাকিয়েছি তাদের দিকে, যেন তারা সবাই চোর, আমাকে খুন না করেই তিলে তিলে আমার জীবন কেড়ে নিচ্ছে তারা।"

তাঁর 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' বেরোয় ১৮৬২তে। ততদিনে ১৮৫০-৫৪র নির্বাসন-দণ্ডের নির্মম কষ্টের ঘা'টা শুকিয়ে গেছে, গভীর ক্ষত চিহ্নটাই শুধু চোখের সামনে হাঁ হয়ে রয়েছে কেবল। ফলত 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' হয়ে উঠেছে মধ্য-উনিশ শতকের সাইবেরীয় জেল-জীবনের নিরপেক্ষ দলিল। ব্যক্তিগত ক্রোধ বিদ্বেষ অসন্তোষ সময়ের জারক রসে পরিপাক হয়ে যাওয়ায় সে-ইতিহাস কোথাও স্বগত অভিজ্ঞতার পোশাক পরে কোন একজনের বিশেষ সময়ের জীবনী হয়ে ওঠে নি, নির্বিশেষ ইতিহাসই থেকে গেছে। অবশ্য সে-ইতিহাস 'টম কাকার কুটির' কিংবা 'নীল দর্পণ'এর উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয় নি। তিনি জেল-সংস্কারের মহৎ প্রেরণায় প্রচারকের ভূমিকাও নেন নি সেখানে। এক নৈর্ব্যক্তিক শিল্পিমানসের প্রেরণায় তাঁর জীবনের এক বিভীষিকার অধ্যায়ে লব্ধ কতকগুলি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে শুধু ইতিহাসে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। তবু তার মধ্যে মূল্যবান মনুষ্য-জীবনের অপচয়ের ব্যাপারে তাঁর বেদনার দীর্ঘশ্বাসেরও অভাব নেই, লিখেছেন:

'আহ্‌, এই কারাপ্রাচীরের আড়ালে আলস্যের মধ্যে কত যৌবনেরই না কবর

হয়ে গেছে, কত শক্তিরই না মিথ্যা অপচয় ঘটেছে এখানে। কেন না, নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই মানুষগুলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। আমাদের জাতির সব চাইতে জেদী সব চাইতে কুশলী এরা। অথচ এই বিপুল মনুষ্য-সম্পদ মিথ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, অস্বাভাবিক ভাবে বেআইনী ভাবে। এ-অপচয়ের ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে না। কে এর জন্যে দায়ী? হাঁ, কাকে দোষ দেব?'

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে শাসকের প্রতি দস্তয়েফ্‌স্কির ঘৃণা সুস্পষ্ট কিন্তু উপন্যাস কিংবা নাটকের মতন তাতে উত্তেজনা অথবা প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা নেই। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও দস্তয়েফ্‌স্কির শিল্পী-মন সর্বদা নির্বিকার, নিরপেক্ষ। তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের এ-গুণ তাঁর রচনার চরিত্রের মধ্যেও সমভাবে সঞ্চারিত। তিনি তাই বলে কখনো কোন কিছুকেই বিবর্ণ হতে দেন নি, জীবনবোধের তীব্রতায় আর অন্তর্দৃষ্টির আলোতে সবই যথাযথ উদ্‌ঘাটিত।

কী ভাবে কয়েদীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত কাজের জায়গায়, কে কী কাজ করত তারা, কী ভীষণ ঝগড়া মারামারি করত পরস্পর, দুর্লভ আমোদ-প্রমোদের সুযোগগুলি কী প্রবল আগ্রহে চেটেপুটে ভোগ করত সকলে; যে-শিকল পরা অবস্থায় তারা খেত শুত কাজ করত ফুর্তি আর মারামারি করত, রোগে ভুগত আর মরত সে-শিকলের কত ওজন ছিল, কী ভাবে পরানো থাকত, বছরে দু' তিনবার কী ভাবে পুরনো পোশাক পালটে শিকলের কোমর-বন্ধের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নূতন পোশাক পরানো হত; হিংস্র জন্তুর মতন রাগী আর নিষ্ঠুর অফিসার আর চৌকিদাররা এতটুকুতেই ক্ষেপে উঠে কিংবা ঠাণ্ডা মাথায় শাসনের নামে কী ভীষণ অত্যাচার করত—শৃংখলা রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার বেত শাসনে কতখানি নির্দয় ও নির্মম হতে পারত, সমস্ত পাওয়া যাবে এই স্মৃতি-গ্রন্থে। পাওয়া যাবে কয়েদীদের ভয়ংকর সব স্বভাবের পরিচয়, দুর্জয় দুর্বিনীত মানুষগুলির আচার আচরণ। নিষিদ্ধ দ্রব্য,—মদ ছুরি ছোরা কারিগরী কাজের যন্ত্রপাতি চৌকিদারদের চোখে ধুলি দিয়ে কি ঘুষ দিয়ে কেমন করে ব্যারাকের ভিতরে আমদানী করত কয়েদীরা, উপার্জন করত বেআইনী টাকাকড়ি, জুয়া খেলত, এমন কি বাইরে কাজে বেরিয়ে কি করে তারা চৌকিদারদের যোগসাজসে মেয়েমানুষ ভোগ করত, দস্তয়েফ্‌স্কি লিখতে কিছু বাদ দেন নি। অধিকন্তু প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব শৈলীতে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোয় জীবন-রহস্যের অন্তিম অবধি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বারবার।

অবশ্য বলাই বাহুল্য, 'পাপ ও শাস্তি' উপন্যাসের প্রতিভা সেখানে

অনুপস্থিত। তবু স্বীকার করতেই হবে, এ-হেন নির্মম বাস্তবের নিখুঁত বর্ণনা দিতে ও তার মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে উন্মোচিত করতে যে বাক-বৈদগ্ধ্য ও শিল্প সামর্থ্য দরকার তার অভাব নেই এর কোথাও। এ-বই পড়তে পড়তে অভিভূত তুর্গেন্‌য়েফ কয়েদীদের স্নান পর্বের বর্ণনায় এসে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'উঃ এ যে দেখছি দান্তীয় নরক।'

বর্ণনাটি এই রকম: 'আমরা যখন স্নান ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে পা বাড়ালাম, আমার মনে হল আমরা যেন নরকে ঢুকছি। কল্পনা কর, গজ বারো লম্বা ও অনুরূপ চওড়া একটা ঘরে কম সে কম এক শ' মানুষ। না হোক অন্তত আশী জন ত অবশ্যি। কেন না আমাদের দু সারিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং আমরা সাকুল্যে ছিলাম প্রায় দু শ' কয়েদী। ঘরের মধ্যেটা নোংরা বীভৎস। তা ছাড়া গরম জলের বাষ্প চোখ অন্ধ করে দিচ্ছিল। সর্বোপরি এমনই ঠাসাঠাসি ভিড় যে পায়ের একটা আঙুল রাখব মেঝেয় তেমন এতটুকু জায়গা নেই। আমি ভাষণ ভয় পেয়ে হটে আসছিলাম; কিন্তু পেত্রফ্ তক্ষুনি বাধা দিল, সাহস দিল আমাকে। চারধারে দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা বেঞ্চ, আমরা দু'জনে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেলেঠুলে পথ করে বেঞ্চির দিকে এগোলাম। মেঝেয় যারা গায়ে গায়ে এঁটে শরীরে শরীরে একাকার হয়ে বসেছিল, তাদের কারো মাথা কারো কোমর আমাদের পায়ে ঠেকছিল, সরে যেতে বলছিলাম, অবশ্য সে শুধু কথার কথা, কে কোথায় সরবে, সরাবে শরীর, আমরা তাদের মাড়িয়েই এগোচ্ছিলাম। পেত্রফ্ বললে, 'এখানে জায়গা কিনতে পাওয়া যায়।' বলেই সে জানালার ধারের এক কয়েদীর সঙ্গে দরদস্তুর শুরু করে দিলে, এক কোপেকেই সে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হল। কোপেকটা পেত্রফ্ হাতে করেই রেখেছিল। মুট খুলে দিয়ে দিলে। মানুষটা অমনি নেমে দাঁড়াল, আমরা তার জায়গা দখল করে নিলে সে গিয়ে আমাদের পায়ের নিচে সোজা বেঞ্চির তলায় সেধিয়ে গেল। সে-জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। দু' ইঞ্চি পুরু প্যাচপ্যাচে কাদায় থিক থিক করছে সেখানটা। তাই বলে কী শূন্য আছে? সেখানেও ভিড়। সেখানেও গাদাগাদি হয়ে আছে মানুষ, এতটুকু জায়গা নেই, হাতের চেটোর সমান জায়গা নেই মেঝেতেও। মেঝেয় বসে যারা তাদের বালতি থেকে গায়ে মাথায় জল ঢালছে, গা ঘষছে সেখানেই আবার আর একদল লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে বালতি নিয়ে গা ঘষছে জল ঢালছে মাথায়। সে জল গড়িয়ে পড়ছে বসে-থাকা মানুষগুলির শরীরে, মাথায় বালতিতে। উঁচু সেলফ্-এ বেঞ্চিতে মেঝেয় গাদাগাদি ঠাসাঠাসি মানুষ

শরীর ধুচ্ছে, চান করছে। কিন্তু একে কি আর চান করা বলে। এখানে কয়েদীদের প্রায় সকলেই চাষা শ্রেণীর, তারা কোনদিনই সাবান ব্যবহার করে না। তারা কেবল প্রথমে গরম বাষ্পে গা ঝলসায় শেষে ঠাণ্ডা জল ঢালে, চান বলতে এই বোঝে তারা।…—সেই চান পর্ব চলছে তাদের—চান করছে চেঁচাচ্ছে ঝগড়া করছে, চতুর্দিক থেকে উঠছে গলাবাজির শব্দ, কথা-বার্তার আওয়াজ, অসন্তোষের গর্জন, শিকলের ঝনঝনানি, সঙ্গে ক্রমাগত উঠছে গরম জলের বাষ্প, পাক খেয়ে খেয়ে শিলিংএ ঠেকছে, শিলিং থেকে নেমে আসছে, সেই বাষ্পের ধোঁয়া চাপ বেঁধে রুদ্ধশ্বাস করছে মানুষকে—সমস্ত মিলিয়ে সৃষ্টি করছে নরকের দৃশ্য কিংবা এই হচ্ছে যথার্থ নরক…'

বছরে কয়েক বার স্নান করানো হয় কয়েদীদের, সেই স্নানেরই এই নারকীয় পরিবেশ—আসলে কাতোরগার গোটা পরিবেশই নারকীয়। কাতোরগার কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে সেমিপালাতিনস্ক্‌-এ নির্বাসনের শেষ বছর পদাতিক সৈনিকের জীবন কাটাতে এসে তাঁর দাদাকে লেখা চিঠিতে দস্তয়েফ্‌স্কি আর একবার তাঁর বিভীষিকার জীবন স্মরণ করেছেন :

"…আমরা খালি পাটাতনের ওপরে ঘুমোতাম। ছোট্ট একটা ঘরে তিরিশ জন মানুষ। বিছানা বলতে একটা খড়ের বালিশ। গায়ে দিয়েছি ভেড়ার চামড়া। সে খাটো চামড়া পা অব্দি পৌঁছত না। সারা রাত শীতে ঠক্‌ঠক করেছি। চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ আরশোলা উকুন ছাড়পোকা। সহ্য করেছি তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন। শীতের দিনে আমাদের পরতে দেওয়া হত ভেড়ার চামড়ার পায়জামা। সবচেয়ে খারাপ জাতের চামড়া, তাতে করে এতটুকু শীত আটকাত না। যে-বুট পরতাম তাতে গোড়ালির বেশী ঢাকত না। হাঁ, সে-জুতো পরে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগত। আমাদের খেতে দেওয়া হত বাঁধা কফির ঝোল আর রুটি। ঝোলে পো' খানেক গরুর মাংস থাকার কথা কিন্তু কখনো একটুকরোও চোখে পড়ত না। ছুটির দিনে আমরা পরিজ পেতাম কিন্তু কদাচিৎ তাতে চর্বি থাকত। …আমি হামেশাই গরহজমে ভুগেছি। কয়েকবার বেশ অসুস্থও হয়ে পড়েছিলাম। এমনতর পরিবেশে হাতে টাকা না থাকলে বেঁচে থাকা শক্ত। বস্তুত টাকা না থাকলে আমি এত দিনে মরেই যেতাম, এ-অবস্থায় কোন মানুষ, কোন কয়েদীই বাঁচতে পারে না।

"যা হোক আমি নিজের পয়সায় খেতাম, দু'এক পিস সেদ্ধ গরুর মাংসও মাঝে মাঝে নিজের পয়সায় খেয়েছি। ধূমপান ছাড়তে পারি নি। ওটা না পেলে বাঘে

পেচ্ছাবের গন্ধে পেট ফুলে মরে যেতাম। এ সবই আমাকে গোপনে চুরি করে সংগ্রহ করতে হত। হাসপাতালে গেলে চুরট জোগাড় করতে পারতাম। সে-চুরটই লুকিয়ে রেখে ব্যারাকে ফিরে এসে অল্পে অল্পে খেয়েছি। আমাকে কয়েক বারই হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

"আমার পায়ে বাত ধরেছিল, এখনও ব্যতের ব্যামোতে ভুগছি, তা ছাড়া মোটামুটি আমি ভালই আছি।

"জেলে বই পড়ার কথা যদি জানতে চাও, বই আদৌ পাওয়াই যায় না ধরে নাও। দু' একখানা যদি বা পেতাম পড়ার উপায় ছিল না। আমার চার ধারে মারামারি গালাগালি চিৎকার হুল্লোড় হট্টগোল চলতই সব সময়, তারই মধ্যে এক ধারে একান্তে গোপনে বই পড়তে হত। কারণ বই-পড়া কয়েদীদের অন্যান্য কয়েদীরা বড্ড ঘৃণা করে। সম্ভ্রান্ত আমরা ওদের দশায় পড়েছি দেখে ওদের মহা আনন্দ, আমাদের ওরা এমন বিষ নজরে দেখত যেন পারলে গিলে খায়। ওদের সঙ্গে আমাদের এই ছিল সম্পর্ক। বোঝ এখন আমাকে এ-অবস্থার মধ্যে চার চারটা বছর কাটাতে হয়েছে।……

"এত গেল আমার শারীরিক অবস্থা। আমার মানসিক অবস্থা আর শুনতে চেয়ো না, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। তবে হ্যাঁ, পিতার্সবুর্গের তিক্ত জীবন থেকে পালাতে চেয়ে আমি যেখানে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলাম তার পরিবেশের সব কিছু আমার সত্তা শোষণ করে নিয়েছে এবং তার ফল ফলতেও শুরু করেছে। আমার মনের মধ্যে অপরিমিত আশা আকাঙ্ক্ষা এখন, এমনটি আমি কোন দিন অনুভব করি নি।……একটা অনুরোধ, আমাকে ভুলে যেয়ো না। আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করো। আমার এক্ষুনি কিছু বই আর টাকার দরকার। আমাকে একখানা কোর্‌আন পাঠাবে আর হেগেলের বই, বিশেষ করে হেগেলের 'হিসট্রি অব ফিলজফি'টা অবশ্যি। কান্টের পাঠাবে 'ক্রিটিক অ্য পা রিজ্‌ন্ পিওর'। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এর ওপরে নির্ভর করে আছে।…"

পত্রের শেষে লিখেছেন, "সেবাসতোপোল ছেড়ে যাওয়ার সময় ফিলিপ্‌পফ্ আমাকে পাঁচ শ' রুবল দিয়ে গিয়েছিল, সে বুঝতে পেরেছিল, আমার পকেটে টাকা নেই। বড় ভাল মানুষ এই ফিলিপ্‌পফ্। আমার সঙ্গে নির্বাসিত অন্যান্য সকলে দণ্ড ভোগ করে যাচ্ছে যথারীতি।……স্পেশনিএফ্ ইরকুস্ক-এ আছে। সেখানে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই একটি আশ্চর্য মানুষ। যেখানেই থাক জমিয়ে নিতে পারে। তার সাহচর্যে এলে অমিশুক মানুষও তার সঙ্গ নিতে

এগিয়ে আসে। শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শুরু করে। বেচারা গ্রিগোরিয়েফ্‌-এর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। সে এখন হাসপাতালে।”

দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনীকার ইয়ানোফ্‌স্কি বলেছেন, ‘দস্তয়েফ্‌স্কিকে যাঁরা টাকা ধার দিতেন তাঁরা হয়ে উঠতেন তাঁর চোখের বালি। কেন না তিনি ধার নিয়ে সহজে আর তা শোধ করে উঠতে পারতেন না। আর ঋণ শোধ করা যতই অসম্ভব হয়ে উঠত ততই তাঁদের মনে হত তাঁর শত্রু। দস্তয়েফ্‌স্কির মুখে তাদের নিন্দেই শোনা যেত কেবল। স্পেশনিএফ্‌ তাঁকে একবার পাঁচ শ’ রুবল ধার দিয়েছিলেন; সে ঋণ তিনি শোধ করতে পারেন নি, উলটে তিনি স্পেশনিএফ্‌কে গাল দিয়েছিলেন ‘মাফিসতোফেলিস’ (শয়তান) বলে।’ অথচ সেই স্পেশনিএফ্‌কেই তিনি উপরিউক্ত চিঠিতে দাদার কাছে প্রশংসা করেছেন এবং ফিলিপ্‌পফ্‌এর দয়া ও দরদের কথা বলেছেন। তবে কি ইয়ানোফ্‌স্কি দস্তয়েফ্‌স্কির অযথা নিন্দে করেছেন? আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, ইয়ানোফ্‌স্কির মন্তব্য যেমন সত্য, দাদাকে লেখা দস্তয়েফ্‌স্কির পত্রও তেমনি সত্য। আসলে নির্বাসনের চার বছরে দস্তয়েফ্‌স্কির চরিত্র আমূল পালটে গিয়েছিল—জীবন-যন্ত্রণার নিদারুণ দহনে তিনি অগ্নি-শুদ্ধ হয়েছিলেন।

সে মর্মান্তিক দহনের ইতিহাস অমর হয়ে আছে তাঁর ‘মৃত্যুপুরীর স্মৃতি’ বইতে। বইখানি পড়ে তদানীন্তন জার ‘নিষ্ঠুর’ নিকোলাইও শিউরে উঠেছিলেন, তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়েছিল। সেই চোখের জলেই ধুয়ে গেল রাশিয়ার কলঙ্ক, কাতোরগার কয়েদখানা ভেঙে দিলেন নিকোলাই।

দুই

ওই সেই মৃত্যুপুরী।

না, কাতোরগার কারাগার নয়। দূর থেকে দেখা যায় তার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওম্‌স্ক্‌ দুর্গ। তুষার-ধূসর আকাশের পটভূমিতে সংলগ্ন তার সু-উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর চোখে পড়ল দস্তয়েফ্‌স্কির। মাটির প্রাচীর। গায়ে আগাছার ঘন জঙ্গল। ওপরে সশস্ত্র সান্ত্রীরা মন্থর পায়ে হাঁটছে। না, ওই দুর্গ নয়; তারই পাশে, দস্তয়েফ্‌স্কির গন্তব্য আর এক প্রাচীরের অন্তরালে।

দস্তয়েফ্‌স্কি কাতোরগার কয়েদখানায় এসে পৌঁছলেন ১৮৫০-এর

২৩ জানুয়ারি। কঠিন কাঠের দুর্লঙ্ঘ্য দেউড়িটা দু' ভাগ হয়ে হাট খুলে গেল। তাঁরা এসে ভিতরে দাঁড়ালেন।

দস্তয়েফ্স্কি লিখেছেন: 'একটা সমতল ক্ষেত্রের অনুমান দু শ' গজ লম্বা ও শ' দেড়েক গজ চওড়া অসম-ষড়ভুজ এই জমিটা গায়ে গায়ে গভীর গর্ত করে বসানো মোটা মোটা আস্ত শাল-খুঁটি দিয়ে ঘেরা। আড়াআড়ি মোটা তক্তা সেঁটে দিয়ে সে-খুঁটির প্রাচীরকে যৎপরোনাস্তি দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। পাছে কোন বে-পরোয়া দুঃসাহসী কয়েদী সে-খুঁটির প্রাচীর টপকে পালাতে চায়, খুঁটির গগনস্পর্শী শীর্ষকে চেঁছে শূলের মতন চোখা করা হয়েছে। এই কঠিন খুঁটির প্রাচীরের একটিই মাত্র প্রবেশ পথ। সে-পথ দিনে দু বার খোলে: ভিতরের কয়েদীদের বাইরে কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে সকালবেলা আর ফিরিয়ে আনার সময় সন্ধ্যাবেলা। আর খোলা হয় নূতন কয়েদী যখন আসে। এই পথটিকে সর্বক্ষণ পাহারা দেয় একদল সশস্ত্র সতর্ক সান্ত্রী।

'এই দেউড়ির বাইরে আলো আর মুক্তির পৃথিবী। সেখানে মানুষ বাস করে পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষের মতন। কিন্তু এই দরজার ভিতরের পৃথিবী অন্য রকম একেবারে বিপরীত, অনধিগম্য যেন অপদেবতার দেশের মতন। এর আইন-কানুন ভিন্ন পোশাক-আশাক ভিন্ন, এর আচার-আচরণ আদব-কায়দা আলাদা। এর নামই জ্যান্ত-মবাদের আস্তানা, 'দ্য হাউস অব দ্য ডেড'।

'এই আস্তানার মাঝখানে একটি উঠোন, তার দু পাশে কাঠের কুঁদোয় তৈরি এক তলা দুটো লম্বা ব্যারাক। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এই ব্যারাক দুটোর ঘরে ঘরে রাখা হয় কয়েদীদের। এ-উঠোনেরই অন্যত্র রান্না খাওয়ার ঘর, স্টোর রুম, আস্তাবল ইত্যাদি।' এই বেড়ায় ঘেরা জগৎটুকুর মধ্যেই শাসন ও জীবন-যাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে।

এখানে এসে পৌঁছে মাসখানেক বিশ্রাম পেয়েছিলেন দস্তয়েফ্স্কি, তখন জেলের পাকা খাতায় নাম উঠেছে তাঁর। সাজার ঘরে লেখা হয়েছে: রাজনৈতিক বন্দী, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী। অর্থাৎ হাল্কা শ্রমের কাজ করবেন, আর পাবেন পড়া-লেখার সুযোগ।

এই নির্বাসিত কয়েদীদের সংখ্যা ছিল আড়াই শ'। কেউ মরত, কেউ মুক্তি পেত, কেউ নূতন আসত—এ-সংখ্যার তাই হের ফের বড় একটা হত না। জার-সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলেরই প্রতিনিধি ছিল এখানে পর্যন্ত দুর্গম ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ। অপরাধের ধরন ও শাস্তির মেয়াদ অনুসারে এরা শ্রেণীবিভক্ত

হত। পৃথিবীতে হেন অপরাধ নেই যা এখানকার কেউ না কেউ করে নি। এখানে এমন অপরাধীও ছিল যাদের সকল রকম নাগরিক অধিকার কেঁড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা সব দাগী আসামী। গালে তাদের জন্মের মতন দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে। মুক্তির পরেও সমাজে আর তাদের জায়গা হবে না। মুক্তি পেয়ে তারা সমাজের বাইরে সাইবেরিয়ারই কোন প্রান্তে চাষবাস করবে, থাকবে।

দাগী ছাড়া কে কোন্ শ্রেণীর কয়েদী তা চেনা যেত তাদের পোশাক দেখে আর মাথা দেখে। কারো মাথা আড়াআড়ি চাঁছা থাকত, কারো লম্বালম্বি, কারো আবার মাথার আধখানা কান অব্দি চাঁছা থাকত। দস্তয়েফ্‌স্কির কান অব্দি মাথার আধখানা চাঁছা ছিল। মাথার মতন জ্যাকেট ট্রাউজারস-এরও রকমারি বাহার ছিল। কারো জ্যাকেট থাকত আধখানা ধূসর আধখানা বাদামী, আবার ট্রাউজারসও তাই—এক পা খয়েরী আর এক পা ধূসর। কারো জ্যাকেটের পিঠে হরতন আঁকা থাকত, কারো অন্য কিছু। দস্তয়েফ্‌স্কির জ্যাকেটের আধখানা ছিল কালো আধখানা ধূসর। তাঁর জ্যাকেটের পিঠে ছিল রুহিতন আকারের হলুদ পট্টি। গরমের দিনে তাঁকে দেওয়া হত হালকা হলুদ ফেজ, শীতে ভেড়ার চামড়ার কান-ঢাকা টুপি আর দস্তানা।

কয়েদীর পোশাকে দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখাত যেন একজন শক্ত সমর্থ শ্রমিক। দু পায়ে দুটো লোহার বালার সঙ্গে দুটো করে লোহার শিক আঁটা। সে শিক চারটে আবার কোমরের লোহার বেল্টের সঙ্গে রিভেট করা তাই স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারতেন না, হাঁটার সময় বিদ্‌ঘুটে দেখাত, তবু হাঁটার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল তাঁর।

জেলের অফিসার আর সহকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, তাঁর কোটরগত চোখে, তাঁর বিন্দু বিন্দু লালচে মেচেতা-পড়া পাণ্ডুর মুখে কেউ কখনো হাসি দেখে নি। তিনি মাথার টুপিটাকে কপালের ওপর টেনে রাখতেন সব সময়; সব সময় তাঁকে বিষণ্ণ ও অসন্তুষ্ট মনে হত। মনে হত যেন কী এক গভীর চিন্তায় আত্মমগ্ন আছেন। হাঁটতেন যখন দৃষ্টি মাটির দিকে নত থাকত। শরীরটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ত। কয়েদীরা কেউ তাঁকে পছন্দ করত না। বিরক্ত-চোখে তাঁর দিকে তাকাত সবাই। নিঃশব্দে পথ ছেড়ে দিত। তিনি পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। সকলের সাহচর্য সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। কেবল প্রশ্নের জবাব দিতে মুখ খুলতেন এবং অতিশয়

সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত জবাব দিতেন। এই অপ্রসন্ন মানুষটিকে দেখলে মনে হত যেন ফাঁদে আটকে পড়া একটা নিরুপায় নেকড়ে।

দস্তয়েফ্‌স্কি স্বীকার করেছেন, প্রথম দিকটায় ওই রকমই ছিলেন তিনি: 'চোখ নিচু করেই থাকতাম। কারো দিকে কিছুর দিকেই তাকাতাম না। চোখ তুলে কিছু দেখতে, কাউকে দেখতে আমার অসহ্য লাগত। কিন্তু ক্রমশ আমি এই বিদ্বেষের মনোভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি। আমি দেখতাম আর অবাক হতাম। যে-সব জিনিসের অস্তিত্ব আছে বলে আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি নি, তাই প্রত্যক্ষীভূত হয়ে আমাকে হতবুদ্ধি করে দিত। কিন্তু সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছি আমি, আমার সঙ্গে অন্যান্য কয়েদীদের অনতিক্রম্য ব্যবধান দেখে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যেত না। তারা কিছুতেই বন্ধু হয়ে উঠতে চাইত না। আমি যেন সম্পূর্ণ পৃথক এক জগতের ভিন্ন গোত্রের মানুষ। আমাকে তারা সন্দেহ করত, শত্রু মনে করত···আমি জানতাম না সম্ভ্রান্তদের প্রতি কৃষকদের ঘৃণা এত গভীর, এমন তীব্র। ······একজন ত বলেই ফেলল, 'তোমরা সম্ভ্রান্তরা, আমাদের জমি কেড়ে নিয়েছ, আমাদের শুদ্ধু কিনে নিয়েছ তোমরা। তোমরা আমাদেরই জমিতে আমাদের ভূমিদাস করে খাটাচ্ছ, আমাদের শ্রমের টাকায় তোমরা বাবুগিরি করছ, আর কেমন মজা এখন তাদেরই একজন তুমি আজ আমাদের সঙ্গে কয়েদ খাটতে এসেছ। খাটো! খেটে মর! আমরা তোমার কেউ না।' ওরা আমাকে পছন্দ করত না। ঘৃণা পর্যন্ত করত।'

ফলে দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেকে সকলকার কাছ থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। একলা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর যে পরিবর্তন ঘটেছিল, কয়েদীদের সঙ্গে আন্তরিক হয়ে ওঠার যে চেষ্টা জন্মেছিল তাঁর মধ্যে, সে দ্যুরফ্‌-এর জন্যে। দ্যুরফ্‌ আর তিনি দু জনেই ছিলেন পেত্রাশেফ্‌স্কিপন্থী। দু'জনেই প্রাণদণ্ডের আসামী হয়ে বধ্যভূমিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন। দু'জনেই বধ্যভূমি থেকে সাইবেরিয়ার এই মৃত্যুপুরীতে নির্বাসিত হয়েছেন। তবু এখানে এসে দ্যুরফ্‌ও তাঁর দু চোখের বিষ হয়ে উঠেছিলেন। দ্যুরফ্‌ ছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কির ঠিক উলটো। আমুদে, মিশুক ও বন্ধুবৎসল। এ-জন্যেই ওঁর ওপরে যত রাগ ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। এই নোংরা জেলে, এই কদর্য পরিবেশে এমন মজা পাচ্ছে লোকটা কিসে, কেমন করে হাসতে পারছে, গল্প করতে পারছে সকলের সঙ্গে? পেঁচার মতন মুখ করে ভাবতেন দস্তয়েফ্‌স্কি। পরে বুঝতে পেরেছিলেন, নির্বাসনের নির্মম

যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছিল বলেই সকলের সঙ্গে মিশে হাস্য-পরিহাসে গল্পগুজবে মেতে, আত্মবিস্মৃত হতে চেয়েছিলেন দ্যুরফ্‌। তবু নির্বাসনের, এই কুৎসিত কয়েদখানার, যন্ত্রণা ভুলতে পারেন নি দ্যুরফ্‌। দস্তয়েফ্‌স্কি লিখেছেন, 'আমি এক ভয়ংকর ভয় বুকে করে দেখতাম, আমার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে (দ্যুরফ্‌-এর প্রতি অসন্তোষবশত তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি তিনি)। একটা জ্বলন্ত মোম গলতে গলতে যেমন ফুরিয়ে যায় সেই ভাবে ফুরিয়ে গেল সে। আমরা একসঙ্গে জেলে ঢুকেছি, তখন দেখতে সে ছিল তরুণ সুকুমার সুন্দর প্রফুল্ল কিন্তু সে যখন চার বছর বাদে জেল থেকে বেরোল তার দিকে তাকানো যায় না—চুল পেকে গেছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে, চলতে পাকিয়ে পড়ে। মাত্র চার বছরে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য অকাল বৃদ্ধ সে তখন।'

দ্যুরফ্‌ যা পারছে সে তা পারছে না কেন? সেই চিন্তা থেকেই প্রেরণা এসেছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। তিনি কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে, তাদের জানতে বুঝতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। সেই ঐকান্তিক চেষ্টার মধ্যে দিয়েই তিনি জেনেছিলেন: নারকোলের ওপরে যেমন ছোবড়া থাকে, থাকে কঠিন মালা, তেমনি মানুষের ওপরেও থাকে ওপর থেকে চাপানো একটা শক্ত খোসা। ওই খোসাটা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারলেই তখন জানা যায় এমন সব বিষয়ের অস্তিত্ব যা আগে কখনো কল্পনায়ও আসে নি। জ্ঞানী মনীষী আমাদের আর কতটুকু শেখাতে পারেন, প্রকৃত শিক্ষা রয়েছে মানুষের ওই ভিতরটা দেখার মধ্যে।

কিন্তু সেই হৃদয়-অনুসন্ধান চেষ্টায় সতত নিযুক্ত থাকলেই কেবল নির্বাসনের মনঃকষ্ট দূর হয় না। দস্তয়েফ্‌স্কি বলেছেন, 'আমাকে বাঁচিয়েছে কাজ—কায়িক শ্রম। আমি দেখেছি কাজ করলে আমার মন ভাল থাকে, শরীর ভাল থাকে। আমি যদি কাজ না করতাম তাহলে বদ্ধ ঘরের নোংরা দুর্গন্ধ হাওয়ায় মানসিক উৎকণ্ঠা আর স্নায়বিক উত্তেজনা সয়ে সয়ে আমি ক্ষয়ে মরে যেতাম।
কাজ করা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না—কি সাবল মেরে বরফ সরানো, হাতুড়ি মেরে আলাবাসটার গুড়ো করা, কি ইরতিশ নদীর ঘাটে বাঁধা বজরা থেকে ইট নামানো—কোন কাজেই আমার সহকর্মীরা আমাকে সহজে হাত দিতে দিত না। আমি তাদের সাহায্য করতে হাত বাড়ালেই আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিত, আমাকে দেখলেই তারা বিরক্ত হত, অভিসম্পাত দিত। তবু আমি তাদের হাতে হাত মিলিয়েছি। বেকার বসে থাকতে আমার ভয়ঙ্কর

করত। ক্লান্ত হতে না পারলে আমার ঘুম আসত না। আর ঘুম আসতে না পারা যে কী বিভীষিকার যন্ত্রণা, জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে সে কেউ বুঝবে না। আমি তাই নিজেকে কেবল বোঝাতাম,—'যতক্ষণ সম্ভব কাজের জায়গায় মুক্ত বাতাসে থাকবার চেষ্টা কর।' 'রোজ ভীষণ ক্লান্ত হও।' 'ভারী বোঝা বইতে অভ্যস্ত হও।' অন্তত তা হলেই তুমি জীবন্মৃত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচবে। যখন তুমি জেল থেকে বেরোবে, সুস্থ সবল থাকবে, বুড়িয়ে যাবে না'—বস্তুত আমি ভুল করি নি। শারীরিক শ্রম আমার খুব উপকার করেছে, আমাকে বাঁচিয়েছে।

'আমাকে যদি দিনরাত বাইরে ধরে রাখত, আর কেবল মাল টানাত কি আলাবাসটার ভাঙাত, আমি আপত্তি করতাম না, অসন্তুষ্ট হতাম না। কেন না, সন্ধ্যা হলে আমাদের সবাইকে যখন এনে ব্যারাকের ঘরে ঢোকাত আর সারা রাত্রির জন্যে তালা দিয়ে রাখত আমি অত্যন্ত হতাশ বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। ঘর বলতে একটা ঢালু নিচু ছাদওলা লম্বাটে নিরন্ধ্র রুদ্ধশ্বাস অন্ধকূপ, আলো বলতে একটা মোমবাতির মলিন শিখা, আর হাওয়া বলতে পুরীষ-প্রস্রাবে দূষিত অচল বাতাস—আমি আজ ভেবে পাই নে চার-চারটে বছর ওখানে আমি কী করে ছিলাম! চার বছর ত চার বছর, অনেকে ওরই মধ্যে দশ বিশ বছর দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছে, দেখেছি।

'তিরিশ জনের একটা ঘরে আমার বলতে ছিল তিনখানা তক্তা পরিসরের এক চিলতে জায়গা। কারো ভাগ্যেই ওর চেয়ে বেশী জায়গা জুটত না তবু তার মধ্যেই কী না করত তারা। গরমের দিনে রাত ছোট বলে তবু এক সময়ে কেটে যেত; কিন্তু শীতের রাত যেন আর কাটতে চাইত না। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যেত। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসত আকাশ জুড়ে। আর সন্ধ্যা হলেই আমাদের টেনে এনে ব্যারাকে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া [illegible]। তক্ষুনি কে আর ঘুমোবে? ঘুমের আগে পাক্কা চার ঘণ্টা জেগে থাকত[illegible]। তখন সে চার ঘণ্টা যেন নরক গুলজার হয়ে উঠত। হৈ হল্লা হাসি, অভিসম্পাত, গালাগালি, মারামারি, অবিশ্রান্ত-অবিরাম শেকলের ঝনঝনা, তামাকের ধোঁয়া, অপরিচ্ছন্ন পোশাকের গন্ধ, ন্যাড়া আধা ন্যাড়া নানা বীভৎস ধরনে চাঁছা মাথা, কর্কশ কঠিন মুখ, তার বিকট ভঙ্গি···আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রগুলি যেন চৌচির হয়ে ফেটে যেতে চাইত তখন। তখন অসহ্য লাগত বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে হত। তব মনে হত এই যেন স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, নিতে পাবে বলেই না এই পরম নারকীয়তার মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারে মানুষ। দেখে দেখে এবং ভুগে ভুগে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—মানুষ এমন এক প্রাণী যে সব অবস্থার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আমার মনে হয় এটাই মানুষের সব বড় গুণ।

কিন্তু তারা যে শুধু হৈ-চৈ চিৎকার গালাগালি মারামারি করে সময় কাটাত তা নয়, তারা কাজও করত। বাধ্যতামূলক কাজের কথা বলছি না, সে কাজকে তারা ঘৃণা করত। নির্দিষ্ট ঘণ্টাগুলি সেই বাধ্যতামূলক কাজ শেষ করে ব্যারাকে ফিরে এসেই শুরু হত তাদের আসল কাজ—বৃত্তি বা পেশা। কারাদণ্ড হওয়ার আগে যে পেশায় বা বৃত্তিতে তারা নিযুক্ত ছিল সেই 'নিজের কাজ', যে-কাজ করতে তার 'ইচ্ছে করে' 'ভাল লাগে', যে-কাজে সে তার সমস্ত মন অপর্ণ করে দিতে পারে সে-কাজ যদি সে না করতে পারে ত সে-মানুষ নির্বাসনের জেলে বাস করতে পারে না। বন্দী-জীবন তার কাছে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। আর বস্তুতও তাই, সমাজ সংসার ও মুক্ত জীবন থেকে কেড়ে এনে যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের যদি 'যে-কাজ তাদের করতে ভাল লাগে' না করতে দেওয়া হয় ত তারা এই বিরূপ বিশ্রী পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবে বাঁচবেই বা কেমন করে? বাধ্যতামূলক কাজটুকু শেষ হওয়ার পরে অবশিষ্ট সময় যদি তারা অলস কর্মহীন হয়ে থাকে ত সেই অবসরের শূন্যতা অপরাধ-প্রবণতায় ভরে উঠবে নাকি, এমন সব অপরাধ-প্রবণতা যার সম্পর্কে আগে তার কোন ধারণা ছিল না? এটা যে জেল কর্তৃপক্ষ বুঝতেন না, তা নয়। বুঝতেন বলেই ওদের 'স্বাধীন' কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু জেলের বিধানে যন্ত্রপাতি রাখা নিষিদ্ধ অথচ যন্ত্রপাতি না হলে কাজ করবে কা দিয়ে, কয়েদীরা চুরি করে তাই যন্ত্রপাতি আমদানি করত জেলের ভিতরে।

জেলে ঢোকার আগে সব কয়েদীরাই যে কারিগর ছিল তা নয়, অনেকেই হয়ত কিছুই জানত না। জেলে এসে শিখেছে। শেষে পাকা কারিগর হয়ে বেরিয়ে গেছে জেল থেকে। জেলে সব রকম বৃত্তির কারিগরই ছিল—মুচি, দরজি, কাঠের মিস্ত্রি, লোহার মিস্ত্রি, তালাওলা, ঝালাইওলা এমনকি একজন স্বর্ণকার পর্যন্ত। তারা সকলেই কাজ করত ও কিছু না কিছু রোজগার করত। শহর থেকে তারা কাজের 'অর্ডার' আনত। শহরে যাওয়ার সুযোগ ঘটত কয়েদীদের জেলের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার সময়।

অর্থ হল মুদ্রায় রূপান্তরিত স্বাধীনতা। সুতরাং যারা স্বাধীনতা হারিয়ে

কয়েদী হয়েছে, তাদের কাছে ছ'চারটে কোপেকও মহামূল্য সম্পত্তি। পকেটে কয়েকটা কোপেক ঝনঝন করতে থাকলেই কয়েদীর পরম সান্ত্বনা; যদিও তা সে ইচ্ছে হলেই খরচ করতে পারছে না। অবশ্য খরচ করার ইচ্ছে হলে সব সময় এবং যে-কোন জায়গায় পয়সা খরচ করা যায়। তা ছাড়া কে না জানে নিষিদ্ধ ফলের চেয়ে মিষ্টি আর কিছু নেই। পয়সা থাকলে জেলের ভিতরে বসে ভোদ্‌কা মেলে, তামাক মেলে, আরামসে পাইপ টানা যায়। ভোদ্‌কা আর তামাক কয়েদীদের 'স্কার্ভি' ও অন্যান্য রোগ থেকে বাঁচায় আব কাজ বাঁচায় অপরাধ-প্রবণতা থেকে। তিল তিল মৃত্যু থেকে। কয়েদখানায় যদি কাজ না থাকত ত কাচের জারে একগাদা মাকড়সা পুরে রাখলে যেমন হয়, পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে খুন জখম হয়ে মরত কয়েদীরা।

এ-সব সত্ত্বেও কয়েদখানার আইনে যে হেতু পয়সা ও কাজ নিষিদ্ধ, মাঝে মাঝে রাত দুপুরে জেল অফিসার সান্ত্রী নিয়ে এসে হঠাৎ তল্লাসী শুরু করে দিতেন আর যন্ত্রপাতি পয়সাকড়ি যা পেতেন সব তুলে নিয়ে যেতেন। তাই কয়েদীরা পয়সাকড়ি খুব সাবধানে ও সযত্নে লুকিয়ে রাখত—যন্ত্রপাতি চুরি করে আমদানি করা যায় কিন্তু পয়সা বড় দুর্লভ বস্তু। তাই পয়সা বড় কেউ সঞ্চয় করত না, মদ খেয়ে উড়িয়ে দিত। যাদের কাছে টাকাকড়ি যন্ত্রপাতি মদ পাওয়া যেত তাদের শাস্তি হত অমানুষিক। কিন্তু নিষিদ্ধ ফলের প্রতি লোভের কাছে সে শাস্তিও তুচ্ছ হয়ে যেত।

নিষিদ্ধ কাজের একটা কুহক আছে যা মানুষকে প্রবল ভাবে টানে, উত্তেজিত করে, অধিকন্তু চোখে ধুলো দিতে পারার মধ্যে, শাস্তি এড়ানোর চেষ্টার মধ্যে থাকে একটা নিদারুণ আত্মতৃপ্তি ও অহংকার, আমি তুচ্ছ কেউ নই এই বোধ। এই বোধের মধ্যেই আছে বেঁচে থাকার তীব্রতম সুখ। সেই সুখটুকুই এখানকার কয়েদীদের সর্বস্ব। ফলত বিপদের ঝক্কি পোহাতে কেউ পেছ পা হয় না, বরং আরও বেশী করে তার দিকে এগিয়ে আসে, ফেঁপে ওঠে ভোদ্‌কা আর তামাকের কারবার। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধক রাখার ঘটা পড়ে যায়। বন্ধকী কারবার ফেঁপে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। জামা জুতো টুপি দস্তানা সব বন্ধক রেখে তামাক কেনে মদ কেনে কিন্তু বন্ধকীমাল ছাড়িয়ে আনার সাধ্য থাকে না কারো, তখন করে চুরি। নিজস্ব জিনিসপত্র রাখার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে একটা করে বাক্স দেয়, তাতে তালা চাবিও থাকে। কিন্তু তালা চাবি বন্ধ করে রাখলেও বাক্সের জিনিস নিরাপদ থাকে না। যার নেই সে যার আছে তারটা চুরি করবেই। চুরি

করলে বেদম প্রহার খাবে যারটা চুরি করেছে তার হাতে, তা জেনেও চুরি করবে; এমনকি সকালে যে জিনিস সে বন্ধক রাখল রাত্রের মধ্যেই সে জিনিস চুরি করে নিজের বাক্সের মধ্যে এনে ভরে রাখবে তখন মারামারি বচসা খুনোখুনি হবে। কিন্তু কুছপরোয়া নেই। মারতে এবং মার খেতে এরা সমান পটু।

এরা পশু, এরা খুনে এরা সব সমাজ-বিরোধী মানুষ কিন্তু সত্যি কি তাই? সবাই জাত পাপী? অথচ তিনি যতদুর জানেন, তা তারা নয়। তবু শাস্তি সকলকার এক—এই কঠোর নির্বাসন দণ্ড। বছরের ফারাক অবশ্য আছে, কারো দশ, কারো পনর, কারো কারো যাবজ্জীবন। কিন্তু দশ বছর আর সারা জীবনের মধ্যে এরা কী কোন পার্থক্য করে, না বোঝে?

সে-মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল এই কয়েদখানায় আসার পথে ট্র্যানজিট ক্যাম্পে। ওম্‌স্ক্‌-এর পথে বাজারে এসে পৌঁছতে তাদের রাত হয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা তখন শূন্য ডিগ্রীর নিচে। সেই ঠাণ্ডায় ট্র্যানজিট ক্যাম্পের উঠোনে খোলা আকাশের নিচে শ'খানেক কয়েদীর সঙ্গে তাঁদেরও এসে বসতে হয়েছিল। এখানে নাম ডাকা হবে। যার যেখানে শাস্তির মেয়াদ খাটতে যাওয়ার কথা এখান থেকে সেখানে পাঠানো হবে তাদের। এতক্ষণ যারা একসঙ্গে ছিল তারা এবার আলাদা হয়ে যাবে। তাঁরা তিনজন ছিলেন এখন দু'জন হবেন। ইয়াস্ত্রেঝেম্বাস্কি তাঁদের ছেড়ে এখান থেকে চলে যাবেন অন্য আর এক জেলে। বিষণ্ণ মন নিয়ে তাঁরা তিনজন নাম ডাকার অপেক্ষায় বসে আছেন তখন দুটি কয়েদীর আলাপ কানে এল দস্তয়েফ্‌স্কির।

'তোর নাম কিরে?'

'কালিনোভিচ।'

'আমার নাম অসটানিন। আমার বিশ বছরের শাস্তি, পাঠাবে খনি এলাকায়। তোর শাস্তি ক'দিনের, তুই যাবি কোথায়?'

'আমি দশ বছরের জেল খাটতে যাব কাতোরগায়।'

'তুই বলছিলি আজ দু'দিন তোর পেটে এক ফোঁটা ভোদ্‌কা পড়ে নি, খেতেও পাস নি পেট পুরে। তা নিবি না কি? আধ বোতল ভোদ্‌কা আছে আমার। আমি তোকে কিছু মাংস রুটিও দিতে পারি। আর এই গরম জামাটা।' হাতের মুঠো আলগা করে একটা রূপোর রুবল দেখিয়ে বলল, 'চাই কি এটাও তোর হয়ে যেতে পারে, নিবি?'

'তুই আমাকে এত দিতে চাইছিস কেন?'

'না, খয়রাত দিচ্ছি নে, আমার সঙ্গে যদি তুই নাম বদল করিস, তবেই পাবি এ-সব।'

'সব—সমস্ত দিবি ?' কালিনোভিচের গলার স্বর লোভে ঘড় ঘড় করে উঠল।

'সব সমস্ত দেব। রাজি ?'

'লোকটা ক্ষণকাল চুপ থেকে বলল, 'রাজি।'

আধ বোতল ভোদ্‌কা কিছু রুটি-মাংস একটা গরম জামা একটা কম্বল—শুধু এই সামান্য জিনিসের বিনিময়ে মানুষটা দশ বছরের জায়গায় বিশ বছর শাস্তি খাটতে রাজি হল! বেঁচে থাকার ও ক্ষুধার দাবির কাছে মানুষের পরমায়ু কত তুচ্ছ দেখে দস্তয়েফ্‌স্কি শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর চোখ ফেটে জল এসেছিল।

বাইরের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় যখন সবাইর সঙ্গে ব্যারাকে ফেরেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তখন থেকে ঘরে তালা পড়ার আগে অব্দি নাম ডাকা আর খাওয়ার সময় বাদ দিয়ে যে-সময়টুকু মেলে, তিনি অসম ষড়ভুজ পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘোরানো প্রশস্ত পথটুকুতে আসেন। এখানে এসে পায়চারি করেন তিনি। এখানে তাঁর দুটি কাজ। প্রথম তিনি খুঁটির গায়ে চিহ্ন দেন। এই পাঁচিলে সর্বসাকুল্যে দেড় হাজার খুঁটি আছে। এক একটি খুঁটি তার এক একটি দিনের প্রতীক। তাঁর কারাবাসের দিন গোনা শেষ হলে তিনি চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তা তাঁর অধিকাংশ সময় এই কয়েদীদের নিয়ে। চলচ্চিত্রের মতন কয়েদীদের চরিত্র তাঁর মনের পর্দায় ফুটতে থাকে, মিলিয়ে যায়, আবার ফুটে ওঠে।

ফাটকের দিন, তা সে জেলে হোক, কেল্লায় হোক, কি সাইবেরিয়ায়—সহ্য করা বড় শক্ত। কিন্তু শক্তি পেয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেকে ভুলতে পেরে, পরের ভাবনা ভাবতে পেরে। জীবন-রহস্যের মূলানুসন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর নির্বাসনের যন্ত্রণা সহনীয় করে দিতে পেরেছিল। তিনি দেখতেন আর ভাবতেন। যেমন, বিভিন্ন ধরনের খুনের অপরাধে একই মেয়াদের শাস্তি কেন ? তিনি কোন দিনই এ-প্রশ্নের উত্তর পান নি।

প্রতিটি খুনই খুন কিন্তু খুনগুলির পেছনে মতলবের কত পার্থক্য!

এক ঠগী টাকার জন্যে একজন চাষীকে খুন করে তার পকেট হাতড়ে পেয়েছিল একটা পেঁয়াজ মাত্র।

'ধ্যেৎ মাত্র একটা পেঁয়াজ!' বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিল সে।

তাকে হতাশ হতে দেখে সঙ্গী বলেছিল, 'তাই বা কম কিসে। অন্তত এক

ফার্দিং দাম এর। তার মানে একশ'টা খুন করে একশ'টা পেঁয়াজ অর্থাৎ একটা আস্ত রুবল, চাট্টিখানি কথা!'

একটা জীবন একটা ফার্দিং-এর চেয়েও তুচ্ছ যার কাছে সে-খুনীর সঙ্গে তুলনা হয় নাকি তার, যে-ব্যক্তি মা বোন কি স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে কামুক-অত্যাচারীকে খুন করেছিল, আবার কার সঙ্গে তুলনা করব সেই পলাতক সৈনিকের—যে উপবাস-মৃত্যু কিংবা নির্বাসন-দণ্ড অনিবার্য জেনেও সেই মুহূর্তের স্বাধীনতার জন্যে খুন করেছিল তার মেজরকে? সেই শিশু-খুনেটার সঙ্গেই বা কার তুলনা হয়—যে শিশু খুন করত কেবল শিশু-খুন করতে ভাল লাগত বলে। শিশুর উষ্ণ রক্তে হাত ধুতে তার আনন্দের সীমা থাকত না। ছুরির সামনে আঁৎকে-ওঠা শিশুর করুণ তরাসে চিৎকার তার কানে মধু ঢেলে দিত। ছুরির আঘাতে আঘাতে বিক্ষত শিশুর ছটফটানি তার রক্তে ছড়িয়ে দিত অপরিসীম সুখ।

অথচ আইন মোতাবেক এদের যখন বিচার হল, খুনী বলে সকলেই সমান শাস্তি পেল, সকলেরই হল দশ বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড। কেন এমন হয়, কেন মুড়ি মুড়কির এক দর এখানে, বুঝতে পারেন না দস্তয়েফ্স্কি। তাঁর অবাক লাগে।

অবাক হন তিনি বিভিন্ন মানুষের মনে সাজার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখেও। মানসিক কষ্টে জ্বলন্ত মোমের মতন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। কেউ কেউ আনন্দে মাতাল হয়ে থাকছে যেন এটা জেল না, একটা নিদারুণ... আবার এমন মানুষও দেখেছেন তিনি, বিবেকের দংশনের কাছে যার নির্বাসনের যন্ত্রণাও তুচ্ছ হয়ে গেছে, অনুতাপ ও পাপবোধের দাহে তিলে তিলে পুড়ে তুষের মতন ছাই হয়ে যাচ্ছে সে। কঠিন আইনের পক্ষেও যা সম্ভব নয়, সেই নির্মমতম শাস্তি দিচ্ছে তাকে তার নিজের মন। আর এর উল্টোটিও দেখেছেন দস্তয়েফ্স্কি, সে-ব্যক্তি ভুলেও ভাবে না কি সাংঘাতিক অপরাধ করে সে এসেছে সাইবেরিয়ায়, সে তার কাজকে অপরাধ বলেই স্বীকার করে না, অতএব সে তার বিবেকের কাছে নির্দায় নিরপরাধ মানুষ, নিশ্চিন্ত ও সুখী। সুখী হওয়ার জন্যেও খুন খারাবি করে সাইবেরিয়ায় আসে অনেকে। বাইরের পৃথিবীতে যাদের দু'বেলার অন্ন জোটাতে নির্মম পরিশ্রম করতে হয়, ভূমিদাস-জীবনের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় যাদের, তবু যাদের আহার ও আশ্রয়ের কোন নিশ্চয়তা মেলে না তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এখানে আসার জন্যে এবং যে-কোন সাংঘাতিক

অপরাধ করে বসে শুধু জেলে আসার সুযোগ পেতে, কেন না সে জানে এখানে আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, দু'বেলা দু'মুঠো নিশ্চিত আহার। তার ত এর বেশী চাহিদা নেই, তাই জেল তার স্বর্গ।

তবে? সবাই ত আইনের চোখে অপরাধ করে শাস্তি ভুগতে এসেছে এখানে, তবু কী নির্বাসনের শাস্তি সবাইকার কাছে পরম শাস্তি হয়ে উঠেছে, সমান শাস্তি?

উত্তরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়ান দস্তয়েফ্‌স্কি, উত্তর মেলে না, অস্থির হয়ে ওঠেন কেবল।

চিন্তা-ক্লান্ত দস্তয়েফ্‌স্কি ফেরেন। ঘরে ফেরার ঘণ্টা বাজে তখন।

তিন

জীবনের রহস্য উন্মোচনের যে প্রতিশ্রুতি দস্তয়েফ্‌স্কি ১৮৪০এর তরুণ বয়সে বরণ করেছিলেন ১৮৫০-৫৪র নির্বাসনে তা সঙ্গী করে নিয়ে যেতে ভোলেন নি তিনি। নির্বাসনের নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর সে প্রতিশ্রুত সাধনা পরম নিষ্ঠায় এগিয়ে চলেছিল। 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার ফলশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। নির্বাসনের নির্মম দিনগুলি তাঁর মানুষের বুক চিরে অন্তিম অব্দি দেখার কঠিন চেষ্টায় মগ্ন ছিল। দস্তয়েফ্‌স্কির বুদ্ধিদীপ্ত তত্ত্ববোধনী প্রতিভা পুঁথিগত বিদ্যার ফল নয়। দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেই বলেছেন, মনীষীরা মানুষকে সামান্যই শেখাতে পারে। যথার্থ শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হয়, মানুষ যখন মানুষের বাইরেকার শক্ত আবরণটা ভেঙে ঢুকে তার ভিতরটা খুব ভাল করে দেখতে পারে।—সেখানেই জগৎ-রহস্যের মূল, সকল জিজ্ঞাসার উত্তর নিহিত।

আসলে যথার্থ শিক্ষা মানে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। জেল-জীবনে দস্তয়েফ্‌স্কি সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ-মনের কতকগুলি মৌল 'বাস্তব' আবিষ্কার করেছিলেন, তার একটি 'টিরেনি', অবৈধ অত্যাচার।

দস্তয়েফ্‌স্কি বলেন, 'টিরেনি' একটা অভ্যাসলব্ধ স্বভাব। দৈহিক-নির্যাতন করার সুযোগ পেলে সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই চায় কেবল মানুষ। এ-প্রবৃত্তি তার তখন কেবল বাড়তেই থাকে। বাড়তে বাড়তে শেষমেশ একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে দাঁড়ায় এসে। অভ্যাস মানুষকে কিনা করে! দৈহিক নির্যাতন দেওয়ার অভ্যাসের ফলে তার ভিতরকার যত মানবীয় গুণ সব ক্রমশ

নষ্ট হতে থাকে, ভিতরটা তার ক্রমাগত কর্কশ ও কঠিন হয়ে ওঠে কেবল। কোমলতা সরলতা স্নেহ মমতা বেদনাবোধ ইত্যাদি মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকে না। রক্তের স্বাদ পেলে হিংস্র জানোয়ার যেমন, শক্তির স্বাদ পেলে মানুষও তেমনি, কেবলই সে-স্বাদ চেটে চেটে ভোগ করতে চায়। মানুষের হৃদয় মনের সহনশীলতা অপরিসীম ; সব কিছুতেই সে ধাতস্থ হয়ে উঠতে পারে এমন কি এই বর্বর বৃত্তিটাও সে অভ্যাসের বশে দিব্যি রপ্ত করে ফেলে। তখন সেইটেই তার বেঁচে থাকার একমাত্র আকর্ষণ হয়ে ওঠে ; নির্যাতন না করে রক্ত না ঝরিয়ে আর তার তৃপ্তি হয় না। এ সব মানুষ কোন দিনই আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। স্নেহ মমতা দয়া ও সেবার বোধ ভোঁতা মেরে যায় বলে অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের গৌরবে ফিরে আসার ভাগ্য আর হয় না এদের।

অধিকন্তু এরা এই নির্যাতনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজকেও নষ্ট করতে ছাড়ে না। সমাজের ওপরে এর নিদারুণ প্রভাব সংক্রামক ব্যাধির মতন ছড়াতে থাকে। তখন সুযোগ পেলেই একজন আর একজনের উপর নির্যাতন করতে অনায়াসে উদ্যত হয় এবং নির্যাতন করতে পারাটাকেই সে তার অধিকার মনে করে। এ-ভাবে গোটা সমাজই কলুষিত হয়ে যায়। এ কলুষ আজ সমাজের মূলে চলে গেছে। একজন আর একজনের ওপরে সুযোগ পেলে দৈহিক নির্যাতন চালাবে এটা এখন স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে মানুষ। এ-ব্যাধি ক্যানসারের মতন গোটা সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেষ্টন করে ধরেছে। সৎ ও সহৃদয় হওয়ার দিকে সকল রকম চেষ্টাই এই নির্যাতনের হাতে মার খেয়ে মরছে।

পেশাদার নির্যাতনকারী, মানে শারীরিক নির্যাতন দেওয়াই যাদের চাকরি সমাজের চোখে তারা ঘৃণার পাত্র। ঘাতক জল্লাদ কি বেত মারার চাকরি যাদের, মানুষ তাদের ভাল চোখে দেখে কী ? অথচ ভদ্রলোক-অত্যাচারী ক্ষমতালোভী-ধনী কিন্তু দিব্যি প্রশ্রয়ই পায়। তার অত্যাচার পরোক্ষ বলে, তার ক্ষমতার লালসার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকার সম্বল কুড়োয় বলে, তাকে কিছু বলতে পারে না কেউ—তাকে কেবল প্রশ্রয় দেয়, ভজনা করে। হালে কিছু লোক এদের বিরুদ্ধে পুঁথিপত্রে কিছু কিছু লিখছে, কিন্তু সে-আক্রমণও পরোক্ষ এবং অস্পষ্ট কেন না যারা লিখছে তাদের নিজেদের মধ্যেও ওই পাপ রয়েছে। তারা নিজেরাই তাদের মধ্যেকার ক্ষমতার লোভ মুছে ফেলতে পারছে না। প্রত্যেক পুঁজিপতি, শিল্প-সামগ্রীর প্রত্যেক উৎপাদক আনন্দ ও তৃপ্তির একটা তীব্র শিহরণ

অনুভব করেন যখন তাঁর মনে পড়ে হাজার তিনেক মানুষ, তিন হাজার পরিবার প্রতিপালন করছেন তিনি, তিনি তাদের মালিক, মা-বাপ। এটা নিঃসন্দেহে সত্যও বটে। চরিত্রের এই ধর্ম নিয়েই তাঁরা জন্মায়। পারিবারিক ও জন্মসূত্রে পাওয়া এ-অহংকার সহজে মরবারও নয়। এ তাঁর রক্তে রয়েছে, মায়ের দুধের সঙ্গে ওটা পান করে বড় হয়েছেন তিনি, পৈত্রিক সম্পদের সঙ্গে ওটাও পেয়েছেন। অতএব খুব সহজে ধনপতিদের মজ্জা থেকে ওটাকে মুছে ফেলাও যাবে না।

কিন্তু দৈহিক নির্যাতনকারীদের মনস্তত্ত্ব আলাদা। নির্যাতন করার প্রবণতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে; কিন্তু থাকলেই সে সব-সময় সব-ছাপিয়ে সবার ওপরে মাথা উঁচু করে ওঠে না। যখন ওঠে, যখন তার মানবীয় সব গুণ চেপে মেরে সর্বেসর্বা হয় তখন তার বড় হিংস্র আর কে?

উপরিউক্ত কথাগুলি দস্তয়েফ্স্কির মনে হয়েছে লেফটেন্যান্ট ঝেরেবায়াৎনিকফ্, লেফটেন্যান্ট স্মেকালফ্কে দেখে। এমন আগাগোড়া বর্বর মানুষ দস্তয়েফ্স্কি আর দেখেন নি। সাংঘাতিক ভয়ংকর মানুষগুলি তার পায়ের তলায় পরম ভয়ে লুটিয়ে পড়ে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করে হত্যা করতে পারেন—এই নিষ্ঠুর অহংকারে পিশাচের মতন কেউ হেসে উঠতে পারে নিজের চোখে না দেখলে তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না।

দস্তয়েফ্স্কি লিখেছেন, 'সবুজ রাস্তায় বেড়ানো' কাকে বলে আমি জানতাম না। এখনও জানি না বেত্রদণ্ডের নাম 'টু ওয়াক দ্য গ্রীন স্ট্রীট' কেন? শুধু জানি এ এক ভয়ংকর শাস্তি। সাধারণত এ-শাস্তি হয় সৈন্যবিভাগের আসামীদের —যারা বিভাগীয় আইন অমান্য করে উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে, বিভাগীয় প্রধানদের গায়ে হাত দেয় কি খুন করে অথবা সৈন্যবিভাগ থেকে পালিয়ে গিয়ে খুন জখম ও ডাকাতি করে জীবন-যাপন করে। এরা ধরা পড়লে বিচারে এদের দীর্ঘ মেয়াদী নির্বাসন দণ্ডের সঙ্গে বেত্রদণ্ডও হয়। সাধারণত পাঁচশ' থেকে এক হাজার বেত্রাঘাত দণ্ড হয়; কিন্তু কোন কোন হতভাগ্যের বরাতে দু'হাজার তিন হাজার বেত্রাঘাতও বর্তায়।

অসুস্থ হয়ে দস্তয়েফ্স্কি প্রথম যখন জেলের হাসপাতালে যান, কয়েদীদের কাছ থেকে লেফটেন্যান্ট ঝেরেবায়াৎনিকফ্ সম্পর্কে অনেক লোমহর্ষক গল্প তিনি শুনেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে চাক্ষুস দেখেন ব্যারাকে। মাঝে মাঝে তাঁর ব্যারাক-পরিদর্শনের ডিউটি পড়ত।

জাঁদরেল চেহারা মানুষটার। যেমন উঁচা লম্বা তেমনি মোটা। লাল মুখ,

ভোঁদা গাল, সাদা দাঁত, বয়স বছর তিরিশ। বিরাট হাঁ করে দাঁত বের করে মানুষটা গোগোলের 'ডেড সোলস'-এর নোজ্‌দ্রাইঅফ্‌-এর মতন প্রবল শব্দ করে হাসতেন। দেখলেই মনে হত লোকটার মাথায় কোন ভাবনা চিন্তা নেই। তাঁর একমাত্র সুখ বেত মারা। বেত মারার সাজা এসেছে জানলে তিনি সব আগে পা বাড়িয়ে এগিয়ে যেতেন। লোকটাকে দেখলে আমার দৈত্য বলে মনে হত। শুধু আমি না, সব কয়েদীরাই তাই মনে করত।

বেত মারার দায় অন্য অফিসারদের ঘাড়েও এসে পড়ত এবং তাঁরা তা যথারীতি সম্পন্নও করতেন। কিন্তু সেটা তাঁদের কাছে কর্তব্য পালনের অধিক, 'রোটিন ওয়ার্কের' বেশী ছিল না। কিন্তু কর্তব্য পালনের অধিক আরও কিছু, বিশেষ কিছু ছিল লেফটেন্যান্ট ঝেরেবায়াৎনিকফ্‌-এর—একটা প্রবলতম সুখ-বোধ ছিল তাঁর শাস্তি প্রয়োগের মধ্যে; ইন্দ্রিয়-পরায়ণ মানুষের সুখ-বোধের সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা চলে। তাঁর কাছে শাস্তি দেওয়াটা ছিল একটা 'আর্ট'। 'আর্ট' হিসেবেই তিনি এটাকে গ্রহণ করেছিলেন। 'আর্ট' হিসেবেই এটাকে উপভোগ করতেন তিনি। পতনোন্মুখ রোমের ভ্রষ্ট সম্রাটের মতন নানা বিচিত্র ও বিকৃত কৌশল আবিষ্কারে ওস্তাদ ছিলেন এই লেফটেন্যান্ট। আর সেই আবিষ্কারের মধ্যেই ছিল তাঁর নষ্ট আত্মার যত তৃপ্তি।

সান্ত্রীর পাহারায় শিকলে শব্দ তুলে আসামী এগিয়ে আসবে। ঝেরে-বায়াৎনিকফ্‌, মুখ্য আধিকারিক, দাঁড়িয়ে থাকবেন অদূরে। একবার তাকাবেন আসামীর দিকে আর একবার তাঁর সৈন্যদের দিকে। গ্রীন স্ট্রীট-এর দু'ধারে লাঠি হাতে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁর সেপাইরা, দেখেই তাঁর চোখমুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আত্মপ্রসাদে পরিতুষ্ট তিনি ঘুরে ঘুরে সেপাইদের দেখবেন এবং মনোযোগ দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবেন। কর্তব্যে অবহেলা দেখলে তিনি তাঁদের কী সাজা দেবেন তা আর তাঁকে উচ্চারণ করে বলতে হবে না, সেপাইরা তাঁর চোখ দেখলেই সমঝে যাবে।

আসামীকে লাইনের সামনে এনে দাঁড় করানো হলে তার শরীরের সব পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে, তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হবে বন্দুকের কুঁদার সঙ্গে। সেই বন্দুক ধরেই আসামীকে পরে 'গ্রীন স্ট্রীট' বরাবর চিৎ করে ফেলে টেনে নেওয়া হবে। তার আগে স্বাভাবিক দৃশ্য হল ভীত আতঙ্কিত আসামীর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাতর আবেদন-নিবেদন।

'আপনি মা-বাপ, আপনি ঈশ্বর, আমার প্রতি করুণা করুন। আমাকে মেরে ফেলবেন না। আমি সারাজীবন ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্যে প্রার্থনা করব। আপনি আমার মিনতি রাখুন। আমাকে একেবারে শেষ করে দেবেন না। ধর্মাবতার আমাকে দয়া করুন।'

ঝেরেবায়াৎনিকফ্ এটাই চান। এই নিরুপায় শরণাগতি। এই ব্যাকুল আকুতি শুনতে তাঁর খুব মজা লাগে। তিনি খুব মন দিয়ে শুনবেন কথাগুলি, শেষে বেশ মোলায়েম গলায়, স্বর যৎপরোনাস্তি মিষ্টি করে বলবেন :

'বন্ধু, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি বল? আমি ত আর তোমাকে সাজা দিচ্ছি নে। তোমাকে সাজা দিচ্ছে আইন।'

'ধর্মাবতার, আইন ত আপনার হাতে, আপনি অনুগ্রহ করে দয়া করুন।'

'তুমি কী মনে কর, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয় না? তুমি কী ভাবো তোমাকে মারতে আমার খুব আনন্দ? আমিও ত একটা মানুষ, নাকি, বল? আমাকে তুমি মানুষ ভাবো না?'

'নিশ্চয় ধর্মাবতার, আমরা সবাই জানি আপনিই আমাদের মা-বাপ, আমরা সবাই আপনার ছেলেপুলে। আপনি আমার বাপ হোন।' ঝেরেবায়াৎনিকফ্-এর সহৃদয় কথা শুনে আসামীর মনে আশার সঞ্চার হবে। সে দ্বিগুণ উৎসাহে বলবে, আপনি বাবা, আপনি বাঁচালে বাঁচি মারলে মরি। জানি আপনি আমাকে প্রাণে বধ করবেন না।'

'কিন্তু বন্ধু, তুমি নিজেই বিচার করে দেখ। তোমার ত বোধ বুদ্ধি নেই তা নয়। আমি তোমার মতনই একজন মানুষ, আমি জানি আমার দয়ালু হওয়া উচিত, এমনকি তোমার মতন একজন ঘোরতর পাপিষ্ঠকেও আমার ক্ষমা করা কর্তব্য।'

'নিশ্চয়, আপনি পবিত্র সত্য উচ্চারণ করেছেন, ধর্মাবতার।'

'সত্যি, পরম পাপিষ্ঠের প্রতিও দয়ালু হওয়া কর্তব্য। কিন্তু কি করব বন্ধু, আমি যে আইনের হাতে বাঁধা। কথাটা বোঝ একবার, ঈশ্বরের প্রতি দেশের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে ত। আমি যদি আইন মোতাবেক কাজ না করি, সেটা কি আমার পক্ষে পাপ-কার্য হবে না?'

'ধর্মাবতার।'

'আচ্ছা আচ্ছা তাই হোক, জানি আমি পাপ করব, ঈশ্বরের কাছে, আইনের কাছে আমি অপরাধী হব, তবু আমি এ-বারের জন্যে তোমার প্রতি দয়ালু হব।

এবারকার মতন আমি তোমাকে সহজেই ছেড়ে দেব। কিন্তু তোমাকে দয়া দেখালে তাতে করে কি তোমার ক্ষতি করা হবে না? একবার দয়া করেছি দেখে তুমি যদি ভাবো, আমি বার বার তোমাকে দয়া করব, ত সে-সাহসে তুমি আবার করে অপরাধ করবে না কি, তখন কেন তোমাকে দয়া করেছিলাম চিন্তা করে আমার অনুশোচনা হবে না?'

ধর্মাবতার, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমি কখনো আপনাকে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী করব না।'

'বেশ, বেশ, তা ভবিষ্যতে তুমি ভাল হবে প্রতিজ্ঞা করছ ত?'

'ভবিষ্যতে আবার যদি আসি তখন যেন আপনি আমাকে খুন করে ফেলেন ধর্মাবতার। আমি শপথ করছি······'

'শপথ করো না। ওটা পাপ। আমি তোমাব কথা বিশ্বাস করছি, হাঁ কথা দিয়েছ ত, আর কখনো অন্যায় করবে না?'

'ধর্মাবতার!!!' চোখের জলে ভাসছে তখন আসামী। তার গলা থেকে কথা বেরোচ্ছে না।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' যেন আসামীর কান্নায় বিগলিত হয়েছেন এমন ভঙ্গি করে য়োরেবায়াৎনিকফ্‌ বললেন, 'তোমার চোখের জলের জন্যে, তুমি নেহাৎই অনাথ বলে, আমি তোমাকে দয়া করব। কি বল, তুমি অনাথ না?'

'হাঁ হুজুর, আমার বাপ মা নেই, আমি পৃথিবীতে একলা, হুজুর।'

'বেশ অনাথ বলেই, এবারকার মতন তোমার বেতের বাড়িগুলি হালকা করে দেব। কিন্তু সাবধান, জেনো, এর পরে আর ক্ষমা পাবে না।' তিনি এমন করুণাঘন গলায় বলবেন যে, আসামী কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে না পেয়ে পরম বান্ধবটির দিকে, যেন ঈশ্বর দেখছে এমন চোখে তাকিয়ে থাকবে।

তদবস্থ আসামীকে এবাব নেওয়া হবে 'গ্রীন ষ্ট্রীট'-এর দিকে। ড্রাম বাজতে থাকবে তখন। যুদ্ধের দামামা যেন। 'গ্রীন ষ্ট্রীট'-এর ওপর দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া হতে থাকবে আর দু'ধার থেকে সেপাইরা তার পিঠের ওপরে হাঁকড়াতে থাকবে লাঠির বাড়ি।

বাদ্যের ধ্বনি ছাপিয়ে, লাঠির শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাবে লেফটেন্যান্ট-এর গলা: 'মারো, মারো। শপাঙ্‌, শপাঙ্‌, মারো। ছাল তুলে দাও। আগাপাছতলা ফাটিয়ে দাও। ঝলসে দাও। অনাথ। জোরছে হাঁকড়াও। অনাথ! আরও জোরছে। অনাথ! চামড়া কাটুক, ছাল উঠুক, হারামজাদ্‌, লাগাও বাড়ি শপাঙ্‌, শপাৎ।'

এবং সেপাইরা মারতে থাকবে। প্রাণপণ মারবে। প্রাণপণে চিৎকার করবে কয়েদী। তার চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাবে, শরষে ফুল উড়বে আর ঝেরেবায়াৎনিকফ্‌ ছুটবেন তার পেছনে পেছনে গ্রীন স্ট্রীট বরাবর। ড্রামের বাজনা ছাপিয়ে লাঠির শব্দ ছাপিয়ে তাঁর পৈশাচিক হাসির গমক ছড়িয়ে পড়বে আকাশে, স্তব্ধ বাতাসে। হাসতে হাসতে পাঁজরা ব্যথা হবে তাঁর। তিনি পাঁজরা চেপে ধরে হাসবেন তখন। পাঁজরা চেপে ধরে হাসতে হাসতে তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না, বসে পড়বেন চেয়ারে, তখনও হাসির উচ্চশব্দ গমকে গমকে বেরিয়ে আসতে থাকবে তাঁর মুখ থেকে। তখন মানুষটির জন্যে তাঁর নিম্নতম কর্মচারীদের কষ্ট হবে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ থাকবে না তাঁর। তিনি তীব্র সুখে অপরিসীম উল্লাসে হাসতেই থাকবেন। মাঝে মাঝে অবশ্য থামতে হবে তাঁকে কেন না, পাঁজরা ব্যথা হয়ে গেছে তখন, পাঁজরায় লাগছে। থেমে থেমে হেসে উঠবেন তিনি আর হাঁক দেবেন, 'ছাল ছাড়াও, জোরছে হাঁকড়াও, হারামজাদাটাকে মারো, অনাথটাকে মারো।'

অথবা ঝেরেবায়াৎনিকফ্‌ অন্য কৌশলও নিতে পারেন।

কয়েদীটি তাঁর কাছে কাকুতি মিনতি শুরু করলে তিনি এবার আর দাঁত খিচোবেন না, কিংবা নরম কথার আলাপও করতে বসবেন না; এবার নূতন কায়দায় গম্ভীর হয়ে বলবেন, 'দেখ ভাই, সোজা সরল কথা, আমি তোমাকে পিটুনি দেব, আচ্ছা পিটুনি খাবে তুমি। তা তোমার জন্যে একটা কাজ করতে রাজি আছি আমি। তুমি যদি চাও, তোমাকে বন্দুকের কুঁদার সঙ্গে বাঁধব না আমি। তোমাকে কেউ টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে না। তোমাকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেব। তুমি গ্রীন স্ট্রীটের ওপর দিয়ে দৌড়বে, যত জোর পার দৌড়বে। দৌড়ে শেষ মাথায় যেতে পারলে বেঁচে গেলে। অবশ্য লাঠির বাড়ি তাই বলে আস্তে পড়বে না। ওরা প্রাণপণে মারবে তোমাকে, তা তুমি যদি খুব জোরে দৌড়ে চলে যেতে পার, বাড়ি কিছু কম পড়তে পারে তোমার পিঠে। কী, চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

ভয়ে এবং অবিশ্বাসে কয়েদীর মন বোবা হয়ে থাকবে, 'কে জানে,' সে চিন্তা করবে, 'এ-ভাবে শাস্তিটা হয়ত সহজ হতে পারে। আমি যত জোরে পারি দৌড়বো। তাতে করে বাড়িগুলি হয়ত খুব জোরে নাও লাগতে পারে, আর কিছু বাড়ি ত অবশ্যি এড়ানো যাবে। চিন্তা করে অপরাধী অবশেষে রাজি হবে।

'ঠিক আছে হুজুর, আমি দৌড়বো।'

'বেশ তাই হোক।' ভাল মানুষটির মতন সম্মতি জানাবেন ঝেরেবায়াৎনিকফ্। 'খুব সাবধান', সেপাইদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলবেন, 'ও কিন্তু সাংঘাতিক দৌড়বে।' অবশ্য এটা তাঁর ভালই জানা যে একটা লাঠিও কয়েদীটার পিঠ ফসকাবে না। সেপাইরাও জানে তার হাতের লাঠি ফসকে গেলে অদৃষ্টে কী জুটবে!

কয়েদী গ্রীন স্ট্রীট বরাবর প্রাণপণ ছুটবে কিন্তু তবু পনরটা সেপাই পার হয়ে যেতে পারবে না সে। ড্রামের ওপরে কাঠি যেমন পড়ে তেমনি বিদ্যুৎগতিতে তার পিঠের ওপরেও পড়বে চাবুকের বাড়ি আর আকাশ-ফাটা চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে সে মাটির ওপরে, একটা কাটা গাছ যেমন করে পড়ে কিংবা বুকে বুলেট-বেঁধা মানুষ।

তাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে তখন। তখন তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ, মারের চোটে গা কাঁপছে তার। হাত জোড় করে বলবে, 'ধর্মাবতার নিয়মমাফিক আমার হাত দুটো বন্দুকের কুঁদোয় বেঁধে টানা হোক। দৌড়োতে পারবো না আমি।'

আত্মপ্রসাদে হো হো করে হেসে উঠবেন তখন ঝেরেবায়াৎনিকফ্। নানা স্বাদে নিষ্ঠুরতা উপভোগ করার জুড়ি ছিল না ঝেরেবায়াৎনিকফ্-এর। সে ফিরিস্তি আর না। এবার লেফটেন্যান্ট স্মেকালফ্-এর কথা বলি।

স্মেকালফ্ বেত্রদণ্ডকে 'আর্ট' করে তুলতে পারেন নি; অর্থাৎ নিষ্ঠুরতার সুখ চেখে চেখে ভোগ করার জন্যে নিত্য নূতন ফন্দি ঝেরেবায়াৎনিকফ্-এর মতন তিনি আবিষ্কার করতে জানতেন না। কিন্তু নিষ্ঠুরতাকে উপভোগ করতে জানতেন তিনি ঝেরেবায়াৎনিকফ্-এর মতনই। স্মেকালফ্-এর কতিপয় ফিকিরের মধ্যে একটাই তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

দণ্ডিত আসামীকে আনা হবে। হাসতে হাসতে স্মেকালফ্ও এসে হাজির হবেন। এসেই আসামীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবেন তিনি। তার দেশ কোন্ জেলায়, গ্রামের নাম কি? সেখানে পাইন বেশী, না বার্চ? সেখানকার কোন্ জিনিস খেতে ভাল? কাছে-পিঠে নদী আছে, না লেক অথবা গভীর বন? এই সব অসংলগ্ন প্রশ্ন করা ও উত্তর শোনার মধ্যেই বার্চের এক বোঝা মোটা ডাল আসবে আর আসবে একখানা চেয়ার। সেপাইরা এক একজনে এক একখানা ডাল হাতে করে তৈরি হয়ে দাঁড়াবে। স্মেকালফ্ চেয়ারে বসে পাইপ ধরাবেন। তাঁর একটা খুব লম্বা পাইপ ছিল।

সৈন্যদের হাতে বার্চের ডাল দেখেই হতভাগ্যের মুখ শুকিয়ে উঠবে। স্মেকালফ্-এর এতক্ষণকার হাসি-মুখ ও অন্তরঙ্গ প্রশ্ন তার মনে যে আশার কুহক রচনা করেছিল, উবে যাবে। সে ডুকরে কেঁদে উঠবে, হুজুর, ধর্মাবতার, মা বাপ ইত্যাদি বলে আকুল প্রার্থনা জানাবে এবারকার মতন ক্ষমা করতে। স্মেকালফ্ আইনের দোহাই পাড়বেন না। বলবেন, 'ওসব কাকুতি মিনতি রাখ, এখন শুয়ে পড় দিখি নি বাছা, উবুড় হয়ে শুয়ে পড়।'

কয়েদী শুয়ে পড়বে। স্মেকালফ্ তখন শুধাবে, 'এবার প্রার্থনা কর, প্রার্থনাটা কী তোমার মনে আছে ?'

'মনে থাকবে না, বলেন কি হুজুর, আমি খৃষ্টান না! আমরা সেই ছোট্ট বেলাতেই এটা মুখস্থ করে ফেলি।'

'বেশ ত এবার আবৃত্তি কর।'

বেচারা জানে এ-আবৃত্তির পরিণাম কী হবে। আরও ত্রিশবার হয়ে গেছে এই কাণ্ড। আর সে যে জানে তাও স্মেকালফ্-এর অজানা নয়। এমন কি ডাণ্ডা-হাতে যে জল্লাদ তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা দর্শক যারা, এ-ঠাট্টাটা তাদেরও জানা। তবু স্মেকালফ্-এর ক্লান্তি সেই। একই ধরনের কৌতুক করতে তাঁর কখনো বিরক্ত বোধ হয় না। বরং তাঁর উজ্জ্বল চোখ ও ঝুঁকে পড়া মুখ দেখে মনে হবে এটা তিনি প্রাণভরে উপভোগ করছেন। তাঁর কারণ আর কিছু নয়, এ কৌতুকের রচয়িতা তিনি নিজে।

স্তোত্র আবৃত্তি করতে শুরু করবে আসামী। শুনতে শুনতে স্মেকালফ্ সামনে ঝুঁকে পড়বেন এমন কি পাইপ টানতে ভুলে যাবেন তিনি, অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে সেই মোক্ষম লাইনটির জন্যে প্রতীক্ষা করবেন। যথাসময়ে সে উচ্চারণ করবে, 'দাই কিংডম কাম' অমনি তিনি চীৎকার করে উঠবেন, 'নাউ গিভ হিম্ সাম।' ছন্দ মিলিয়ে দিয়েই তিনি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠবেন। সমবেত দর্শক উপস্থিত সেপাইরা দাঁত কড়মড়িয়ে উঠবে। দাঁত কড়মড় করে উঠবে যে জল্লাদ বেত মারছে তারও। যে-আসামী মার খাচ্ছে তারও দাঁত ঘষার শব্দ উঠবে। কিন্তু সে-শব্দ শোনা যাবে না কেন না যে মুহূর্তে 'নাউ গিভ হিম সাম' পংক্তিটি উচ্চারণ করবেন স্মেকালফ্ বাতাসে শাই শাই আওয়াজ তুলে বার্চের চাবুক এসে পিঠে পড়বে আসামীর। পাপিষ্ঠ-শরীরের মাংস কেটে যাবে ক্ষুরের মতন সূক্ষ্ম রেখায়। চামড়ায় রক্তের সূক্ষ্ম রেখা আঁকতে আঁকতে চাবুক ক্রমাগত পিঠে পড়তে থাকবে। পাশে দাঁড়িয়ে গুনতে থাকবে আর একজন লোক। আর খুশীতে

উজ্জ্বল মুখ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন স্মেকালফ্। দেখবেন, আর হাসবেন, হাসবেন আর খুশী হবেন কেন না 'কাম' শব্দটির সঙ্গে 'সাম' শব্দটির অপূর্ব মিলের আবিষ্কর্তা তিনি নিজে।......

যারা বেত মারে তাদের মনস্তত্ত্ব যেমন তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন দস্তয়েফ্স্কি তেমনি যারা বেত খায় তাদের মন জানতেও তিনি কম পরিশ্রম করেন নি।

যারা বেত খায় তাদের মধ্যে দু'রকম মানুষই আছে, কেউ ভীরু কেউ দুঃসাহসী। ভীরুরা বেত খাওয়ার আগেই ভয়ে আধ-মরা হয়ে যায়। দ্যুতফ্ ছিল সেই শ্রেণীর মানুষ। ভীরু মানুষ। সৈন্যবিভাগ থেকে পালিয়ে এসে সে গ্রামবাসীদের ওপরে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চালিয়ে চলেছিল। সেই অপরাধে তার যখন পনর বছরের জেল আর হাজার বেত্রাঘাত দণ্ড হল সে ভয়ে একেবারে কেঁচোটি হয়ে গেছে।

'বেত! ওরে বাব্বা। মরে যাব। আমি আর বাঁচব না।' সভয়ে স্বগতোক্তি করত সেই দুর্দান্ত খুনে মানুষটা, আর কাঁদত। যে-দিন তাকে বেত মারা হবে তার আগের দিন সে বেপরোয়া হয়ে একজন অফিসারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জানে, এ-কাণ্ড করার জন্যে তার শাস্তি মকুফ হবে না বরং আরও কঠোর হবে। তবু নূতন অপরাধের বিচারের অপেক্ষায় তার বেত্রদণ্ড কয়েক দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টার জন্যেও স্থগিত থাকবে, সেই তার তখন পরম লাভ। বেটা এমন ভীরু ছিল যে, অফিসারের ওপরে ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে তাঁকে আঘাত করে নি কেবল ভয় দেখিয়েছিল। ফলত হাজার বেতের জায়গায় এবার তার দণ্ড বেড়ে হল দু'হাজার বেত। রায় শুনে সে এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে 'গ্রীন স্ট্রীট'-এ নিয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে সে মস্ত এক জগ ভোদ্‌কা ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেললে। সারা দিনটাই সে ভোদ্‌কা গিলছিল তার ওপরে আবার এক জগ পুরো ভোদ্‌কা খেয়ে সে তার অনুভূতিকে একদম ভোঁতা করে ফেললে।

বেত খাওয়ার আগে, পনের বিশ মিনিট আগে পেট ভরে ভোদ্‌কা খাওয়া জেলখানার একটা খুব চালু প্রথা। এদের বিশ্বাস ভোদ্‌কায় পেট ভর্তি থাকলে লাঠির বাড়ি সহ্য করার শক্তি বাড়ে। যন্ত্রণা কম মনে হয়। তাই অনেক দিন বসে অনেক কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে হতভাগারা ভোদ্‌কা কেনার পয়সা জমাতে থাকে। সেই সঞ্চিত পয়সা সব খরচ করে বেত খাওয়ার আগে পেট পুরে

মদ খায়। কিন্তু যে-কথা বলছিলাম। দ্যাতফ্‌ পেট পুরেও ভোদ্‌কা খাওয়ার অল্প পরেই বমি করতে সুরু করল। বেত খাওয়ার হাত থেকে তাতে করে লোকটা রেহাই পেল বটে কিন্তু বমি করতে করতে রক্ত উঠতে থাকল তার, আর তাইতে দিন তিনেক ভুগে সে মারা গেল।

বেতের শাস্তি এমনই ভয়ংকর যে শুধু বেত খেতে হবে এ-কথা ভাবতে তাবড় তাবড় দুর্ধর্ষ জোয়ানরা দ্যাতফ্‌-এর মতন প্রায়শ মুষড়ে পড়ে, নেতিয়ে ন্যাকড়া হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কেউ শেষ অব্দি অদ্ভুত শক্ত থাকতেও পারে, দেখেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তেমন একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল হাসপাতালে। জেলের হাসপাতালে প্রায়ই যেতে হয়েছে দস্তয়েফ্‌স্কিকে। তিনি হামেশাই পেটের অসুখ, বাতের ব্যামো, অনিদ্রা কিংবা হিসটিরিয়ায় ভুগেছেন জেলে। একবার তেমনি এক অসুখ নিয়ে হাসপাতালে এলে পরিচয় হল তার ওরলফ্‌-এর সঙ্গে।

মানুষটা ছিল হিংস্র জন্তুর মতন ভয়ানক। দুর্দান্ত মনোবল আর প্রচণ্ড গায়ের জোর ছিল তার। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় অনেক শিশু বৃদ্ধ ও নারীকে নির্মমভাবে খুন করেছিল সে। আর সে-কথা গর্ব করে বলতে এতটুকু দ্বিধা ছিল না তার। লোকটা ছিল একজন পলাতক সৈনিক। সৈন্যবাহিনীতে একটা কুকীর্তি করে পালিয়ে এসে সে লুটতরাজ খুনখারাবি পেশা করে নিয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হল, সে অচৈতন্য। এলোমেলো চুলে ঢাকা তার বিবর্ণ মুখ ভয়ানক দেখাচ্ছিল। সারা পিঠে তার লম্বা লম্বা এলোপাথাড়ি রক্তের দাগ। বেত্রাঘাতের রক্তমাখা দাগগুলি ফেটে ফুলে নীল শিরা পড়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে। থানে থানে রক্ত চোয়াচ্ছে। সারারাত কয়েদীরা তাকে পাহারা দিয়েছে, জল খাইয়েছে, ঘায়ে ওষুধ লাগিয়েছে, এ-পাশ ও-পাশ করে দিয়েছে দরকার মতন।

দেখতে দেখতে দস্তয়েফ্‌স্কি ভেবেছিলেন, মানুষটা আর বাঁচবে না, অচৈতন্য অবস্থাতেই মরে যাবে মানুষটা। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে অবাক করে দিয়ে পরের দিনেই মানুষটা উঠে দাঁড়াল। শুধু উঠে দাঁড়াল না, দরদালানে খানিক হেঁটেও বেড়াল।

তিন হাজার বেতের অর্ধেকটা দেওয়া হলে তখন সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। উপস্থিত ডাক্তারের নির্দেশে তখন তাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

তার মানে একেবারে রেহাই নয়। অবশিষ্ট বেত্রাঘাত পাওনা থাকল তার। সুস্থ হয়ে উঠলে তখন নিতে হবে।

ওরলফ্-এর চেহারাটা কিন্তু মোটেই দস্যুর মতন ছিল না। ছোটখাট পাতলা মানুষটি বিচারাধীন কয়েদী হিসেবে দীর্ঘদিন হাজত খেটে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল, তার ওপরে বেত্রাঘাতের জন্যে অপেক্ষমান কয়েদীদের যা হয়, জীর্ণ বিবর্ণ জ্বরো-রোগীর চেহারা হয়ে গিয়েছিলে তার। তৎসত্ত্বেও আশ্চর্য দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল ওরলফ্। বিস্ময়কর মনের জোর লোকটার। দস্তয়েফ্‌স্কির কৌতূহলকে এমন করে উদ্দীপ্ত করেছিল ওরলফ্ যে, তিনি এগিয়ে এসে আলাপ জমিয়েছিলেন তার সঙ্গে।

ওম্‌স্ক্-এর পথে তোবোলস্ক্-এ একটা দস্যুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। নাম তার কোরেনেফ্। তখনও তিনি তার পরিচয়, নাম ধাম জানেন না, কেবল পাশে বসে দেখছিলেন তাকে। যেমন চেহারা তেমনি চোখের দৃষ্টি। কেবল কাছে বসেই দস্তয়েফ্‌স্কি নিজের বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ভয়ের গুড়গুড় ধ্বনি টের পেয়েছিলেন এমনই অমানুষ চেহারা আর হিংস্র দৃষ্টি ছিল তার। যেন একটা জঙ্গলের জানোয়ারের কাছে বসে আছেন মনে হয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। জানোয়ারের ক্ষুধা লোকটার মনে, শরীরে। মানুষের আত্মা বলে ওর মধ্যে কিছু আছে বলে ভাবতে পারেন নি তিনি। শুধু চোখে দেখে মনে হয়েছিল, লোকটা কেবল দেহ নিয়ে বেঁচে আছে, দেহের বাসনা, দেহের ক্ষুধার ওপরে আর কিছু জানে না সে, আর কিছুর সঙ্গে পরিচয় নেই তার।

ওরলফ্‌কে দেখে সেই কোরেনেফ্-এর কথা মনে পড়ল তাঁর। বেত্রাঘাতের শাস্তি যদি হত কোরেনেফ্-এর ত সে পাতার মতন থরথর করে কাঁপত। কাঁপতে কাঁপতেই মরে যেত লোকটা, যদিও মানুষের গলা কাটতে তার এতটুকু হাত কাঁপত না।

কিন্তু ওরলফ্ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। শরীরের ওপরে নিঃসন্দেহে তার অসামান্য দখল। ওরলফ্‌কে দেখেই তিনি নিশ্চিত জেনে গেলেন মানুষের মনোবলের সীমা অন্ত নেই। সে অপরিসীম মনোবলের কাছে কঠিনতম দৈহিক শাস্তি ও নির্মমতম উৎপীড়নও তুচ্ছ হয়ে যায়, যেতে পারে। মানুষের মনোবল পৃথিবীর কিছুকেই কিছুতেই ডরায় না। এই মনোবলী মানুষরা থামতে চায় না, থামতে জানে না। লক্ষ্যে পৌঁছনোই তাদের জেদ। সে-জেদ চরিতার্থ করতে তারা কোন বাধা কোন বিঘ্নকেই পরোয়া করে না। এরা এগোবেই, এদের

থামাতে পারবে না কেউ। এরা পৃথিবীর তাবৎ বিষয়কে তুচ্ছ করে উচ্চতর চিন্তা বহন করে চলতে থাকে, সে-চিন্তা চোখের দৃষ্টিতে তার কখনো স্পর্ধার মতন ঝিকিয়ে ওঠে না। ওটা একটা স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারের মতন কাজ করে তার মধ্যে। এমন মানুষকে কোন দেশের কোন শাসকই তাঁর তাঁবে রাখতে পারেন না। সে সব কিছুর দিকেই এমন শান্তভাবে তাকায় যেন কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এদেরই মধ্যে যারা পথভ্রষ্ট তারই একজন ওই ওরলফ্‌।

এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে কার না ইচ্ছে যাবে। দস্তয়েফ্‌স্কি স্বতঃই এগিয়ে এলেন, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে তাকে গ্রহণ করল ওরলফ্‌।

মানুষটি আদৌ বাচাল নয়। তাই বলে খুব চাপাও নয়। সে স্বচ্ছন্দ সরল এবং স্পষ্টভাষী। নিজের সম্পর্কে তার কিছুমাত্র উচ্ছ্বাস কি অতিশয়োক্তি ছিল না। অত্যন্ত সাদা চোখে দেখত সে সব এবং তেমনি সাদামাঠা সরল ভাষায় বলত মনের কথা।

দস্তয়েফ্‌স্কির প্রশ্নের জবাবে সে অকপট কণ্ঠে বলেছিল, 'আমি এখন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে চাই, আমার আর দেড় হাজার বেত পাওনা আছে, ওটা পেলেই আমি মুক্ত পাখি। সে মুখ টিপে হেসেছিল। বলেছিল, 'সত্যি বেত খাওয়ার আগে অব্দি আমার ধারণা ছিল, অত বেত আমি সহ্য করতে পারব না, পাঁচ সাত শ' বেত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবো আমি। পুরনো কয়েদীদের কাছে শুনে শুনেই সে-ধারণা হয়েছিল আমার; কিন্তু বেত খেয়ে দেখলাম, যত ভয় পেয়েছিলাম ব্যাপারটা তত ভয়ানক নয়। তাই চাইছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ পর্বটা শেষ হোক। তখন আর আমাকে আটকায় কে? এখান থেকে আমাকে আর এক জেলে পাঠানো হবে পনর বছরের ফাটক খাটতে। কিন্তু সে আর আমি খাটছি না। পথেই পালাব।'

এমন ভাবে কথাগুলি বলেছিল ওরলফ্‌ যেন অতিশয় সাধারণ একটা ব্যাপার। চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা পাঁয়তারার কিছু নেই এর মধ্যে।

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের জীবন সম্পর্কে যত কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, সে নির্বিবাদে তাঁর সে-কৌতূহল মিটিয়েছে, কোথাও দ্বিধা করে নি, সংকোচে থেমে যায় নি কোথাও। যখন সে টের পেয়েছে দস্তয়েফ্‌স্কি তার বিবেকের দরজায় ঘা দিচ্ছেন, তার মধ্যে কোন অনুশোচনা আছে কিনা, আছে কিনা কোন পাপবোধ বুঝতে চেয়েছেন, ওরলফ্‌ অবশ্য তখন সচকিত

হয়ে উঠেছে। গভীর চোখে তাকিয়েছে দস্তয়েফ্‌স্কির দিকে। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছে। যেন এ কোন বালকের প্রশ্ন, অবান্তর। উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কেন যে নিষ্প্রয়োজন দস্তয়েফ্‌স্কির অন্তরোদ্‌ঘাটনী দৃষ্টি তাও আবিষ্কার করেছে। তিনি জেনেছেন—এরা তাদের কোন কৃতকর্মকেই পাপ মনে করে না, কেন না তারা দেখে এসেছে একটা শ্রেণী সর্বদাই আর একটা শ্রেণীর ওপরে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। নির্যাতন করাটাই শক্তিমানের ধর্ম এরা জেনেছে, অতএব অনুশোচনা কিসের? পাপবোধ কেন?

পরের দিন ওরলফ্‌-এর সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কিও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। সে গেছে গার্ডের ঘরে, দস্তয়েফ্‌স্কি ফিরে এসেছেন তাঁর ব্যারাকে। বিদায় নেওয়ার সময় সে পরম প্রীতিভরে হাতে হাত রেখেছে দস্তয়েফ্‌স্কির। ওরলফ্‌-এর মুখ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, ওর আত্মপ্রত্যয়ের অবধি নেই। অন্যপক্ষে দস্তয়েফ্‌স্কিকে যেন সে দেখছে অত্যন্ত কৃপার চোখে, যেন কত করুণার পাত্র। বটেই ত, দস্তয়েফ্‌স্কির মনে হয়েছে, আমার মধ্যে সে একটা বশংবদ মানুষকেই দেখছে। দুরন্ত দুর্নিবার কোন শক্তির উৎস, যা সব ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যেতে ছটফট করে, তাকে চোখে পড়ে নি আমার মধ্যে। তার মতন মানুষের তুলনায় আমরা ত স্বভাবত নিস্তরঙ্গ।

পরের দিনই আবার তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'গ্রীন ষ্ট্রীট'-এ। তার পাওনা অবশিষ্ট দেড় হাজার বেত খেয়ে আবার সে হাসপাতালে গেছে। তখন সে মুমূর্ষু। তবু তখনও তার চোখে স্বপ্ন—মুক্তির স্বপ্ন, খোলা রাস্তা, মাঠ, অরণ্য, স্বাধীন জীবন। কিন্তু সে-জীবনে আর সে ফিরে যেতে পারে নি। সেই হাসপাতালে, সেই বিছানায় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

ভুক্তভোগীরা বলেছে, বেতের বাড়ি বড় প্রচণ্ড। লাঠির বাড়ির চেয়ে বার্চের ডালের বাড়ি বেশী সাংঘাতিক—সারা গায়ে যেন আগুনে পোড়ার জ্বালা ছড়িয়ে দেয়। লাঠির বাড়িতে পেশীর ক্ষতি হয় কিন্তু বার্চের ডাল কেটে ছিঁড়ে তছনছ করে দেয় স্নায়ুর জাল। তাই কখনো কখনো বার্চের পাঁচ সাত শ' মার খেয়েই মরে গেছে অনেক মানুষ। কিন্তু পরম বিস্ময়ের হলেও সত্যি কেউ কেউ দু'হাজার বাড়ি সহ্য করেও বেঁচে গেছে। অবশ্য সে বার্চের মার নয়, মোটা লাঠির মার।

কিন্তু সাংঘাতিক ও সাংঘাতিকতম-র মধ্যে পার্থক্য যাই থাক দুটোই যে নির্মম এবং ভয়াবহ তাতে সন্দেহ কি! সে-ভয়াবহ শাস্তিও সহ্য করে কেউ

কেউ, সহ্য করে বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু কেমন করে? সে-রহস্যের উত্তরও পেয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি: বেত মেরে যেমন কেউ কেউ তীব্র সুখ অনুভব করে তেমনি প্রচণ্ড বেত্রাঘাতও কারো কারো মধ্যে প্রবল যৌন সুখ সঞ্চারিত করে। মর্ষকামী মানুষরা সেই সুখানুভবের তীব্রতায় অভিভূত থেকে শারীর-যন্ত্রণা অতিক্রম করে আসতে পারে বলেই বেঁচে যায়। যাদের শরীরে তেমন তীব্র সুখানুভব সঞ্চার হয় না মরে তারাই। অথবা তীব্রসুখানুভূতির আরোগ্য-ক্ষমতাকেও যখন ছাড়িয়ে যায় বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা, তখনই মারা পড়ে সে। এ-ছাড়া কঠিন মনোবলের শক্তির কথা আগেই বলেছেন তিনি।

মর্ষকাম এবং ধর্ষকাম এ দুটোরই পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর নির্বাসনের জীবনে। ধর্ষকামীরা মানুষকে আঘাত করার অধিকার পেলে আর কিছু চায় না। উৎপীড়নের মধ্যেই সে তার অহংকে পরিপূর্ণ ভাবে বোধের মধ্যে অনুভব করে।

'গ্রীন স্ট্রীট'-এ যারা বেত মারে তারা সেপাই। তাছাড়া অন্য সময় ভিন্ন স্থানে একক বেত মারার শাস্তিও আছে। সে-বেত যারা মারে তারা হল 'জল্লাদ'। কয়েদীদের মধ্যে থেকেই বেছে নিয়ে জল্লাদ করা হয়। এই জল্লাদরা যাকে মারবে তার কাছে ঘুষ চায়। ঘুষ চাইলে তখন দিতেই হয়। অবশ্য না চাইলেও দিতে হয়। তাই বলে বেত্রাঘাতটা কি পিঠের ওপরে কম জোরে এসে পড়ে? উহুঁ, ঘুষ দিলেও যা, না দিলেও তাই। তবু কেন দেয় কয়েদী? না, না-দিলে মার খাওয়ার সময় মনে হবে, ঘুষ দেই নি বলে বেটা এমন গায়ের জোরে মারছে আমাকে। অন্তপক্ষে ঘুষ দিলে মনে হবে, ঘুষ দিয়েছি তাই, নয়ত বেটা আরও জোরে, ভীষণ জোরে মারত আমাকে। অথচ পিঠ ফাটে দু জনেরই,—যে ঘুষ দেয়, যে ঘুষ দেয় না—রক্ত ঝরে, চামড়া ছিঁড়ে যায়, থাবলা থাবলা মাংস উঠে আসে নানা থান থেকে।

ধর্ষকামের সে-আর এক প্রকরণ। ঘুষ নিক আর না-নিক হাতে বার্চের ডাল এবং তার নিচে একটা উদম পিঠ পেলে ধর্ষকামীর হৃদপিণ্ডের রক্ত সারা গায়ে নেচে ওঠে, সুখে টগ্‌বগ্‌ করতে থাকে সে। আর এমন না হলে সে জল্লাদ কিসের! এমন মানুষকেই ত বেছে বেছে জল্লাদ বানানো হয়। এই খুনী জল্লাদ থেকে প্রেমিক, স্তনন্ধয়, দেশপ্রেমিক তীব্র জীবনবোধে অস্থির বিপন্ন আড়াই শ' আর-মুখো মানুষের মধ্যে নির্বাসনের নরক-জীবন কেটেছে দস্তয়েফ্‌স্কির। সেই আড়াই শ' মানুষের চরিত্র বুঝতে বুঝতে, হিস্টিরিয়ায়, আমাশয়ে, বাতে অনিদ্রায়

ভুগতে ভুগতে, আলাবাসটার ভাঙতে ভাঙতে, ইটের বোঝা বইতে বইতে, গাঁইতি মেরে বরফ কাটতে কাটতে নরকের চার বছর কেটেছে।

১৮৫৪, ২ মার্চ পায়ের শিকল হাতে করে দু' মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আশ্চর্য, এই ছিন্ন-শিকল মুহূর্ত আগেও তার পায়ের বেড়ি হয়ে ছিল।

অনেক পরে এক বন্ধু দস্তয়েফ্‌স্কিকে বলেছিলেন, 'আপনাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে সরকার দারুণ অবিচার করেছিল আপনার ওপরে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আমার ভাগ্যবিধাতা আমাকে সেখানে পাঠাতই, যেমন করে হোক আমাকে সেখানে যেতে হত। কেন না জীবনের রহস্য উন্মোচন করে তা পরিবেশনের দায় বর্তেছে যে আমার ওপরে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি আর এক জায়গায় লিখেছিলেন: "নির্বাসনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার জন্যে আমি আমার ভাগ্যকে বারবার প্রশস্তি জানিয়েছি। চার বছরের নির্বাসন আমার মনে চিন্তায় বিশ্বাসে, আমার সমগ্র অস্তিত্বে কী বিপুল বিবর্তন ঘটিয়েছে আমি শত চেষ্টায়ও তা কোন মতে বোঝাতে পারব না।··· সেখানে না গেলে আমি নিজেকে কখনোই বিচার বিশ্লেষণ করতে পারতাম না, নিজেকে এমন করে জানতে চিনতেও পেতাম না কোনদিন।···নিঃসঙ্গ সশ্রম কারাদণ্ডের জীবনে মানুষ আকুল হয়ে একটা বিশ্বাসের অবলম্বন খোঁজে যেমন শুকনো ঘাস খোঁজে বৃষ্টিকে। এবং অবশেষে মানুষ সে বিশ্বাসের অবলম্বন পায়ও। কেন না দুঃসময়ের পটভূমিতেই বিশ্বাসের সত্য উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে।'

যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে খাঁটি সেই দুঃসময়ে অর্জিত বিশ্বাসই ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির সকল বোধের ও শিল্পী সত্তার মৌল উপাদান।

চার

যেন কবর থেকে বেরিয়ে এলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। যেন নূতন করে জন্ম হল তাঁর। পাখির ডানার মতন দু' হাত মেলে দিলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে কিছু দূর এগিয়ে গেলেন; ডাণ্ডা বেড়ির ভারমুক্ত পালকের শরীর যেন তাঁর এখন। ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন 'মৃত্যুপুরী'কে আর একবার দেখলেন তারপর চীৎকার করে বলে উঠলেন—'মুক্তি! মুক্তি!'

মাথার ওপরে অসীম আকাশ, পায়ের তলায় দিগন্ত জোড়া সমতল। সামনে কল্লোলিত ইরতিশ। তিনিও ওই ইরতিশ-এর মতনই মুক্ত। কালের পথে তাঁর দিগ্বিজয়ী গতির ধারা আর রোখে কে! উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আর একটা বছরের বাধ্যতামূলক খাটুনি সামনে, তা হোক, তবু তিনি মুক্ত। অর্ধমুণ্ডিত মস্তক নেই, নেই কয়েদখানার তাপ্পিমারা পোশাক। ডাণ্ডা-বেড়ি খুলে পড়েছে!—আর যা তিনি চান, নিজের শক্তিতে অর্জন করে নেবেন। সেই সংকল্পে বুক ভরে উঠেছে এখন দস্তয়েফ্‌স্কির।

কাতোরগা থেকে তাঁকে পাঠানো হল সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌-এ। এখানে সাইবেরিয়ার পদাতিক বাহিনীতে সাধারণ সৈনিকের জীবন কাটাতে হবে তাঁকে এক বছর। শাস্তির এটা শেষ বছর। তবু দস্তয়েফ্‌স্কির মনে হল এটা শাস্তি নয়, নবজীবনের সংকট পথে নূতন করে তাঁর দুরূহ সংকল্পের পদযাত্রা।

সৈনিক-জীবন আদৌ সহজ ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির পক্ষে। সকাল বেলা উঠে ড্রিল, মার্চিং, ড্রেস-প্যারেড তারপর শহর থেকে বিশ মাইল দূরে বনে গিয়ে গাছ কাটা। সে-কালে সামরিক শৃংখলায় কঠোরতার সীমা ছিল না। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে বার্চের ডাল পিঠে পড়ত, ঘুষির চোটে দাঁত উপড়ে যেত। সৈন্য-ব্যারাকে থাকার জায়গাটা কাতোরগার কয়েদখানা থেকে খুব বেশী উন্নত ছিল না। ছোট ছোট খোপে দু'জন করে সৈন্যের শোবার জায়গা—বিছানা বলতে সেখানে কাঠের পাঠাতন, বালিশ বলতে চটে মোড়া খড়ের আঁটি। খাওয়া বলতে রুটির সঙ্গে শাক-সবজি-মাংস দিয়ে ফোটানো থকথকে ঝোল। লোহার বাটি থেকে তা কাঠের চামচ দিয়ে তুলে তুলে খেতে হত। সে চামচও বানিয়ে নিতে হত নিজেদেরই কিন্তু কাতোরগা জেলে যিনি চার বছর কাটিয়ে এসেছেন তাঁর কাছে এ-জীবন নিঃসন্দেহে স্বর্গ।

এ-সময়ে দস্তয়েফ্‌স্কি মিখাইলকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, "সৈনিকের পোশাকে আমি এখনো অবশ্য সেই কাতোরগা জেলের বন্দীদশাতেই আছি তবে সেখানকার সেই অমানুষিক যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটেছে। আমার স্বাস্থ্য ভালই যাচ্ছে এখন। মাস দুই হল এখানে এসেছি এর মধ্যেই আমার চেহারা ফিরে গেছে। গায়ে বল পাচ্ছি। সেই স্নায়ু-রোগটাও অনেকটা সামলে উঠতে পেরেছি মনে হয়। হামেশা আর ফিট হচ্ছে না আমার। কমে কমে সে এখন তিন-চার মাসে একবার এসে ঠেকেছে।

সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌-এ তাঁর স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। হোক সীমাবদ্ধ তবু ত

স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা-বোধ তাঁর মধ্যে এমনই তীব্র ছিল যে, তার কাছে অর্থকষ্ট, সামান্য সৈনিকের পদ ও আসামী বলে মানুষের তাচ্ছিল্যও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

কাতোরগা থেকে সেমিপালাতিন্স্ক্-এ এলে তাঁর কোম্পানির ক্যাপ্টেন ভেদেনিএফ্ তাঁর অধস্তন সারজেনটকে বলেছিলেন—'এই লোকটার ওপর কড়া নজর রেখো। নির্বাসনের চার বছর সে কাতোরগার কয়েদখানায় কাটিয়ে এসেছে। ও যেন না একবিন্দু প্রশ্রয় পায়।' অতএব বোঝাই যাচ্ছে স্বাধীনতার যে সুখে ময়ূরের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি তা স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল অনেকদিন। পায়ের শিকল কাটা গিয়েছিল বটে, অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত জায়গায় থাকতে পারছিলেন তাও ঠিক, কিন্তু এখনও যে তিনি দণ্ডিত আসামী এ কথা তাঁকে ভুলতে দেয় নি তাঁর সারজেন্ট্। কোন দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে সারজেন্টের হাতের চাটি তাঁর মাথায় পড়ত। অফিসারদের সামনে পড়লে হেঁকে বলতেন, 'এই, ওভার কোটটা পরিয়ে দে ত। পাইপটা এগিয়ে দে।' যেন পদাতিক সৈন্য নয় একজন গোলাম।

এ-সব যদি বা সহ্য হত, অসহ্য লাগত বার্চের ডাল হাতে সৈন্যদের সঙ্গে 'গ্রীন স্ট্রীট'-এ লাইন দিয়ে দাঁড়াতে আর শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত হতভাগ্যদের পিঠে সেই বার্চের লাঠি ভাঙতে। তখন সৈন্যদের পেছনে চক্ হাতে চৌকিদারী করতেন ক্যাপ্টেন ভেদেনিএফ্ নিজে। লক্ষ্য করতেন কোন্ সেপাই বাড়ি মারতে দ্বিধা করছে কি আস্তে বাড়ি মারছে। তেমন দেখলে তিনি হাতের চক্ দিয়ে তার পিঠে চিহ্ন এঁকে দিতেন। তার মানে অতঃপর ওই পিঠেও বেত পড়বে কেন না, বেত মারতে দ্বিধা করে সে-ও শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধ করেছে। কাতোরগার জেলে যারা বেত খেত তাদের কাছে দস্তয়েফ্স্কি জানতে চাইতেন মারের অভিজ্ঞতা, লাঠির বাড়ির জ্বালা যন্ত্রণার কষ্ট। সেই পরোক্ষ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হল এখানে এসে। শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে নিজের পিঠেই বেত পড়ল কয়েকবার। একবার মারের চোটে ফিটই হয়ে পড়লেন তিনি।

১৮৫০-এর সময়কার সেমিপালাতিন্স্ক ছিল একটা বিরাট পতিত অঞ্চল। কিরঘিজ এলাকার চীন-সীমান্তে ইরতিশ-এর দক্ষিণ পারের এই জায়গাটির নাম সেমিপালাতিন্স্ক্ হয়েছিল সেখানকার সাতটি প্রাসাদের নাম অনুসারে। এই প্রাসাদ সাতটি ছিল প্রাচীন মঙ্গোলিয়ার যাযাবর জাতির একটি প্রধান কেন্দ্র। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে সেকালের অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ

উদ্ধার করেছেন এখান থেকে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি রুশ-সম্রাট এখানে একটি সীমান্ত সেনা-নিবাস স্থাপন করেন। এই সেনা-নিবাসকে কেন্দ্র করে যে-শহর গড়ে ওঠে সামরিক অসামরিক লোকজন নিয়ে সেখানে সাকুল্যে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ছ'হাজার। আর উল্লেখ্য বলতে ছিল একটি চার্চ, একটি সরকার পরিচালিত ওষুধের ফারম্যাসি, আর শুকনো খাদ্য-সামগ্রীর দোকান একটা, একটা মদ তৈরির কারখানা। এ-ছাড়া খচ্চর আর উটের পিঠে চাপিয়ে তাসখন্দ, বোখারা ও কাজান থেকে বেনেরা বেসাতি নিয়ে আসত। তারা তাঁবু ফেলত কিংবা হাটের চালা-ঘরে পসরা সাজিয়ে বসত। জিনিসপত্রের দর ছিল আগুন। পদাতিক সৈন্যের মতন সাধারণ মানুষও তার ধাবে কাছেও ঘেঁষতে পেত না। দস্তয়েফ্স্কি কখনো কখনো বাজারে বেড়াতে আসতেন। দাদার দয়ার দানে জীবন-ধারণ ছিল তাঁর তখন, তাই তিনিও বিশেষ কিছু কিনতে পারতেন না। তাঁর একমাত্র বিলাস ছিল মাঝে মধ্যে সাদা রুটি কেনা কিংবা খাস্তা বিস্কুট।

শহর জুড়ে সর্বত্র ছিল কাঁচা রাস্তা। শরৎ হেমন্তে সে যেমন কাদায় থল্ থল্ করত, তেমনি সারা গ্রীষ্মটা থাকত আগুলফ ধুলোয় ডুবে। কোথাও শাক-সবজী দূরে থাক ঘাসও গজাত না। যত বাড়ি ঘর সবই ছিল একতলা আর কাঠের কুঁদোয় তৈরি। তাদের ছায়ার আনাচ-কানাচেও ঝোপঝাড় আগাছার নামগন্ধও দেখেন নি দস্তয়েফ্স্কি। বৃক্ষলতা-তৃণশূন্য একটা মরুভূমি মনে হত জায়গাটাকে। কিন্তু সেই মরু সদৃশ শহরের বাইরে অদূরেই চোখে পড়ত অরণ্য— সেখান থেকে ফার বার্চ পাইন উইলোর অরণ্য শতাধিক মাইল অবধি বিস্তৃত ছিল।

রাত্রিবেলা শহরের রাস্তা জমাট পিচের মতন কালো অন্ধকারে ঢেকে থাকত! পথে বাতি বলে কোন বস্তু ছিল না। সারারাত ভরে অসংখ্য কুকুরের চিৎকার শোনা যেত চতুর্দিকে। তাই কেবল বোঝা যেত এখানে লোকালয় আছে, মানুষ বাস করে। কিন্তু মানুষ বাস করলেও বাড়িগুলিতে সাজ-সজ্জার বড় বিশেষ রকমারি ছিল না। নিতান্ত মামুলি যা-না-হলে-চলে-না, নিয়েই চলে যেত সেখানকার মানুষের সংসার।

সপ্তাহে ডাক আসত মাত্র একবার। সারা শহরে জন পনর মানুষ দৈনিক কাগজ, সাপ্তাহিক, মাসিক রাখত। আর লেখাপড়া জানা অবশিষ্টরা সেই পনর জনের বৈঠকখানায় এসে জড় হত। মসকো আতে পিতার্সবুর্গে কী ঘটছে পড়ত বা শুনত, শেষে আলোচনা সমালোচনা করত। তর্কের ঝড় উঠত তখন।

দস্তয়েফ্স্কির কমেণ্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট করনেল বেলিকফ্। ভদ্রলোক নিজে পারৎপক্ষে খবরের কাগজ ওলটাতে চাইতেন না। ডাক এলে ডেস্কে পড়ে থাকত। কেউ খবর জানতে এলে সে জোরে জোরে পড়ত, তিনি শুনতেন। তিনি যখন একদিন জানলেন, তাঁর র‍্যাঙ্কে একজন খুব পড়াশোনাওলা পদাতিক এসেছে, ডেকে পাঠালেন: 'তুমি আমাকে রোজ খবরের কাগজ বই পড়ে শোনাবে। তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না।'

সেই থেকে ভাগ্য ফিরে গেল দস্তয়েফ্স্কির। মার-খাওয়া আর মার-দেওয়ার দুই কঠিন যন্ত্রণার কাজ থেকে রেহাই পেলেন তিনি অধিকন্তু সেমিপালাতিন্স্ক্-এর অফিসার সমাজের দুয়ার খুলে গেল তাঁর কাছে, শিক্ষিত সৈনিক বলে একটা মর্যাদার আসন মিলল তাঁর। সর্বোপরি ব্যারাকের বাইরে ঘর ভাড়া নিয়ে স্বাধীন ভাবে বাস করার অধিকার পেলেন। বাসা নিলেন শহরের একটেরেতে এক সৈনিকের বিধবার বাড়িতে।

বাড়িটির সুনাম ছিল না। কিন্তু দস্তয়েফ্স্কি সে খবর রাখতেন না। এসে জানলেন। অবশ্য তাতে করে দস্তয়েফ্স্কির লাভই হল। সেই যে ১৮৪৯-এর ২৩ এপরিল জারের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল, সেই থেকে দীর্ঘ এতটা কাল জীবনের যত কিছু প্রিয় ও রমণীয় সব থেকে বঞ্চিত তিনি নরকের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন কেবল, আর ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এখন মুক্তি পেয়ে ক্ষুধার্ত তিনি সেই অতীত অভ্যাসের জীবনে ফিরে আসতে চাইবেন, স্বাভাবিক। ক্ষুধার্ত বেড়াল দুধের সন্ধানে বাড়ি বাড়ি ঘোরে—দস্তয়েফ্স্কিকে আর সে ধকল সইতে হল না! ভাগ্য তাঁকে একেবারে ভরা দুধের কড়ার সামনে এনে হাজির করে দিলে। বাড়িওলির দুই মেয়ে। একটি ষোল আর একটি সতর। সপ্তদশীর চেয়ে ষোড়শীকেই ভাল লেগে গিয়েছিল দস্তয়েফ্স্কির। চতুর চঞ্চল যুবতী তার তনু-শরীর নিয়ে তাঁকে ঘিরে প্রজাপতির মতন ওড়া-ওড়ি করে। দস্তয়েফ্স্কি ডিউটি থেকে ফিরে এসেছেন টের পেলেই ছুটে আসে ভেতুশকা। তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেয়। জামার বোতাম খুলে দেয়। আর জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে, জামার বোতাম খুলতে খুলতে, ঘাড় কাত করে চোখের কোণে তাকায়, ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। জামা জুতো ছাড়া হয়ে গেলে পায়জামা পিরান চটি এগিয়ে দেয় তারপরে ছোটে জল আনতে। এক গামলা জল এনে দিলে তিনি হাত মুখ ধুতে থাকেন। ভেতুশকা তখন টেবিল চেয়ার বিছানা আলনা গোছায়।

টেবিলে এক প্রস্ত লেখা কাগজ পেয়ে একদিন শুধোল, "এগুলি কী?"

"আমি অনেক দিন সাইবেরিয়ার জেলে ছিলাম ত এখন অবসরে বসে বসে সে-সব দিনগুলির কথা লিখছি।"

'আমাকে একটু পড়ে শোনাও না।'

'এখন সময় কোথায়? দেখি, তোয়ালে দাও।'

ভেতুশকা তোয়ালে এনে তাঁর ভিজে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'আমি কিছু বললেই আজকাল তোমার মুখে শুনছি কেবল, 'সময় কোথায়?'…'সময় নেই।'…'এই ত ডিউটি থেকে ফিরলে আবার কী কাজ শুনি?'

'বারে বেলিকফ্-কে কাগজ পড়ে শোনাতে হবে না আজ?'

'বেশ তাই যাও।' দস্তয়েফ্স্কির গায়ে তোয়ালে ছুঁড়ে দেয় ভেতুশকা। অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে ওঠে, গলা ভারী হয়।

অগত্যা হাত বাড়িয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন দস্তয়েফ্স্কি, অভিমানিনীকে চুমু খান আদর করেন। আর চুমু খেতে খেতে, আদর করতে করতে, অনুভব করেন—ভেতুশকার জন্যে তাঁর মধ্যে প্রথম দিককার সেই তীব্র আবেগ সেই ভীষণ উত্তেজনা আর নেই। ওই চেনা-শরীরে আর যেন তিনি কোন রোমাঞ্চ খুঁজে পান না। মাত্র ত একমাস এখানে এসেছেন এরই মধ্যে ভেতুশকা তাঁর কাছে পুরোনো হয়ে গেছে।

আসলে শরীর বড় তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যায়, তা হোক-সে কোন ষোড়শীর যতই নরম মসৃণ শরীর। সে-শরীর পুরুষকে দেহের তৃপ্তি দিতে পারে সত্য কিন্তু সে-পুরুষ বুদ্ধিজীবী হলে তাতে করে হৃদয় ভরে না তাঁর। হৃদয় ভরে তুলতে চাই অন্তরে ঐশ্বর্য আছে এমন নায়িকা। তারই সন্ধানে তিনি তখন এক শরীর থেকে আর এক শরীরে সেই অন্তরের ঐশ্বর্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে ছোটেন। বস্তুত তাঁর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হৃদয়ের একটা আশ্রয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি। শরীর মন আত্মা এই তিনই ছিল তাঁর মধ্যে উপবাসী, নিরাশ্রয়। শরীরের ক্ষুধা যদি বা মিটেছে তাঁর, সে-যদি বা কোন বুকের বালিশে নিশ্চিন্তে মাথা রাখতে পেরেছে, ভালবাসার ক্ষুধা মেটে নি তখনো, আত্মা আজীবনই থেকে গেছে নিরাশ্রয়, অনিকেত। যে-মতাদর্শের প্রবক্তা হওয়ার জন্যে দস্তয়েফ্স্কিকে গ্রেফতার বরণ করতে হয়েছিল, মৃত্যুমঞ্চ থেকে যেতে হয়েছিল নির্বাসনে—নির্বাসনের জেলে রাশিয়ার অন্ধকার-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটার ফলে সেই 'কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক' চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর সব ধারণা পালটে গিয়েছিল। কাতোরগার জেলে বসে তিনি ঈশ্বরে

শরণাগতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন : যীশু, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজে মৃত্যুবরণ করে মনুষ্যজাতির পাপের ঋণ শোধ করেছিলেন, তিনিই তখন হয়ে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে আদর্শ মানুষ। কাতোরগার জেল থেকে বেরিয়েই তিনি জনৈক নির্বাসিত 'ডিসেম্বর বিপ্লবী'র স্ত্রী শ্রীমতী ফন ফিসিনাকে লিখেছিলেন, "যীশুর চেয়ে শুদ্ধ, যীশুর চেয়ে মানবিক, অনুরূপ জ্ঞানী ও দয়ালু, মঙ্গলময় ও সুন্দর আর কেউ নেই, আর কিছু হতে পারে না। এই বিশ্বাসে বুক বেঁধো তুমি···যদি কেউ আমার কাছে প্রমাণ করতে পারে যে, যীশু সত্য থেকে ভিন্ন, সত্যিই যদি প্রমাণিত হয় যে, যীশুর সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই ত আমি সত্য ত্যাগ করে যীশুকেই বুকে তুলে নেব।"

কিন্তু এই অমোঘ বিশ্বাসের উচ্চারণ তাঁর আচরণে কখনো সত্য ওঠে নি। আসলে বিশ্বাসের অবলম্বন ঐকান্তিক আগ্রহে চাওয়া আর একান্ত করে পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। তাই ত দেখি, উপরিউক্ত চিঠি লেখার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৫-র ফেবরুআরি তিনি তাঁর দাদাকে লিখছেন, "····আমি এ-কালের গর্ভজাত সন্তান। এ-কালের অবিশ্বাস ও সংশয় আমাকে আশ্রয় করে আছে। এটা আমি নিশ্চয় করে জেনে গেছি, কবরে যাওয়ার আগে অব্দি এ-অবিশ্বাস এ-সংশয় থেকে আমি মুক্তি পাব না। মনে বিশ্বাস পুষে রাখতে যে কী কষ্ট পেয়েছি, কী যন্ত্রণা ভুগেছি এবং এখনও যে কী মূল্য দিতে হচ্ছে আমাকে, সে আমি বোঝাতে পারব না।"

বস্তুত আত্মার আশ্রয় সারা জীবনেও মেলে নি তাঁর, বিশ্বাস ও সংশয়ের দুই মেরুতে পেণ্ডুলামের মত দুলে দুলে আর কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে না পেরে কেবল মর্মান্তিক কষ্টে ভুগেছেন। কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা না জুড়োলেও মনের ক্ষুধা মিটেছিল তাঁর। তাঁর উপবাসী মনের পিপাসা মিটাতে তিন-তিনটি রমণীই তাঁদের বুকের মধু নিঃশেষ করে দিতে এগিয়ে এসেছিল। দস্তয়েফ্‌স্কির হৃদয়ের জ্বালা তাতে যদি জুড়িয়ে না থাকে সে-দোষ তাঁর নিজের।

কিন্তু সে কথা এখন নয়। এখনকার কথা বলি। ওই তিনটি রমণীর একজনকে তিনি পেয়েছিলেন এই সেমিপালাতিনস্ক্-এই। শ্রীমতী মারিয়া ইসায়েভার চোখে চোখ রেখে এক পলকেই যেন দস্তয়েফ্‌স্কি জেনে গিয়েছিলেন, এরই জন্যে তাঁর নিয়তি তাঁকে সেমিপালাতিনস্ক্-এ টেনে নিয়ে এসেছে।

অবশ্য মারিয়া ইসায়েভার আগে আর একটি যুবতীও এসেছিল তাঁর জীবনে। তখন ভেতুশকা পুরনো হয়ে গেছে। তার শরীরের ভূগোল জানা

হয়ে যাওয়ার পরে দেহ-সর্বস্ব যুবতীর ওপরে আর কোন আকর্ষণ ছিল না দস্তয়েফ্স্কির। একদিন যে-যুবতীর আতুরেপনা গায়ে-পড়া নেওটা-স্বভাব মাতাল করে তুলেছিল দস্তয়েফ্স্কিকে সেই স্বভাবই অবশেষে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে তখন। তখন একদিন সেই বিরক্তিবশেই বাড়িওলিকে বলেছেন তিনি: 'লেখাপড়া না শিখিয়ে এ কী করে তুলেছ তোমার মেয়ে দুটোকে!'

'আমি করেছি? বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেরাই ওই রকম বাঘিনী হয়ে উঠেছে। তাই এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।' বাড়িওলি সরল স্বীকারোক্তি করেছে, 'আমি বাগ মানাতে পারতাম না। কোথাকার কোন ছোটলোক মোটলোক মদোমাতাল জুটিয়ে আনত, তার চেয়ে এই ভাল নয় কী, আমিই সুন্দর-সুন্দর পয়সাওলা অফিসারদের জুটিয়ে দিচ্ছি। তুমিও বাবা বড় ভাল ছেলে, লেখাপড়া জানা ছেলে, আমার খুব পছন্দ, আমার মেয়েদের যদি তোমার ভাল লাগে আমি খুব খুশী হব।'

ভাল লাগবে না কেন, খুব ভাল লাগে, শরীরের জড়তা কাটাতে তোমার মেয়েরা কফির মতন চমৎকার!—মনে মনে চিৎকার করে জবাব দিয়েছেন দস্তয়েফ্স্কি। মনে মনেই বলেছেন—না, তার বেশী না।

তার বেশী অনেক বেশী চান দস্তয়েফ্স্কি। ভালবাসার জন্য চান, ভাল বাসতে চান। ভালবাসতে না পারলে বড় একলা লাগে, নিঃসঙ্গ মনে হয়। অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি। সেই অস্থির মনে শান্ত স্থির একখানি মুখ ফুটে ওঠে বিষণ্ণ সুন্দর মুখখানি দেখতে ভাল লাগে। ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সেই ইচ্ছে নিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি, যুবতীও পিছিয়ে থাকে না।

বাজারে রুটির দোকান ছিল লিজাংকা নেভোরোতোভার। সপ্তদশী এই তরুণীর শুধু রূপ যৌবন নয় নরম একটি হৃদয়ও ছিল, ছিল আয়ত দুই চোখে সুন্দরের স্বপ্ন। দস্তয়েফ্স্কি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বেচারীর দারিদ্র্য তাঁকে বড় কষ্ট দিত। ওই রুটি বেচে একটা বড় সংসার বাঁচিয়ে রাখতে হত তাকে। তাই অভাবী দস্তয়েফ্স্কিও যখন যা সামর্থ্য সাহায্য করতেন তাকে। যুবতীর প্রতি প্রথমে তিনি একটা স্নেহের আকর্ষণ বোধ করেছিলেন, ক্রমশ তাই ভালবাসার রূপ নিয়েছিল। ভালবাসার টানে শেষে দু'জনে কাছাকাছি হয়েছিলেন। সে-সান্নিধ্য নিবিড় হয়ে উঠতে না উঠতে মারিয়া ইসায়েভা এসে তাঁকে কেড়ে নিলেন লিজাংকা নেভোরোতোভার কাছ থেকে। কিন্তু যার আয়ত চোখের দিঘল পালকের ছায়ায় মরু-বুক প্রথম শীতল হয়েছিল, ভালবাসার

প্রথম ফুল ফুটে ছিল মনের মাটিতে, দূরে দূরে সরে গিয়েও তাকে ভুলতে পারেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি। তাঁর মনে লিজাংকার জন্যে একটি কোমল স্থান ছিল বহু দিন। সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌ ছেড়ে আসার পরেও বহু দিন তিনি লিজাংকার সঙ্গে চিঠিপত্রের সম্পর্ক রেখেছিলেন। দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা কতখানি নিকট ছিল ইতিহাসে তা লেখা নেই; কিন্তু লিজাংকা যে তাঁকে ভালবেসে ছিল এবং একমাত্র তাঁকেই দেহ-মন সমর্পণ করে দিয়েছিল তার প্রমাণ সে কুমারীই থেকে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌-এর ছোট্ট শহরের এক প্রান্তে বসে শবরীর মতন অপেক্ষা করেছিল। দস্তয়েফ্‌স্কির চিঠিগুলি সে মূল্যবান রত্নের মতন যত্নে বুকের মধ্যে করে লুকিয়ে রেখেছিল, কাউকেই কোন দিন সে-চিঠি দেখতে দেয় নি। উপেক্ষিতা প্রেমিকা সে-সম্পদ বুকে করে নিঃশব্দে কবরে চলে গেছে। ঘটনাটা বেদনার হলেও, স্বাভাবিক, কেন না, মারিয়া ইসায়েভার সঙ্গে লিজাংকার কোন তুলনা চলে না। একজন যদি যত্নের বাগানে ফোটা রজনীগন্ধা আর একজন কাঁচা মাটির পথের ধারে অবহেলায় ফোটা ছোট্ট একটি ভূঁইচাঁপা মাত্র।

মারিয়া ইসায়েভার সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির পরিচয় ঘটার কোন কারণ ছিল না। নিয়তি ছাড়া এ-মিলন আর কেউ ঘটাতেও পারত না। দূরের শহরে শ্বশুরের স্কুলে মাস্টারি করতে করতে আলেকসানদার ইসায়েফ্‌ মদ তৈরির কারখানার কনট্রোলারের সরকারী চাকরি পেয়ে চলে আসেন সেমি-পালাতিন্‌স্ক্‌-এ। বিনা কাজের এই চাকরির অবসর তাঁর ভরে উঠেছিল মদ্যপানে আর আড্ডা দানে। ফলে অচিরেই চাকরিটি খোয়ান তিনি। চাকরি খুইয়ে আরও বেশী করে মদ খেতে শুরু করেন। অষ্টপ্রহর মদেই ডুবে থাকেন তিনি। ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্বলমনা এই মানুষটির ক্রমশ পদস্খলন ঘটতে থাকে। আগে যাঁকে দেখা যেত অফিসারদের ক্লাবে, তাঁদের বাড়িতে—দরাজ গলায় চেঁচিয়ে আসর মাৎ করে আড্ডা মারছেন; তাঁকে পরে দেখা যেতে থাকল বদমাস খারাপ-চরিত্রদের সঙ্গে কুখ্যাত জাগায়, ভাটিখানায়।

হাতে মদের গ্লাস উঠলে তাঁর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হত। তাঁর উচ্চকণ্ঠ থেকে মহৎ চিন্তার ও পরিশীলিত রুচির বাণী বেরোতে থাকত অনর্গল। দস্তয়েফ্‌স্কিকে ইসায়েফ্‌ খুব পছন্দ করতেন। লেখক হিসেবে এবং মানুষ হিসেবেও ইসায়েফ-এর প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। দস্তয়েফ্‌স্কির-ও ভাল লাগত মানুষটিকে। মিখাইলকে এক চিঠিতে ইসায়েফ সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"..... অত্যন্ত অনাচারের জীবন কাটাত মানুষটি। স্বভাবেও ছিল অত্যন্ত অগোছাল। মেজাজও ছিল তেমনি—রাগী আর একগুঁয়ে, শেষের দিকে বড় বেশী রুক্ষও হয়ে উঠেছিল। অধঃপাতে গেছে বলে শহরের সবাই তাকে নিন্দে করত। কিছু নিন্দের কাজ যে সে করে নি তাও নয়; কিন্তু শহরের অভিজাত সমাজও তার ওপরে কম অবিচার করে নি, তাঁদের হাতে যথেষ্ট উৎপীড়ন সহ্য করেছে সে। কিন্তু কোন কিছুকেই বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। খানিকটা যাযাবরের মতন স্বভাব ছিল তার। অহংকারী আর আত্মাভিমানী—সংযমের কোন বালাই ছিল না। তাই পিছল পথে অতি দ্রুতই সে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এত দোষ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, রুচি ছিল তার খুব মার্জিত, হৃদয়টা ছিল বেশ উদার। সর্বোপরি শিক্ষা-দীক্ষা ছিল। যে-কোন প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারত, বুঝত। সর্বাঙ্গে তার গ্লানির কাদা থাকলেও আমি তাকে মহৎ না বলে পারছি না।"

'উচ্চ আশার স্বপ্নচারী এই মহৎ মানুষটি' দস্তয়েফ্‌স্কির খুব কৌতূহল উদ্রেক করেছিল বলেই তাঁর উপন্যাসে বার বার এসেছেন তিনি। 'পাপ ও শাস্তি' উপন্যাসে মারমেলাদফ্‌কে আর 'ইডিয়েট' উপন্যাসে লেবেদফ্‌কে আলেকসানদার ইসায়েফ্‌ বলে চিনতে কোন পাঠকেরই কষ্ট হবে না।

যখন দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে ইসায়েফ্‌-এর পরিচয় হল, দুর্দশার চরমে পৌঁছে যেতে তখন আর তাঁর বাকি নেই, সেমিপালাতিনস্ক্‌-এর অফিসার ও তাদের স্ত্রীরা তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে তখন। তখন তাঁর নিন্দায় নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে সেমিপালাতিনস্ক্‌-এর অভিজাত সমাজ। সমাজত্যক্ত, নিঃসঙ্গ ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষটির তখন স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ঋণে আর অভাবে বেপরোয়া মানুষটা তখন নোংরা বস্তিতে নষ্ট মানুষদের ভিড়ে ক্রমাগত ডুবছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন।

একদিন এই মাতাল মানুষটি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন রাস্তায়, সেখান থেকে তুলে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আর সেই তখন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নাকে প্রথম দেখেন তিনি। দুটি আয়ত করুণ চোখে চোখ রেখে দস্তয়েফ্‌স্কির আর পলক পড়ে না। সে-অপলক দৃষ্টির সামনে মারিয়ার কালো ভ্রমর চোখ নত হয়ে পড়েছিল। আঠাশ বছরের স্থির যৌবনের লাবণ্য ব্রীড়া-পীড়িত হয়ে অরুণ বর্ণ হয়েছিল।

হাঁ, রূপসী ছিলেন শ্রীমতী ইসায়েভা। দস্তয়েফ্‌স্কির বন্ধু ভ্রাঙ্গেল লিখেছেন, "শক্ত-স্বভাবের এই রমণীর অনতিদীর্ঘ তনু-শরীরে রূপ ছিল বটে, মুগ্ধ হওয়ার

মতন লাবণ্য ছিল তাঁর। রূপসীর শুধু রূপ নয়, বিদ্যাও ছিল। নানা বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছিলেন তিনি। শিল্প-সাহিত্যের যে-কোন শাখার ওপরে আলোচনায় অনায়াসে যোগ দিতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে মাধুর্য আর যুক্তির দৃঢ়তা খুব সহজেই শ্রোতার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারত।

'মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটতেন তিনি। ঢেউ খেলানো ঘন চুল দু' ভাগ হয়ে কাঁধের ওপরে নেমে আসত। সেই চুলের দেউরির মাঝখানে আনত আয়ত গভীর কালো চোখ, স্ফুরিত নাসা, স্বল্প বিস্তৃত মুখ, পাঁপড়ির মতন বাঁকা সামান্য স্থূল অধর, ঈষৎ শীর্ণ কপোল—সব মিলিয়ে তাঁকে মনে হত যেন এক খেয়ালী নায়িকা।'

স্ত্রাখফ্‌ বলেছেন, 'অনতি দীর্ঘাঙ্গী এই মহিলাটির বেশ আকর্ষণীয় চেহারা ছিল। কথায় কথায় গাল দু'টি হঠাৎ গোলাপী হয়ে উঠত, তখন আরো রমণীয় দেখাত তাঁকে। কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন দুর্বল ভঙ্গুর-স্বাস্থ্যের মানুষ। এবং সেদিক থেকে দস্তয়েফ্‌স্কির মায়ের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল ছিল।'

প্রথম সাক্ষাতেই মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না যে দস্তয়েফ্‌স্কিকে অভিভূত করে ফেলতে পেরেছিলেন তার আপাত কারণও তাই: তাঁর মুখের নরম লাবণ্য, দুর্বল স্বাস্থ্য আর খানিকটা শিশুর মতন অসহায় ভাব নিয়ে শ্রীমতী ইসায়েভা ছিলেন ফিওদরের মায়ের মতনই নিঃসঙ্গ আর তেমনি পলকা ও রুগ্ন। পুরুষ প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ে কোন্ মেয়ের? স্বভাবতই যে-মেয়েকে তার মায়ের মতন লাগে। মায়ের প্রতি টানই এ-সব ক্ষেত্রে প্রেম হয়ে আচ্ছন্ন করে পুরুষকে! দস্তয়েফ্‌স্কির বেলাতেও সেই মনস্তত্ত্বই কাজ করেছিল, যদিও মারিয়ার খেয়ালী স্বভাবের হেঁয়ালী ও তাঁর আঠাশটি বসন্তের যত্নে লালিত যৌবনও তাঁকে মুগ্ধ করতে কম কোশিশ করে নি। তা-ছাড়া অসহায় শিশু আর আর্ত নারীর প্রতি চিরদিনই দস্তয়েফ্‌স্কির একটা দুর্বলতা ছিল। (মাদার ফিক্সেশন) 'মায়ের প্রতি টান'-এর সঙ্গে সে সমবেদনাও প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত ছিল বলেই হয়ত প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। অবশ্য ব্যাপারটার কোন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আত্মসমালোচনানিপুণ দস্তয়েফ্‌স্কিও দিতে পারেন নি কখনো। প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলে তিনি যে আত্মানুসন্ধান করেছেন তাতেও শুধু নিজের নিরাশ্রয় হৃদয়ের নীড়-প্রত্যাশাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তখন নীড়-নির্মাণের বাধা অসুবিধাগুলিই দেখেছেন, আর কিছু না।

অথবা হয়ত নির্ভীক আত্মসমালোচক দস্তয়েফ্‌স্কি পরবর্তীকালে চিঠিপত্রে

সে-সময়কার মানসিকতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে থাকবেন; কিন্তু কে জানে হয়ত তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী আন্না ও তাঁর মেয়ে লিয়ুবভ্‌ চিঠিগুলির সে-সব অংশ কেটে কালো করে দিয়ে থাকবেন, কেন না, মারিয়া সংক্রান্ত সে সময়কার যে-সব চিঠি তাঁর জীবনীকারদের হাতে এসে পৌঁছেছিল তার অধিকাংশই ছিল স্থানে স্থানে কালি দিয়ে ঢাকা, পাঠ উদ্ধার না করা যায় এমন ভাবে কাটা।

মানেটা পরিষ্কার, ঈর্ষান্বিত স্ত্রী আন্না, অতএব তাঁর কন্যা লিয়ুবভ্‌ চান নি লোকে জানুক তিনি মারিয়াকে ভালবাসতেন, ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন মারিয়াকে। ওঁরা বলতে চান, 'কুহকিনী মারিয়াই ভুলিয়ে ভালিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কিকে বিয়ে করেছিল, তিনি ভালবাসেন নি, ভালবেসেছিল মারিয়া।'

ওঁরা বলতে চান, 'মারিয়ার মা ছিল নিগ্রো। নিগ্রো মেয়েরা ভীষণ শঠ ও কুহকিনী হয়। মারিয়াও মায়ের থেকে সে-কুহক আয়ত্ত করেছিল। অবশ্য শ্রীমতী লিয়ুবভ্‌ স্বীকার করেন, মারিয়ার চেহারা দেখে তাকে নিগ্রো বলে সন্দেহ করার উপায় ছিল না।'......শ্রীমতী লিয়ুবভ্‌-এর এ-কাহিনী সম্পূর্ণ ঈর্ষা-প্রসূত এবং মিথ্যে। ইতিহাস বলে মারিয়ার বাবা ফ্রান্সের এক অভিজাত বংশের পুরুষ। ফরাসী-বিপ্লবের সেই নিদারুণ সংকটের দিনে দিশেহারা হয়ে যাঁরা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন। আসত্রাখানে তিনি কোয়ার‍্যানটিন-এর প্রধান হন ১৮১২ সালে। ওখানেই তিনি এক বণিকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেন। তিনি নিগ্রো মহিলা ছিলেন না আর নিগ্রোর মেয়ে কখনো মারিয়ার মতন ফরাসিনী সুলভ রং রূপ পায় না।

ইতিহাস আরও জানে, প্রথম দর্শনেই মারিয়ার রূপে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন দস্তায়েফ্‌স্কি নিজে, মারিয়া নয়। গোড়ার দিকে মারিয়ার মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কির জন্যে প্রেম নামক এক বিন্দু দুর্বলতা ছিল না। মারিয়ার কাছে তিনি ছিলেন অতিথি।

দস্তয়েফ্‌স্কি এখন প্রায়ই আসেন তাঁর বাড়িতে। মারিয়াও তাঁকে অতিথির মতনই অভ্যর্থনা করেন। উপকারী মানুষটির প্রতি সদয় সহৃদয় হতেও বাধে না তাঁর। তাঁকে ভালই লাগে মারিয়ার। তাই বলে তাঁকে অনাগত-প্রতিভা বলেও কখনো বুঝতে পারেন নি মারিয়া, সে-দিন কে-ই বা তা বুঝেছিল? সকলের মতন তিনিও তাঁকে ভাগ্যের মার খাওয়া একজন দরিদ্র সৈনিক বলেই জানতেন ও সে-জন্যে সহানুভূতিও বোধ করতেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি এসে তক্ষুনি কথায় মেতে উঠতেন না। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে

যেত তাঁদের। তারপরে হঠাৎ যেন প্রগলভ হয়ে উঠতেন তিনি। বুকের কপাট খুলে যেত তাঁর। মুখে শব্দের খই ফুটতে থাকত। তার অনেকটাই অবশ্য হৃদয়ংগম হত না মারিয়ার তবে এটা তিনি ভালই বুঝতে পারতেন যে, মানুষটি অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছে এবং এমন পোড়-খাওয়া মানুষ তিনি আর দেখেন নি। এখন দেখতে দেখতে করুণায় ভরে ওঠেন মারিয়া, সমব্যথায় বিষণ্ন হন। কিন্তু সেইটে লাঞ্ছিতের প্রতি সহানুভূতি; অলক্ষ্যে পুরুষ দস্তয়েফ্‌স্কির প্রতি রূপসী মারিয়ার যে-আকর্ষণ ক্রমশ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হচ্ছিল তার কারণ অন্য। তার কারণ মারিয়ার সামান্য মিষ্টি কথা, ঈষৎ কটাক্ষ, সমবেদনার তুচ্ছ আহা উহুঁ দস্তয়েফ্‌স্কির মুখে চোখের পলকে পরম-প্রাপ্তির যে সুখ ফুটিয়ে তুলত তাই দেখে মারিয়ার রমণীমনোচিত অহংকার তৃপ্ত হত। সেই তৃপ্তিই ক্রমশ মারিয়াকে দস্তয়েফ্‌স্কির ঘনিষ্ঠ করে তুলছিল। দস্তয়েফ্‌স্কি যখন তন্ময় গলায় বলে উঠতেন 'মাই অ্যানজেল', মারিয়ার তখন সারা মুখে আবীর ছড়িয়ে যেত, মন ভরে যেত খুশীতে। তাছাড়া তাঁর যে এখন এমনই একটি পুরুষ দরকার, যে তাঁকে মুগ্ধ হয়ে ভালবাসবে, যে স্বেচ্ছায় তাঁর সকল দুঃখের অংশ নেবে, তাঁর পাশে পাশে থাকবে, হাল ধরবে তাঁর ভাঙা সংসারের। নির্বান্ধব এই বিভুঁই বিদেশে এই মানুষটিই এখন তাঁর একমাত্র বন্ধু যে!

মদ্যপ স্বামীর অবিবেকী ব্যবহার অসন্তুষ্ট সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌-এর সব পরিবারের সঙ্গেই মারিয়া বন্ধুত্বের সম্পর্ক শিথিল করে দিয়েছিল। তা-ছাড়া তাঁর সেই পয়সা কই যে তিনি সামাজিকতা বজায় রাখবেন। কেউ বেড়াতে এলে তাকে এককাপ কফি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার সামর্থ্যও ত তাঁর নেই। ফলত তাঁর অবসর যেন আর কাটতে চাইত না। মারিয়া ক্রমশই নিঃসঙ্গ ও অবসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। খিটখিটে আর অভিমানী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য স্বামী ও সাত বছরের শিশু-পুত্রের সেবায় কখনো অবহেলা অমনোযোগ ছিল না। অনীহায় কি অসন্তোষে সংসারের প্রতি বিমুখ হন নি তিনি। কিন্তু অভিযোগ করতে চাইতেন, মনের বোঝা হালকা করতে চাইতেন তিনি, দস্তয়েফ্‌স্কি ছিলেন সে দিক থেকে আদর্শ শ্রোতা। নীরবে ও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি শুনতেন, তাঁর দুর্ভাগ্য সসম্মানে বহন করতে শক্তি ও সাহস যোগাতেন। হাতের কাছে সব সময়ের জন্যে এমন একজন সমব্যথী পেয়ে বর্তে গেলেন মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না। ছোট্ট শহরের একঘেঁয়ে জীবনের জলায় ডুবে হেজে মজে যাওয়ার হাত থেকে তাঁকে বাঁচালেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

'পারতপক্ষে তাঁর বাড়ি ছেড়ে আসতাম না।' পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি যৎপরোনাস্তি সময় তাঁর সঙ্গে কাটাতে চেষ্টা করলাম। আমি সত্যি এক দুর্লভ রমণীর সাহচর্যে এসেছিলাম।'

বাড়িতে শুঁড়িখানা খুলতে পারলে যেন সাধ মেটে এমনই হয়ে উঠেছিল ইসায়েফ্-এর অবস্থা। সেইটে পারেন নি কিন্তু বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন, মাতাল হয়ে ডিভানের উপর অবশ হয়ে পড়ে থাকতেন। নিঃসঙ্গ মারিয়াকে সঙ্গ দিতে সান্ত্বনা দিতে তখন পাশে থাকতেন দস্তয়েফ্স্কি।

এখন আর দস্তয়েফ্স্কি সরাসরি মারিয়ার রূপ যৌবন বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করতে সংকোচ বোধ করছেন না। এখন আর তাঁর ভয় ডর নেই, প্রেমে পাগল তিনি এখন নির্ভয় নিরঙ্কুশ। সারাজীবনে এমন অবসর আর এমন রমণীয় সঙ্গ আর তিনি পান নি কখনো। শুধু ত রূপসী আর বিদুষীই নয়, মারিয়া অভিজাত পরিবারেরও একজন। এমন প্রণয়িণীর সঙ্গে সারাক্ষণ বসে কথা বলতে পারা, মনের সব ভাবনা আশা উজাড় করে দিয়ে সুখী হতে পারা নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ ভাগ্য। সত্যি তেত্রিশ বছরে এমন সুন্দর দিন, এমন সুখের দিন তাঁর আর কোন দিন আসে নি। এখানে তাঁকে বিদ্রূপ করার কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেই কেউ! শ্রীমতী পানায়েভার বাড়ির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁকে নিয়ে তুর্গেনেফ্-এর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, সমালোচনা; পানায়েভার জন্যে নেক্রাসফের সঙ্গে তার তিক্ত প্রতিযোগিতা। শ্রীমতী পানায়েভা-ই কী তাঁকে কম অসম্মান করেছে; কিন্তু আজ তার জন্যে বিন্দুমাত্র বেদনা-বোধ নেই তাঁর মনে। আজ তাঁর বুক-ভরা সুখ, আজ তিনি মারিয়ার মুখোমুখি বসে তাঁর হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ উত্তাপে সুখী।

দস্তয়েফ্স্কি সর্বান্তঃকরণে ভালবেসে ফেলেছেন মারিয়াকে; কিন্তু মারিয়া তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। তখনও তেমন করে ভালবাসতে পারেন নি তিনি দস্তয়েফ্স্কিকে। অবশ্য বিষণ্ণ দিনগুলি দস্তয়েফ্স্কির কাঁধে মাথা রেখেই কাটত মারিয়ার, দস্তয়েফ্স্কি যখন তাঁকে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিতেন, সে আদরেও সাড়া দিতে এতটুকু কুন্ঠিত হতেন না তিনি; তিনি দস্তয়েফ্স্কিকে ভালবাসতেন, তাঁর প্রেমিকা—মিসট্রেস, হতেও দ্বিধা করেন নি কিন্তু সে-সবই তিনি তখন করছিলেন নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায়, স্বামীর প্রতি অভিমানে অসন্তোষে। অবশিষ্ট জীবনের জন্যে দস্তয়েফ্স্কির অঙ্কশায়িনী হওয়ার কথা তখনও তিনি ভাবেন নি। অন্যপক্ষে তখনই দস্তয়েফ্স্কি আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন তাঁর ভালবাসায়।

পাঁচ

দস্তয়েফ্‌স্কির লাঞ্ছিত বিপর্যস্ত জীবনে ভালবাসার শুশ্রূষা, ভালবাসার আশ্রয় একান্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি ঐকান্তিক আগ্রহে কাঙালের মতন ভালবাসা খুঁজছিলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্‌নার মধ্যে তাঁর সেই ভালবেসে সুস্থ হওয়া, সুখী হওয়া, শুশ্রূষা ও আশ্রয় পাওয়ার অভীপ্সা সত্য হয়ে উঠল। মারিয়াকে আশ্রয় করে তিনি সেই প্রথম নিজেকে খুঁজে পেলেন, চিনতে পেলেন। তাঁর সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল তাঁর মধ্যে। তাঁকে বেষ্টন করে তাঁর অবরুদ্ধ আবেগ নববর্ষার লতাঙ্কুরের মতন লকলকিয়ে বেড়ে উঠতে থাকল। দীর্ঘকাল নারী-সঙ্গ বর্জিত মর্মান্তিক কষ্টের জেল-জীবনবাহনের শেষে এক সমব্যথী রূপসীর সান্নিধ্য পেয়ে পরম কৃতার্থ তিনি তাঁর ক্ষুধিত কামনা, অপূর্ণ বাসনা, রমণীয় স্বপ্ন, সব— সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে মালা করে গেঁথে তাঁর গলায় পরিয়ে দেবেন, স্বাভাবিক। তাঁর জীবনের সব সেরা সুখ যে ওই রূপসীর শরীরে শরীর পেয়েছে! মারিয়ার দেহে ও-ত লাবণ্য নয়, যেন তাঁরই গহন সুখের অলৌকিক উদ্‌ভাস।

মারিয়া চতুরা, মারিয়া লাস্যময়ী, মারিয়া সহৃদয়া তবু তাঁর প্রেমে দস্তয়েফ্‌স্কির পাগল হয়ে ওঠার ওটাই একমাত্র কারণ নয়। মারিয়া দুঃখী, দারিদ্র্য-পীড়িত, তাঁর স্বামী-সুখ নেই—সে কষ্ট দুরবস্থাও তাঁকে সমান আকর্ষণ করেছে। পরদুঃখকাতরতা দস্তয়েফ্‌স্কি-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। তদুপরি দুঃখী যদি রূপসী যুবতী হয়, হয় পরকীয়া সে-যে সব পুরুষের পৌরুষকেই প্রবল ভাবে টানবে সে ত স্বতঃসিদ্ধ। তা-ছাড়া আরও একটা ব্যাপার ছিল, মারিয়ার মুখখানা ছিল নরম তুলতুলে, দেহ ছিল পলকা দুর্বল, আর সব মিলিয়ে মানুষটিকে মনে হত প্রতিকার-অক্ষম পরম অসহায়। মারিয়ার এই বিপন্ন বিষাদ বারে বারে তাঁর অসহায় মায়ের মুখ মনে করিয়ে দিত তাঁকে ফলত এক সর্পিল মনস্তাত্ত্বিক পথে এই মাতৃ-এষণা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁর অভুক্ত কামনাকে সুপ্তোত্থিত করেছিল। মারিয়াকে পাওয়ার জন্যে তাই তিনি এমন ব্যাকুল, এমন আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন।

এখানে একটু আগবাড়িয়ে বলে রাখা ভাল, দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে ধর্ষকাম ও মর্ষকাম সমান সক্রিয় ছিল। ভালবাসা এক ধরনের মর্ষকাম যা কিনা পুরুষকে দেহ মনে সর্বস্ব উজার করে দিতে উত্তেজিত করে, ('অভাজন'-এর নায়ক যেমন দিয়েছিল)। তার জন্যে সব রকম শারীর কষ্ট স্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু কখনো ভালবাসা মানে কষ্ট দেওয়াও বটে। ভালবাসার

জনকে আঘাত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে কাতর করে তবে তৃপ্তি পায় প্রেমিক। তবেই তার ভালবাসা তীব্র শিখায় জ্বলে ওঠে। প্রেমের জন্যে ত্যাগ করতে দুঃখ পেতে আরও আনন্দ তখন তার, আরও সুখ। দুঃখ দিয়ে সে-দুঃখ দূর করার সুখ। নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে সে-আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সুখ। প্রেমিকার জন্য সর্বস্ব পণ করার সুখ। কিন্তু গোড়ার দিকে ধর্ষকাম নয়, মর্ষকামেই কাতর দেখি আমরা দস্তয়েফ্স্কিকে।

মারিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়া, শান্ত করা বড় সহজ ছিল না। সামান্যতেই দোষ ধরতেন তিনি, একটুতেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠতেন, হামেশাই মাথা ধরত তাঁর; মাথা ধরলে অস্থির হয়ে উঠতেন তখন, অসহায় মানুষের মতন কপাল চাপড়াতেন। খিটখিটে মানুষটি কথায় কথায় ক্ষেপে উঠে বলতেন—আমাকে বুঝল না, চিনল না, কেউ আমি অপরিচিত অজ্ঞাতই থেকে গেলাম। আমি শহীদ হলাম।'

মারিয়ার অনুশোচনা অসন্তোষ কিংবা যন্ত্রণার বিলাপে অতিশয়-উক্তি ছিল না। একদিনের সাক্ষী ত দস্তয়েফ্স্কি নিজেই। মারিয়া তাঁর স্বামীকে কোনদিন ভালবাসেন নি তা নয়; কিন্তু ক্রমশ তাঁর ব্যবহারে বিরূপ হয়ে উঠেছে মারিয়ার মন, বিষিয়ে উঠেছে, আস্তে আস্তে তাঁর মন সরে এসেছে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। ভালবাসা উপবাসী থেকে থেকে মরে গেছে। মদ্যপ অপদার্থ বেকার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষই প্রবল হয়ে উঠেছে ক্রমশ। তবু অনন্যোপায় তিনি সেই স্বামীর জন্যেই রাজপুরুষদের দোরে দোরে দরবার করে ফিরছিলেন—'আমি কি আমার কচি বাচ্চাটাকে নিয়ে না-খেয়ে মরে যাব? আমার স্বামীকে একটা চাকরি দিন, যে-কোন একটা চাকরি।'

স্বামীর চাকরির জন্যে যখন হন্যে হয়ে দরখাস্ত করছেন, ছুটোছুটি করছেন মারিয়া তখন একদিন তাঁর পায়েব প্রায়-নূতন জুতো জোড়া কোথাও আর খুঁজে পান না মারিয়া, তখন বাচ্চা ছেলেটার ওপরে ক্ষেপে গিয়ে তাকে বকাবকি করতে লাগলেন তিনি। মদে চুর ইসায়েফ্ ডিভানের ওপরে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন। পাশাকে বকাবকি করতে ইসায়েফ্-এর শরীরে যেন চেতনার সঞ্চার হল। ডিভানের ওপরে সোজা হয়ে বসতে চেয়ে, বসতে না পেরে, আবার গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন—'পাশাকে মিথ্যে বকছ মারিয়া, আমি জুতো জোড়া শুঁড়িখানায় বেচে দিয়ে মদ খেয়ে এসেছি এখন।'

নির্লজ্জ পাষণ্ড স্বামীর কথা শুনে শিউরে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি, জুতো নিয়ে

না-জানি কী লঙ্কাকাণ্ড ঘটবে ভেবে অস্থির হয়ে তাকিয়ে ছিলেন মারিয়ার দিকে। মারিয়া সাপের মতন ফুঁসছিল, তার কপাল ঘেমে উঠেছে, সারা মুখ গোলাপী। দেখাচ্ছে, দেখতে দেখতে একটা তীব্র বাসনায় ভরে উঠল দস্তয়েফ্‌স্কির মন।

মারিয়া কী বলতে চাইল; কিন্তু গলা থেকে শব্দ বেরোল না। একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ হল। তারপরেই শুরু হল কাসি। কাসতে কাসতে বেদম হয়ে তিনি ছুটে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লেন। কাসি থামল; কিন্তু চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এল তাঁর। দস্তয়েফ্‌স্কি এসে তাঁর পাশে বসলেন। তাঁর মাথাটা টেনে নিলেন কোলে। আদর করতে করতে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। সেই আদর দরদ ও সুহানুভূতির কাছে মারিয়া আস্তে আস্তে আত্মসমর্পণ করলেন। দু'টি শরীরের ক্ষুধিত বাসনা মুহূর্তে একটি শিখা হয়ে জ্বলে উঠল।

এমন জ্বলে উঠত হামেশাই। কিন্তু দেহের আগুন প্রাণের প্রদীপ জ্বালাতে পারে নি তখনও মারিয়ার। মারিয়ার প্রাণ তখনও শীতল। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির প্রাণের প্রদীপ, আগেই বলেছি, প্রবল শিখায় জ্বলছে সেই থেকে, সেই প্রথম থেকে। পুরুষেব ভালবাসা কৃত্রিম কি নিখাদ, বাইরের খোলস কিংবা আন্তরিক তাঁর স্বরূপ বোঝার ক্ষমতা সব মেয়েরই থাকে। মারিয়াও বুঝেছিলেন, দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছেন। তবু সে-ভালবাসাকে নিজের মনে বড় বেশী আমল দিতে চান নি মারিয়া। তথাপি যে তাঁর শৃঙ্গারে সাড়া দিতেন সে-শুধু তাঁর এই অশান্তির দিনগুলিকে আত্মবিস্মৃত থেকে পার হয়ে যাওয়ার স্বার্থে।

দস্তয়েফ্‌স্কি একজন পূর্বতন কয়েদী, সামান্য পদাতিক সৈন্য মাত্র এখন, না আছে অর্থ প্রতিপত্তি, না সম্মান। তাঁর 'অভাজন' পড়ার পরেও তাঁর সাহিত্যিক সাফল্য সম্পর্কে সামান্য আশাও ছিল না মারিয়ার। অতএব তাঁর প্রণয়ের কোন ভবিষ্যৎ তিনি কল্পনা করতেন না। কেবল বর্তমানের গুরুভার লঘু করতে, নিঃসঙ্গতা দূর করতে দস্তয়েফ্‌স্কিকে দরকার হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি দস্তয়েফ্‌স্কিকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। সাময়িককে চিরন্তন করতে বিন্দু মাত্র আগ্রহ ছিল না তাঁর।

সেদিন মারিয়ার বাড়ি থেকে ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির, একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই ভেতুশকা ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল।

'বলি থাকো কোথায়, ছুটি ত হয়ে যায় সেই কখন, তারপর এতক্ষণ কোথায় কী কর, শুনি?' ভেতুশকার চোখে সন্দেহের ছুরি চকচক করে। ঠোঁটে ফুটে

থাকে সন্ধ্যামণির মতন টাটকা খানিকটা চতুর মিষ্টি হাসি। হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আজ একজন অফিসার এসেছিলেন তোমাকে খুঁজতে। কী সুন্দর চেহারা আর কী চমৎকার দামী পোশাক! দু' ঘোড়ার একটা ল্যাণ্ডোতে চড়ে এসেছিলেন। আহা চোখ জুড়িয়ে যায় গাড়িটার দিকে তাকালে। তোমার বন্ধু বুঝি খুব বড় লোক? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

'তুমি আবার পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষায় থাক নাকি?' স্বরে বুঝি বিদ্রূপ ছিল দস্তয়েফ্স্কির।

'অভিমান স্ফুরিত গলায় ভেতুশকা বলল, 'তুমি আমাকে কী ভাব বলত?'

একটা কুত্তি ছাড়া আর কী ভাবব শুনি, মনে মনে বললেন দস্তয়েফ্স্কি। এ-কথা উচ্চারণ করে ওকে চটানো যায় না। কেন না ভেতুশকা তাঁর ঘরে ঝাঁট-পাট দেয়, টেবিল আলনা বিছানা গোছায়, হাত মুখ ধোয়ার, স্নান করার জল টানে, জুতোয় কালি দেয়, জামা ইস্তিরি করে। ওকে খুশি রাখতে শুধু টাকাটা সিকিটা মাঝে মধ্যে দিলেই হয় না। আদর-সোহাগও করতে হয়। অথচ অনেক দিন থেকেই সেটা আর তাঁর ভাল লাগছিল না। আজ ত না-ই। আজ এই মাত্র তিনি মারিয়ার কাছ থেকে এসেছেন।

ভেতুশকা প্রশ্ন করে দু' পলক দস্তয়েফ্স্কির দিকে তাকিয়েছিল, বলল, 'তুমি কি ভাব আমি একটা, আমি একটা……'একটা সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে অভিমানিনীর গলা বুজে আসছিল।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে দিতে হল তাঁর, তাকে কাছে টেনে এনে বলতে হল, 'তুমি একটা, তুমি একটা সুন্দর পুরুস্টু পুষী বেড়াল।'

সে আদরে ভেতুশকা তাঁর শরীরে গলে পড়ল। ফলে অনিচ্ছার সোহাগ সহজে বন্ধ করতে পারলেন না দস্তয়েফ্স্কি, হয়ত ভেতুশকার চরম ইচ্ছাটাও পূরণ করতে হত, বাঁচাল এসে তার দিদি।

দরজার বাইরে থেকে লুবিয়েংকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফিওদর মিখাইলোভিচ, তোমাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন।' ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনেছিল সে, বলে উঠল, 'বলব নাকি, ফিওদর মিখাইলোভিচ এখন ব্যস্ত আছেন, এখন দেখা হবে না।' বলে লুবিয়েংকা খিল খিল করে হেসে উঠল।

শিথিল নীবিবন্ধ আঁটতে আঁটতে ভেতুশকা বেরিয়ে এল। 'দিদি, তোর পেট ভরা কেবল হিংসে। তুই একদিন হিংসেয় পেট ফুলে মরে যাবি।'

দস্তয়েফ্স্কি ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দিলেন, 'আসতে বল ভদ্রলোককে।'

১৮৫৪-র শীতে পাবলিক প্রসিকিউটর ব্যারণ ভ্রাঙ্গেল পিতার্সবুর্গ থেকে বদলী হয়ে আসেন সেমিপালাতিন্স্ক্-এ। এসেই ডেকে পাঠিয়েছেন দস্তয়েফ্স্কিকে। পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে সৈন্যবিভাগের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তবু সহজ হতে পারেন না দস্তয়েফ্স্কি। স্বচ্ছন্দে এসে উঠতে পারেন না তাঁর অফিসে। ভ্রূ কুঁচকে থাকে, শরীর শক্ত হয়; একটা স্থির গাম্ভীর্য নেমে আসে মুখে, যেন প্রচ্ছন্ন কোন বিরোধের মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কোথায় বিরোধ, এক অভাবনীয় বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন।

দস্তয়েফ্স্কি ঘরে পা দেওয়া মাত্র ভ্রাঙ্গেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে দু' হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে, বললেন, 'আপনাকে যে আবার দেখতে পাব এ আমি চিন্তাও করতে পারি নি। কাতোরগার যমপুরী থেকে কেউ সুস্থ দেহে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারে এ আমার জানা ছিল না। তার ওপরে আবার শুনলাম, আপনার দাদা বললেন, আপনি নূতন করে লিখতে শুরু করেছেন।' দস্তয়েফ্স্কিকে আলিঙ্গন মুক্ত করে, তাঁকে, তাঁর পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজেকে মহৎ সৃষ্টির যোগ্য করে তুলতে আপনি দাদার কাছে হেগেল কান্ট কোরআন চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, এই সেই সব বই আপনার দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গে, আর এই তাঁর চিঠি।'

ভ্রাঙ্গেল একটা পার্সেল আর একখানা লেপাফা তুলে এনে দস্তয়েফ্স্কির পাশে রাখলেন। রেখে তাঁর পাশে বসলেন।

দস্তয়েফ্স্কির মুখে কথা নেই। তিনি নিঃশব্দে কেবল দেখছিলেন মানুষটিকে। ভ্রাঙ্গেল বসলে এবার তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধরে রাখলেন তাঁর মুখে।

'কী দেখছেন?' ভ্রাঙ্গেল দস্তয়েফ্স্কির চোখে চোখে রাখলেন।

'এমন আন্তরিক আগ্রহে পুরনো বন্ধুকেই মানুষ বুকে টেনে নেয়, ত আমি আপনাকে চিনছি না কেন?' দস্তয়েফ্স্কি জবাব দিলেন।

ভ্রাঙ্গেল হেসে উঠলেন, 'চিনবেন কী করে, আপনি আমাকে দেখেছেন নাকি?'

'ত আপনিও আমাকে দেখেন নি।'

'অথচ সত্যিই দেখেছি।'

'আপনি দেখেছেন কিন্তু আমি দেখি নি এ কী করে সম্ভব। কোথায় দেখেছেন, কবে দেখেছেন আপনি আমাকে?'

'আমি খুব সংকোচ বোধ করছি ফিওদর মিখাইলোভিচ, আপনি আমাকে আপনি করে বলবেন না, তুমি করে বলুন। আমি আপনার থেকে বয়েসে অনেক ছোট।'

দস্তয়েফ্‌স্কি কিছু না বলে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। খুঁটে খুঁটে দেখতে থাকলেন তাঁর মুখ। নবীন যুবক। শান্ত অমায়িক মানুষ। আরও কিছু দেখলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখেছেন কিনা মনে পড়ছে না। মনে করতে পারলেন না তিনি।

ভ্রাঙ্গেল ঠোঁট টিপে হাসলেন, 'চিনতে বৃথা চেষ্টা করছেন। আমাকে আপনি ইতিপূর্বে দেখেন নি।'

দস্তয়েফ্‌স্কি তখন বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আমি যদি তুমি বলি ত তুমিও আমাকে তুমি করে বলবে, আপনি নয়। কিন্তু তার আগে বল কোথায় তুমি আমাকে দেখলে, কবে?'

'১৮৪৯-এর সেই শীতের সকাল আমার মনে জন্মের দাগ রেখে গেছে, ফিওদর, ও আমি কোনদিন ভুলব না। আমার বয়েস তখন ষোল। আমি তখন 'আলেকজান্ড্রোভ্‌স্কি লিসে'-এর ছাত্র। তোমার 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি' 'অভাজন' পড়েছি। পড়তে পড়তে কেঁদেছি। কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি…'

অধৈর্য দস্তয়েফ্‌স্কি শুধোলেন, 'কিন্তু দেখলে কবে, বল?'

'আহা বলছি কী তবে…' ভ্রাঙ্গেল হাত তুলে তাঁকে সবুর করতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'সেই ২২ ডিসেম্বর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, ঘুম থেকে উঠেছি এ-কথা বলা ভুল, কেন না, সারারাত একফোঁটা ঘুমোই নি, কেবল ছটফট করেছি আর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বাইরে বেরোনোর জন্যে তৈরি হয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তুষার-কুচি-কুয়াসার ঘেরাটোপে আবছা রাস্তায় চোখ পেতে অপলক তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল কয়েকখানা দু' ঘোড়ার শ্লেজ কোচ……'

স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের নিষ্ঠুর ইতিহাসের কলঙ্কিত সেই অধ্যায় অবাক করে ভেসে উঠল ভ্রাঙ্গেলের চোখে।

স্মোল্‌নি ইনসটিটিউটের ছাত্রী অ্যারিসটোক্র্যাট যুবতীরাই সাধারণত ওইগুলি ব্যবহার করে। কখনো কখনো ইমপিরিয়াল থিয়েট্রিক্যাল স্কুলের ব্যালে শিক্ষার্থিনীরা। বিস্ফারিত চোখে ভ্রাঙ্গেল দেখলেন আজ সে-গাড়িতে করে যাচ্ছে রাজবন্দীরা। পেত্রাশেফ্‌স্কি দলের কুড়ি জনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে জারের পুলিশ। কানাঘুষায় তিনি শুনেছিলেন, জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধ আবিষ্কার করে ফেলেছে সম্রাটের গুপ্তচর। ষড়যন্ত্রকারীরা সমাজতন্ত্রে

বিশ্বাসী। তাঁরা নাগরিক অধিকার চাইছেন। ভূমিদাসদের মুক্তি দাবি করছেন। তা ছাড়াও অনেক সাংঘাতিক ভাবনা ভাবছেন নাকি তাঁরা। মিখাইল পেত্রাশেফ্স্কির নেতৃত্বে এই বিপ্লবীদল জারকেই নাকি উচ্ছেদ করতে কৃতসঙ্কল্প। এ-দলে লিসে-র কোন-কোন গ্র্যাজুয়েটও নাকি ছিলেন। সে সূত্রে লিসে-র হোসটেলেও জারের পুলিশ হানা দিয়েছিল, তাদের সন্দেহ ছিল, এখানেও কিছু বে-আইনী বই-পত্র পাওয়া যাবে। পায় নি পুলিশ কিন্তু ছাত্রদের ওপরে গুপ্তচররা কড়া নজর রেখেছিল। তাই লিসে-র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্ররা পেত্রাশেফ্স্কি-দলের কার্যকলাপ সমর্থন করলেও মুখ ফুটে সে-কথা কখনো উচ্চারণ করত না। ভ্রাঙ্গেলের ছিল আরও মুশকিল, তাঁর এক আত্মীয় কার্ল ইগোরোভিচ্ মানদের্সর্তেন ছিলেন জারের সেই গুপ্তচরদের একজন। খ্রীস্টমাস-এর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ভ্রাঙ্গেল সেই আত্মীয়ের কাছে শুনেছিলেন পেত্রাশেফ্স্কি-দলের কুড়ি জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। গুলি করে তাঁদের হত্যা করা হবে। আর তার মধ্যে আছেন ভ্রাঙ্গেলের প্রিয় লেখক ফিওদর দস্তয়েফ্স্কি। যাঁর গৌরবে তিনি গর্ববোধ করেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে জেনে অব্দি মনের মধ্যে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা পোহাচ্ছিলেন ভ্রাঙ্গেল। ভ্রাঙ্গেলের মামা ছিলেন জারের ঘোড়-সওয়ারবাহিনীর একজন অফিসার। সেদিন মৃত্যুমঞ্চ পাহারায় তাঁর কোম্পানী নিয়ে উপস্থিত থাকার আদেশ হয়েছিল তাঁর ওপরে। ভ্রাঙ্গেল ধরে বসেছিলেন, 'আমাকেও নিয়ে যেতে হবে, মামা।' ভাগ্নের আবদার রাখতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। তাই সেই ভোরেই সেজেগুজে তৈরি হয়েছিলেন ভ্রাঙ্গেল। স্লেজ ক'খানায় রাজবন্দীদের দেখেই তিনি নেমে এলেন। সেমিওনোফ্স্কির প্যারেড গ্রাউণ্ড তখন লোকে লোকারণ্য। অবশ্য সৈন্যসামন্তের সংখ্যাই বেশি। জনতার মধ্যে প্রায় সবাই চাষাভূষা আর ফেরিওলা। ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটের উপরে খাটো ওভারকোট গায়ে সেই নিদারুণ শীতের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। ভদ্রলোক কি ছাত্র বলতে বড় কেউ ছিল না তার মধ্যে। ভ্রাঙ্গেলের আত্মীয় আর এক অফিসারও উপস্থিত ছিলেন তখন, ভ্রাঙ্গেলকে দেখেই তিনি ছুটে এলেন, 'তুমি এখানে কেন, তুমি এখানে কী করছ, শিগগির পালাও; গুপ্ত-পুলিশদের কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ ঘটে যাবে।' অগত্যা ভ্রাঙ্গেলকে পিছু হটতে হল, কিন্তু পালিয়ে যেতে মন সরল না তাঁর, তিনি আত্মীয়টির চোখ এড়িয়ে জনতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন……

এ-দুঃসাহসের কথা তিনি আজ পর্যন্ত কারো কাছে ফাঁস করেন নি। এখন

দস্তয়েফ্স্কিকে তাঁর সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বললেন, 'সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে আমি পায়ের আঙুলের ওপরে ভর করে মাথা উঁচু করে দেখছিলাম। প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে কতকগুলি খুঁটি পোতা হয়েছে; দণ্ডিতদের কষে বাঁধা হয়েছে সে-খুঁটির সঙ্গে। এক সারিতে ন'জন আর এক সারিতে এগারো জন। শূন্যের কুড়ি ডিগ্রি নিচে ঠাণ্ডা তার মধ্যে বন্দীরা দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে তাদের জামা বলতে একটা শার্ট মাত্র। হঠাৎ কানে গেল একজন মুৎসুদ্দী দণ্ডাদেশ পাঠ করছেন। সকলের আগে আপনার…'দস্তয়েফ্স্কি ফিওদর মিখাইলোভিচ জারতন্ত্র উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বেলিন্স্কির লেখা একখানা রাজদ্রোহ-মূলক বাজেয়াপ্ত চিঠি প্রচারের দায়ে অপরাধী। তা ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলার মতলবে প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলেন। অতএব মহামান্য জার তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করেছেন……তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছে।

'আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার প্রিয় লেখক দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়বেন। অসহ্য কষ্টে অবশ হয়ে গিয়েছিল আমার শরীর, চোখের জলে সব ঝাপসা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার মতন উপস্থিত জনতা সকলে কাতর, শোকাচ্ছন্ন। পার্কে এত এত মানুষ কিন্তু নিঃশব্দ মাঠটাকে মনে হচ্ছিল যেন নির্জন, শূন্য। হঠাৎ সেই শূন্য পূর্ণ করে ঘোড়ার খুরের শব্দ ছুটে এল।……মৃত্যুদণ্ড নয়। সম্রাটের পুনর্বিচারের রায় নিয়ে ছুটে এসেছে ঘোড়া-সওয়ার—সম্রাট ক্ষমা করেছেন; মৃত্যুদণ্ডের বদলে নির্বাসন। চার বছর সাইবেরিয়ার জেলে কাটাতে হবে দস্তয়েফ্স্কিকে। আর কার কী সাজা হল শুনলাম না। কেউ মরল না সেই আনন্দে বুক ভরে উঠল আমার। প্রিয় লেখক বেঁচে গেলেন, বেঁচে থাকবেন। উঃ কী আনন্দ, আমি মনের মধ্যে নৃত্য করে উঠলাম; কিন্তু পাছে কেউ সন্দেহ করে নিঃশব্দে সরে পড়লাম পার্ক থেকে। সেই থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে ছিলাম, ফিওদর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দেখা, বন্ধু, তোমাকে বুকে টেনে নেব না বল?'

'বন্ধু!' দস্তয়েফ্স্কির চোখ ছলছল করছে তখন। ভিজে গলায় দস্তয়েফ্স্কি রুদ্ধস্বরে বললেন, 'বন্ধু, তুমি আমার বন্ধু।'

সেমিপালাতিন্স্ক্-এর মতন নির্বান্ধব বিদেশে এমন বন্ধু তাঁর কেউ ছিল না। তাঁর দুর্লভ ভাগ্য যেন হাত ধরে ভ্রাঙ্গেলকে এনে তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে।

'…এমন সহৃদয়, এমন দয়ালু এমন উপকারী মানুষ বুঝি আর হয়

না…' দস্তয়েফ্‌স্কি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু আপোলোন মাইকফ্‌-কে। ভ্রাঙ্গেলের মতন একজন সুদর্শন তরুণ পদস্থ রাজকর্মচারীর বন্ধু হতে পেরে সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌-এ তাঁর মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

এই পরম কারুণিক বন্ধুটির জন্যেই মারিয়াকে এত অর্থ সাহায্য করা দস্তয়েফ্‌স্কির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যখন তখন ভ্রাঙ্গেলের কাছে হাত পাততেন তিনি, আর হাত পাতলে ভ্রাঙ্গেল কখনো তাঁকে বিমুখ করতেন না।

ভ্রাঙ্গেল ঘরে ঢুকেই চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, ঠোঁটে একটা চতুর হাসি ঝুলিয়ে বললেন, 'তুমি একটি আস্ত শয়তান, একবারও বল নি, তুমি এমন সুখে আছ।'

'সুখে আছি ?' অবাক হয়ে তাকালেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

হাসিটাকে এবার সারা মুখে ছড়িয়ে দিলেন ভ্রাঙ্গেল, 'দু' পাশে দু'টি সেবাদাসী তোমার, তারপরেও সুখী নও ?'

'আদৌ না।' দস্তয়েফ্‌স্কি হাসলেন কিন্তু সে হাসি ভ্রাঙ্গেলের মতন উজ্জ্বল হয়ে ফুটল না। 'আমার জন্যে লুবিয়েংকার মাথা ব্যথা নেই, তার অনেক আছে, কিন্তু ওই ছোটটা, ভেতুশকা, সব ছেড়ে যেন আমাকেই হাঁকের মতন আঁকড়ে থাকতে চাইছে। কিন্তু আমি আঁকড়ে থাকতে পারছি না, পারব না। শুধু শরীর আমার ভাল লাগে না। আমার কী চাই তুমি জান, আমি চাই একটি দুর্জয় বিদুষী হৃদয়। মারিয়াকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, ভ্রাঙ্গেল। এরা সব আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে এখন। কিন্তু তুচ্ছ বলে কী ঠেলে রাখতে পারছি ভাই, সেখানেই হয়েছে মুশকিল। আমার কাপড় কাচা, জল তোলা, ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি কাজের জন্যে ওকে মাঝে মধ্যে দু'চার টাকা দিলেই হয় না, ও আরও কিছু চায়। আদর সোহাগ না পেলে ঠোঁট ফোলায়, অভিমান করে। কিন্তু আমি যে বিরক্ত হই, আমার যে ভাল লাগে না সেটা ওকে বোঝাতে পারি নে। বোঝ এখন কী বিপদে পড়েছি।'

'বিপদ, একে তুমি বিপদ বল ?' এবার হো হো করে হেসে উঠলেন ভ্রাঙ্গেল।' আমি ত বলি, আসলে এ-ই মঙ্গল। একজনকে হৃদয় দিয়ে আর অন্য জনকে শরীর দিয়ে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার সুবিধে হয়েছে তোমার। তুমি মারিয়ার জন্যে মুষড়ে পড়ার হাত থেকে বেঁচেছ।'

'না ভাই, একেবারে না। তুমি ভুল বুঝেছ। মারিয়াকেই আমি দেহ-মন সমর্পণ করে বসে আছি। আধখানা একে আর আধখানা ওকে দিয়ে কোন সুখ

নেই। ওটা প্রতারণা। ও-ভাবে আমি সুখী হব না। ভেতুশকাকে আমি তাই এড়িয়েই চলছি, ভাই। আমি এখন মারিয়া-অন্ত প্রাণ, আর কোন মেয়ের দিকে আমার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। আমি আর কারো মধ্যেই একবিন্দু আকর্ষণ বোধ করি নে '

ভ্রাঙ্গেল উঠে দাঁড়ালেন।

'ওকি এরই মধ্যে উঠলে যে? আমি তোমার কাছেই যাব ভাবছিলাম। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।'

'বেশ ত পথে যেতে যেতে বলবে। ওঠ। আমি তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি। আমি জারদঁ্যা দে কোসাক-এ একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেলেছি। তোমাকে দেখাব। চল।'

'অত দূরে।' দস্তয়েফ্‌স্কি যেন বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃখে তখনি মুষড়ে পড়েছেন এমন আর্ত শোনাল তাঁর স্বর।

'অত দূর বলে আঁৎকে উঠছ কেন? আমার ল্যাণ্ডো আছে কী করতে। ও-ও, ভাবছ আমার সঙ্গে তোমার আর এমন হামেশা দেখা সাক্ষাৎ হবে না? ভাবছ আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেব?'

'কিন্তু…'

'আমি যদি লুব্‌য়েংকা আর ভেতুশকাকেও নিয়ে যাই তখনও কী 'কিন্তু' থাকবে বন্ধু?'

'এতক্ষণ ধবে তবে কী আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বললাম?'

'যদি সত্যি বলে থাক ত আমার বাড়িতে থাকতে আপত্তি কেন? ভেতুশকার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ত আমার বাড়িতে এসে থাকা উচিত তোমার।'

বন্ধুর কাছে হাত পাতা যায়, তাই বলে তার ঘাড়ে চাপা যায় না। কিন্তু সে-কথা না বলে তিনি নিঃশব্দে এসে ভ্রাঙ্গেলের সঙ্গে তাঁর ল্যাণ্ডোতে উঠলেন।

ছয়

১৮৫৫-র বসন্তকাল সেদিন। রাস্তায় গোড়ালি-ডোবা ধুলো। দুটো ঘোড়ার আটটা খুরের দাপটে সে-ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছিল, ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারধারে। সেই ধুলোর মেঘ পেছনে ফেলে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছিল ব্যারন আলেকসানদার এগোরোভিচ ভ্রাঙ্গেলের ল্যাণ্ডো। দু' বন্ধু পাশাপাশি বসেছিলেন। কারো মুখে কথা নেই। ভ্রাঙ্গেল চোখের কোণে একবার দেখে নিলেন বন্ধুকে,—মুখ গম্ভীর, তিনি সামনে তাকিয়ে আছেন। কী ভাবছেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর অজানা নয়। ভেতুশকাকে নিয়ে যতই ঠাট্টা মশকরা করুন না কেন দস্তয়েফ্‌স্কি যে এখন মারিয়া-অন্ত প্রাণ, তাঁর ভালবাসার মধ্যে তিনি যে সমস্ত সত্তা শুদ্ধু ডুবে আছেন সে-কথা ভ্রাঙ্গেল ভাল করেই জানতেন। সেই প্রথম যেদিন মারিয়ার কথা তাঁকে বলেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি সেদিনই টের পেয়েছেন কী গভীর আর তীব্র মারিয়ার প্রতি তাঁর অন্তরের টান। এখনও তিনি অনায়াসে স্মরণ করতে পারেন এমনই দাগ কেটে গেছে দস্তয়েফ্‌স্কির কথাগুলি তাঁর মনে :

'আলেকসানদার এগোরোভিচ,' মনের মধ্যে এক প্রবল দ্বন্দ্ব নিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি, তুমি ছাড়া এখানে আমার আর বন্ধু নেই, তাই তোমাকেই আমি আমার মনের কথা বলতে এসেছি। আমি এক মহা সংকটে পড়েছি। আমি ভেবে উঠতে পারছি না, কী করব, কী করা উচিত। আমি তোমার সাহায্য চাই, পরামর্শ চাই।' বলতে চেয়েও কী আর সহজে বলতে পেরেছেন। বলতে বলতে কখনো থেমে গিয়ে ঘরময় পায়চারি করেছেন, কখনো জানলার শিক্ ধরে স্তব্ধ হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। কিন্তু বেশীক্ষণ পায়চারি করতে কিংবা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, আবেগ সামান্য থিতিয়ে এলেই ছুটে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। এমনি করে জীবনের প্রথম প্রেমের উত্তেজনা উৎসাহ আর যন্ত্রণার কথা বলেছেন কখনো কলরব করে, কখনো নিঃশ্বাসের স্বরে। বলেছেন, 'ভাই, আমি একটি মহিলাকে ভালবেসে ফেলেছি। দেবীতুল্য সে-রমণী এক পরম বিস্ময়, আর গুণের কথা যদি তোল, তারও তুলনা নেই। এমন রমণীকে ভাল না বেসে উপায় থাকে না কারো। কিন্তু সংকট কী জান বন্ধু, মহাসংকট? ভদ্রমহিলা বিবাহিতা।....এ দুর্ভাবনাকে আমি সব সময় ভাবি। আমি ইচ্ছে করে ভাবি তা নয়, ভাবনা আপনা থেকে এসে মন ছেয়ে

ফেলে। তার অলৌকিক সুন্দর মুখ সব সময় আমার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে থাকে। …ভদ্রমহিলা বড় বিপদে পড়েছে। তুমি ত জান ভাই, আমি অল্পেতেই বিচলিত হয়ে পড়ি; কিন্তু এখন আমাকে বিচলিত করেছে ওর কষ্ট। এবং সে-কষ্টও অল্প নয়, তুচ্ছ নয়। একটা সাত বছরের শিশু নিয়ে মারিয়া কঠিন আর্থিক সংকটে ভুগছে। তার ওপর মানুষটি খুব সুস্থ সবল নয়। পলকা স্বাস্থ্যের মানুষটি সর্দি কাসিতে কষ্ট পায় কেবল। কষ্ট তার স্বামীকে নিয়েই আসলে চরম। পাড়-মাতাল স্বামীটির জন্যে আজ সে সেমিপালাতিনস্ক্‌-এ প্রায় একঘরে। কারো সঙ্গে মিশতে পারে না। কেউ তার সঙ্গে মেশে না। আর মেলামেশার জন্যে ত সচ্ছলতারও দরকার। কাউকে এক কাপ চা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে সে-সামর্থ্যও তার নেই, বলে নিজেদেরই অনেক দিন দু' বেলা দু' টুকরো রুটি জোটে না। অথচ তার স্বামীটি অযোগ্য নয়। সু-পুরুষ উদার শিক্ষিত বুদ্ধিমান। উচ্ছৃংখল হয়ে গিয়েই বিপদ ঘটেছে তার। খুব ভাল একটা চাকরি খুইয়েছে।'

শুধু প্রেমিকার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি, প্রেমিকার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন তাঁর। আলাপ করে খুশী হয়েছেন ভ্রাঙ্গেল। দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে একমত হয়েছেন। মহিলা সত্যি সুন্দরী। পলকা-স্বাস্থ্যের যুবতী-মুখে নরম এক আলগা লাবণ্য মাখানো, দেখতে বেশ ভাল লাগে। তিনি যখন কোমল গলায় কথা বলেন কিংবা উত্তেজিত হলে স্বর গম্ভীর করেন, আরও ভাল লাগে। দস্তয়েফ্‌স্কি বাড়িয়ে বলেন নি। মার্জিত রুচির এই মহিলা যথার্থ বিদুষী।

ভ্রাঙ্গেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন। পরের বউকে ভালবাসার যন্ত্রণা যে কী মর্মান্তিক তিনি জানেন, নিজেও তিনি ভুক্তভুগী। কয়েকটি সন্তানের জননী এক সুন্দরীর প্রেমে তিনিও সমান কাতর। দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে সে-কথা স্বীকার করে তিনি বলেছিলেন, 'দুর্লভকে ভালবেসে কষ্ট পাব, এই যেন আমাদের নিয়তি।'

সেই প্রিয়-মুখ মনে পড়তেই ভ্রাঙ্গেল চঞ্চল হলেন, নিজের আসনে নড়ে চড়ে বসলেন, যেন সেই প্রিয়-মুখ ভুলতেই দস্তয়েফ্‌স্কির দিকে ফিরে তাকালেন।

'কী হে, তুমি যে কথাটি বলছ না। অথচ তোমার নাকি আমাকে ভীষণ দরকার।'

দস্তয়েফ্‌স্কির যেন ধ্যান ভাঙল, তিনিও নড়েচড়ে বসলেন, 'ওরা বড় দুঃখে আছে ভ্রাঙ্গেল।'

'কেন তুমি সাহায্য করছ না ?'

'আমার সাহায্যে আর কতটুকু সুরাহা হয় !'

'জানি হয় না ! আমার থেকে নাও।'

'তোমার থেকে আর কত ধার করব ?'

'ধার ভাবছ কেন ফিওদর, ভাবছ না কেন দু'জনে মিলে একটা দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করছি।'

'তার চেয়ে আলেকসানদার ইসায়েফ্‌কে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না।'

'সে তুমি আগেও বলেছ, আমি ভুলি নি, এখানকার সরকারী কর্তারা তার ওপরে খুব অসন্তুষ্ট তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না। মারিয়া দমিত্রিয়েভ্‌না নিজেও ধরাধবি করে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং যেখানে হোক চাকরি ইসায়েফ্‌-এর একটা হবেই। আর যতক্ষণ না হচ্ছে আমবা ত আছি। তার জন্যে অত ভাবছ কেন ?' তারপর হেসে বললেন, 'প্রেমই ভাবায়, তাই না ? তোমার আর দোষ কী !'

একটু পরেই গাড়ি এসে থামল একটা মস্ত দেউড়ির সামনে। ওঁরা নেমে এলেন গাড়ি থেকে।

জারভ্যাঁ দে কোসাক সেমিপালাতিনস্ক্‌ ছাড়িয়ে তার উপকণ্ঠে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানেই কাজাকফ্‌ গার্ডেনস। মসকোআর এক ধনী জমিদার তাঁর এ-অঞ্চলের খেত-খামার দেখা-শোনার জন্যে তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত একটি বাগান-বাড়ি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু জমিদার সম্প্রতি আব এদিক পানে আসছেন না ; বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। বাড়ির মূল্যবান আসবাব-পত্রে ধুলো জমে উঠছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জেনে বাড়ির কেয়ার-টেকারকে তিনি বাড়িটা ভাল লোক পেলে ভাড়া দিয়ে দিতে লিখেছিলেন। খবর পাওয়ামাত্র ভ্রাঙ্গেল সেই সুযোগটা নিয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমে সদর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন ভ্রাঙ্গেল। 'সুযোগ ছাড়লে তুমি পসতাতে, ভ্রাঙ্গেল।' চারদিক দেখতে দেখতে বললেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তখন কেয়ার-টেকার সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে তারা এসে ঘরে ঢুকল। মূল্যবান আসবাবে সাজানো বড় বড় ঘর সব। আপাতত ভ্রাঙ্গেলের থাকার মতন কয়েকখানা ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলি ধুলোয় জঞ্জালে তেমনি অবহেলায় পড়ে আছে। ঘর দেখে দু'জনে বাগান দেখতে বেরিয়ে এলেন। ঘরের আসবাবের প্রতি যত্ন না থাকলেও

বাগানের প্রতি কেম্বার-টেকারের অমনোযোগ নেই দেখে খুশি হলেন দস্তয়েফ্স্কি। চারধারে নানা বর্ণের ফুল আর চটকদার বাহারী-পাতার গাছ ঝলমল করছে। বড় বড় গাছের তলায় লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা।

'বিশ্রাম ভোগের, অবসর যাপনের চমৎকার জায়গা।'

দস্তয়েফ্স্কিকে সমর্থন করে ভ্রাঙ্গেল বলেছিলেন, 'শুধু অবসর আর বিশ্রাম যাপনের নয়, লেখার পক্ষেও একটি আদর্শ স্থান।' ভ্রাঙ্গেলের আমন্ত্রণ আন্তরিক ছিল, 'এস, থাক এসে এখানে, আমরা দুটিতে বেশ থাকব।'

বেশ থাকবেন জেনেও দস্তয়েফ্স্কি রাজী হন নি। যখন তখন টাকার জন্যে হাত পাততে হয় যাঁর কাছে, তাঁর ওপরে নিজের খাওয়া-দাওয়া-থাকার দায় চাপাতে মর্যাদায় বাধবে, স্বাভাবিক। তিনি স্বাধীন থাকতে চান। তাই ভ্রাঙ্গেলের সঙ্গে থাকতে চান না। তবে মাঝে মাঝে আসেন। দু'চার দিন থাকেন। আসতে হয় এবং বন্ধুর অনুরোধে থাকতেও হয়—টাকার জন্যে, পরামর্শের জন্যে - দু' বন্ধু দু' বন্ধুর পরকীয়া প্রেমের জ্বালা নিয়ে কথার মালা গাঁথেন। মারিয়ার কথা বলতে বলতে দস্তয়েফ্স্কির চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

একদিন নিঃস্বর গলায় হতাশ দস্তয়েফ্স্কি শুধোলেন, 'বল বন্ধু, এখন কী করি!

ভ্রাঙ্গেল হাসলেন, 'ইসায়েফ্-এর চাকরি হোক তুমি মনোবাক্যে চাইছিলে। সে-চাকরি যেই একটা হল তার, অমনি তোমার জীবনে আর এক সংকট দেখা দিল। বল বন্ধু, তোমার এই পরম সংকটে আমি কী পরামর্শ দিই?'

রাত-ভর দু' বন্ধু সে আলোচনাই করলেন।

ইসায়েফ্-এর চাকরি হয়েছে, আর এদের জন্যে তাঁকে ধার করে মরতে হবে না জেনে প্রথমে খুশীতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দস্তয়েফ্স্কির। শুধিয়েছিলেন, 'কোথায় চাকরি হল, মাইনে কত?'

মারিয়া প্রশ্নটা যেন ভাল করে শোনেন নি কি শুনেও গ্রাহ্য করেন নি। ঠোঁট টিপে হেসে ছিলেন! 'আর কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, ফিওদর।'

'কেন!' এক ফুঁয়ে যেন দস্তয়েফ্স্কির চোখের আলো নিবিয়ে দিয়ে ছিলেন মারিয়া।

চতুর হাসিটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে মারিয়া বলেছিলেন, 'দেখা করতে হলে তোমাকে পাঁচ শ' মাইল ছুটে যেতে হবে। আমরা কুজ্‌নেৎস্ক্ চলে যাচ্ছি।'

'এত দূরে!' অসহায়ের মতন হতাশ স্বর দস্তয়েফ্স্কির।

মারিয়া এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তখন। তখন আর তাঁর মুখে চতুর হাসিটি নেই। তাঁরও মুখ আলো-নেভা মেঘলা-আকাশের মতন মলিন হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'চাকরি যদি আরো দূরে হত, যেতে হত। তুমি ত চিরকাল ধার করে খাওয়াতে পারতে না আমাদের।'

যেন দস্তয়েফ্‌স্কির দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ। যেন দরিদ্র বলেই দস্তয়েফ্‌স্কির প্রেম করার অধিকার নেই। যেন দরিদ্র বলেই মারিয়া তাঁর প্রেমে আকণ্ঠ ডুবল না। বরং যেন এই দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই সে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

দস্তয়েফ্‌স্কিকে মৌন ও মলিন হয়ে বসে থাকতে দেখে মারিয়া তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।' তুমি দুঃখ পেয়ো না ফিওদর, আমি জানি, তুমি আমাদের বোঝা বইতে পার, বইবেও, কারণ, যে-সামান্য মাইনের চাকরি ও পেয়েছে তাতে আমাদের সংসার চলবে না।'

'তবু সে সামান্য চাকরির ভরসায় তুমি এত দূরে চলে যাবে?'

'লোকটা তোমার পয়সায় তোমার চোখের সামনে বেকার বসে মদ গিলবে শুধু? বল, জবাব দাও।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মারিয়া।

দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দিলেন না। বদলে, দু' হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'মারিয়া তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না, আমি নির্ঘাৎ মরে যাব।'

সেই আকুলতায় আর্দ্র সিক্ত হয়ে মারিয়াও তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

যেন শেষবার বলেই দস্তয়েফ্‌স্কির কোন বাড়াবাড়িতেই আর বাধা দিলেন না মারিয়া। মারিয়াকে বুকে ভরে, বুকে রেখে দস্তয়েফ্‌স্কি তখনকার মতন শান্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এলে আবার বুকের আগুন দারুণ জ্বলে উঠেছিল। ছুটে এসেছিলেন বন্ধুর কাছে। 'বল বন্ধু, এখন কী করি?'

*

পরের দিন মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ইসায়েফ্‌ দোর গোড়াতেই ধরে বসলেন তাঁকে। মুখ থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। মদ খেয়েছে কিন্তু মত্ত অবস্থা নয় তখন। দস্তয়েফ্‌স্কিকে টেনে এনে তিনি ডিভানে বসালেন, 'ফিওদর, শুনেছ ত সব? আমরা কুজ্‌নেৎস্ক্‌ চলে যাচ্ছি। পাঁচ শ' মাইল পথ যেতে অনেক খরচ, তার ওপর ওখানে গিয়ে পৌঁছে মাসখানেক খেতে হবে তবে

মাইনে পাব। অর্থচ আমার হাতে একটা কোপেকও নেই। শেষবারের মতন কিছু সাহায্য না করলেই যে নয়, ফিওদর।' দস্তয়েফ্স্কিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন নেশাগ্রস্ত মানুষটা।

দস্তয়েফ্স্কি কোথায় আর টাকা পাবেন! ছুটে এলেন ভ্রাঙ্গেলের কাছে। 'আমার জীবনে সূর্য উঠতে না উঠতে ডুবে গেল ভ্রাঙ্গেল। আমার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। আমি আর বাঁচব না।' চোখ ছলছল করে উঠল দস্তয়েফ্স্কির, গলা বুজে এল।

ভ্রাঙ্গেল তাঁকে কাছে বসিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, টাকা দিলেন। বললেন, 'প্রেমের টান থাকলে পাঁচ শ' মাইল আর কতটুকু! মারিয়ার সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে তুমি মুষড়ে পড়ো না বন্ধু। আমি ত রয়েছি।'

সত্যি, বন্ধুর মতন বন্ধু ছিলেন ভ্রাঙ্গেল। শুধু যে রাহা খরচা আর অপরিচিত জায়গায় গিয়ে অসুবিধেয় না পড়তে হয় তার জন্যে একটা মোটা টাকা মারিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাই নয়, তার পরেও যা করেছিলেন সেটা অবিস্মরণীয়।

ইসায়েফ্‌কে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি; বলেছিলেন, 'কুজ্‌নেৎস্ক্ যাওয়ার পথে জারন্তাঁ দে কোসাক-এ কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করে যাবেন। আমার বাড়িতে কিছু মূল্যবান মদ আছে। শেষবারের মতন আপনাকে পেট ভরে মদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

এমন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না তেমন মানুষ নন ইসায়েফ্। তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। সানন্দে রাজী হলেন।

পয়সা বাঁচাতে তাঁরা দু'টি মালটানা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন। দুটো গাড়িতেই মালপত্র ঠাসা। তারই মধ্যে বসার মতন তিনটে জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁরা গাড়ি দু'টোয়। ক্যাকরা গাড়ি দু'টো দুপুর বেলাতেই এসে থামল জারন্তাঁ দে কোসাক-এ ভ্রাঙ্গেলের বাড়ির সামনে। দস্তয়েফ্স্কি সকালবেলা থেকেই হাজির সেখানে। দু'জনে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসালেন। এক ঘরে মদের বোতল আর গেলাস দিয়ে ইসায়েফ্‌কে বসিয়ে দিলেন ভ্রাঙ্গেল। তিনিও বসলেন তাঁর সামনে। বললেন, "বিদায় বেলায় যত মদ পার পেট পুরে খেয়ে নাও, ইসায়েফ্।"

"বেঁচে থাক ভাই।" বলে বোতলের মদ গেলাসে ঢাললেন ইসায়েফ্। ভ্রাঙ্গেল তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। গল্প করতে করতে গেলাসের পর গেলাস

মদ গিলতে থাকলেন ইসায়েফ্‌। পাশাকে তুলে দেওয়া হয়েছে কেয়ার-টেকারের হাতে। পাশা খেলছে তার সঙ্গে।

নিরঙ্কুশ সেই অবসরে দুটি বিচ্ছেদ-বেদনাবিধুর মানুষ এসে বসল ছায়ানিবিড় গাছের নিচে, নিভৃত বেঞ্চিতে। ফুলের গন্ধ, পাখির কলরব, নরম বাতাস ও মাটির পোকার একটানা শব্দে গম্ভীর সবুজ নির্জনতা ঘিরে থাকল বাহুলীন দুই প্রেমিককে। বিদায় বেলায় শেষ মুহূর্তগুলি দু'জনে গণ্ডুষ ভরে আকণ্ঠ পান করতে থাকলেন। বিদায়ের সময় যত এগিয়ে আসে বাহুর বন্ধন তত দৃঢ় হয়। কিন্তু বাহু-বন্ধন যতই দৃঢ় হোক বিচ্ছেদকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

জারন্ধাঁ দে কোসাক-এর দেউড়ির শান বাঁধান পথের ওপরে অসহিষ্ণু ঘোড়ার অস্থির খুরের শব্দ ওঠে, ঘোড়ার হ্রেসা শোনা যায় বারবার। এবং সেই সব—সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে গাড়োয়ানের গলা চেঁচিয়ে ওঠে—তারা আর অপেক্ষা করতে চায় না। তাদের আরো দেরি করিয়ে দিলে ডবল ভাড়া দিতে হবে। অতএব বাহু-বন্ধন শিথিল করতে হল। চোখের জল মুছে মারিয়ার গায়ে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দস্তয়েফ্‌স্কি। মারিয়া আগে আগে এগিয়ে চললেন, দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর পেছনে।

ইসায়েফ্‌-এর তখনও উঠতে আপত্তি। তিনি আরো খাবেন। এখনও তাঁর আকণ্ঠ পান হয় নি। এখনও তিনি পরিপূর্ণ তৃপ্ত নন।

ভ্রাঙ্গেল তখন বললেন, 'বেশ ত এস, তুমি আর আমি আমার ল্যাণ্ডোতে উঠি। তুমি ল্যাণ্ডোতে বসে প্রাণ ভরে পান কর।' তিনি এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এলেন, বললেন, 'এ বোতল শেষ করতে তোমাকে নিয়ে আমার যত দূর যেতে হয় যাব। তারপর তোমাকে তোমার গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরব আমি।'

'বহুৎ আচ্ছা।' বলে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে যেতে ভ্রাঙ্গেলের গলা জড়িয়ে ধরলেন ইসায়েফ্‌। তাঁকে ধরাধরি করে এনে ল্যাণ্ডোতে ওঠানো হল।

স্যাকরা গাড়িতে মালপত্রের ডাঁইয়ের এক ধারে পাশাকে নিয়ে উঠলেন মারিয়া। তার পাশে দস্তয়েফ্‌স্কি গিয়ে বসলেন।

পাশার চোখ জোড়া ঘুম তখন। তাকে শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমে তলিয়ে গেল। পাশাপাশি বসে রইলেন মারিয়া আর দস্তয়েফ্‌স্কি। ভ্রাঙ্গেলের ল্যাণ্ডো আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে তাঁদের গাড়ি। বোঝার ভারে স্যাকরা গাড়ি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। একে একে জারন্ধাঁ দে কোসাক-এর শেষ বাড়িটিও ছাড়িয়ে গেলেন তাঁরা। শেষ বাতিটি, গাঁয়ের শেষ কুকুরের ডাকটিও

পেছন পড়ে থাকল। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পতিত প্রান্তর। তারই মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পুরু ধুলোর আস্তরণে ঢাকা প্রশস্ত রাজপথ। কোথাও জন-মানুষের চিহ্ন নেই। তবু সে শূন্য নির্জন নিঃসঙ্গ লাগল না দস্তয়েফ্‌স্কির। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না-ই সবশূন্য পূর্ণ করে আছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। মারিয়ার মাথা তাঁর কাঁধে। কাঁধ থেকে মাথা তুলে নিয়ে তিনি তাঁর গালে কপালে চুলের মধ্যে হাত বুলোতে থাকলেন, মুখ বাড়িয়ে দিলেন মুখের কাছে। মারিয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট রাখলেন তাঁর। মারিয়া দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরলেন দস্তয়েফ্‌স্কির। শূন্য প্রান্তরের পূব প্রান্তে চাঁদ উঠেছে তখন। ক্রমশ মধ্য-আকাশের দিকে এগিয়ে আসছে চাঁদ। নাতিশীতোষ্ণ বাতাস বইছে। প্রচ্ছন্ন এক বেদনার পটভূমিতে পরম যন্ত্রণার সুখে সংলগ্ন দু'টি মানুষ একাঙ্গ একাত্ম হয়ে আছে। মনের এক কোণে যেন আশা—এ-চাঁদনী রাত ফুরোবে না, এ-যাত্রা শেষ হবে না জীবন থাকতে। তাদের বিচ্ছেদ ঘটবে না কোনদিন।

কিন্তু অসম্ভব সে-আশার আলো অচিরেই নিভে গেল। দস্তয়েফ্‌স্কি দেখলেন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভ্রাঙ্গেলের ল্যাণ্ডো। তাঁদের গাড়ি ভ্রাঙ্গেলের ল্যাণ্ডোর কাছে এলে ভ্রাঙ্গেল নেমে এলেন। গাড়ি থামিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে এসে বললেন, 'নেমে এস ব্রাদার। অনেক দূর চলে এসেছি আমরা, আর না, এবার ফিরতে হবে।' মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বিদায় দিন মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না, আমরা ফিরি।' তাঁর হাতে সসম্ভ্রমে চুমু খেয়ে ভ্রাঙ্গেল ফিরে এলেন তাঁর ল্যাণ্ডোতে।

ভ্রাঙ্গেল পেছনে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দস্তয়েফস্কি আবার মারিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা এবার যেন সত্তার অন্তিম অব্দি পৌঁছেছে মারিয়ার; তাঁর চোখ উপচে গাল বেয়ে নেমে আসছিল জল। কথা বলতে পারছিলেন না, কেবল মুহুর্মুহু চুমু খাচ্ছিলেন, অবশেষে অনেক কষ্টে বললেন, 'এবার বিদায় দাও ফিওদর।'

'বিদায়।' ভগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

মারিয়া বললেন, 'হতাশ হয়ো না। এখানেই শেষ নয়, আবার দেখা হবে আমাদের, আবার আমরা মিলিত হব।'

সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গাড়ি থেকে নেমে এলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ভ্রাঙ্গেল আর দস্তয়েফ্‌স্কি মিলে তখন নেশায় অবশ ইসায়েফ্‌কে ধরাধরি করে এনে মারিয়ার পাশে শুইয়ে দিলেন। গাড়ি গড়িয়ে চলল।

দস্তয়েফ্‌স্কি কিছু দূর হেঁটে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মারিয়া মাঝে মাঝে হাত নাড়ছিলেন। মাথার ওপরে পূর্ণিমার চাঁদ। উতলা হয়ে বসন্তের বাতাস বইছে। রাস্তার দু' পাশে মাঝে মাঝে পাইনের ছায়া। মারিয়ার গাড়ি ছায়া পার হলে তাঁর মুখে চাঁদের আলো পড়ে। দস্তয়েফ্‌স্কি তখন মারিয়ার মুখ, মুখের লাবণ্য দেখতে পান। কিন্তু ক্রমশ সে দৃশ্য অস্পষ্ট হতে থাকল। গাড়ি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ঘোড়ার সাজে বাঁধা ঘন্টির শব্দ মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসছে। এক সময়ে সে-শব্দ তারপর গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। জনহীন প্রান্তরে চাঁদের আলো আর ঘোড়ার পায়ে পায়ে ঘুলিয়ে-ওঠা ধুলোর মেঘ পেছনে পড়ে রইল শুধু।

দস্তয়েফ্‌স্কি দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। তাঁর চোখ বেয়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে জল গড়িয়ে নামছিল; এবার তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় বুক ভেঙে যেতে থাকল, তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন। ভ্রাঙ্গেল তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাঁকে সস্নেহে বয়ে নিয়ে এসে ল্যাণ্ডোতে তুললেন তিনি।

সাত

মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভ্‌না নেই। সেমিপালাতিনস্ক্‌ আজ দস্তয়েফস্কির কাছে সত্যিকার মরুভূমি। দূরের নীল অরণ্য আর নিকটের বিবর্ণ ধুলির মাঝখানে অফিসার সৈন্য অধ্যুষিত ছোট্ট শহরটা কতকগুলি বণিক দোকানদার এবং অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লিপ্ত কিছু সাধারণ মানুষ নিয়ে অলস একঘেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ভাল লাগে না। অস্থির লাগে। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে মন। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি খাঁচার পাখি। আকাশের নীল গায়ে মেখে ওড়ার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা বুকে করে খাঁচার পাখি যেমন এক কোণে বসে চোখ বুজে দূরের স্বপ্ন দেখে—দস্তয়েফ্‌স্কির সে-অবস্থা এখন। বুকের মানুষটি দূরের নক্ষত্র আজ। চোখ বুজলে দেখতে পান, মারিয়ার মুখের লাবণ্য মনের আকাশে শুকতারার মতন জলজ্বল করছে। দেখতে দেখতে দু'চোখ ঝেঁপে জল আসে তাঁর। তিনি ফুঁপিয়ে ওঠেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেই হতাশ মুহূর্তে হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠেন তিনি: না না, এই বিচ্ছেদের দিনগুলিকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নষ্ট করে দিলে ত চলবে না। সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে। দস্তয়েফ্‌স্কির শিল্পী-মন সৃষ্টির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি লিখতে বসেন।

লিখতে বসেছেন তিনি সেমিপালাতিন্স্কে এসে যে-দিন ঘর ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করবার সুযোগ পেয়েছেন সে-দিন থেকেই। পাঁচ বছর পর কলম ধরতে গেলে সে এক অদ্ভুত কসরং হয়, লেখা হয় না। হবে কী করে? বাধা ত একমাত্র অনভ্যাস নয়, উদ্যত খড়্গের মতন সেনসরশিপ ঝুলছে। বেফাঁস কিছু লিখে ফেললে তাঁর অন্ধকার জীবনে সূর্য উঠবে না আর কোনদিন, এই সাইবেরিয়াতেই অবশিষ্ট জীবন পচে মরতে হবে। অতএব খুব সাবধানে নানা দিক ভেবে-চিন্তে আট-ঘাট বেঁধে লিখতে হয়। আর তেমন লিখতে গেলে অন্য যা-ই হোক শিল্প হয় না। সুতরাং কাগজ কলম নিয়ে বসাই সার হচ্ছিল দস্তয়েফ্স্কির, আর কিছু হচ্ছিল না। তবে হ্যাঁ, যে-কাজটি ধীরে-সুস্থে ও সুপরিকল্পিতভাবে এগুচ্ছিল সে তাঁর জেল-জীবনের ইতিহাস। রোজনামচার আকারে তিনি তাঁর 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' অল্পে অল্পে চয়ন করছিলেন প্রতিদিন। তা ছাড়া জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার শখ হঠাৎ জেগেছিল তাঁর মনে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে শ্লেষ কৌতুকের মধ্যে দিয়ে হালকা মেজাজে মানুষের স্বভাব-চরিত্রকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ফুটিয়ে তুললে কেমন হয় দেখবার কৌতূহল হয়েছিল তাঁর। তাঁর মাথায় তখন তেমন দুটি মাঝারি উপন্যাসের প্লট 'দিয়াদয়ুশকিন সোন' (খুড়োর স্বপ্ন) আর 'সেলো স্তেপান্চিকোভো ই য়েগো ওবিতাতেলি (স্তেপান্চিকোভো গ্রাম ও তার মানুষ)। ভাল ও মন্দ-র সংঘাতে ঘুলিয়ে-ওঠা জীবন-যন্ত্রণার মধ্যে থেকে মানুষের অস্তিত্বের মৌল রহস্য উন্মোচনের যে অদ্বিতীয় দক্ষতার পরিচয় তিনি পরবর্তীকালে দিয়েছেন, ওই বই দু'খানির মধ্যে আমরা তা খুঁজতে গেলে হতাশ হব। তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, 'স্তেপান্চিকোভো গ্রাম ও তার মানুষ' উপন্যাসে অজ্ঞাতসারে হলেও এক নূতন তারে সুর বাজিয়েছেন তিনি। সে তুলনায় 'খুড়োর স্বপ্ন' তুচ্ছ। আসলে মানুষের ভঙ্গুর অহমিকা ও অন্তঃসারশূন্য অস্তিত্ব নিয়ে প্রহসন। নায়ক কাউন্ট 'ক' যেন একটি ক্লাউন। অকাল-জীর্ণ মানুষটি, বয়েস ফুরোতে না ফুরোতে যৌবন ফুরিয়ে ফেলেছেন। এখন তিনি পাউডার রুজ পমেড নিয়ে দিনের অর্ধেক কাটান। হৃত-যৌবন ফিরিয়ে আনার সে-এক হাস্যকর কাণ্ড। কী করে তিনি অমন অল্প বয়েসেই বুড়িয়ে গেলেন কেউ জানে না! তাঁর গোঁফ-দাড়ি-চুল সবই নকল। এমন কি তাঁর কপাল ও মুখের কোঁচকানো চামড়া যে টানটান দেখা যায় সেও তার চুল দাড়ি গোঁফের ভিতরে লুকোনো স্প্রিংয়ের সৌজন্যে।

ইতালি থাকতে এক অবৈধ প্রেমের খেসারৎ দিতে পাঁজরার একটা হাড় গেছে তাঁর ; পারীতে অনুরূপ অবস্থায় ধরা পড়ার ভয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পালাতে গিয়ে পা দিতে হয়েছে একখানা। এখন সে-ভাঙা পাঁজরার গর্ত ঢাকতে জামার নিচে করসেট পরেন। কাটা পায়ের লজ্জা ঢাকেন অতি নিপুণ কারিগরীর তৈরি কর্কের কৃত্রিম পা লাগিয়ে। নানারকম পেটেণ্ট লোশন মেখে স্নান করেন তিনি, গায়ে সুগন্ধী মাখেন। এবং এ-সব 'মেক-আপ' সম্পন্ন না করে কখনো কারো সামনে আসেন না! প্রথম যৌবনের বেপরোয়া দিনগুলিতে প্রিন্স কাউণ্ট 'ক' তার পৈতৃক সম্পত্তির সবটুকুই ফুঁকে দেন। শেষে অনুপায় তিনি ধার্মিকের ভেক ধরেন। কয়েক বছর এভাবে কেটে যাওয়ার পরে হঠাৎ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ছোটখাট এক জমিদার হয়ে বসেন। সেই জমিদারীর লোভেই এক জননী তাঁর একমাত্র সুন্দরী তরুণী মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। প্রিন্স 'ক' সে-প্রস্তাবে এক কথায় রাজী হয়ে যাবেন, স্বাভাবিক। কিন্তু বাদ সাধল যুবতীর প্রেমিক। ফলে যেদিন যুবতীর মা পড়শী ডেকে বিয়ের প্রস্তাবটা পাকা করতে যাবেন সেই নাটকীয় মুহূর্তে একদিককার অক্ষম লোভ আর একদিককার অন্তঃসারশূন্য অহমিকা বেআবরু হয়ে ফুটে উঠল উপস্থিত সকলের চোখের সামনে। কাউণ্ট 'ক' ঘরে ঢুকলে সকলে যখন সমস্বরে কলরব করে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে থাকল তখন, উদ্‌ভ্রান্ত কাউণ্ট হকচকিয়ে উঠলেন ও ব্যর্থ প্রেমিকের প্রম্পট্ করা কথাগুলিই পরম বিশ্বাসে স্বীকার করে গেলেন। বললেন, 'সে কি, আমি কি সত্যি জেনা-কে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। না না, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি প্রচুর মদ খেয়েছিলাম। মদের নেশায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই মধুর নিদ্রার মধ্যে দেখেছিলাম ওই রমণীয় স্বপ্ন, বিয়ের স্বপ্ন, না, আমি কখনো বিয়ে করতে চাই নি।' সেই একটি কথায় চুরমার হয়ে গেল জেনার মায়ের উচ্চাশা—একজন প্রিন্সকে জামাই করার গৌরব, সমাজের ওপরে তাঁর আধিপত্য আর আভিজাত্য। ছোট্ট শহরে তাঁর অব্যাহত প্রতিপত্তি একটি সন্ধ্যাতেই সশব্দে ভেঙে ধসে পড়ল। সেই সঙ্গে ধুলায় গড়িয়ে পড়ল বেকার ব্যর্থ প্রেমিকের উপহসিত ভাগ্যও।

এ-কাহিনীর মধ্যে পরবর্তীকালের দস্তয়েফ্‌স্কির দুর্ধর্ষশক্তির পরিচয় হয়ত নেই ; কিন্তু আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, চতুর সংলাপ, নিপুণ ঘটনা-বিন্যাস, আর আছে সেই সজাগ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়টি, যার সামনে ঠুনকো আভিজাত্যের তামাম ফাঁকি নিমেষে নিরাবরণ হয়ে যায়।

কিন্তু ওই একই সময়ের ও একই কলমের রচনা 'স্তেপান্‌চিকোভো গ্রাম ও তার মানুষ' 'ফ্রেনড অব এ ফেমিলি' নামে ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাসখানি একেবারে আলাদা বস্তু। এখানে মানুষের দ্বৈত অস্তিত্বকে উদ্‌ঘাটন করাই লেখকের রচনার প্রেরণা। সে-দিক থেকে দেখলে এ-বইখানিকে দস্তয়েফ্‌স্কির উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টার সূচনা বললে অত্যুক্তি হবে না।

উপন্যাস শুরু হয়েছে করনেল রোসতানেফ্‌ উত্তরাধিকার সূত্রে ছ'শ' ক্রীতদাস সমেত স্তেপান্‌চিকোভোর জমিদারী পাওয়ার পর। তিনি তখন সৈন্যবাহিনীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ওখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রেখে রোসতানেফের স্ত্রী মারা গেছেন আট বছর আগে আর তিনি বিয়ে করেন নি। বিয়াল্লিশ বছরের এই বিগত-দার মানুষটি অতিশয় সজ্জন নম্র ও শান্ত। এ-হেন মানুষটির পরমতসহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে ফোমা ফোমিচ তাঁকে তাঁর বজ্জাতি দিয়ে কব্‌জা করে ফেলেন। ফোমা ফোমিচ এ-পরিবারে এসে ঢোকেন বছর ছয় আগে। তার আগে অব্দি তিনি কেবল ব্যর্থতা কুড়িয়েছেন। সাহিত্যিক হতে চেয়ে অনেক লিখেছেন, কেউ পাত্তা দেয় নি; চাকরি করতে গিয়ে কেবল গোলামী করেছেন ঈনাম পান নি। এক সময়ে ধর্ম-প্রচারকও হয়েছিলেন সেখানেও ইজ্জৎ মেলে নি শুধু বুজরুক বলে নিন্দে কুড়িয়েছেন। ফলে তাঁর মন ভরে পাহাড় হয়ে উঠেছে শুধু ক্ষোভ ক্রোধ আর হতাশা। সেই সব—সমস্ত মিলে তাঁকে করে তুলেছিল গোঁয়ার, অহংকারী আর অবিবেচক। দস্তয়েফ্‌স্কি এখানে মন্তব্য করেছেন, 'একদা যারা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়, পরে সুযোগ পেলে তারাই অন্যকে বঞ্চনা করতে লাঞ্ছনা দিতে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।' ফোমাও তাই হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি করনেলের মায়ের প্রশ্রয়ে। এই খামখেয়ালী মহিলা ছিলেন অতিশয় জেদী আর আত্মসুখী। ছেলে তাঁকে সব সময় অবহেলা ও অবজ্ঞা করে এই কাল্পনিক বিশ্বাসবশে তিনি সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকতেন। আর তাঁর প্রতি ঔদাসীন্যের অভিযোগ তুলে অনুক্ষণ ছেলেকে তিরস্কার করতেন।

ষোল বছর আগে, চব্বিশ বছর বয়েস তখন রোসতানেফের, তিনি করনেলও নন তখন। তখন সামান্য একজন করনেট, ঘোড়সওয়ার সৈন্য মাত্র। বিয়ে করবেন বলে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন মায়ের। পত্র পাওয়া মাত্র মা ক্ষেপে আগুন। লিখে দিলেন, 'তুমি আমারই খরচ চালাতে পার না, বিয়ে করতে চাও কোন সাহসে।' সম্মতি ত দিলেনই না উলটে স্বার্থপর বেইমান বলে গাল

দিলেন। এবং সেখানেই থামলেন না, নিজেই হুট করে বিয়ে করে ফেললেন রিটায়ার্ড বুড়ো জেনারেল ক্রাহোৎকিনকে। কোন্ স্বার্থে যে এ দু'জনের পরিণয় ঘটল কে জানে! হয়ত জেনারেল ভেবেছিলেন, বিধবার অনেক টাকা আছে, কিংবা নানা রোগের ডিপো বুড়ো জেনারেলের সেবার প্রয়োজন ছিল। আর মহিলা হয়ত ভেবেছিলেন, ছেলে যখন বিয়ের অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে, অনুমতি না পেলেও বিয়ে করবেই। অতএব তিনি আর ছেলে, ছেলের বউয়ের অধীন থাকবেন না, বিয়ে করে স্বাধীন হবেন, নাকি জেনারেলের স্ত্রী 'মাদাম লা জেনারেল' হওয়ার শখ হয়েছিল!

মা বিয়ে করে বসলে ছেলেও আর অপেক্ষা করে রইলেন না। কিন্তু মাতৃভক্ত ছেলে বিয়ে করা সত্ত্বেও মায়ের অশেষ গঞ্জনা শিরোধার্য করে তাঁকে তাঁর মাইনের সিংহ-ভাগ পাঠাতেন ও নিজে বউ নিয়ে করতেন কৃচ্ছ্রসাধনা। তবু মহিলার মন কখনো ছেলের ওপর প্রসন্ন হয় নি। যে ছেলে মাকে সুখে শান্তিতে রাখতে পারবে না সে যদি বিয়ে করে ত সে স্বার্থপর ছাড়া কী! মহিলার সে-ছিল আর এক রাগ। তাঁর রাগ পান থেকে চুণ খসলেও। স্তেপান্‌চিকোভোর জমিদারী পাওয়ার আগে অব্দি রোসতানেফের অবস্থা ভাল ছিল না। দেড়শ' ক্রীতদাস অধ্যুষিত সামান্য সম্পত্তিতে আয় বলতে উল্লেখ্য ছিল না কিছুই। ছেলে কত মাইনে পায় তাও তিনি জানতেন না তবু অবিবেকী মায়ের কোন বিবেচনা ছিল না। সে-অবিবেচনার মার খেতে খেতে একটি একটি করে দশটি বছর কেটে গেছে রোসতানেফের। বুড়ো জেনারেল শয্যা নিয়েছেন। শেষমেশ অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। অন্ধ মানুষটিকে সঙ্গ দিতে, তাঁকে খবরের কাগজ বই পড়ে শোনাতে একটি লোকের প্রয়োজন হয়েছে তখন। সেই তখন মাস-মাইনের চাকরি নিয়ে ফোমা ফোমিচ এসে ঢোকেন এই পরিবারে। তারপরে জেনারেল মারা গেছেন। ছেলের কষ্টার্জিত টাকাতেই বিপুল সমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাতেও লেঠা চোকে নি। ফোমা ফোমিচ তার পরেও থেকে গেছেন সংসারে। পরিবারের একজন হয়ে গেছেন তিনি ততদিনে। খামখেয়ালী মায়ের প্রশ্রয়ের ছত্রচ্ছায়ায় তিনি হয়ে উঠেছেন পরিবারের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সে-দুর্দণ্ড প্রতাপ রোসতানেফ্, জমিদার হয়ে সপরিবারে স্তেপান্‌চিকোভোতে এসে বসবাস করতে শুরু করলেও খর্ব হয় নি। বরং ফোমার কর্তামি অমায়িক সাদাসিধে মানুষটিকেও অনায়াসে মুঠোয় করে ফেলতে পেরেছিল। তাঁর প্রতিপত্তির

দাপটে রোসতানেফের ছ'শ' ভূমিদাসও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ধর্মের মুখোসধারী পণ্ডিতম্মন্য এই মানুষটির অন্যকে পদানত রাখার কায়দা ছিল অত্যন্ত বেআবরু ও সূক্ষ্ম। উৎপীড়ন যত সূক্ষ্ম হয় আর ধর্মের ভানে ভরা থাকে, ততই জগদ্দল পাথরের মতন ভারী ও দুঃসহ হয়ে ওঠে সে-উৎপীড়ন। না পারা যায় রুখে দাঁড়াতে, না পারা যায় সহ্য করতে। শান্ত শান্তিপ্রিয় রোসতানেফ্‌ সে-উৎপীড়নে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু উৎপীড়ন সহ্যেরও একটা সীমা আছে। যার পরে উৎপীড়িত, যতই সে নিরীহ হোক প্রবল শক্তিতে রুখে দাঁড়ায়। রোসতানেফ্‌ও একদিন রুখে দাঁড়ালেন। রুখে দাঁড়ানোর কারণটিও অত্যন্ত মৌলিক। অশান্তি এড়ানোর জন্যে মানুষ অনেক কিছু মেনে নেয়, যৎপরোনাস্তি সহ্য করে কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি ইত্যাদির ওপরেও যখন অন্য মানুষ এসে হামলা করতে চায় তখন অতিবড় সহিষ্ণুও ক্ষেপে যায়, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তাই হয়ে উঠেছিলেন রোসতানেফ্‌। ফোমা ফোমিচ তাঁকে বাধ্য করতে চাইছিলেন বিয়ে করতে। এমন একটি রমণীকে বিয়ে করতে চাপ দিচ্ছিলেন তাঁকে ফোমা যাকে বিয়ে করলে রোসতানেফ্‌ অনেক সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন। এতে করে ত রোসতানেফেরই লাভ, ফোমার কী স্বার্থ, তিনি রোসতানেফেরই শুভাকাঙ্ক্ষীর কাজ করছেন; কিন্তু না, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও রোসতানেফ্‌ জানতেন ফোমার এ-চাপের পেছনে সরল-মনের শুভবুদ্ধি নয় বরং একটা অশুভ মতলবই কাজ করছে। রোসতানেফ্‌ ভালবাসেন তাঁরই পরিবারে আশ্রিতা এক গরীব কেরানীর সুন্দরী মেয়েকে যার ওপরে ফোমার ছিল অসুস্থ লোভ। রোসতানেফ্‌কে বিয়ে দিয়ে ফোমা তাঁর পথ পরিষ্কার করতে চাইছেন জেনেই কঠিন হয়ে উঠলেন রোসতানেফ্‌। ফোমা ফোমিচকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এতদিনে এইবার তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বও খুঁজে পেলেন। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন। আর সেই সামর্থ্যের মধ্যেই আমরা তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেকার যথার্থ মানুষটিকে দেখতে পেলাম। ঘটনার মধ্যে দিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি দেখালেন, সংকটে-সংঘাতে আলোড়িত হলেই ব্যবহারিক জীবনের মালিন্য থেকে মুক্তি পেয়ে আসল-মানুষটি দৃশ্যমান হয়ে সামনে দাঁড়ায়। সেই আসল মানুষটিকে আমরা দেখি যখন তিনি ফোমা ফোমিচকে তাড়িয়ে দিয়েও বললেন, 'এক ছাদের নিচে আমরা দুই ব্যক্তিত্ব আর থাকতে পারছি না বটে, তাই বলে আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাও না। বন্ধুর

মতন আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি, বন্ধুর মতনই থাকব অতঃপর। আমাদের সৌভ্রাত্রিত্বের বন্ধন অটুটই থাকবে।' এ-আন্তরিক ও মানবিক শুভেচ্ছার যে কত শক্তি এ-উপন্যাসের শেষে তাও দেখিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তবু বইয়ের এ-অবধি অনেক কূটসমালোচকের ভাল লাগে নি। তাঁরা দেখেছেন গোগোলের স্পষ্ট ছাপ ও ডিকেনসের অস্পষ্ট প্রভাব দস্তয়েফ্‌স্কির ওপরে। শুধু আমরা দেখতে পাই সেই স্পষ্ট ছাপ ও অস্পষ্ট প্রভাব অতিক্রম করে বইয়ের শেষে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেরও স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন যখন বিতাড়িত ফোমা ফোমিচ আবার নত মস্তকে ফিরে এল রোসতানেফের কাছে। তার সেই শরণাগতির মধ্যে পরিষ্কার ধরা পড়ল মানুষের মৌল দুটি বাস্তবতা। এক, আন্তরিক সৌভ্রাত্রিত্বই মানুষকে সমাজ-বদ্ধ রাখতে পারে; বিচ্ছেদই শেষ কথা নয়। দুই, মানুষের মনের গভীরে ভাল মন্দ-র দ্বন্দ্ব-সংকটে-সংঘাতে তীব্র হয়ে উঠলে মানবীয় গুণগুলি মন্দ-র ময়লা ঝেড়ে ফেলে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রোসতানেফের সহনশীলতার গভীরে তাঁর অনিবার্য দৃঢ় মনোবল আর তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি ও গুণগ্রাহিতা ফোমার চরিত্রে বিবর্তন ঘটাল। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফোমা অশুভবুদ্ধির ক্রীড়নক তথা উৎপীড়ক হয়ে উঠেছিল; সে-হারানো বিশ্বাস ফিরে পেয়েই আবার তিনি যথার্থ মানুষ শুভানুধ্যায়ী মানুষ হয়ে উঠতে পারলেন। অশুভবুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করেই রোসতানেফ্‌ আপন অস্তিত্বকে ক্রমাগত অবমানিত করে চলেছিলেন, সবলে সে অশুভবুদ্ধিকে পর্যুদস্ত করতে তবেই তিনি আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

'অকৃত্রিম ভালবাসার মধ্যে দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বে উত্তরণ'—পরবর্তীকালে এই যে সত্যে পৌঁছেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি তারই আভাস দেখতে পাই আমরা এখানে। ঘৃণা ঘৃণা উদ্রেক করে, ভালবাসা উদ্রেক করে ভালবাসা—'ইউনিভারসেল ব্রাদারহুড'-এর প্রবক্তা এখান থেকেই সমকাল ও পূর্বকালকে অতিক্রম করে যাওয়ার অভিযাত্রায় পরিব্রাজক হয়েছেন। সে-সাধনারই সার্থক ফলশ্রুতি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'ইদিয়ত' (দ্য ইডিয়েট)-এর প্রিন্‌স্‌ মিশকিন্‌। করনেল রোসতানেফ্‌-এ যে-সত্য আভাসিত প্রিন্‌স্‌ মিশকিন্‌-এ তাই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম 'সেলো স্তেপানচিকোভো ই য়েগো ওবিতাতেলি'র আঙ্গিক ও প্রকরণে অনেক দুর্বলতা আছে। শুধু ঘটনায় সংকট সৃষ্টি করে চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ফলে চরিত্রের বিবর্তন

স্থানে স্থানে আকস্মিক ও অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি এর কারণ কলমের জড়তা। দীর্ঘকাল পড়ে লিখতে বসে ভাষা, বিষয় ও বিন্যাসকে এক কদমে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হন নি তিনি।

আসলে এ-বই তিনি একটানাও লিখতে পারেন নি। যখনকার কথা বলছি তখনও এ-বই শেষ হয় নি। বস্তুত শুরু হয়েছে কেবল। কাহিনীটা মাথায় ঘুরছিল মেঘের মতন। মনস্থির করে যে একটানা লিখে যাবেন, এক সঙ্গে কয়েক পাতা লিখবেন মনে সে-স্থৈর্য কোথায় তাঁর তখন! তখন তিনি দু'চার মিনিট যদি লেখেন ত আধঘণ্টা কলম কামড়ে ভাবেন—না, এ-বইয়ের প্লট কিংবা চরিত্র নয়। পাঁচ শ' মাইল দূরের নক্ষত্রটিকে। বুক খালি করে যে অত দূরে চলে গেছে, শূন্য বুকের মধ্যে তার স্মৃতি খোঁজেন কেবল। শেষে চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে লেখেন।

বেশী কিছু লিখতে পারেন না, পাছে ইসায়েফের নজরে পড়ে। উদ্বেগ আকুলতা চেপে রেখে সাদামাটা কথা লেখেন: "পাশার লেখা-পড়া হচ্ছে ত? ইসায়েফ্‌ এখনো কি মদে চুর হয়ে থাকে সব সময়? থাকলে চাকরি করে কখন, কেমন করে চাকরি করে? চাকরি ঠিক মত না করলে এ-চাকরিও কী থাকবে? তুমি কেমন আছ? তোমার অভাবে আমি মরমে মরে আছি। বড় নিঃসঙ্গ একলা লাগছে……"

কিন্তু এমন রাস-টানা সংযত লেখা দু'একখানার বেশী লিখতে পারলেন না তিনি। অবিলম্বেই তাঁর কলম স্বতঃস্ফূর্ত হতে থাকল। লিখলেন:

"…তোমার বিরহে ভুগছি। আর সেই দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে অনুভব করছি তোমার প্রতি আমার প্রেম কত গভীর। তুমি লিখেছ, দীর্ঘ পথের ধকল এখনও সামলে উঠতে পারো নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। জেনে অব্দি আমি কোন কাজে মন বসাতে পারছি না। সত্যি এ-মন্দভাগ্য তোমার হওয়ার কথা নয়। এত দুঃখ যন্ত্রণা অশান্তি কেন সইবে তুমি, যে-তুমি যে-কোন সমাজের অলংকার হতে পার। আশ্চর্য হৃদয়বতী তুমি, তুমি এক অলৌকিক রমণী। তোমার মনের সারল্য যেন তোমার অস্তিত্বের সহোদরা ভগ্নীর মতন। রমণীর প্রাণ, রমণীর সহানুভূতি, রমণীর সহৃদয়তা—সব, সমস্ত পেয়েছি তোমার মধ্যে। আজ আমি নিঃসঙ্গ একলা। বস্তুত কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আজ আর আমার।"

মিথ্যে বলেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি। লিখতে বসলে যেমন লেখায় মনোযোগ

দিতে পারেন না, তেমনি কোথাও গিয়েও আনন্দ পান না। তিনি নাইট ক্লাবে গিয়েছেন। নানা সুন্দরীদের সঙ্গে মিশেছেন নেচেছেন কিন্তু না কোথাও তিলেকের শান্তি পান নি তিনি। অর্থের অভাব কিঞ্চিৎ মিটবে বলে এক পোলিশ পরিবারের মেয়েকে অঙ্ক শেখানোর মাস্টারি নিয়েছিলেন। মারিনা শুধু সুন্দরী আর তন্বী তরুণীই নয়, প্রজাপতির মতন চঞ্চলও বটে। উদাসীন অমনোযোগী শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে সে কেবল ঠোঁট টিপে-টিপে হাসে। সে কেমন করে জেনে গিয়েছে, তার মাষ্টারমশাই একজনের প্রেমে পড়ে হাবড়ুবু খাচ্ছেন। সেই জানাই হয়েছিল কাল। যেন মাস্টারমশাইয়ের মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে তাতে করে মারিনার কাছে। মারিনার কাছে দস্তয়েফ্‌স্কি একটি কৌতূহলের বস্তু, কোন মজাদার রোমান্টিক নাটকের হীরো হয়ে উঠেছিলেন। এমনই বুঝি হয়, দুর্লভকেই জয় করতে চায় সকলে। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা যে-হেতু পরের বউ, অন্য বুকের মানুষ তাকে জয় করতে, নিজের বুকে কেড়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তেমনি মারিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় শক্ত হয়ে উঠেছিল মারিনা। তাঁকে মারিয়ার কাছ থেকে লুফে নিতে যেন সে সমস্ত মন পণ করে বসেছিল। পড়াশোনায় আর মন বসছিল না। মারিনার মনের সেই প্রবল পণের কাছে পরম অনিচ্ছায়ও দস্তয়েফ্‌স্কিকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সতের বছরের কুমারী কোথায় পাবে আঠাশ বছরের বিবাহিতা যুবতীর অভিজ্ঞতা। মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার মতন সেই শিক্ষিত পটুত্বই বা কোথায় মারিনার! সুতরাং তেত্রিশ বছরের পোড়-খাওয়া একটি পুরুষকে কেড়ে নেওয়া, তাঁকে বশ করা সম্ভব হয় নি মারিনার পক্ষে। কিন্তু কু-চক্রীর ত অভাব নেই। কুজনেস্ক-এর ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা মারিয়াকে জানিয়ে দিলে: তোমাতে আর দস্তয়েফ্‌স্কির মন নেই এখন, সে এখন এক সপ্তদশী সুন্দরীকে নিয়ে মত্ত।

মারিয়ার কাছ থেকে তাই নিয়ে অভিমান আর ভৎর্সনার চিঠি এসে দস্তয়েফ্‌স্কি ত অবাক। সত্য বটে মারিনাকে নিয়ে তিনি বিকেলের আলোয় বাগানে বেড়ান, তখন গোগোল পড়ে শোনান, আলো মলিন হয়ে এলে আবৃত্তি করে শোনান পুশকিন। মারিনা অবশ্য কখনো কখনো যৌবনের আবেগে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, কিন্তু তাতে কী! শুধু চুমু খেয়ে প্রেম ভোলাবে দস্তয়েফ্‌স্কির প্রেম কী এত ঠুনকো! তিনি মারিয়াকে লেখেন, "…কু-লোকের কথায় কান দিও না লক্ষ্মীটি।"

কিন্তু কু-লোকের চোখ বড় সতর্ক, তারা জেনে গেছে, বাড়ি পরিপাটি রাখার

জন্যে ব্যারন ভ্রাঙ্গেল দস্তয়েফ্স্কির বাড়িওলির দুই মেয়েকেই মোটা মাইনের চাকরি দিয়েছেন। তারা এখন ওখানেই থাকে আর দস্তয়েফ্স্কি সপ্তাহের তিন দিনই কাটান সেখানে। কখনো কখনো গোটা সপ্তাহটাই।

দুই নিঃসঙ্গ পুরুষের মুঠোর মধ্যে দুই নষ্ট যুবতী, অর্থটা কী কারো বুঝতে বাকি! কিন্তু সেমিপালাতিনস্কের অভিজাত রমণীরা তাই বলে ভ্রাঙ্গেলকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন না, চানও না। ভ্রাঙ্গেলের বাগান-বাড়িতে বাহারী ফুল ও গাছের সমারোহের কথা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। মহিলারা ঝাঁকে ঝাঁকে সে-ফুলের শোভা দেখতে আসেন। কিন্তু নির্জনতা-পিয়াসী দস্তয়েফ্স্কির তাড়ায় অচিরেই তাঁরা নিরস্ত হলেন। ব্যারন ভ্রাঙ্গেলকে জয় করার সে-সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ব্যর্থ হলে আবার নির্জন হল জারদ্যাঁ দে কোসাক। সেই নির্জনে বসে দুই বন্ধু অফুরন্ত কথা বলে যান। আগেই বলেছি, ব্যারন ভ্রাঙ্গেলও তখন এক মহিলার প্রেমে কাতর। সেই মহিলাও পরের বউ। অনেকগুলি সন্তানের মা। তবু অটুট স্বাস্থ্যের শরীরে উজ্জ্বল লাবণ্য তার, শুধু শরীরটি নয় মনটিও তার জ্যান্ত সবুজ। যেন এক মনোরম ছোট্ট পাখি। সেই পাখি মাথায় বসে ঘাড়ে বসে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না। তখন যন্ত্রণা হয় না বুকে? দুই বন্ধু সেই নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে অধরা দুই পাখির কথায় মগ্ন হয়ে সময় কাটান। কিন্তু দস্তয়েফ্স্কির কষ্টটাই বেশী। তাঁর অবস্থাই শোচনীয় হয়ে উঠ্ছিল দিন দিন।

আট

মারিয়ার সঙ্গে দস্তয়েফ্স্কির প্রেম প্রেমের লুকোচুরি খেলা ছিল না, ছিল না ক্ষণকালের সঙ্গ-সুখের আনন্দ। তিনি তাঁকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রথম প্রেম দিয়ে পরিপূর্ণ আবেগে ভালবেসেছিলেন। তাঁর মধ্যেকার যা-কিছু সুন্দর, উদার ও মহৎ, যত অনিরুদ্ধ আবেগ ও বাসনা সব উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন সে-ভালবাসার সঙ্গে—একখানা তাসে বেপরোয়া জুয়াড়ী যেমন তার সর্বস্ব পণ করে বসে। আর তার ফলে জেগে থাকলে চোখের জলে সব আবছা দেখছেন, ঘুমোলে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা।

মারিয়ার চিঠি এলেও তাঁর শান্তি ছিল না। তাঁর চিঠির জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন কিন্তু চিঠি এলে তক্ষুনি খুলে পড়তে পারেন না আজকাল।

কী থাকবে তাতে তিনি জেনে গেছেন, অর্থাৎ তিনি যা আশা করছেন তা থাকবে না অধিকন্তু সন্দেহ সংশয় আর তজ্জনিত ক্ষোভ তিরস্কার থাকবে।

কাজাকফ্‌ গারডেনসের যে-নির্জন ছায়ার বেঞ্চিতে বসে শেষ বারের মতন মারিয়াকে বুকে ধরেছিলেন তিনি, সেখানে এসে একলা বসে থাকেন এখন, আর সেই মধুর-স্মৃতির কষ্টে ডুবে যান, ভ্রাঙ্গেল এসে পাশে বসলে তাঁর সঙ্গে মারিয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন। কথা বলেন আর চোখের জল ফেলেন। এই বিরহ-কাতর মানুষটির যন্ত্রণা অবশেষে তাঁর ছোট্ট বন্ধু মহলটিকেও বিব্রত করে তুলল। তারা তাঁকে শান্ত অন্যমনস্ক করতে আনন্দ দিতে টেনে হেঁচড়ে নাচের আসরে নিয়ে যেতে থাকল। না-ছোড়বান্দা বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে দু'চারবার নাইট ক্লাবে নাচের ফ্লোরে যেতে হল তাঁকে। কিন্তু অনিচ্ছার সে-কর্মেরও ফল ফলল গুরুতর। মন তাতে করে প্রফুল্ল অন্যমনস্ক ত হলই না অধিকন্তু মারিয়ার কাছ থেকে মিলল বিদ্রূপ আর তিরস্কার তাঁর নাইট ক্লাবে যাওয়া নিয়ে কারা রং ফলিয়ে চিঠি লিখেছিল মারিয়াকে। আর মারিয়া, একে ত মনসা তাতে আবার ধূপের ধোঁয়া, রেগেমেগে তাকে নানা কটূক্তিতে জেরবার করতে থাকলেন।

'না, এ-মিথ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। বেশী দূর একে এগুতে দিলে, বেশীদিন চলতে থাকলে ভাবপ্রবণ মানুষটি হয়ত আত্মহত্যা করে বসবে। অদর্শনের ফলেই এই ভুল বোঝাবুঝি, দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্যেই এই ঈর্ষা আর হিংসা। অতএব ওদের অবিলম্বে এক জায়গায় হওয়া দরকার, মুখোমুখি বসা, কথাবার্তা বলা দরকার।' বন্ধুরা সকলে মিলে পরামর্শ করল।

ঠিক হল সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌ আর কুজনেস্কের মাঝামাঝি এক জায়গায় গিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি মারিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু যাবেন বললেই হুট করে যেতে পারেন না তিনি। একজন সামান্য সৈনিকের পক্ষে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলের এলাকার বাইরে দূরে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ তার ওপরে তিনি আবার নজর-বন্দী। সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সবসময় সতর্ক হয়ে আছে তাঁর ওপরে। বন্ধুরা তখন একটা ফন্দি আঁটল। ভ্রাঙ্গেলের এক ডাক্তার বন্ধুর থেকে একটা সার্টিফিকেট আদায় করল তারা। ডাক্তার লিখে দিলেন, দস্তয়েফ্‌স্কি অসুস্থ। তাঁকে দিন কয়েক বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। নড়া-চড়া পর্যন্ত চলবে না। ব্যস, সেই মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটি যথাস্থানে দাখিল করে নিঃশব্দে কেটে পড়লেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

তার আগেই দিন তারিখ জানিয়ে মারিয়াকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তিনি, "তুমি জামিএভে এস, আমি ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছি।" এক দুরন্ত দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে দু'শ মাইল ছুটে গেলেন দস্তয়েফ্স্কি। কিন্তু এত কাঠ খড় পুড়িয়ে, এত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর সেই প্রেমাভিসার একেবারেই বিফলে গেল। গিয়ে দেখেন মারিয়া আসে নি। এসেছে তার একখানা চিঠি; অতিশয় সংক্ষিপ্ত তার ভাষণ, 'বিশেষ কারণে কুজনেস্ক ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ক্ষমা কর।'

পত্র পেয়ে ধুলো পায়েই ফিরে এলেন তিনি। ফিরে এসে পথের ধকলে আর হতাশায় এবার সত্যি শয্যা নিলেন; ক'দিন আর বিছানা থেকেই উঠতে পারলেন না। কেন মারিয়া এল না, কী বিশেষ কারণে সে আটকে গেল?... নাকি...তবে কি...সে কি.. তাকে কি.. সন্দেহ যন্ত্রণা অবিশ্বাস দুর্বল স্নায়ুর মানুষটিকে কুরে কুরে খেতে থাকল। কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থেকে উঠে বসলেন বটে, কাজেও বেরোলেন; কিন্তু অস্থির যন্ত্রণায় দিন-যাপন তাঁর মর্মান্তিক হয়ে উঠল। তিনি জামিএভে গিয়েছিলেন জুলাই মাসের প্রথম দিকে সেই থেকে একটা চিঠিও আর লেখেন নি মারিয়া। 'কী হল তার,...সে-কী তবে আর'...না দস্তয়েফ্স্কি ভাবতে পারলেন না মরিয়া তাঁকে ভুলে গেছে, মারিয়া তাঁকে উপেক্ষা করছে, মারিয়া আর কাউকে ভালবাসছে। কিন্তু ভাবতে পারা যায় না বলেই ত আর ভাবনা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ভাবনা অকটোপাসের মতন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, তাঁকে হাড়ে-মাসে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এহেন নিদারুণ অবস্থায় অবশেষে চিঠি এল মারিয়ার, সেটা ১৮৫৫-র ১৪ আগস্ট কি কাছাকাছি একটা দিন। দীর্ঘ চিঠি। খুঁটে খুঁটে সব লিখেছেন মারিয়া।

—জামিএভ যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাওয়ার আগেই রোগে পড়েছিল ইসায়েফ্। ক্রমশ সে রোগ বাঁকা পথ নিচ্ছিল। জুলাইয়ের শেষে এসে জানা গেল এ-রোগ থেকে ইসায়েফের আর নিস্তার নেই। সত্যি নিস্তার পেল না কিংবা মরে জীবন-যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেল মানুষটা। '......আমাদের ভাসিয়ে গেল বলব না, ও বেঁচে থাকতেই আমরা ভাসছিলাম।...মরার সময় মানুষটি আমাকে ও ছেলেকে অনেক আশীর্বাদ করল। ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছিল তখন। করুণ সে-দৃশ্য ধারাল নখের আঁচড় কাটছিল আমার বুকে।' স্বামীর মৃত্যুর কথা লিখতে বসে নিজের বর্তমান অসহায় অবস্থার কথাও বাদ দিতে পারেন নি মারিয়া, লিখেছেন, "কপর্দকহীন এই অবস্থায় কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না..."

পত্র পেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি এত দিনে সুস্থ হলেন, স্বস্তি পেলেন। ইসায়েফের জন্যে তাঁর দুঃখ হল বটে, দীর্ঘশ্বাসও পড়ল একটা; কিন্তু মারিয়ার পত্র পেয়ে তিনি যে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন সে-আনন্দ মলিন হল না। যে-নিষ্ঠুর চিন্তাটা তাঁকে একটা নিদারুণ জোঁকের মতন কামড়ে ধরে প্রাণপণে রক্ত খাচ্ছিল সেটা খসে পড়ল এখন। হালকা হলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তক্ষুনি মারিয়াকে পঁচিশ রুবল পাঠিয়ে দিলেন। ওই ক'টা রুবলই মাত্র ছিল তাঁর কাছে; কিন্তু এই বিপদে ওই ক'টা টাকায় তাঁর কী হবে! অথচ ভ্রাঙ্গেল তখন বারনাউলে। ঈশ্বরের নামে দোহাই পেড়ে তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন, "সদ্য বিধবার প্রতি দয়ালু হও তুমি, এ বিপদে তাকে সাহায্য কর।"

সত্যি বিপদ, বড় বিপদে পড়েছেন মারিয়া। কাছে পিঠে না আছে কোন আত্মীয়-স্বজন, না কোন বন্ধু-বান্ধব। একলা বিদেশে নিঃসম্বল তিনি তার ওপরে একটি কচি ছেলের বোঝা। 'এমন অসহায় অবস্থায় মারিয়া ওখানে থাকবে কী করে?' দস্তয়েফ্‌স্কি অস্থির হয়ে উঠবেন, স্বাভাবিক। ইসায়েফের মৃত্যুর পরে দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে মারিয়ার সম্পর্কের পরিবেশটাও বদলে গেল অনেকখানি। এখন আর তাঁদের প্রণয় লুকিয়ে রাখার ব্যাপার নয়। দস্তয়েফ্‌স্কি বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন মারিয়ার কাছে; আর দ্বিধা কেন, আর অপেক্ষা কিসের জন্যে? দস্তয়েফ্‌স্কি যে মারিয়াকে সাহায্য করবার জন্যে, তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার জন্যেই এ-প্রস্তাব পাঠালেন তা নয়। একটা অচরিতার্থ ভালবাসার দুর্নিবার কষ্টে তিনি ভুগছেন ঠিকই, এ কষ্ট পার হয়ে এসে পরিতৃপ্তির স্বর্গে তিনি পৌঁছতে চান অবশ্যি; কিন্তু তার চেয়েও বড় দরকার আজ তাঁর পারিবারিক জীবনের শান্তি।

'বিবাহিত জীবনের চেয়ে সুখের আর কিছু নেই পৃথিবীতে।' জেল থেকে বেরিয়েই তিনি লিখেছিলেন দাদাকে। জেলে যাওয়ার আগে হতাশায় বিপর্যস্ত তিনি বার বার বারবণিতার কাছে ছুটে গিয়েছেন; কিন্তু জেনেছেন, ওরা ক্ষণকালের জ্বালা জুড়োতে জানে, সব সময়ের শান্তি দিতে পারে না কখনো। সেই অনুক্ষণের শান্তির জন্যে চাই স্ত্রী, চাই পরিবার-জীবন। আজ তাঁর কেবলই মনে হয়, তাঁর বাবা-মার দাম্পত্য-জীবন ছিল বড় নির্মল বড় সুখের। সেই সুবিমল সুখী-পরিবেশে তাঁর কৈশোর কেটেছে, তাঁর এত কালের জীবনে সেই কৈশোরকালের মতন এমন হৃদয়-জুড়োনো স্মৃতি আর নেই। বিয়ে করে তিনি সেই সুখের জীবনে ফিরে যেতে চান। এতদিনের মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগের

শেষে আজ সেই বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিই তাঁর আদর্শ হয়ে উঠবে, তাঁকে আকুল করে টানবে, স্বাভাবিক। তা ছাড়া মাকে হারানোর পরে, সেই সতর বছর বয়েস থেকে পৃথিবীর কোন কোথাও তাঁর ক্ষুদ্রতম এমন একটা কোণ নেই, যাকে তিনি নিজের বলতে পারেন, 'আমার' বলে আঁকড়ে থাকতে পারেন। বিয়ে করলে সেই কোণটি পাবেন তিনি, সেই গৃহকোণ : দাম্পত্য-জীবনের সেই মাটির-স্বর্গই কেবল হাতছানি দিচ্ছিল তাঁকে। সেই টানেই তিনি মারিয়াকে টানতে চাইছেন নিজের কাছে। নারী-বুকের উত্তাপে লালিত পারিবারিক জীবনের আরাম আজ তাঁর জীবনের ঐকান্তিক প্রার্থনা। মারিয়ার সঙ্গে বিয়ে মানে এক অকৃত্রিম ভালবাসার উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান। মারিয়াকে বিয়ে করা মানে সমস্ত সমস্যার সমাধান। তাঁর ভাবাবেগ, তাঁর যৌনতাড়না পাড়ের নিগড়ে নির্দিষ্ট-গতি নদীর মতন সংহত গতিতে বয়ে যাবে, তা আর তাঁর সাহিত্য-চিন্তার বাধা হবে না কখনো। সংযত জীবনের ব্যয়ও হবে সুমিত, আর্থিক ক্লেশ কমে আসবে।

অথচ মারিয়ার চিন্তার সঙ্গে দস্তয়েফ্স্কির চিন্তার কোন মিল ছিল না। তাঁর চিন্তা বইছিল ভিন্ন খাতে। তিনি দস্তয়েফ্স্কির দ্রুত ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তের আকুল প্রার্থনার জবাবে জানালেন, 'আমি বড় হতাশায় ভুগছি। বুঝতে পারছি না আমি কি করব।'

দস্তয়েফ্স্কি বুঝতে পারেন মারিয়ার এই দ্বিধার জন্যে তাঁর নিজের আর্থিক দৈন্যই দায়ী। শুধু কী অর্থের দৈন্য, তাঁর যে সামাজিক মর্যাদাও নেই। সরকার তাঁর 'ভদ্রলোকের মর্যাদা' কেড়ে নিয়েছেন তাঁকে সেই সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানোর সময়েই। এখনো তাঁকে সৈন্য বিভাগে একজন সামান্য পদাতিক করে রেখেছেন। সর্বোপরি তিনি নজরবন্দী। সরকার এখনও তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেন। মস্কোআ বা পিতার্সবুর্গে চিঠি লিখলে সেগুলি গুপ্তচর বিভাগের দপ্তরে যায়। তাঁরা খুলে পড়েন তবে যথাস্থানে যেতে দেন। এ-মর্মান্তিক অবস্থায় হয়ত তাঁকে আরও বছর চার থাকতে হবে তার পরেও যে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। অনিশ্চিত কুয়াশায় অস্পষ্ট সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, লেখক হিসেবেও যে তিনি দারুণ কিছু হবেন এমন প্রমাণই বা কী তিনি রাখতে পেরেছেন মারিয়ার সামনে। দশ বছর আগে তিনি 'বেদনিয়ে লিয়ুদি (অভাজন) লিখে নাম করেছিলেন। এত দিনে সে নাম হয়ত পাঠকের মন থেকে মুছে গেছে। তিনি যদি এখন

ভাল কিছু লিখতে পারেনও সরকার তা প্রকাশ করতে দেবেন, এমন নিশ্চয়তাই বা কই। পিতার্সবুর্গ যাওয়ার রাস্তা তাঁর বন্ধ। আয় বলতে দাদার দয়ার দান ছাড়া কিছু নেই। এমন অসহায় নিঃসম্বলকে কী কেউ বিয়ে করতে চাইবে? দস্তয়েফ্‌স্কি স্বীকার করেন মারিয়ার ভয় স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে জার-সম্রাট প্রথম নিকোলাই মারা গেছেন। ১৮৫৫-র মার্চে দ্বিতীয় আলেকসানদার সিংহাসন আরোহণ করেছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি শুনেছেন, মানুষটি প্রথম নিকোলাই-এর মতন কট্টর নন, প্রজাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে তিনি রাজী। তা ছাড়া রাজনৈতিক আবহাওয়াটাও নাকি বেশ অনুকূল। দস্তয়েফ্‌স্কি চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করেছেন তাঁর মস্কোআ ও পিতার্সবুর্গের বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে—"দোহাই তোমাদের, তোমরা একটু চেষ্টা কর: এই মিলিটারী চাকরিতেই আমার যাতে পদোন্নতি হয় দেখ। আমার বই যাতে ছাপতে অনুমতি দেয় সরকার তার জন্যে তোমরা একটু উঠে পড়ে লাগো।"

যেমন চিঠি লেখেন রাজধানীতে তেমনি লেখেন মারিয়াকে, "শোন মারিয়া, ভাগ্যকে জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছি আমি। তুমি পাশে এসে দাঁড়াও, তুমি উৎসাহ দাও। দেখো কিছুই অজেয় থাকবে না আমার।"

এই সব মিনতি ও প্রার্থনা এবং দুর্মদ সংকল্পের চিঠি পড়ে মাঝে মাঝে মন যে টলে ওঠে না মারিয়ার, তিনি যে বিয়ের সম্মতি দিতে চান না তা নয়। কিন্তু সম্মতি দিতে মন তৈরি হয়ে উঠতে উঠতেই আবার অবিশ্বাস এসে অবশ করে তাঁকে। প্রেম ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্রমাগত দুলতে থাকেন তিনি।

মন স্থির করা কঠিন হয়ে ওঠে তাঁর। মারিয়াকে যদি একমাত্র দস্তয়েফ্‌স্কির দয়ার দানের ওপরেই ভরসা করতে হত, তাঁর যদি নির্ভর করার আর কেউ কিংবা আর কিছু না থাকত ত ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু তা নয়। তাঁর বাবা আসত্রাখান থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন মাঝে মাঝে, সরকারী চাকুরের বিধবা হিসেবেও কিছু পেনশন পাচ্ছেন তিনি। অতএব সম্মতি দেওয়ার আগে সব দিক ভেবে দেখবার অবসর ছিল বই কি তাঁর। তার ওপরে মহিলার রয়েছে অসুখ। নিত্য-রোগী তিনি। পরবর্তীকালে যে-রোগ তাঁর যক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বর্তমানে তারই সূচনায় ভুগছিলেন তিনি। আর সেই লাগাতার সর্দি-কাশি অল্প অল্প গা-গরম তাঁর স্নায়ুগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ফলে প্রশান্ত চিত্তে কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। যা ভাবতেন তার ওপরে ভরসা রাখতে পারতেন না,

ক্রমাগত মত বদলাতেন। অভাব অসুখ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁর মেজাজটাকে খিটখিটে করে দিয়েছিল। সর্বোপরি একটা সন্দেহ ও ঈর্ষায় ভুগছিলেন তিনি। পাঁচ শ' মাইল দূরে বসে দস্তয়েফ্‌স্কির নিষ্ঠার ওপরে যেন তিনি আর নির্ভর রাখতে পারছিলেন না। মারিয়ার সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন আর বাড়িওলির মেয়ের সঙ্গে শুচ্ছেন, এ-সন্দেহ কেবলই বিঁধছিল তাঁকে। তাই তিনি দস্তয়েফ্‌স্কিকে একটু যাচাই করে নিতে চাইলেন। বলা ভাল, জ্বালাতন করতে চাইলেন, লিখলেন, "তুমি আমার একজন ঐকান্তিক শুভানুধ্যায়ী, আমাকে নিঃস্বার্থ জবাব দাও, আমার বর্তমান অসহায় অবস্থা দেখে যদি কোন সচ্ছল দয়ালু প্রৌঢ় আমাকে বিয়ে করতে চায়, মত দেব কী ?"

সেই চিঠি পড়ে দস্তয়েফ্‌স্কির বজ্রাহত মানুষের অবস্থা। বিমূঢ় তিনি দু' হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। ব্যর্থ-প্রণয়ের তপ্ত অশ্রু দুচোখ বেয়ে অঝোরে ঝরতে থাকল। কেঁদে কেঁদে মনটা যখন হালকা হল, আবার পড়লেন তিনি চিঠিটা। আবার। আবার। শেষে চোখের সামনে ধরে রাখলেন।

ইতিমধ্যে তিনিও একটা গুজব শুনেছিলেন (আমল দেন নি) কুজনেস্কের কতিপয় প্রবীণ মারিয়ার জন্যে একটি সৎ ও সচ্ছল পাত্র খুঁজছেন। অসহায় বিধবার জন্যে তাঁদের দয়া উথলে উঠেছে। তিনি দাঁতে দাঁত ঘষলেন। কিন্তু চোখের জলে ক্রোধ ভেসে যায়, তাঁর কেবল মারিয়ার মুখখানা মনে পড়ে। অব্যবস্থিতচিত্ত অবলা কোন দিনই কোন কিছুতে মনঃস্থির করতে পারে নি, আজ ত আরও পারবে না। আজ সে নিঃসম্বল পরিত্যক্ত অসহায়-বিধবা। এখন অনায়াসে সে যে-কোন পুরুষের স্ত্রী হতে রাজী হবে। নিজে এগিয়ে গিয়ে কারো হাতে হাত না রাখুক কেউ যদি কাউকে এনে সামনে হাজির করে দেয়, ভরসা পেলে অনায়াসে সে তার পাণিপীড়ন করতে পারে।

দস্তয়েফ্‌স্কি চিঠিখানার দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। পত্রের শেষে মারিয়া লিখেছে, "আমি তোমাকে ভালবাসি। জেনো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা খুবই আন্তরিক।" নিঃসন্দেহে আন্তরিক, দস্তয়েফ্‌স্কি স্বীকার করেন, তাঁর প্রতি মারিয়ার ভালবাসাকে তিনি কোনদিনই অবিশ্বাস করেন নি। আজও করলেন না। তার ভালবাসা আন্তরিক বলেই না সে এ-রকম একটা চিঠি লিখতে পেরেছে তাঁকে। পাঁচ শ' মাইল দূরে বসে সে যা-খুশী করতে পারে, যে-কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে, কিংবা কারো প্রণয়িনী হয়ে থাকতে পারে, বাধা দিতে প্রতিবন্ধক হতে কেউ পাঁচ শ' মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে না। তবে

কেন সে চিঠি লিখল ? না, ভালবাসে বলেই, সে-ভালবাসা আন্তরিক বলেই। তবু দস্তয়েফ্‌স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, হতাশ হয়ে ভাবেন, এ আন্তরিক ভালবাসা আসলে করুণা, আসলে দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নয়।

দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে দুর্বল মানুষটির স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই অবসন্ন স্নায়ুতে এবার বিপুল আঘাত লাগল। মারিয়াকে তিনি বুঝি আর পাবেন না। তাঁর মারিয়া বুঝি জন্মের মতন পর হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভাবনায় বিভ্রান্ত দস্তয়েফ্‌স্কি সারারাত বিভীষিকা দেখলেন, শেষে অনিদ্রার রাত্রি কাবার করে উঠে বসে চিঠি লিখলেন, "তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও মারিয়া ত আমি মরব। আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।"

ইতিমধ্যে ভ্রাঙ্গেল এখান থেকে বদলী হয়ে চলে গেছেন পিতার্সবুর্গ। তিনি তাঁকে মারিয়ার চিঠির কথা জানিয়ে লিখলেন,..."সন্দেহ নেই, ভালবাসা এক অসীম আনন্দ; কিন্তু এর যন্ত্রণা এমনই নির্মম যে, সে-কথা চিন্তা করে কেউ কোন দিন যেন-না কাউকে ভালবাসে। সত্যি বলছি, কেউ যেন আমাকে হতাশার সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, আমি অকূলে ভাসছি। কী করছি, কী বলছি, কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি যে কী করে বেঁচে আছি, সেটাই এক বিস্ময়।...আমি একমনে কিছু ভাবতে পারছি না। কিছুই লিখতে পারছি না আমি। যে বইগুলি শুরু করেছিলাম সব ক'টাই অসমাপ্ত পড়ে আছে। যে-ঘটনা যে-পরিস্থিতি আমার জীবনে ঘটতে এত দেরি হয়েছে, সেই ঘটনা, সেই পরিস্থিতি অবশেষে আমার জীবনে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসল। আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল সে। আমাকে একেবারে অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিলে।"

১৮৫৬-র জানুয়ারিতে বন্ধু মাইকফ্‌কে লিখেছিলেন, "আমি খুব সুখী ছিলাম, সুখের আতিশয্যে কিছু লিখতে পারছিলাম না। তারপরে অকস্মাৎ দুঃখ এসে ছোঁ মেরে সে সবটুকু সুখ কেড়ে নিল আমার। শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তৈরি হয়ে উঠেছিল সব ধসে পড়ল। আমি সর্বস্বান্ত হলাম। শত শত মাইলের বিচ্ছেদ এখন আমাদের মধ্যে। আমি এক লাইন লিখতে পারছি না।"

কেন ? না, দারিদ্র্যে ও রাজরোষে তাঁর পায়ের তলার মাটি তপ্ত হয়েছিল, ভালবাসার পাখা পেয়ে তক্ষুনি তিনি তপ্ত মাটি থেকে পা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। প্রাণের নিদারুণ আবেগে ও বাসনায় প্রেমের নীলাঞ্জন আকাশে পাখা মেলে দিয়েছিলেন তিনি এবং নিমেষে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন বাস্তব। অর্থাৎ তাঁর যে

এখন বিয়ে করার অবস্থা নয়, তাঁর নিজেরই যে এখন আশ্রয় ও আহার অনিশ্চিত, সর্বোপরি ঋণে ঋণে তিনি যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাঁর পক্ষে যে এখন ঘর-বাঁধা, সংসার-পাতা আদৌই অসম্ভব এ-কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। কিংবা গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু যিনি তাঁর সংসারে আসবেন তাঁর ত এ-কথা ভুলে থাকলে চলবে না, কিংবা গ্রাহ্য না করেও তাঁর উপায় নেই, কেন না দায় ত তাঁরই ; আসলে বোঝা যে বইতে হবে তাঁকেই। মারিয়ার দ্বিধা ছিল সেইখানে, তাই দস্তয়েফ্স্কিকে ভালবেসেও সচ্ছল অন্য পুরুষের ঘরনী হওয়ার কথা ভাবছিলেন তিনি।

মারিয়ার এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি। তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, " 'বেদ্‌নিয়ে লিয়ুদি' (অভাজন) উপন্যাস লিখে আমি আমার দুর্ভাগ্যেরই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম।" কথাটা তিনি মিথ্যে লেখেন নি, তাঁর 'অভাজন' উপন্যাসের নায়িকা ভারাংকা থেকে অব্যবস্থিত-চিত্ত মারিয়ার এতটুকু পার্থক্য ছিল না। ভারাংকা জমিদার বীকভকে বিয়ে করে দারিদ্র্য এড়াতে চেয়েছিল, চেয়েছিল তার প্রেমমুগ্ধ প্রিয়চিকীর্ষু গরীব মাকার আলেক্সয়েভিচ্‌কে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে। কিন্তু ভারাংকা ছিল কুমারী অন্যপক্ষে মারিয়া শিশু-কোলে বিধবা। কুমারী ভারাংকাই যখন গরীব মাকারের প্রেমে সাড়া দিতে পারল না, তখন সবৎসা বিধবা মারিয়ার পক্ষে নিঃস্ব এক সাধারণ সৈনিকের প্রেমে পড়ে ঘর-বাঁধা শক্ত বই কি!

তাই বুঝি ওখানকার একটা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার চব্বিশ বছরের যুবক ভারগুনফের প্রেমে পড়তে চান, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চান মারিয়া। খবরটা সেমিপালতিন্‌স্কের কানে কানে ঘুরতে ঘুরতে যখন দস্তয়েফ্স্কির কানে উঠল, তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠতে চেয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন।

ভ্রাঙ্গেলকে লিখলেন, "আমি যদি আমার প্রিয়াকে হারাই, আমি পাগল হয়ে যাব, কিংবা ইরতিশের জলে ডুবে মরব।"

কিন্তু পাগল হলেন না তিনি, ইরতিশের জলেও ডুবে মরলেন না। কুজ্‌নেস্কের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তেই বরং বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন তখন। মারিয়াকে পেতে হলে চাই সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জেতার সেটাই সবচেয়ে শক্ত হাতিয়ার। তিনি মসকোআ আর পিতার্সবুর্গের আত্মীয় বন্ধুদের পত্র লিখে লিখে উদ্ব্যস্ত করে তুলতে থাকলেন। তোমরা এমন কিছু কর যাতে সামরিক বিভাগ থেকে আমি বদলী হতে পারি। মাসমাইনের কেরানী হতে পারি কোন সরকারী দফতরের।"

দস্তয়েফ্‌স্কি একটা কেরানীর চাকরি পেলেও বর্তে যান এখন। চতুর্দশ শ্রেণীর কেরানী হতে পারলেও তিনি খুশী আজ। যে-জাতের কেরানীকে নায়ক করে তিনি 'পুঅর ফোক' আর 'ডাবল' লিখেছেন—সেই অসহায় পরম করুণার মানুষই আজ তাঁর কাছে ঐকান্তিক লোভের জীবন।

অবশ্য তাঁর সব-বড় উপকার হবে, বর্তমান সমস্যার সর্বোত্তম সমাধানও বটে, যদি তাঁকে লেখা ছাপানোর ছাড়পত্র দেন সরকার। সেই উপকারটুকু করার জন্যেও তিনি বন্ধুদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ পাঠান। যদিও তিনি ভাল করেই জানেন, তার যে প্রতিভা আছে, তিনি যে লিখে জীবনধারণের উপযুক্ত উপার্জন করতে পারবেন, এ-বিশ্বাস তাঁর বন্ধু কিংবা আত্মীয়-স্বজন কারো নেই। তাই তিনি কেরানীর চাকরির জন্যেই প্রার্থনা করে যাচ্ছেন কেবল।

আর মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন। যেন তেন প্রকারেণ এই রাজরোষ আর বন্দীদশা থেকে মুক্তি চাই। তিনি আর রাজদ্রোহী নন, তিনি যে তাঁর ১৮৪৯-র ভুল ইতিমধ্যেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন, জারতন্ত্রই যে উৎকৃষ্ট তন্ত্র তা প্রমাণ করতে তিনি কিছু দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন সেমিপালাতিন্‌স্কে পা দিয়েই, এখন আরও দুটি কবিতা লিখলেন। এ-সব কবিতা থেকে বেছে বের করলেন 'শান্তির সিদ্ধান্ত বিষয়ক' আর 'সেই ভয়ংকর যুদ্ধের শেষ'। কবিতা দুটি কাব্যমূল্য কিছুই ছিল না। তিনি তা চানও নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল কবিতার মধ্যে দিয়ে রাজানুগত্য প্রকাশ করা, তা তিনি যে কবিতাগুলিতে ভাল করে ফোটাতে পেরেছেন তারই দুটি পাঠিয়ে দিলেন পিতার্সবুর্গে, জেনারেল তংলেবেনকে। মিলিটারী এনজিনিয়ারিং আকাদামীতে তংলেবেন ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে ভদ্রলোক সরকারের কাছে দস্তয়েফ্‌স্কির জন্যে দরবার করবেন, শুধু কবিতাগুলি পিতার্সবুর্গের কোন পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতিই চাইবেন না, দস্তয়েফ্‌স্কির প্রতি জারের করুণাও প্রার্থনা করবেন—আশ্বাস দিয়ে, ধৈর্য ধরতে চিঠি লিখেছেন তিনি।

যতক্ষণ অব্দি না প্রার্থনা মঞ্জুর হচ্ছে আশ্বাসের কোন দাম নেই তবু তংলেবেনের আশ্বাস দস্তয়েফ্‌স্কির মনে আশার সঞ্চার করল। ভ্রাঙ্গেলের আশ্বাস ত তিনি আগেই পেয়েছেন, বারবারই পাচ্ছেন অতএব মাঝে মাঝে মন তাঁর সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বই কি, সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ কল্পনায় এঁকে তিনি মারিয়াকে চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর সেই আবেগ-উত্তপ্ত চিঠির উত্তরে মারিয়া লেখেন নিরাবেগ ঠাণ্ডা কতকগুলি লাইন। সব চেয়ে আহত

হন দস্তয়েফ্‌স্কি মারিয়ার 'ভাই' সম্বোধনে। মারিয়া আজকাল চিঠিতে তাঁকে ভাই বলে ডাকতে শুরু করেছে।

এই শব্দটি যে কী হৃদয়বিদারক ভ্রাঙ্গেলকে সে-কথা জানিয়ে তিনি চিঠি লেখেন, "...তবু আমি এখনও একেবারে হতাশ হই নি। যে-ছেলেটির ওপরে মারিয়া নির্ভর করতে চাইছে, সেই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারটির বেতন বছরে মাত্র তিন শ' রুবল। এর বেশী সে কোন দিন রোজগার করতে পারবে বলেও আমি বিশ্বাস করি নে, কেন না তার বিদ্যার দৌড় শুনেছি খুবই সামান্য, এবং সে যে কোন দিন কুজনেস্ক ছেড়ে বাইরে যাবে তেমন সাহস কি উচ্চাশাও তার নেই। তুমি কী মনে কর মাত্র তিন শ' রুবলের ভরসায় মারিয়া চিরকালের জন্যে সাইবেরিয়ায় পড়ে থাকবে কেবল একটা জোয়ান যৌবনের সঙ্গ পেতে? এত অনভিজ্ঞ ও বোকা মারিয়া নয় নিশ্চয়। তবু যদি তাই সে থাকতে চায়, আমি বাধা দেব না। মারিয়ার সুখই আমার সুখ। সে-ক্ষেত্রে ভারগুনফের জন্যে আমি চেষ্টা করব। চেষ্টা করব সে যাতে আরও কিছু দূর লেখাপড়া করতে পারে। যাতে কোন ভাল চাকরি একটা পায়। আমার চেষ্টা মানে সে তোমারই চেষ্টা, পড়াশোনা ও একটা ভাল চাকরির জন্যে তোমাকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে ভাই। মারিয়া যদি সুখে না থাকে, আর্থিক কষ্টে ভোগে আমি কোনদিন শান্তি পাব না, বন্ধু।

"কিন্তু এ-সব পরের কথা। আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি গিয়ে তার সামনে দাঁড়াব। দাদাকে টাকা পাঠাতে লিখেছি। লিখেছে শিগগিরই টাকা পাঠাবে। টাকা পেলেই একটা সুযোগ বের করে কুজনেস্ক্ ছুটব। দাদার কষ্টার্জিত টাকা আমি মায়া-হরিণীর পেছনে ছুটে নষ্ট করছি, এ-কথা যেন বলো না তাকে। তুমিও মুখ ফিরিয়ে নিও না ভাই। আমাকে বিচার করতে বসো না।...এখন আমি আর কিছু ভাবছি না। ভাবতে পারছি না। মারিয়া আমার সম্পূর্ণ মন জুড়ে আছে। আমি অবিলম্বে তাকে দেখতে চাই, তার স্বর শুনতে চাই। আমি এক অসুখী উন্মাদ। আমি জানি এ ধরনের ভালবাসা আসলে একটা সাংঘাতিক অসুখ।"

নয়

সেই ভালবাসার অসুখে এমনই ভুগছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, যে, আর কোন অসুখের কথা তাঁর মনে ছিল না, কি আমল দেন নি। অথবা মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার প্রেমে পড়া অব্দি দস্তয়েফ্‌স্কির জীবন ক্রমশ বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন অ-লৌকিক হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বপ্নচারী হয়ে উঠেছিলেন কিংবা নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতন। তাঁর খাওয়া-ঘুম-চাকরি, প্রেমের সুখ ও দুঃখ, আর্থিক কষ্ট ও ঋণের দায়—কোন কিছুর মধ্যেই তাঁর বোধ অনুভূতি সজাগ সক্রিয় ছিল না। কতকগুলি তাঁর সজ্ঞান মনের অগোচরেই অভ্যাস বশে ঘটে যেত, কতকগুলি ঘটত স্বপ্নে যেমন ঘটে সেই ভাবে। দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে ভীষণ ভয়ে ঘেমে নেয়ে ঘুম ভেঙে গেলে যেমন আর ভয়ের চিহ্ন মাত্র থাকে না, দুঃস্বপ্নটাও মিলিয়ে যায়, তেমনি করে কাল কাটছিল তাঁর; কাল যা ঘটে গেছে সুখ কিংবা দুঃখ, পরের দিন কি দু' দিন বাদে আর চিন্তা করে ঠিক করতে পারেন না, সে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা স্বপ্নে দেখেছিলেন কেবল। এ-ভাবে মগ্ন অন্যমনস্ক মানুষটির দিন কাটছিল বলে গুরুতর ঘটনাগুলিও তাঁর মনের ওপর দিয়ে হালকা মেঘের মতন ভেসে চলে যেত, তিনি তাঁর গুরুত্ব বুঝতেন না। আবার তুচ্ছ ঘটনা গুরুতর হয়ে পাথরের মতন চেপে বসে থাকত বুকের ওপরে, কিছুতেই তিনি তাকে ঠেলে সরাতে পারতেন না।

'মারিয়াকে চাই। মারিয়া আমার। আমি তাকে আর কারো হতে দেব না।' এই প্রাণপণ দাবির কাছে তাঁর আর সব, সমস্ত কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল; তাছাড়া একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা তাঁকে প্রায় আকণ্ঠ গিলে ফেলেছিল—ভারগুনফ্‌ কে? কেমন দেখতে লোকটা? কোন্‌ গুণে সে মারিয়াকে বশ করে ফেলল, মারিয়াই বা তার মধ্যে এমন কী দেখল যে তার প্রেমে মজে গেল? এই প্রশ্নগুলি ক্রমাগত হুল ফোটাচ্ছিল তাঁকে আর সেই বিষে তিনি কেবলই অস্থির হয়ে উঠছিলেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। প্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেই অস্থির অসুখে তাঁর যে এমন কঠিন মৃগী রোগ তাও ভুলে গিয়েছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বলে কী রোগও তাঁকে ভুলে থেকেছিল? জবাবটা মিলবে ১৮৫৭-র ডিসেম্বরে সামরিক বিভাগের ডাক্তার তাঁকে যে সারটিফিকেট দিয়েছিলেন তার থেকে।

সামরিক চাকরি থেকে দস্তয়েফ্‌স্কিকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করে ডাক্তার লিখেছিলেন: 'এক পুরনো মৃগী রোগের পুনঃপৌনিক আক্রমণের

জন্যে সামরিক বিভাগের কাজ তিনি যথারীতি করে উঠতে পারছেন না। মিঃ দস্তয়েফ্‌স্কির বয়স ৩৫। চেহারায় কোন বিশেষত্ব নেই। তিনি মৃগী রোগে প্রথম আক্রান্ত হন ১৮৫০-এ। ওই রোগ হঠাৎ এসে তাঁকে আক্রমণ করে। তখন তিনি জন্তুর মতন অমানুষিক চিৎকার করে ওঠেন, শেষে বেহুঁস হয়ে যান। হাতে পায়ে ও মুখে খিচুনি হয় ও খিল ধরে। মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠে। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে দুর্বল নাড়ী প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকে। এ-অবস্থা থাকে মিনিট পনর। তারপর যখন হুঁস হয় তখন তাঁর অবসাদের আর অবধি থাকে না। ১৮৫৪-তে দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হন তিনি ও সেই থেকে গড়ে মাসে একবার করে এই রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হালে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন খুব, দুর্বলতায় ভুগছেন আর ক্রমশ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মুখে স্নায়বিক পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে; তার কারণ মস্তিষ্কের আঙ্গিক অসুস্থতা। যদিও মিঃ দস্তয়েফ্‌স্কি গত চার বছর ধরে নিয়মিত চিকিৎসিত হয়ে আসছেন, তাঁর রোগের কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে মহামান্য জারের সেবা করা সম্ভব নয়।'

ডাক্তার কী দস্তয়েফ্‌স্কিকে সামরিক বিভাগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে এই মিথ্যে সারটিফিকেট দিয়েছিলেন? যদি ডাক্তার মিথ্যে না লিখে থাকেন ত মারিয়া কি জেনে শুনে একটি মৃগী রোগীকে ভালবেসেছিলেন, একটি মৃগী রোগীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন? মারিয়াকে আমরা এ-পর্যন্ত যতদূর জেনেছি তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি জানতেন না দস্তয়েফ্‌স্কির অমন একটা মারাত্মক অসুখ আছে। অতএব সন্দেহ থাকে না রোগের কথাটা মারিয়ার কাছে তিনি বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন; অথবা তিনি বুঝি ভেবেছিলেন মারিয়াকে বিয়ে করলেই তাঁর এ-রোগ সেরে যাবে, তাই তিনি রোগের কথাটা আর জানানোর দরকার বোধ করেন নি তাঁকে। কিন্তু তার ফল যে ভাল হবে না, তাঁর দাম্পত্য জীবনের সব আশা সুখ ও ভবিষ্যৎই যে তাতে করে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে তা তিনি জানবেন কী করে? ভবিষ্যৎ কী কেউ জানতে পারে? আশংকা ভয় ইত্যাদির দিক থেকে মানুষ সাধারণতই ত চোখ ফিরিয়ে থাকে। অতএব ভবিষ্যতের কথা থাক, ওটা ভবিতব্যের হাতে তুলে দিয়ে এখনকার কথা বলি। এখন তিনি কেবল ভাবছেন। ভারগুনফের কথা শোনা অব্দি তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন—মারিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর মুখেই শুনবেন সব।' একটা এসপার ওসপার হয়ে যাক্। কিন্তু যাচ্ছি বললেই

ত যাওয়া যায় না সামরিক-চাকরির নিষেধ বাধা অনেক, তার ওপর তিনি নজরবন্দী, তাঁর গতিবিধি সব সময় কর্তৃপক্ষের গোচরে রাখার বিধি; সে-বিধি তিনি অমান্য করবেন কেমন করে? সেবার ভ্রাঙ্গেল ছিল সাহস করে তাই অন্যান্য বন্ধুরাও সহযোগিতা করেছিল। তিনি ডুব মেরে চলে যেতে পেরেছিলেন মারিয়াকে দেখতে। এবার তেমন কিছু কায়দা করার উপায় নেই, এবার তিনি কী করবেন! আকাশ-পাতাল চিন্তা করে তাঁর যখন পাগলের অবস্থা তখন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। তখন ১৮৫৬-র জুন মাস। হুকুম হল কিছু সামরিক মালপত্র নিয়ে তাঁকে বারনুল যেতে হবে। তিনি একাই যাবেন। হুকুমনামা না যেন আকাশের গোটা চাঁদটাই হাতে পেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। বারনুল যেতে পারলে কুজনেস্ক্‌ আর কতটুকু! কুজনেস্ক্‌ যেতে আর আটকায় কে তাঁকে!

বারনুলের কাজটুকু সেরে তিনি এসে যখন কুজনেস্ক্‌ পৌছলেন তখন দুপুর বেলা। আরও কিছু সময় গেল ঠিকানা খুঁজে বের করতে। শেষে শহরতলির এক গরীব পল্লীতে দু'খানা কাঠের ঘরের এক ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

বন্ধ দরজায় কে টোকা মারছে? দরজা খুলে মারিয়া অবাক: 'ফিওদর তুমি, তুমি কী করে এখানে এলে?'

দস্তয়েফ্‌স্কি দেখলেন মারিয়া তাঁর এই অভাবিত উপস্থিতিতে আনন্দে আকুল হয়ে উঠল না, ঝাঁপিয়ে পড়ল না তাঁর বুকে। সে কেবল তাঁর ডান হাতটা টেনে নিয়ে কয়েক পলকে চুমোয় চুমোয় হাতটা ভরে দিল। তারপরে টেনে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

দস্তয়েফ্‌স্কি বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'কতদিন তোমায় দেখি নে। তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না, একটা সুযোগ পেয়ে লুকিয়ে চলে এসেছি।' তিনি মারিয়ার মুখের ওপরে চোখ রাখলেন। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হয়ত সে ভীষণ বিব্রত বোধ করছে কিংবা রুদ্ধশ্বাসে এতগুলি চুমু খেয়ে এমন রক্তোচ্ছ্বাস হয়েছে মুখে।

সে-মুখ দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'তুমি কল্পনা করতে পারবে না মারিয়া, এই মুহূর্তটির জন্যে আমি কী ভীষণ প্রতীক্ষা করেছি। কেবল এই মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি আমি দিন রাত।' বলতে বলতে তিনি মারিয়াকে কাছে টেনে নিলেন, তাঁর গালের কাছে ঠোঁট এগিয়ে আনলেন তিনি; কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত মারিয়া মুখ সরিয়ে নিলেন, দস্তয়েফ্‌স্কির ঠোঁট এসে তাঁর কাঁধ স্পর্শ করল।

মারিয়া ব্যাকুল গলায় বলে উঠলেন, 'না না, ওসব থাক এখন। তুমি এখন

বস।' দস্তয়েফ্স্কির হাত থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তিনি তাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। 'তুমি বস, আমি তোমার জন্যে চা করি।'

মারিয়া সরে যাচ্ছিলেন। দস্তয়েফ্স্কি তার দিকে এগিয়ে গেলেন, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর লক্ষ্মীটি। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার রুক্ষ চিঠিগুলি তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি চিঠি লিখে লিখে তোমাকে বিরক্ত অসন্তুষ্ট করেছি কেবল।'

'ও-সব কথা থাক, ও-সব কথা তুল না এখন। তুমি বস।' মারিয়া চায়ের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চাপা দিতে নানা প্রসঙ্গ তুলতে থাকলেন। ভ্রাঙ্গেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সেমিপালাতিন্স্কের চেনা মানুষদের নাম করে কুশল জানতে চাইলেন। সেখানকার বনে কয়েকবার মারাত্মক আগুন লেগেছিল—তার ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। দস্তয়েফ্স্কি তাঁর প্রশ্নের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছিলেন আর ঘরের পুরনো প্রায়-নষ্ট আসবাব দেখছিলেন। এক সময়ে তাঁর চোখ মারিয়ার ওপরে এসে থামল। মারিয়ার পরনে জীর্ণ বিবর্ণ পোশাক। সে আরও শীর্ণ হয়েছে। শীর্ণ মুখে তার বড় বড় দুটি চোখ আরও বড় দেখাচ্ছে। ঘন অবিন্যস্ত চুলের জন্যে মুখাবয়বে যেন আর এক রকম লাবণ্য এখন। তিনি সে-লাবণ্য দু' চোখে লেহন করতে করতে শুধোলেন, 'মারিয়া, দয়া করে বলবে, পুরুষটি কে? সত্যি কী তুমি আর কাউকে ভালবেসেছ? সত্যি করে বল, আমার কাছে কিছু লুকিও না তুমি, আমাকে এমন করে দগ্ধে মেরো না।'

'ন্ না, ন্ না,' কী বলবে ভেবে না পেয়ে হাত কচলাতে থাকলেন মারিয়া। অস্থির হয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘোরাতে থাকলেন। উৎকণ্ঠার স্বরে বললেন, 'ন্ না, ন্ না, ও-কথা এখন না, এখন থাক।'

'কিন্তু আমি যে এ-জন্যেই এসেছি, আমাকে জানতেই হবে। পরী আমার, প্রিয় আমার, বল।' দস্তয়েফ্স্কি উঠে এসে তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। মারিয়া ভয়ে সংকোচে পিছে হটে গেলেন। বললেন, 'তুমি ভুল করেছ, আসলে ও-সব কিছু না। আমি তোমাকে নিয়ে একটু মজা করছিলাম মাত্র।' বললেন বটে কিন্তু দস্তয়েফ্স্কির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না তিনি।

'সত্যি, তেমন কেউ নেই? কিন্তু···তবে যে···' তিনি এগিয়ে এলেন তাঁর সামনে, মুখোমুখি দাঁড়ালেন, বললেন, 'মারিয়া, মুখ তোল আমার দিকে তাকাও।'

মারিয়া তবু মাথা নিচু করে রইলেন। কেঁপে উঠলেন। সত্য গোপন করতে পারলেন না আর, 'আছে, তেমন একজন··কিন্তু বিশ্বাস কর ফিওদর, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি। তুমি বড় ভাল মানুষ। তুমি বড় সরল, বড় একনিষ্ঠ, তোমার হৃদয় খুব উদার. এমন মানুষের মনে আঘাত লাগুক, তার কষ্ট হোক আমি চাই নি।'

শুনতে শুনতে দস্তয়েফ্‌স্কির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি করুণ চোখে তাঁর মুখে দৃষ্টি রেখে শুধোলেন—'কে সে?' জিজ্ঞেস করে হঠাৎ তিনি শক্ত হয়ে উঠলেন। একটা নিষ্ঠুর তৃপ্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন, 'সে কী ওই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার, ভারগুনফ্‌?'

এবার আহত পাখির চোখে তাকালেন মারিয়া। স্বীকার করলেন। 'হুঁ, নিকোলাই বরিসোভিচ্‌ ভারগুনফ্‌। ঠিকই শুনেছ, সে এখানকার একটা স্কুলে মাস্টারী করে ঠিকই। অল্প বয়েস। সবে ঢুকেছে। ওমস্কে ওর বাড়ি। মানুষটি আর যাই হোক খুব পরিশ্রমী আর নম্র।'

'কত বয়েস তার? জিজ্ঞেস করতে গলা কেঁপে উঠল দস্তয়েফ্‌স্কির।

'চব্বিশ।'

'বল কী!' বিস্মিত ও ব্যথিত হল দস্তয়েফ্‌স্কির গলার স্বর, তুমি বুদ্ধিমতী, কষ্টের অভিজ্ঞতাও তোমার কম নয়, সাইবেরিয়ায় জীবন যে কী সে-ও তুমি খুব ভাল করেই জান, অথচ সেই তুমি কি না, তোমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট একটা মাইনর স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধে সেই নিদারুণ কষ্টের জীবনটাকেই আঁকড়ে থাকতে চাইছ? কী মাইনে তার! ও-তে তার নিজেরই চলে নাকি যে তোমাকে আর পাশাকে পুষবে?'

'বছরে তিন শ' রুবল পাচ্ছে সে এখন; কিন্তু শিগগিরই তার মাইনে বাড়বে।'

'বেড়েই বা কত হবে! সেই তুচ্ছ ক'টা টাকাতেই তুমি সংসার চালাতে পারবে ভেবে তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো? হা ঈশ্বর!' দস্তয়েফ্‌স্কি থামলেন. একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা তুমি কী তাকে সত্যিই ভালবেসেছ মারিয়া?'

'হাঁ,' ফাঁসির আসামীর মতন মারিয়া তাঁর পরম গোপনীয় সত্য স্বীকার করে দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। দস্তয়েফ্‌স্কি হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত ধরতে যাবেন, মারিয়া মুখ তুলে তাকালেন, তাঁর দু' চোখ বেয়ে তখন জল গড়াচ্ছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কত ভালবাস আমি জানি, ফিওদর মিখাইলোভিচ্‌। আসলে আমিই অপদার্থ মেয়ে, তোমার সঙ্গে খুবই খারাপ

ব্যবহার করেছি। অথচ সেমিপালাতিন্স্কের কথা আমি এতটুকু ভুলি নি, সে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। আহ্ কেন যে ওর সঙ্গে আমার দেখা হল। না দেখা হলে আজ আমি তোমাকে নিয়েই মগ্ন মুগ্ধ থাকতে পারতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমি ভারগুনফ্‌কে ভালবেসে ফেলেছি। তাই বলে তোমাকে আমি দূরে ঠেলে দিতে পারব না। বন্ধু, তুমি বন্ধুর মতন আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আজ আমার একজন বন্ধুর বড় প্রয়োজন। তোমার উদার হৃদয়ের স্নেহ না পেলে আমি মরে যাব।' অসহায় নিরবলম্ব মানুষের চোখে তাকালেন মারিয়া।

কিন্তু সে অশ্রুসজল আবেদন কিছুমাত্র উৎফুল্ল করল না দস্তয়েফ্স্কিকে, তাঁর মুখ থমথমে হয়েই রইল। বললেন, 'না মারিয়া, যা হবার হয়ে গেছে, তারপর তোমার বন্ধু হয়ে পাশে থাকা অসম্ভব।' কিন্তু 'অসম্ভব' কথাটা বলতে যেন তাঁর গলা বুজে এল। একটা প্রবল যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে কুঁকড়ে যেতে থাকলেন তিনি। এ এক নিষ্ঠুর সাজা। তিনি জানেন মারিয়ার প্রার্থনা তাঁকে পূর্ণ করতেই হবে। মারিয়ার বন্ধু হয়ে থাকতে হবে তাঁকে, এ তাঁর প্রাণের পিপাসাও বটে কিন্তু এ যে কত বড় অপমান তাও তাঁর অজানা নয়।

মারিয়া বললেন, 'ওর আসার কথা আছে এখন। এখনই হয়ত এসে পড়বে। ওকে কিন্তু তুমি ছুঁয়ো না; বিদ্রূপ করো না ওকে। ভারগুনফ্ নিতান্তই ছেলে-মানুষ। ওর কোন দোষ নেই। আমিই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছি, টেনে এনেছি কাছে। আমি যদি মুখ ফেরাই, ওকে প্রশ্রয় না দিই, অন্য মেয়েরা ওকে কেড়ে নেবে আমার থেকে। তখন আমার উপায় কী হবে, আমি যে অসহায় হয়ে পড়ব, আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। জান, আমার কেবলই ভয় করে, একটু অনাদর পেলে, সামান্য অবহেলা দেখলে সে আর আমাকে ভালবাসবে না। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

দস্তয়েফ্স্কির সামনে এমন সরল মনে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের গোপন কথা বলে গেলেন মারিয়া যেন দস্তয়েফ্স্কি তার প্রণয়ী নয়, একজন শুভানুধ্যায়ী মাত্র, তাঁর সঙ্গে তাঁর কোন হৃদয়-ঘটিত সম্পর্ক নেই। দস্তয়েফ্স্কি চুপ চোখে তাকিয়ে থেকে শুনছিলেন। শুনে এই শিশুর মতন সরল মানুষটির ওপর না পারলেন তিনি ক্ষোভে ক্ষেপে উঠতে, না পারলেন হতাশায় কেঁদে ফেলতে। বরং যেন করুণাই হল তাঁর, প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর মতনই তিনি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'তবে তুমি কেমন করে ভালবাসছ

তাকে? তার প্রতি তোমার একবিন্দু শ্রদ্ধা নেই। তার ভালবাসায় পর্যন্ত তোমার বিশ্বাস নেই এতটুকু। অথচ সেই অবিশ্বাসের ভালবাসায় মজে যাচ্ছ তুমি। তুমি নিজেকে নষ্ট করছ। এর মানে কী? এমন হলে সে তোমাকে পায়ে পায়ে নির্যাতন করবে যে।'

দস্তয়েফ্‌স্কির কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত বিপন্ন চোখে তাকিয়ে থাকলেন মারিয়া। তারপর দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন; দু' হাতে তাঁর দু' হাত টেনে নিয়ে বললেন, 'আমরা দু'জন দুই হতভাগ্য মানুষ ফিওদর…' তারপর আরও কিছু বলতে চেয়ে বলতে পারলেন না। প্রবল কাশির দমকে দম বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। কাশতে কাশতে সর্বাঙ্গে টালমাটাল হতে থাকলেন। একটু বাদে কাশির দমকটা একটু কমে এল বটে কিন্তু তখনও কিছু বলতে পারলেন না তিনি, তার আগেই ভেজানো দরজার ওদিকে জুতোর শব্দ শুনতে পেলেন তাঁরা। এবং তখনই দরজা হাট খুলে ঘরে ঢুকল এক যুবক। ভারগুনফ্‌কে দেখলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। অনতিদীর্ঘ মানুষটির লম্বাটে ধরনের মুখে একটা কিশোর বয়েসের ছাপ। চোখ দু'টি নীল। অবয়বের আর কিছু দেখবার আগেই তার বেঢপ পোশাক দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাঁর। একটা হাতা-কাটা জামা গায়ে। কনুই থেকে বাহু দু'টি উদম, শক্ত হাড়ের লালচে বাহু দুটো দু' পাশে ঝুলছে। রোমশ কব্জি দেখে বোঝা যায় বেশ বলবান পুরুষ। তার ভঙ্গিতেও আত্মপ্রসাদের ভাব। যৌবনের ঔদ্ধত্যও বেশ সোচ্চার। তবু কেন যেন মনে হল, মনের দিক থেকে মানুষটি খুব সরল, নম্র ও নির্ভরশীল।

মারিয়া বললেন, 'কোলিয়া, এই আমার সেই দরদী বন্ধু ফিওদর মিখাইলোভিচ্‌ দস্তয়েফ্‌স্কি, যাঁর কথা তোমাকে আমি হামেশাই বলি।'

'ও, স্বর্গত আলেকসান্দার ইভানোভিচ্‌ ইসায়েফের বন্ধু। হাঁ, তোমার মুখে এর কথা অনেকবার শুনেছি বটে।' বলে সে মারিয়ার হাতটা নিজের মুঠোয় টেনে নিল।

মারিয়ার কান্নায় লাল চোখ কি তাঁর বিচলিত অবস্থা বুঝি নজরে পড়ে নি তার। অথবা গ্রাহ্য করল না। হঠাৎ যেন তার মনে পড়েছে মারিয়াকে চুমু খাওয়া হয় নি, তাঁর হাতটা ঠোঁটের কাছে তুলে কয়েকটা গাঢ় চুম্বন করল হাতের পিঠে। তারপর দস্তয়েফ্‌স্কির দিকে তাকিয়ে চোয়াড়ের মতন হাসল।

'স্বর্গত' কথাটা ভারগুনফ্‌ এমন ঠোঁট বাঁকিয়ে উচ্চারণ করেছিল যে, ব্যাপারটা দস্তয়েফ্‌স্কির অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। তার ওপরে মারিয়ার হাতে

চুমু খেয়ে ওই উদ্ধত অপমানকর হাসি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, মারিয়া সত্য গোপন করেছে, তাঁকে ইসায়েফের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছে ভারগুনফের কাছে।

'ফিওদর মিখাইলোভিচ্,' ভারগুনফের ডাক শুনে আবার চোখ ফেরালেন তিনি। ভারগুনফ্ বলল, 'আপনার সঙ্গে কোলাকোলি করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। আপনার কথা আমি মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনার মুখে অনেক শুনেছি, শুনতে শুনতে আপনাকে দাদার মতন মনে হয়েছে আমার।'

অথচ, দস্তয়েফ্স্কি দেখলেন, তখনও সে মারিয়াব হাত ধরে আছে। কোলাকোলি করবে কিন্তু এগিয়ে আসার কোন তাড়া নেই তার।

মারিয়া ব্যাপারটা আঁচ করে বললেন, 'কোলিয়া, তুমি যদি কাল এস ত ভাল হয়, আজ আমি একটু ব্যস্ত।'

ভারগুনফ্ বলল, 'আমি পাশাকে ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি করার সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, সেই খবরটাই দিতে এসেছিলাম তোমাকে।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এখন না, পরে শুনব সব। কাল শুনব।'

ভারগুনফ্ মারিয়ার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছিল। সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী নীরবতা তখন। মারিয়া কী করবেন বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতন তাঁর পোশাকের সামনেটা টান টান করছিলেন। মনে হচ্ছিল ভারগুনফ্ পাছে বেফাঁস কিছু বলে বসে, ভয়ে মারিয়া অস্থির হয়ে উঠেছেন।

'তুমি কী ভাবছ তুমি মারিয়াকে বিয়ে করবে, হুঁ,' দস্তয়েফ্স্কি প্রায় উচ্চারণ করেই ফেলেছিলেন; কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন, 'মারিয়ার কাছে শুনলাম, তুমি এখানকার একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার। কী পড়াও তুমি?'

'আমি হাতের লেখা আর বানান শেখাই। আমি এখনও টিচারী করার পুরো সারটিফিকেট পাই নি। বছর দু'য়ের মধ্যেই পেয়ে যাব আশা করছি, তখন একটা গ্রেডও হবে আমার। আচ্ছা, আসি এখন।'

সে দরজার দিকে পা বাড়াল। চৌকাঠে পা দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। দস্তয়েফ্স্কির দিকে তাকিয়ে এমন ভাব দেখাল আর নাক দিয়ে এমন শব্দ করল যে, দেখে শুনে দস্তয়েফ্স্কির আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল, প্রথমে রাগে পরমুহূর্তে হতাশায়।—ওই হাসি দিয়ে ওই উদ্ধত শব্দ করে ভারগুনফ্ যেন মারিয়ার ওপরে তার অধিকার ঘোষণা করে গেল। তিনি কাঁপছিলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

মারিয়াও ধাতস্থ নেই। তাঁর মুখও লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁটে ঠোঁটও চেপে রাখতে পারছেন না আর। ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে আছে। তার ফাঁকে শুভ্র সুন্দর এক জোড়া দাঁত দেখতে পেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। তিনি কথা বলতে চাইলেন, পারলেন না, তখন, তাঁর বদলে, হঠাৎ তিনি হাঁটুর ওপরে বসে পড়লেন, মারিয়ার দুই জানু জড়িয়ে ধরলেন তিনি, মুখ চেপে ধরলেন তাঁর উরুর মধ্যে। তাঁর দু' চোখ ফেটে জল নেমেছে। তিনি চোখের জল চাপতে পারছিলেন না। বলে উঠলেন, 'মারিয়া, মারিয়া, এ-ভাবে এমন করে সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। কিছুতেই না।'

তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন মারিয়া। তিনি তাঁর ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁকে টেনে তুলতে চাইলেন তিনি। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেঁদো না, হতাশ হয়ো না। আমি যে একেবারে মনঃস্থির করে ফেলেছি তা নয়। হয়ত শেষমেশ তোমার সঙ্গেই যাব আমি, তোমার সঙ্গেই থাকব, অন্য কেউ থাকবে না আর আমাদের মাঝখানে।'

আশ্বাস পেয়ে খুশী হলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। মরিয়াকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘ দিন পরে এতক্ষণে এখন দু' বাহুর মধ্যে পেলেন প্রিয়াকে। চুমুতে চুমুতে রুদ্ধশ্বাস করে ছাড়লেন তাঁকে। মারিয়া অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন, শুধোলেন, 'তুমি ক'দিন আছ এখানে?'

'পরশু দিন অব্দি থাকতে পারব। কবে আমাদের বিয়ে হবে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তুমি বলে দিতে পারবে।'

'না না, তুমি আজই চলে যাও। তুমি এখানে থাকলে আমি মনঃস্থির করতে পারব না। উঁহু অসম্ভব।'

'অথচ এইমাত্র তুমি বললে…'

'তুমি আমাকে জ্বালাতন করো না ফিওদর।' হঠাৎ মারিয়া বিরক্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।' তুমি ভারগুনফ্‌কে দেখলে ত, এখনও আমি মনঃস্থির করি নি। কী করব এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি, ভীষণ ক্লান্ত। দেখছ ত আমার একটা ছেলে আছে, তার কথা ভাবতে হবে।' মারিয়া বাঁ হাতে কপাল টিপে ধরলেন।

কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির তখন জেদ চেপে গেছে, বললেন, 'কী চাও তুমি? হ্যাঁ, ভারগুনফ্‌কে ত দেখলাম; শুনলাম, সে তোমার ছেলের একটা হিল্লে করার

জন্যে খুব খাটছে। কিন্তু তাতে কী, তাতে করে কী ভারগুনফের ভেল্লা কিছু বাড়বে? একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার, সাইবেরিয়ার বাইরে সে কিছু জানে না, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তার সঙ্গে তোমার মতন একজন বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলার কেমন করে সারা জীবন কাটবে? এও কী সম্ভব! দু'দিন বাদে মনে হবে না কি, তুমি তোমার রূপ লাবণ্য আশা ভবিষ্যৎ একটা অজ্ঞ অখ্যাত যুবকের জন্যে নষ্ট করছ? ততদিনে একপাল ছেলেপুলে হবে তোমার। তাদের নিয়ে এই কুজনেস্কের একঘেয়েমির নরকে অসন্তোষে হতাশায় কষ্টে ক্রমাগত ডুববে নাকি, তখন কী তোমার আর মুক্তির উপায় থাকবে? ওদিকে অভাবের আগুনে পুড়তে পুড়তে ভারগুনফের মনও কী বিষিয়ে উঠবে না তোমার ওপরে?'

'থামো থামো।' আকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন মারিয়া। দস্তয়েফ্স্কি তবু থামলেন না; তিনিও চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'একপাল ছেলে নিয়ে তুমি শুকনো লতার মতন কুঁকড়ে পাটকিলে হয়ে যাবে অথচ তখনও থাকবে তার অটুট যৌবন অপূর্ণ ক্ষুধা। সে কী তখন তোমাকে ছেড়ে আর একজনকে চাইবে না? আর কাউকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না?'

'কিন্তু এখন এই অসহায় একলা অবস্থায় কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়া আমি থাকব কী করে, বাঁচব কী করে?' কোণ-ঠাসা কুকুরের মতন খেঁকিয়ে উঠলেন মারিয়া।

'তাই বলে একটা অপোগণ্ডকে বিয়ে করে নিজেকে তিলে তিলে খুন করবে?' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন দস্তয়েফ্স্কি।

'তাই বটে!' ফুঁসে উঠলেন মারিয়া, 'একটা স্কুলমাষ্টারকে বিয়ে করে আত্মহত্যা না করে আমি একটা এক্‌স্‌কনভিকটের জন্যে পথ চেয়ে থাকব। এখন যে একটা সামান্য সেপাই মাত্র, যার...'

'...যার সংসার পাতার মতন আর্থিক সামর্থ্য নেই। ঠিক, আমি গরীব কিন্তু......'

'...কিন্তু একদিন তুমি বড় হবে, মস্ত বড় লেখক, সারা দেশের তাবৎ মানুষ তোমার দুয়ারে লুটোপুটি খাবে, বই বেচে তুমি ধনী হবে, মস্ত বড় ধনী—সেই সোনার রোদের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি সাইবেরিয়ার এই বরফ-চাপা অন্ধকারে ক্ষুধায় পচতে থাকব!' ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মারিয়ার কর্কশ গলায়। 'তুমি যাও, তুমি আর আমাকে পিতার্সবুর্গের স্বর্গ দেখিও না। সেখানকার নর্দমা

থেকে এখানকার আঁস্তাকুড় অনেক ভাল। কোলিয়ার রোজগার বছরে মাত্র তিন শ' রুবল—হোক তবু সে যুবক, জোয়ান, সৎ লোক।'

'সৎ হোক কি না-হোক যুবক ঠিকই।' দস্তয়েফ্স্কির জিব এবার বিষ উগরে দিল। 'তার যৌবনটাকেই তুমি দেখছ, তার জোয়ান বয়েসটার লোভেই সব ভুলে গেছ, তোমার দেহের ক্ষুধার কাছে তোমার বিচার-বিবেচনা অন্ধ হয়ে গেছে।'

'হা ঈশ্বর, তুমি, তুমি এই সব নোংরা কথা ভাবছ? সেমিপালাতিন্স্কে বসে এই সব ভেবেছ? এখন এখানে ছুটে এসেছ সেই সব বলে আমাকে অপমান করতে?' অসম্মানে আর অভিমানে, ক্রোধে আর দুঃখে মলিন হয়ে গেলেন মারিয়া। চোখে ভৎর্সনা আর বেদনা তাঁর। তিনি দস্তয়েফ্স্কির দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে রইলেন।

চোখের সেই ম্লান-বিষাদ দেখতে দেখতে দস্তয়েফ্স্কির ঈর্ষার ক্রোধ শান্ত হয়ে এল। যে-প্রবল বিদ্বেষে তিনি জ্বলে উঠেছিলেন তা মারিয়ার ছলছল দৃষ্টির বিষণ্ণ জলে ভিজে শীতল হয়ে গেল। তিনি এগিয়ে এসে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর মারিয়া, লক্ষ্মীটি, ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি, আমি পশু হয়ে উঠেছিলাম।'

'জানি তুমি তোমার ভুল বুঝবে, শান্ত হবে।' মারিয়া তাঁর কাঁধে মাথা রাখলেন।

বিচিত্র এই রমণী। দস্তয়েফ্স্কির মেয়ে লিখেছেন, 'মারিয়া ছিল কুহকিনী।' কিন্তু মারিয়া-চরিত্র যাঁরা মন দিয়ে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন, মহিলা ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত, ক্রোধী এবং অভিমানী। ক্রোধ ও অভিমানবশে তিনি দস্তয়েফ্স্কিকে নিদারুণ মনঃকষ্ট দিয়েছেন, এমন কি ভারগুনফেরও শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন কিন্তু সেটা কুহকিনী বলে নয়, কুহকিনী হলে তিনি দস্তয়েফ্স্কিকে আদরে যত্নে ভুলিয়ে রেখে ও-কাজ করতেন। আসলে দস্তয়েফ্স্কি আর ভারগুনফের মধ্যে তাঁর হৃদয় ভাগাভাগি হয়েছিল। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কাকে তিনি চান।

তখন পড়ন্ত বিকেল। অদূরের মাঠে পাশা খেলছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়। জানলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মারিয়া। দস্তয়েফ্স্কি পাশাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাশা এখন পড়তে আসবে, ওকে পড়াতে আসবে ভারগুনফ্?'

'না', চাপা ঠোঁটে হাসলেন মারিয়া; দস্তয়েফ্স্কির দিকে একটা চকিত কটাক্ষ হেনে বললেন—'আজ আর ভারগুনফ্ আসবে না, আর পাশার ফিরতেও

দেরি হবে। ও যাবে ওর স্কুলের বন্ধু আলেক্সেই-এরা বাড়িতে, ফিরতে অন্তত দু' ঘণ্টা।' জানলা দিয়ে পাশাকে কয়েক পলক দেখে চোখ ফিরিয়ে হাসতে গিয়ে লাল হয়ে উঠলেন মারিয়া।

ওই হাসতে চেয়ে মুখ লাল করার মানে বুঝতে দেরি হল না দস্তয়েফ্স্কির। তিনি তাঁকে দু' হাতে পাঁজা কোলে করে খাটের ওপরে শুইয়ে দিলেন।

বহু দিন পরে দস্তয়েফ্স্কির তৃষিত বুক সুধায় ভরে গেল। ক্ষুধার্ত শরীর শান্ত হল। শেষ বিকেলের আলো নিভে গেছে। সন্ধ্যার ধূপ ছায়া রং গাঢ় হয়ে আসছে। ক্লান্ত-সুখে দু'জন তখনও শুয়ে আছেন। যেন নড়বেন না কেউ, নড়ার ইচ্ছে নেই।

দশ

মারিয়া তাঁকে সব দিয়েছে। আবার দিল ঃ দেহ দিল, মন দিল। এবং সেই উজাড় করে দেওয়া দেহ-মন এক সঙ্গে পেয়ে দস্তয়েফ্স্কির নিঃসংশয় বিশ্বাস হল—ভারগুনফ্‌কে নয়, তাঁকেই মারিয়া সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে। এখনও তাঁর প্রতিই সে অনুরক্ত। তার এই দেহদানের মধ্যে কোথাও খাদ নেই, ছলনা নেই; তাঁকে খুশী করে তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার মতলব নেই এর মধ্যে। ঈর্ষাবশে তিনি ভারগুনফের সঙ্গে মারিয়ার সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা করেছিলেন—আসলে যে তার মধ্যে আদৌ কোন সত্য নেই, ঈর্ষা যে একটা বিষম বস্তু মনে মনে তিনি তা স্বীকার করলেন। মন হাল্‌কা হল। খুশীর বাতাসে পাখির পালকের মতন নির্ভার ভাসতে থাকল তাঁর মন।.

কিন্তু পরের দিন মারিয়া যখন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এলেন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, মারিয়ার মুখ শুকনো, সে-মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার গভীর ছাপ। 'তবে? দ্বিধা কী কাটে নি তার? এখনো কী সে স্থির করতে পারে নি, কাকে বাহু বাড়িয়ে দেবে, কার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে?'

ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটল। দস্তয়েফ্স্কি পেছনে তাকিয়ে আছেন। ধুলোর মেঘের ভিতর দিয়ে দেখলেন, শ্লথ পায় ফিরে যাচ্ছে মারিয়া। দস্তয়েফ্স্কির মন আবার ভারী হয়ে উঠল, মনের মধ্যে সংশয় জেগে উঠল আবার।—ও কী এখন ভারগুনফের কাছে যাচ্ছে! ঈর্ষায় নিজের অজান্তেই আবার জ্বলে উঠলেন তিনি। অস্থির হয়ে উঠলেন।

তিনি ঘুরে বসলেন। সামনে দীর্ঘ পথ। সে ধূসর পথের দিকে তাকিয়ে তিনি বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজেকে সবলে সামলে নিতে চাইলেন তিনি—না আর দ্বিধা নয়, ঈর্ষা না। মারিয়ার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসে অবিচল নিঃসংশয় থাকবেন তিনি।

কিন্তু সেমিপালাতিন্স্কে ফিরে আসার দিন দশেকের মধ্যেই তাঁর সেই অবিচল বিশ্বাসের নিষ্ঠায় ফাটল ধরল। ফাটল ধরিয়ে দিলেন মারিয়া নিজেই। দশ দিনের মধ্যেই দু' দু'খানা চিঠি এসে হাজির হল তাঁর। আর সে-দু'খানা চিঠির নির্গলিতার্থ এক-ই। এক কথায়, তিনি ভারগুনফ্‌কেই বিয়ে করবেন। ভারগুনফ্‌কেই তিনি ভালবাসেন।

চিঠি পড়ে দস্তয়েফ্স্কি হতবাক। যন্ত্রণায় বুকটা মোচড়াতে লাগল তাঁর। তিনি ভেবে পেলেন না, মাত্র দশ দিন আগে দেহমন সমর্পণ করে ভালবাসার এমন আনুগত্য জানিয়ে দশ দিন যেতে না-যেতে কেমন করে সে এমন চিঠি লিখতে পারে।

'আমি কী মহামুশকিলে পড়েছি দেখ', ভ্রাঙ্গেলকে লিখলেন, '····· আমি যদি ওদের উপদেশ দিতে বসি, এ বিয়ের ভবিষ্যৎ সুখের হবে না—যদি সাবধান করতে চাই, ওরা ভাববে, মানুষটা ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে নানা কাল্পনিক ভয়ের কথা সব লিখে তাদের নিরস্ত করতে চাইছে। মানুষটা ভীষণ স্বার্থপর। অথচ শুভানুধ্যায়ী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে আমার আর কি করার আছে, আর কী করতে পারি বল ?······'

অবশ্যই তাদের দু'জনকে সুখী হওয়ার সুযোগ দিয়ে দূরে সরে থাকতে পারেন তিনি! কিন্তু মর্ষকামী প্রেমিকের চরিত্র তা নয়। ভালবাসায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েই তার সুখ, ভালবাসার জনকে সুখী করতে সুখী দেখতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকারের মধ্যেই তার আনন্দ। ত্যাগের অহংকার বুকে করে দস্তয়েফ্স্কি তখন সেই আনন্দেই মশগুল। কিন্তু না ওটাকে অহংকার বলা ঠিক হল না। যে-অহংকারের মধ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার বিলিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বড়, তাকে অহংকার না বলে মহত্ত্ব বলাই সমীচীন। কিন্তু শুধু ওইটুকু বললেই দস্তয়েফ্স্কির মতন জটিল চরিত্রের মানুষকে সবটুকু চেনানো যাবে না। দস্তয়েফ্স্কি যে শুধু মর্ষকামীই ছিলেন তা নয়, তাঁর মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট মানবীয় গুণও ছিল। ভালবাসার উত্তাপে সেগুলিও সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়ি থেকে ফুলে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে—সেগুলি হল তাঁর দয়া মমতা উদারতা ও আত্মদানের ঐকান্তিক

আগ্রহ। অথচ তাঁর মধ্যে যে স্বার্থপরতা ছিল না তা নয়, খুব ছিল। সেই স্বার্থপরতাবশেই ত তিনি মারিয়ার চিঠি পেয়ে, তাকে ফেরানো যাবে না জেনেও বার বার চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, "লক্ষ্মীটি ভেবে দেখ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে ভারগুনফ্‌কে বিয়ে করা মানে নিজের ভবিষ্যৎকে সাইবেরিয়ার বরফের তলায় কবর দেওয়া।"

জানেন, এ-উপদেশে কোন ফল হবে না, তিনি বেশ বুঝে গেছেন, ভারগুনফের ওপরে মারিয়ার অসীম দখল। ঐ দুরন্ত যৌবনকে আর সকলের কাছ থেকে কেড়ে এনে পোষা কুকুরের মতন করে রাখার কর্তৃত্বপিয়াসী ইচ্ছার তাড়নাতেই ওর ওপরে এত ঝোঁক মারিয়ার। আর দস্তয়েফ্স্কিকে কষ্ট দিচ্ছে আর নির্যাতন করছে কেন না বুঝে গেছে ওঁকে মারিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার কেউ নেই. মারিয়ার ভালবাসার শেকলে বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি। তিনি মারিয়ার ক্রীতদাস হয়ে গেছেন এখন। এখন তাই তাঁকে আঘাত দিয়ে লাঞ্ছিত করে পরম তৃপ্তি ভোগ করছে মারিয়া।

মারিয়াকে বারবার কাকুতি মিনতি জানিয়ে, ভারগুনফের সঙ্গে বিয়ে হলে তার ভবিষ্যৎ কী হবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে যখন ফল হল না, তখন দস্তয়েফ্স্কি তাঁর অসূয়াজর্জর মনের সব বিষ ঢেলে দিয়ে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। একটা অক্ষম দরিদ্র পাঠশালার মাস্টারকে কেবলমাত্র যুবক বলে বিয়ে করা যে একটা নিদারুণ উন্মত্ততা, একটা বিপুল মূর্খতা, সে-চিঠিতে সে-কথা লিখতেও তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন নি।

সে-চিঠি পড়ে ভারগুনফ্ অপমান বোধ করেছিল, ঘৃণার ভাষায় লিখে একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল সে দস্তয়েফ্স্কিকে। সেই তখন দস্তয়েফ্স্কির মোহ-ভঙ্গ হল, চৈতন্যোদয় হল তাঁর, বুঝলেন—এর অন্যথা হবার নয়, ওদের বিয়ে হবেই। তখনই তাঁর অসূয়া গেল মরে, ভালবাসারই জয় হল। তিনি চরম ত্যাগের জন্যে তৈরি হলেন, স্থির করে ফেললেন, তাঁর রোজগারের শেষ কপর্দক অব্দি তিনি মারিয়াকে সাহায্য করে যাবেন। তিনি ভারগুনফের জন্যে একটা ভাল চাকরির চেষ্টা করবেন।

স্নেহময়-মমতা মাখা চিঠি লিখতে থাকলেন তিনি তাদের কাছে। ভারগুনফ্‌কে এক পত্রে তিনি লিখলেন, 'তুমি পরীক্ষার জন্যে তৈরি হও। তুমি যাতে তোম্স্ক গিয়ে একটা পরীক্ষা দিয়ে আসতে পার আমি তার ব্যবস্থা করব। তখন তোমার পদোন্নতি হবে। বছরে হাজার রুবল মাইনে হবে তোমার। তখন আর তোমার মারিয়াকে নিয়ে সংসার পাততে কষ্ট হবে না।'

১৮৫৬-র ডিসেম্বরে সে কথাই জানালেন তিনি ভ্রাঙ্গেলকে। 'আমি অসুয়া ত্যাগ করেছি। মারিয়া যাতে সুখী হয় তাই আমি চাই। ভারগুনফ্‌ আজ আমার নিজের ভাইয়ের থেকে প্রিয়। তোম্‌স্কে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দাও। তার যাতে বছরে অন্তত হাজারখানেক রুবল রোজগার হয় সে চেষ্টা দেখো।'

প্রেমের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত বলে, মানে তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলে, দস্তয়েফ্‌স্কির চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছিল: প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়ে তিনি ভয়ানক অনিশ্চয়তায় ভুগতেন। পাব কি পাব না এই অনিশ্চয়তার কষ্ট তখন তাঁর রক্তে ও স্নায়ুতে বিপুল যন্ত্রণা হয়ে উঠত। সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভুগতে ভুগতে তিনি অনুভব করতেন, তিনি বেঁচে আছেন। 'আমি আছি, আমি বেঁচে আছি' এই বোধ তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত করে তীব্র হয়ে উঠত বলেই প্রেমের এই অনিশ্চয়তার কষ্টটাকে তিনি সাগ্রহে বুকের মধ্যে লালন করতেন, তার জন্যে যৎপরোনাস্তি অসুখী হয়ে উঠতে চাইতেন। ফলত কেবল চোখের জল পড়ত, অনিদ্রায় রাত কাটত। এই চোখের জলে এই অনিদ্রার কষ্টে আর অনিশ্চয়তার পীড়নে মথিত হয়ে তাঁর মধ্যে এক বিষামৃত সুখ ফেনিয়ে উঠত; তার নেশায় আচ্ছন্ন আবৃত হয়ে যেতেন তিনি। এই উপলব্ধির কথা ১৮৫৭ সালে ভ্রাঙ্গেলকে লিখেছিলেন তিনি: "দু'টো বছর মারিয়া আমাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে, সত্য, আমি অসহনীয় কষ্ট পেয়েছি ঠিকই; কিন্তু আমি 'বেঁচে আছি' এ-উপলব্ধির সুখও সে-দুঃখের মধ্যে কম পাই নি। নয়ত সেমিপালাতিন্‌স্কের মতন মরু-শহরে আমি ধড়ে প্রাণ রাখলাম কী করে।"

আসলে তীব্র সুখে জ্বলে উঠতে পারাটাই বাঁচা, জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে যাওয়ার বিষামৃত সুখই বাঁচা—এই বাঁচার সুখ তাঁর মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিল মারিয়া। সে-উপলক্ষে মারিয়ার মধ্যে তিনি যে-দু'টো বৃত্তির প্রবল বিক্রিয়া দেখেছেন, পরবর্তীকালে তাকেই অমর করে রেখেছেন তিনি তাঁর 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে। নারী তার দয়িতকে কষ্ট দিয়ে নিজেও ততোধিক কষ্ট পায়, এ-ভাবে এক সঙ্গে ধর্ষকাম ও মর্ষকামের সুখ চরিতার্থ করে—এই হল ওই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য দস্তয়েফ্‌স্কির নিজের চরিত্র। আপন জীবনের নির্বাসন-পূর্ব অধ্যায়ের সুখ-দুঃখবিধুনিত অভিজ্ঞতাকে ঢেলে সাজিয়েছেন তিনি ওই 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে।

উপন্যাসের নায়ক (ইভান পেত্রোভিচ) ভানিয়ার মতনই তখনকার অবস্থা দস্তয়েফ্‌স্কির। মারিয়ার প্রত্যাখ্যান তাঁকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে আর

সেই নিষ্ঠুর যন্ত্রণার বোধ এক দুঃসহ সুখে ভরে তুলেছে তাঁর অস্তিত্ব। তিনি যেন এখন আরও বেশী করে ভালবাসছেন তাঁকে। তাঁর ছলনা, অবমাননা, পীড়ন ও প্রতারণা সব—সমস্তই যেন ইন্ধন যুগিয়েছে তাঁর ভালবাসায়। ভালবাসা দাবানলের মতন জ্বলে উঠেছে। সেই জ্বলন্ত শিখা বুকে করে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর প্রিয়ার প্রসন্নতা তাঁর সুখ ও সৌভাগ্য নিয়ে আরও বেশী করে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সে-সব শুভ ভাবনা ও শুভানুধ্যানের চিঠি পড়ে মারিয়া ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়লেন। কোথায় গালমন্দ করবে, অভিসম্পাৎ দেবে আহত মানুষটা, না, তার মঙ্গল-চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে তাঁর ফিওদর। সেই ঐকান্তিক সহৃদয়তায় বিগলিত মারিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যে মর্মান্তিক কথাগুলি লিখেছিলেন, 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের নায়িকার মুখ দিয়ে সে কথাগুলি অবিকল বলিয়েছেন তিনি: 'হাঁ', আমি তাকে পাগলের মতন ভালবেসেছি। এমন করে কোন দিন আমি তোমাকে ভালবাসি নি। আমি জানি আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম বলেই তোমাকে যেমন করে ভালবাসা উচিত ছিল তেমন করে ভালবাসতে পারি নি। তাকে ভালবাসাও আমার ঠিক হয় নি। কেন না আমি গোড়াতেই জানতাম, তার সঙ্গে আমার চরম সুখের মুহূর্তেও আমার মনে হয়েছে, সে আমাকে দুঃখ দেবে; তাকে ভালবেসে আমি শুধু যন্ত্রণাই পাব। কিন্তু তার দেওয়া দুঃখই যদি আমার সুখের সামিল হয়ে ওঠে ত আমি উপায় কী করি, বল ?……'

'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে তিনি মারিয়ার পরবর্তী চিঠিখানাও নাতাশার মুখে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন: 'তুমি বড় দয়ালু। বড় সত্যনিষ্ঠ মানুষ তুমি। তোমার নিজের সম্পর্কে একটা কথাও বলছ না। এতটুকু দুঃখ প্রকাশ কিংবা অভিযোগ নেই তোমার। অথচ দোষ আমারই, আমিই তোমায় ত্যাগ করেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তুমি আমার সব দোষ অপরাধ ক্ষমা করেছ—আমার সুখ, মঙ্গলই হয়ে উঠেছে তোমার একমাত্র কামনা।'

মারিয়ার এই প্রশংসার চিঠি পেয়ে তাই বলে দস্তয়েফ্‌স্কি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারেন নি। সত্য বটে তিনি মারিয়ার সুখের জন্যে সর্বস্ব পণ করেছেন তবু মনের মধ্যে যে তাঁর অনির্বাণ জ্বালা সে নিভছে কই!

মারিয়া একটা হতদরিদ্র যুবককে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এ কী তাঁর কম অপমান! তাঁর পরাজিত পৌরুষ আহত গোখরোর মতন কেবল ব্যর্থ আক্রোশে নিজের বুকের দেয়ালে মাথা খুঁড়ছিল। ভারগুনফের ভবিষ্যৎ যত উজ্জ্বলই হোক

তাঁর মত বড় হতে পারবে কী সে কোনদিন? তিনি একজন লেখক। একদা তিনি রুশ-সাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিলেন। খ্যাতির শিরোপা পরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে সেদিন রাশিয়া। আবার কী সেদিন আসবে না? আসবে। আসবে। এ বিশ্বাস নিঃসঙ্গ রাত্রির যবনিকা তুলে তাঁর কানে কানে কথা বলে। তবে কেন প্রত্যাখ্যান করল তাঁকে মারিয়া? সে কেন তাঁর বিশ্বাসের অংশীদার হতে পারল না, অংশীদার হতে অস্বীকার করল? সব মানুষের সঙ্গে এক করে দেখল কেন তাঁকে মারিয়া? তাঁর মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাকে সে আবিষ্কার করতে পারল না? নিজেকে ধিক্কার দেন দস্তয়েফ্‌স্কি। এতবড় পরাজয়কে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারেন না। পারে না একটা সাধারণ প্রতিভার মানুষও, তাঁর মতন অনন্যসাধারণ মননের মানুষ পারবে এ-আশা করাটাও ত ভুল। তবু সময়ের সংকটে পড়ে সে-অপমান তাঁকে গলাধঃকরণ করতে হল। আর সেই বিষে ক্রমাগত জর্জরিত হতে থাকলেন তিনি। তথাপি এই একনিষ্ঠ প্রেমিক তাঁর প্রোষিত প্রিয়াকে ভুলতে পারেন না।

এ-সময়ে তিনি ভ্রাঙ্গেলকে লিখেছিলেন: "না না, এটা আমার পক্ষে একদম অসম্ভব। কোন অবস্থাতেই মারিয়াকে আমি হাতছাড়া হতে দিতে পারব না, কিছুতেই না। এ-বয়সে আমার এই ভালবাসাকে একটা খেয়াল ভেবো না। শুনছ? দু' বছর ধরে তিলে তিলে আমি তাকে ভাল আরও ভালবেসে এসেছি। গত দশ মাসের বিচ্ছেদে সে ভালবাসার টান কেবল যে শিথিল দুর্বল হয়ে এসেছে তাই নয় একেবারে মিথ্যে হয়ে যেতে বসেছে, এ আমি সইব কী করে, কী করে…"

সত্যি, সহ্য করার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলছিলেন। অতীত দিনের প্রিয়-স্মৃতি ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য কেবলই মনে পড়ত আর যন্ত্রণায় শিউরে উঠতেন তিনি। যেন সে-স্মৃতি বড়শির মতন তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডটাকে গেঁথে ফেলেছে, রক্তাক্ত হচ্ছেন তিনি, সর্বাঙ্গে মনে বিধ্বস্ত হচ্ছেন। তবু মারিয়া যে তাঁকে কত ভালবাসেন তার নজির উল্লেখ করতেন বন্ধুদের কাছে, তার ওপরে তাঁর দাবি প্রমাণ করতে চাইতেন।

কিন্তু কেবল স্মৃতিমন্থন আর বন্ধুদের কাছে দাবি প্রমাণ করে অবস্থা আদৌ সহজ হয়ে উঠছিল না। বন্ধুদের চোখের ওপরেই ক্রমশ তিনি শীর্ণ হলুদ নিরক্ত হয়ে উঠতে থাকলেন। ১৮৫৬-র হেমন্তে চেহারা তাঁর ঝলসানো ছাল-ছাড়ানো শোল মাছের মতন হয়ে উঠল। মিলিটারি ড্রিল ও প্যারেডের সময় তাঁর

সে-চেহারা আরও মর্মান্তিক দেখাত। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন—মানুষটা বুঝি আর বাঁচবে না।

না-বাঁচার দশাই হয়েছিল তাঁর এ-সময়ে। মৃগীর আক্রমণে হামেশাই তিনি ভুগছিলেন। এক একটা আক্রমণের পরে সপ্তাহখানেক আর বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না।

এ-সময়কার এক চিঠিতে (৯ নবেম্বর, ১৮৫৬) ভ্রাঙ্গেলকে তিনি সেই শোচনীয় অবস্থার কথা লিখেছিলেন, "···আমার জন্যে কিছু একটা কর। এমন কিছু কর যাতে করে আমি পিতার্সবুর্গে আসার অনুমতি পাই। অবিলম্বে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু না হলে আমার জীবনের আর আশা নেই আমি এমনই জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছি।"

বস্তুত মূর্ছা-ভঙ্গের পরে তিনি যে সর্বাঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েই যেতেন তাই নয়, মানসিক অবসাদে ভীষণ ভীতও হয়ে পড়তেন।—"আমার কিছু মনে থাকে না। মনে হয় যেন কোন অচেনা জগতে চলে এসেছি। আমার জগতে, বাস্তব জগতে ফিরে আসতে, সব কিছু মনে পড়তে, স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। আমার এই বিপন্ন-বিষাদ অবস্থা আমাকে বড় ভাবনায় ফেলেছে। মনে হচ্ছে আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।" ওই একই দিনে দাদাকে লিখেছিলেন তিনি।

এমন অবস্থায় তবে কেন তিনি বিয়ে করতে উতলা হয়ে উঠেছিলেন, তার হদিস মিলবে বোনকে লেখা চিঠিতে। ভারভারাকে লিখেছেন, "আমি নজরবন্দী। চিরদিন জারের-পুলিশ আমাকে নজরে-নজরে রাখবে। কোন দিনই সরকার আমাকে বিশ্বাস করবে না। তবে যদি আমি বিয়ে করি, সংসারী হই এবং শান্ত-শিষ্ট থাকি তখন হয়ত সরকার ভাববে—লোকটা যখন বিয়ে করেছে, নিশ্চয় আর সে বিপজ্জনক কাজকর্মে যোগ দিয়ে পারিবারিক সুখ-শান্তি নষ্ট করবে না। নিজের ভবিষ্যৎ গড়তেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবে। জান বোন, আমার বিশ্বাস একমাত্র এ-পথেই আমি রাজ-রোষ এড়াতে পারব। আমার ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন সফল করতে পারব।"

নিঃসন্দেহে এই অমিত বিশ্বাসই তাঁর ভগ্ন-মনে মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করছিল তখন। তাইতেই তিনি অমন দুঃখের দিনেও শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন, রোগের কষ্ট, অর্থ-কষ্ট, সমভাবে তুচ্ছ করে মারিয়াকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারছিলেন।

মারিয়া সেমিপালাতিন্স্ক্ থাকতেই ঋণ শুরু হয়েছে তাঁর, ধাপে ধাপে

বাড়তে বাড়তে সে-ঋণ এখন হাজার রুবল ছাড়িয়ে গেছে। শোধ দেবেন তার কোন উপায় নেই, নতুন ধার করবেন তেমন কাউকে অবশিষ্ট রাখেন নি। যে-দিকে তাকান কেবল রুদ্ধদ্বার নিরন্ধ্র দেয়াল দেখেন চারধারে, আর অন্ধকার! সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিরন্ধ্র দেয়ালের অন্ধকারে জীবন তাঁর এখন দান্‌তীয় নরক পরিক্রমা কেবল। কেবল অসুস্থ মস্তিষ্কের অবাস্তব স্বপ্ন-বিলাস।

দস্তয়েফ্‌স্কির অবস্থা যখন দুর্দশার সেই চরমে এসে পৌঁছল, অবসন্ন বিধ্বস্ত মানুষটি যখন হতাশার সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে একেবারে তলায় এসে ঠেকলেন, তখন সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটা আলোর রশ্মি এসে পড়ল তাঁর মুখে—আবার আলো দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর জীবন এখান থেকে এক নূতন পথে বাঁক নিল। ভ্রাঙ্গেল আর জেনারেল তৎলেবেনের চেষ্টার ফল এবার ফলল। ১৮৫৬-র অক্টোবরে পদোন্নতি হল তাঁর; তিনি পদাতিক থেকে প্রাথমিক অফিসার প্রোপোরচিক পদে উন্নীত হলেন, পেলেন নাগরিক অধিকার আর সুবিধাভুগী শ্রেণীর মর্যাদা—যা না থাকলে জারের রাশিয়ায় মানুষের মতন বাঁচা অসম্ভব, যার অভাবে তিনি এতদিন মরমে মরে ছিলেন, হয়েছিলেন জীবন্মৃত।

খবরটা জানিয়ে ভ্রাঙ্গেল লিখলেন, "এবার তোমার প্রতি মারিয়ার আচরণ নিশ্চয় বদলাবে। বদলাল কিনা, বদলাচ্ছে কিনা লিখো।"

কয়েকদিন পরে ভ্রাঙ্গেলের ওই চিঠির জবাব দিতে বসে দস্তয়েফ্‌স্কি লিখলেন, "আমার পদোন্নতির কথা জেনে মারিয়া আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তার চিঠি পড়ে বুঝলাম, সে খুব খুশী হয়েছে কিন্তু সে খুশী হওয়া যে কতখানি আন্তরিক আর কতখানি মৌখিক আমি জানি নে; তবে এটা ঠিক পদোন্নতি হওয়াতে আমার আনন্দের অবধি নেই। কেন না এবার আমি খুব শিগগিরই তার কাছে যেতে পারব। আমার হাতে টাকা নেই বলে তার কাছে যাওয়ার দিন ঠিক করতে পারছি নে। দাদা কিছু টাকা পাঠাবে লিখেছে। আশা করছি সামনের সপ্তাহ নাগাদ টাকাটা পেয়ে যাব। আমার কমানডিং অফিসার আমাকে ক'দিনের ছুটি দেবেন কথা দিয়েছেন। ওর সম্পর্কে চিন্তা করে করে আমি সত্যিই মরে যাচ্ছি, ওর চিন্তা আমাকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, আমাকে গাল পেড়ো না। আমি যা করছি তা বিজ্ঞের মতন কিছু নয়। বস্তুত আমার কোন আশাই নেই। কিন্তু এখন আর আশা আছে কি নেই তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি আর

এখন অন্য কিছু ভাবছি নে। আমি এখন একটা অসুখী পাগল, রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। আমি সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ঋণে ঋণে ডুবে গেলাম। তবু ঋণ করছি, করতে হবে। এখন আর আমি কিছুই গ্রাহ্য করছি নে। ঈশ্বরের দিব্যি এ-চিঠি তুমি দাদাকে দেখিও না। গরীব মানুষটি তার শেষ কড়ি দিয়ে আমাকে সাহায্য করছে আর আমি এভাবে কিনা সে টাকা উড়োচ্ছি।"

এ-চিঠি একটি উদাহরণ যাতে আমরা দেখি, নিজের নির্বুদ্ধিতা ব্যাখ্যা করতে কতখানি নির্দয় হয়ে উঠতে পারেন তিনি, নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন। আত্ম-সমালোচনার এ-শক্তিই তাঁকে সত্যদ্রষ্টা করেছিল, তিনি রাশিয়ার 'প্রফেট' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সে-প্রসঙ্গে পরে আসব।

তাঁর পদোন্নতি হওয়ার পরে থেকে মারিয়া যে-সব চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কি লক্ষ্য করলেন, মারিয়ার মনটা যেন ক্রমশ নরম হয়ে আসছে। ভারগুনফের ওপরে তার টানটা যেন শিথিল হয়ে আসছে ক্রমশ, ক্রমশ যেন ভারগুনফ্‌কে বিয়ে করার জেদ থিতিয়ে আসছে তাঁর।

অবশেষে মারিয়া একদিন সত্যিসত্যি লিখে বসলেন, "···না, ভেবে দেখলাম, স্বামী হওয়ার মতন যোগ্যতা ভারগুনফের নেই। তোমার কথাই ঠিক। বছরে তিনশ' রুবল যার রোজগার সে সংসার চালাবে কেমন করে?" মারিয়া শুধু এ-প্রশ্ন তুলেই থামেন নি, দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভালবাসা জানিয়ে লিখেছেন, "আমি তোমাকেই ভালবাসি, তুমিই আমার জীবনের সব।"

এই সব আশার চিঠি দস্তয়েফ্‌স্কিকে অবশেষে দারুণ উৎসাহিত করল; বস্তুত পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর সেই পরাজিতের গ্লানি ও অবমাননা-বোধ মুছে গেল মন থেকে। নতুন উৎসাহে বুক বেঁধে আবার এসে হাজির হলেন কুজনেস্ক। এবার আর লুকিয়ে পালিয়ে নয়। তিনি এখন ছোট হলেও অফিসার। অফিসারের মর্যাদা নিয়েই ছুটি নিয়ে ছুটে এলেন মারিয়ার কাছে।

মারিয়ার অভ্যর্থনাতেও এবার আর উত্তাপের অভাব থাকল না। পরম আগ্রহের বাহু বাড়িয়েই তিনি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। কুজনেস্কের কাঠের ঘরে অধরা স্বর্গ আবার নেমে এল দস্তয়েফ্‌স্কির হাতের মুঠোয়। এ স্বর্গ-সুখ আর আলেয়ার ছলনা নয়। মারিয়া রাজী হয়েছেন, দস্তয়েফ্‌স্কিকেই বিয়ে করবেন তিনি।

সেই পরম সাফল্যের কথা জানিয়ে তিনি ভ্রাঙ্গেলকে লিখেছিলেন, "আমার

জীবন-যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটল। এবার আমি আমার সুখী গৃহকোণে বসে প্রশান্ত মনে ক্রমাগত রূপ দিতে থাকব আমার এতকালের পরিকল্পনা। আমি নিবিষ্ট মনে অতঃপর কেবল সাহিত্য-সাধনাই করব।

সেই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা বুকে করে মারিয়াকে পাশে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন কুজনেস্কের ছোট্ট চার্চটির পবিত্র বেদীর সামনে। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি তৃষিত আত্মা তার পরম প্রার্থনার হাতে হাত রাখল। ১৮৫৭-র ৬ ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটা তাবানতাসে উঠে বসলেন। দু' ঘোড়ার গাড়ি ছুটল বারনুলের দিকে। সেখানে এক হোটেলের ফ্ল্যাট আগে থেকেই ভাড়া করে রেখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেখানে তাঁরা তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রজনী যাপন করবেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি যখন গাড়িতে উঠছেন পেছনে চেয়ে দেখতে পেলেন দূরে আর একখানা গাড়িতে উঠে বসল ভারগুনফ্‌। তিনি গ্রাহ্য করলেন না। শেষ বিকালের সূর্য তখন পশ্চিমের আকাশে একটা লাল উলের বলের মতন দেখাচ্ছিল। গাড়ি ছুটছে। রাস্তা বারে বারে বাঁক নিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। দস্তয়েফ্‌স্কি দেখছেন, একটা গাড়ি প্রাণপণ ছুটে আসছে তাঁদের দিকে, যেন পাল্লা দিয়ে ছুটছে। ভারগুনফ্‌ বুঝি তাঁদের ধরতে চায়। কী, মারিয়াকে কেড়ে নিতে আসছে নাকি সে?

'জোরছে হাঁকাও, চাবুক মারো। আরও জোরে, আরও আরও জোরে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর কোচমানকে তাড়া দিলেন। ব্যর্থ প্রেমিকের চেষ্টা স্তব্ধ করে দিতে দস্তয়েফ্‌স্কির উৎসাহের গলা উদ্যত হয়ে রইল কোচমানের ওপরে। ক্রমাগত তিনি চেঁচিয়ে চললেন—'চাবুক মারো, আরো জোরে, আরও আরও জোরে।'

চাবুক খেয়ে খেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির গাড়ির ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। ভারগুনফের গাড়ি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল, দৌড়ের বাজিতে হেরে যাচ্ছিল সে ক্রমশ। ক্রমশ তাঁর গাড়ি পেছনে অনেক দূরে একটা বিন্দুর মত হয়ে মিলিয়ে গেল।

তবু হাঁক ডাক থামে না দস্তয়েফ্‌স্কির। তিনি কেবলই চিৎকার করতে থাকেন—'জোরছে হাঁকাও, আরও জোরে।'

এবার আর ভারগুনফ্‌কে হারানোর জন্যে নয়; দাম্পত্য জীবনের প্রথম মিলনকে ত্বরান্বিত করতে যত দ্রুত সম্ভব বারনুল পৌঁছতে চাইছিলেন তিনি।

গাড়োয়ান প্রাণপণ চাবকাচ্ছিল ঘোড়া দু'টোকে। ঘোড়ার খুরে খুরে ছিটকে

ছড়িয়ে যাচ্ছিল জল-জমাট পথের কাদা। ক্রমশ সন্ধ্যা নামছিল। আলতাইয়ের পাহাড় চূড়ার বিবর্ণ আকাশে মলিন চাঁদ উঁকি মারছে তখন। অসমতল রাস্তায় গাড়ি দুলছে কাঁপছে, ছুটছে দুরন্ত গতিতে। তখনও চিৎকার করছেন দস্তয়েফ্‌স্কি —জোরে, আরো জোরে।

দুরন্ত-গতি গাড়ির প্রবল ঝাকুনিতে অস্থির মারিয়া অবশেষে প্রতিবাদ করলেন—'না না, আর জোরে নয়, না।' এত জোরে ছুটতে ছুটতে মারিয়ার বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অসহ্য লাগছিল।

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁকে বাধা দিলেন—'তুমি থাম ত। তুমি কথা বলো না। ছুটতে হবে আরও জোরে ছুটতে হবে ওকে।'

মারিয়া অগত্যা চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। মানুষটার বাড়াবাড়ি সব বিষয়ে—ভালবাসায় যেমন, ছোটার বেলায়ও তেমনি।

দেখতে দেখতে বারনুলের আলো ফুটে উঠল চোখের সামনে। যেন আকাশের কিছু হলুদ তারা মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমশ ঘর বাড়ি শহরের নানা চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। গাড়ি এসে থামল হোটেলের দরজায়। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাঁরা উঠে এলেন তাঁদের ঘরে। লগেজ তুলতে যা-একটু দেরি তারও যেন তর সইছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির। দয়িতাকে বুকে পাওয়ার জন্যে দীর্ঘ আড়াই বছর অনিশ্চয়তার সঙ্গে মর্মান্তিক লড়াই করে এখন যেন মুহূর্তের অপেক্ষাও অসহ্য লাগছিল তাঁর। মারিয়াকে বুকে করে বুকে ভরে এবার শুয়ে পড়তে চান তিনি। জয়ের পরিপূর্ণ আনন্দে বুকে বুক মুখে মুখ রেখে একটা দীর্ঘ সুখ-নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যেতে চান। তাঁর দুর্বল স্নায়ুগুলি সহন-সীমার শেষ প্রান্তে এসে এখন ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়তে চাইছে। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধের পরে বিজয়ী রণ-ক্লান্ত সৈনিকের দশা এখন তাঁর। সুখের সুরা আকণ্ঠ পান করে এখন তিনি তাঁর রণ-বিধ্বস্ত স্নায়ুগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে চান—কিন্তু তার আগে তিনি একবার দু' বাহুর কঠিন বন্ধনের মধ্যে পুরে ফেলতে চান তাঁর তপঃসিদ্ধিকে। মারিয়ার কানে কানে বলতে চান—এত দিনে তোমাকে একান্ত আপনার করে পেলাম, আজ থেকে তুমি আমার, শুধু আমারই।

মারিয়া খাটের ধুলো ঝেড়ে বিছানা করছিলেন তখন। দস্তয়েফ্‌স্কি দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। তাঁকে বুঝি দু' হাতে বুকের মধ্যে টেনেও নিয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর মুখে একটা তীব্র সুখের বাতি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। একটা অসহ্য অকথিত পুলকে টানটান হয়ে উঠেছে তাঁর শরীরের স্নায়ু

শিরা তন্তু। আর সেই মুহূর্তে তিনি একটা অতি শীতল মন্থর বাতাসের স্পর্শ অনুভব করলেন মুখে চোখে। শুনতে পেলেন একটা চিৎকার—বহু দূর থেকে একটা আহত বোবা জন্তুর ক্ষীণ চিৎকার যেন আকুল উদ্বেগে ছুটে আসছে। শব্দটা যত কাছে আসছে তত বিকট হচ্ছে, হতে হতে শেষমেশ ভীষণ আর্তনাদ হয়ে ফেটে পড়ে যেন তাঁর কানে তালা লাগিয়ে দিল। তাঁর জিভ বেরিয়ে পড়ল। মুখ কপাল ঘেমে উঠল। এতক্ষণে তিনি টের পেলেন শব্দটা তাঁর ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছিল। তিনি প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে সংযত করতে চেষ্টা করছিলেন। বুনো মোষের মতন যেন শক্তিটা তাঁর সত্তার মূল ধরে তাঁকে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিচ্ছিল। তাকে ঠেকাতে বাধা দিতে চাইছিলেন তিনি প্রাণপণ; কিন্তু সব চেষ্টা সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি অসাড় হয়ে গেলেন।

সেই মুহূর্তে তিনি আরও একটা ভয়-তরাসে ভীষণ চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর পাশে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে প্রবল ঝড়ে একটা সন্ত্রস্ত শিশু-দেওদারের মতন থরথর করে কাঁপছিলেন মারিয়া। তাঁর চোখ গোল, মুখ বিবর্ণ হলুদ। মুহূর্তের জন্যে দস্তয়েফ্‌স্কি মারিয়ার সে-বিস্ফারিত চোখে একটা বিভীষিকার ভয় ও নিদারুণ ঘৃণা দেখলেন। তারপরেই আর কিছু মনে নেই তাঁর। তখন তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছেন মেঝেয়।



'বেসী' উপন্যাসের খসড়া পাণ্ডুলিপির একটি পাতা। (উপন্যাসটি "দ্য পজেসড্" নামে ১৯৩১-এ ও "দ্য ডেভিলস" নামে ১৯৫৩-য় ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।)

তৃতীয় পর্ব

এক

নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে শিকল-পরা পায়ে দস্তয়েফ্‌স্কি যে-দিন পিতার্সবুর্গ থেকে সাইবেরিয়ার পথে রওনা হলেন তার পরে দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে। সে-দশ বছরে পিতার্সবুর্গের চোখের ওপরে ঘটে গেছে তিন তিনটে বৈপ্লবিক ঘটনা।—ক্রিমিয়ার যুদ্ধে হেরে গেছে রাশিয়া, জার প্রথম নিকোলাই-এর ত্রিশ বছরের রাজত্ব শেষ হয়েছে, পিতার্সবুর্গ থেকে বেরলিন অব্দি তৈরি হয়েছে দীর্ঘ রেল-রাস্তা। আর এই বৈপ্লবিক তিন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার জীবনে ও মননে শুরু হয়ে গিয়েছে এক সুদূরপ্রসারি পালা-বদলের পালা।

কিন্তু তাতে করে পিতার্সবুর্গের বাইরের চেহারাটা বড় বেশী পালটায় নি। দৃশ্যত সবই যেন ঠিক তেমনটিই আছে—যেখানকার পথটা সেখানে, যেখানকার গাছটা সেখানে, যেখানকার পার্কটা সেখানে। বাড়িগুলিও যার যার জায়গাতেই আছে যেমন দেখে গিয়েছিলেন তিনি দশ বছর আগে। ডিসেম্বরের সে-দিনটিতে যেমন বরফ পড়ত, বৃষ্টি নামত, রাস্তাঘাট জমাট জলের তলায় চাপা পড়ে থাকত আজও তাই থাকছে। একটুখানি এদিক-ওদিক হলেও আপাতদৃষ্টিতে সবই যেন ঠিক আগেকার মতন।

কেবল নেই সেই সেদিনের মনটি। মনে মনে পিতার্সবুর্গ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যেমন দস্তয়েফ্‌স্কিও আর সেদিনকার মানুষটি নেই, অনেক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পোড়খাওয়া সেদিনের তিনি আজ যেমন অন্য মানুষ।

১৮৫৯-এর ডিসেম্বরে দুই আগন্তুক এসে মুখোমুখি দাঁড়াল—দস্তয়েফ্‌স্কি আর পিতার্সবুর্গ তথা ইওরোপীয় রাশিয়া। রাজনৈতিক আর সামাজিক ভাবাদর্শে কী নিদারুণ পরিবর্তন ঘটেছে রাশিয়ার। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের বিপর্যয় বে-আবরু করে দিয়েছে বিশ্বজোড়া দুর্নীতি আর প্রথম নিকোলাই-এর আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের ঘুণধরা কাঠামোটা। সেই ঘুণধরা কাঠামোতে পলেস্তারা লাগাতেই যেন স্বৈরাচারী প্রথম নিকোলাই-এর স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন উদারপন্থী দ্বিতীয় আলেকসান্দার। আর সেই উদার-নীতির সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা দিকে দিকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে। দস্তয়েফ্‌স্কি প্রমুখ তখনকার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করে দিয়ে এঁদের আন্দোলন এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। শিক্ষিতেরা ক্রমশ রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠছেন; দিনে দিনে তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়াচ্ছে বিপর্যস্ত ভূস্বামী আর লাঞ্ছিত ও বিপন্ন মধ্যবিত্ত

মানুষ। এঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিদেশে হেরজেন, স্বদেশে চের্নিশেফ্‌স্কি। সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সামিল হচ্ছে এসে হাজার হাজার যুবক—জার-সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে জোরদার হচ্ছে তারা ক্রমশ। জোরদার হতে পারছে কারণ সমকালের সেই সক্রিয় তরুণ সমাজ যেমন সবল তেমনি সচেতন; অধিকন্তু গণ-সংযোগ্ও তাঁদের সেদিনের থেকে অনেক বেশী। তা ছাড়া ১৮৪০-এর অচলায়তন স্থবির পরিবেশে পেত্রাশেফ্‌স্কির দল, তদানীন্তন তরুণ র‍্যাডিক্লরা যে-হতাশা ও অনিশ্চয়তায় অব্যবস্থিত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন এখন সে-রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ আর নেই। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও জার দ্বিতীয় আলেকসান্দারের উদার নীতি যথাক্রমে তাদের ছায়া ও প্রশ্রয় দিচ্ছিল। সর্বোপরি নূতন ভাবের জোয়ার এনে দিয়েছিল কার্ল মার্ক্স আর বাকুনিনের চিন্তা—বুদ্ধিজীবী উঠতি তরুণ র‍্যাডিক্লরা ক্রমশ ভক্ত হয়ে উঠছিল বস্তুবাদের। ভাববাদের নিন্দায় আর বিজ্ঞানের জয়-জয়কারে মুখর হয়ে উঠেছিল তারা। নিভৃতে বেড়ে উঠছিল সন্ত্রাসবাদীর দল—রাশিয়া এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছে তখন।

রাশিয়ার যখন ওই রকম রাজনৈতিক আবহাওয়া, ১৮৫৯-এর ডিসেম্বরে, দীর্ঘ দশ বছর পর দস্তয়েফ্‌স্কি পিতার্সবুর্গের মাটিতে পা রেখেছিলেন। সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে স্টেশনে এসেছিলেন মাত্র দু'জন—তাঁর দাদা মিখাইল আর দাদার বন্ধু আলেকসান্দার মিলিউকফ্‌। দশ বছর আগেও এ-দু'জনই এসেছিলেন তাঁকে নির্বাসনের পথে বিদায় জানাতে। শূন্য স্টেশনে আর কাউকে না দেখে দস্তয়েফ্‌স্কি বুঝলেন, 'অভাজন'-এর বিখ্যাত লেখককে ভুলে গেছে পিতার্সবুর্গ, নির্বাসিত বিপ্লবীকেও আজ তার মনে নেই। অথচ কী বোকা তিনি, বিপ্লবীর দলে নাম লেখাবার সময় ভেবেছিলেন, অন্তত এ-পথে তিনি হৃত গৌরব উদ্ধার করতে পারবেন, অন্তত বিপ্লবী হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম। তাঁর মন তখন একসঙ্গে রুষ্ট ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে স্বাভাবিক। তাঁর অসন্তুষ্ট উচাটন মন সেই মুহূর্তেই জেদে ভরে উঠল—না, তিনি এমন অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে থাকবেন না, থাকতে পারবেন না কিছুতেই। রাশিয়ার মন জয় করবেন তিনি। তিনি রাশিয়াকে চিরদিনের মত পদানত করে রাখবেন। রাশিয়ার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। কিন্তু এই রুগ্ন নিঃসম্বল মানুষটি তখনও জানেন না, এ-পণ পূর্ণ করবেন তিনি কেমন করে, কী করবেন তিনি, কী তাঁর ভবিষ্যৎ!

সে ভবিষ্যৎ-বিষয়ে মন দেবার আগেই, একটু দেরিতে হলেও, রাশিয়া তাদের পূর্বসূরী রাজবন্দী দস্তয়েফ্‌স্কিকে নেতৃত্বে বরণ করতে এগিয়ে এসেছিল; কিন্তু সে-শিরোপা নিতে তাঁর একবিন্দু আগ্রহ ছিল না। নির্বাসিত জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা তাঁকে ভীত করেছিল বলে নয় কিংবা রাজনৈতিক চিন্তায় তারা তাঁকে ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল বলেও না—তিনি নিজেও সেই পুরনো কুয়োর জলে নাক উঁচিয়ে ছিলেন না, তাঁরও চিন্তায় বিবর্তন ঘটেছে, বাইরের পৃথিবীর গতির সঙ্গে পা ফেলে তিনিও চিন্তার রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন, দশ বছর আগেকার সে মানুষটি আর নেই তবু যে, নেতৃত্বের শিরোপা অস্বীকার করলেন তার কারণ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার মতন মনের গঠন কোন দিনই ছিল না তাঁর; তা ছাড়া এ-রক্তারাক্তির রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাসও ছিল না। বিশেষ করে তিনি কখনোই পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু এ-সবই বাইরের ব্যাপার; আসলে রাশিয়ার মনোরোগের ওষুধ তিনি এত দিনে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। রাশিয়াকে তিনি কী দিতে চান, আজকের রাশিয়ার সব চেয়ে কী বেশী প্রয়োজন তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। সে-ওষুধ তৈরি করতে এখন চাই সময়, অবসর। তার আগে মারিয়া আর পাশাকে নিয়ে পিতার্সবুর্গের কোথাও একটা ডেরা বাঁধতে চান তিনি।

কুজনেস্ক থাকতেই পাশা ক্যাডেট-স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দস্তয়েফ্‌স্কি যখন মারিয়াকে বিয়ে করেন তখন সে ক্যাডেট-স্কুলের বোর্ডিংএ থাকছে। সেমিপালাতিনস্ক্‌ ছেড়ে আসার সময় তাকে সে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন তিনি কিন্তু তারপরে এখন অব্দি তার শিক্ষার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। একবছর কেটে গেছে ৎভেরে; সেখানকার অস্থির দিনগুলিতে পাশার দিকে মন দেওয়ার মন ছিল না তাঁর, সুযোগও ছিল না। এবার তিনি আকাঙ্ক্ষিত জমিতে পা রেখেছেন, এবার তাঁর মন স্থির হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন, তার আগে অবশ্যি পাশার শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা হওয়া চাই, মারিয়ার জন্যে চাই একটি গৃহকোণ। নিঃসম্বল মানুষের পক্ষে সুখের সুন্দর নীড় একটা স্বপ্ন মাত্র। শহরের একটেরেতে গরীব এলাকায় কোনমতে একটা ডেরা বাঁধতে পারলেন মাত্র। আর তারই জন্যে কেটে গেল তাঁর বেশ কয়েকটা মাস। তখন হাত দিতে পারলেন তাঁর পরিকল্পনায়।

স্বাধীনভাবে লিখতে হলে, আর নিজের মনের কথা মনের মতন করে বলতে চাইলে দরকার নিজের একটি কাগজ; কিন্তু পূর্বতন রাজবন্দী এবং এখনও যিনি

নজরবন্দী, সারাজীবনই যাঁকে সন্দেহভাজন হয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁকে কাগজ বের করতে দিতে রাজী হবেন কেন জার! সে মুশকিলের আসান করতে এগিয়ে এলেন দাদা।

দস্তয়েফ্‌স্কি যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের দিন কাটাচ্ছেন মিখাইল তখন পিতার্সবুর্গে পেতে বসেছিলেন এক সিগার ও সিগারেট তৈরির কারখানা। সংশয়ের সে-ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত ভাগ্যে দিনে দিনে ফেঁপে ফুলে উঠছিল। বেশ দু' পয়সা কামাচ্ছিলেন মিখাইল। আর এ-ব্যবসায়ে তাঁর মাথাটাও খেলছিল ভাল। এক ডজন মাল কিনলে কিছু বিনামূল্যের টুকিটাকি উপহার 'ফ্রী গিফ্‌ট্‌' দিতেন তিনি। ফ্রী গিফ্‌টের এই রীতি তথা মাল জনপ্রিয় করার এই কৌশলের আবিষ্কর্তা সারা পৃথিবীতে নাকি মিখাইল দস্তয়েফ্‌স্কিই প্রথম, বলেছেন ফিওদর দস্তয়েফ্‌স্কির অন্যতম জীবনীকার এডোয়ার্ড হ্যালেট কার।

পেশাটা তামাকের হলেও নেশাটা ছিল কবিতা লেখার। ছোটবেলায় মিখাইল কবিতা লিখতেন। এখন উৎসাহের অভাবে সেই নেশাটা নিরুত্তাপ হয়েছিল কেবল। ফিওদর পিতার্সবুর্গ ফিরে এলে এবার সেই নেশাটা চাগিয়ে উঠল তাঁর। অবশ্য ফিওদরই সেই নেশার গোড়ায় ইন্ধন যোগালেন অনেকখানি। অথবা শনিগ্রহের মতন তিনি এসে দাদার কাঁধের ওপর চেপে বসলেন। অমন লাভের তামাকের ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে তিনি কাগজের সম্পাদক হয়ে বসলেন। ফিওদর দস্তয়েফ্‌স্কিকে প্রধান লেখক করে মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'ভ্রেমিয়া'র (সময়) প্রথম সংখ্যা বেরোল ১৮৬১-র জানুয়ারিতে। কাগজের প্রধান আকর্ষণ হল দস্তয়েফ্‌স্কির ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'।

দাদার বেনামীতে কাগজ বের করলেন তাতে একটা উপন্যাসও শুরু করে দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি কিন্তু তাই বলে যে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে হাত পা ছড়িয়ে লিখতে বসতে পারলেন তা নয়। দাদার টাকায় কাগজ বেরোল বটে কিন্তু অর্থকষ্ট আগের মতনই থেকে গেল অধিকন্তু জুটল এসে কাগজ নিয়ে নানা ভাবনা, চালু কাগজগুলির তরফ থেকে প্রতিযোগিতা প্রতিবন্ধক। সে-যদি বা সহ্য করে নিলেন তিত-বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি সেনসরশিপের জ্বালায়। একজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী যে-কাগজের কর্ণধার সে-কাগজের ওপরে সরকারের শ্যেনদৃষ্টি থাকবেই। জারের জানতে বাকি নেই মিখাইল নামেমাত্র সম্পাদক, ফিওদরই সব অতএব মাঝে মাঝেই ডাক পড়ে তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে। আর ডাক পড়লে রক্ষে নেই তক্ষুনি সব কাজ ফেলে ছুটতে হয় সেখানে।

সে-দিন সে-উদ্দেশ্যেই তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন।

ক'দিন ধরেই রাতদিন তুষার-বৃষ্টি হচ্ছিল। পিতার্সবুর্গের রাস্তাঘাট বরফের স্তূপের নিচে তলিয়ে আছে। বরফ সরিয়ে রাস্তা সাফ করতে গিয়ে রাস্তার দু' পাশে মানুষ-সমান উঁচু বরফের পাহাড় বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। মাথার টুপিটা কপালের ওপরে টেনে দিয়েছেন, অলস্টারের কলার দিয়ে কান ঢেকেছেন। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দ্রুত হাঁটছেন তিনি।

একটা পার্কের কাছে আসতেই তাঁর কানে গেল স্লোগান। একজন চেঁচিয়ে খানিকটা বলছে, একসঙ্গে অনেকগুলি গলা বলে উঠছে বাকিটুকু। পার্কে একপাল ছেলে জড় হয়েছে। পাশের রাস্তা ধরে আরও ছেলে আসছে পার্কের দিকে। এমন দিনেও সভা হবে। দেখে শুনে বুঝতে বাকি থাকে না, রাশিয়াব যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাওয়া বইছে বিবোধেব, বিদ্রোহের। গোটা শহরই সে উত্তেজনায় কাঁপছে। কিছু সংস্কার করে, সংস্কারের কিছু আশা দিয়ে নূতন জার দ্বিতীয় আলেকসান্দারই বুঝি এই আন্দোলনের মদৎ যুগিয়েছেন। তাঁর উদারতা ও প্রজারঞ্জন-ইচ্ছা এই চেহারা নেবে বুঝি বুঝতে পারেন নি জার। তাই সতর্ক প্রহরা সশস্ত্র হয়ে উঠেছে; গিস্‌গিস্ করছে পুলিশ, জনতা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলে তাদের শায়েস্তা করতে এতটুকু দ্বিধা দেরি করবে না তারা। তিনি যে দিকে তাকান দেখেন পুলিশ—পার্কের কোণায়, গাছের তলায়, রাস্তায়। আরও মিছিল আসবে বুঝি সেই অপেক্ষায় আছে তারা। দেখলেন একদল ঘোড়সওয়ার কসাক-সৈন্যও অদূরে প্রস্তুত হয়ে আছে।

একজন সারজেণ্ট এগিয়ে এসে দস্তয়েফ্‌স্কিকে বাধা দিল—'যাচ্ছ কোথায়?'

'চেরনিচেভ্‌ স্ট্রীটে।'

'সোজা নয়, পাশের রাস্তা ধর।' হুকুম করল সারজেণ্ট।

সেই পাশের রাস্তায় পা দিতে গিয়েই দেখা হয়ে গেল আদলফ্‌ তৎলেবেনের সঙ্গে।

'আরে! ফিওদর মিখাইলোভিচ না, তা হলে তুমি ফিরে এসেছ।' হাত বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল। দস্তয়েফ্‌স্কি সাগ্রহে বন্ধুর হাত টেনে নিলেন হাতে। কিন্তু বন্ধুত্বের বোধটা কতিপয় মুহূর্তের বেশী মনের মধ্যে জায়গা পেল না। তৎলেবেনের সযত্ন কামানো মসৃণ গাল, ঐশ্বর্য-লালিত নিটোল স্বাস্থ্য আর জেনারেলের ঝকঝকে তকমা তাঁকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। নিজের দারিদ্র্য-

পীড়িত জীর্ণ চেহারা আর সস্তা পোশাকের কথা ভেবে নিজেকে বড় হীন মনে হল তাঁর। ধনী রাজপুরুষের প্রতি উষ্মায় ভবে উঠল মন। যে-সব প্রভাবশালী ব্যক্তির চেষ্টা তাঁর পিতার্সবুর্গে আসার পথ সুগম করেছে তৎলেবেন তাঁদের একজন তবু তৎক্ষণাৎ তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করলেন তিনি বরং ঘৃণাই প্রকাশ করতে যেন ইচ্ছে করছিল তাঁর। এই ছিল দস্তয়েফ্‌স্কি চরিত্রের আর এক দিক—কেউ উপকার করলে, কদাচিৎ দু'একজন ছাড়া, কাউকেই বড় একটা সহ্য করতে পারতেন না। উপকার করে মানুষটা তাঁকে তাঁর চেয়ে ছোট মনে করছে চিন্তা করে তাঁর মন বিদ্বেষে ভরে উঠত। তিনি উপকারীর চেয়ে যোগ্যতায় কোন অংশে খাটো নন বরং সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ এ-বোধ উপকারীর প্রতি তাঁকে উদ্ধত করে তুলত। তাঁর চরিত্রের এই শ্রেয়োমন্যতা-দোষের জন্যেই জীবনে কোন দিনই তিনিই বেশী বন্ধু পান নি, কেবল শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে গেছেন সারা জীবন।

দস্তয়েফ্‌স্কি যেই দেখলেন তাঁর মনের সেই অসামাজিক বোধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে তাড়াতাড়ি তিনি অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, নরম গলায় বললেন, 'তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ ভাই, কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি পিতার্সবুর্গে এসেই তোমার খোঁজ করেছি, ক'মাস ধরেই খুঁজছি তোমাকে। দেখা পাই নি। কোথায় ছিলে তুমি?'

নির্জলা মিথ্যে কথা, তবু কাকতালিয়বৎ কাজে লেগে গেল। তৎলেবেন বললেন, 'আমি ত এখানে ছিলাম না, আমি ককেসাস গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল। খুব খুশী হলাম।'

তখন পার্ক থেকে একটা প্রবল জিগির উঠল—রুশ সোশ্যাল রিপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক।

দু'জনেই চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। তৎলেবেন বললেন—'সরকার বেশীদিন এ-সব সহ্য করবেন না। থাক, এস। তুমি কোথায় যাবে বলছিলে, স্বরাষ্ট্র দফতরে? আমিও যাচ্ছি ওদিকেই, আমি সামরিক দফতরে যাব। আমার গাড়ি রয়েছে। ওই যে গাড়ি। চল আমি তোমাকে একটা লিফ্‌ট দেব।'

দস্তয়েফ্‌স্কি পাছে আপত্তি করেন, তিনি তাঁকে হাত ধরে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে এলেন। তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পাশে বসে বললেন—'এবার বল, কি ভাবে কী হল?'

দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন—'আমার আবেদন-নিবেদনে আর তোমাদের চেষ্টার ফলে সরকার আমাকে সামরিক বিভাগ থেকে অব্যাহতি দিলেন, আমাকে আসতে দিলেন ৎভের পর্যন্ত। ৎভের ভাল লাগছিল না তবু সেখানে এক বছর থাকতে হল তার পরে অনুমতি পেলাম এখানে আসবার। যে-মাটিতে আমি আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম নিন্দের আঘাতে আর ঋণের বোঝায় সে-মাটিতেই আবার এসে দাঁড়িয়েছি। জানি না আমার ভাগ্যে কী আছে।' দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি। মুখে একটা যন্ত্রণার হাসি ফুটে উঠল। 'তা সে যাই হোক, আমি আমার হারানো অধিকার ফিরে পেয়েছি। লিখবার অনুমতি পেয়েছি আবার। অবশ্য এ-সবই তোমার আর ভ্রাঙ্গেলের আন্তরিক চেষ্টায়। তুমি বোধ হয় জান না, আমি এর মধ্যেই একটা মাসিক পত্রিকা বের করে ফেলেছি। নাম দিয়েছি 'ভ্রেমিয়া'। বেশ চলছে কাগজটা। আমি একটা নতুন উপন্যাস শুরু করেছি তাতে, নাম দিয়েছি 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'। অবশ্য খুব সহজে চালাতে পারছি না কাগজটা। সেনসরশিপের ধাক্কায়ই হিমসিম খাচ্ছি কেবল। মাসের মধ্যে সতরবার ছুটতে হয় স্বরাষ্ট্র দফতরে।'

দস্তয়েফ্‌স্কির কথা শুনতে শুনতে তৎলেবেন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তা বিয়ে করেছ ক'দিন হল?'

'বছর তিন।' জবাব দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

এখন সেই বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়েই নানান কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলেন তৎলেবেন। ভ্রাঙ্গেলের কাছে তাঁর প্রেমের ব্যাপার হয়ত কিছু শুনে থাকবেন তিনি তাই আলোচনাটা ক্রমশ ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে থাকল। কিন্তু তৎলেবেনের কৌতূহল নিবৃত্তি করতে ক্রমশই দস্তয়েফ্‌স্কি মনের মধ্যে একটা প্রবল অনীহা বোধ করতে লাগলেন।

নেভার পাড় দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। ধোবানীরা কাপড় কাচছে। গরু ভেড়াকে জল দিচ্ছে চাষী। এক জায়গায় একটা মাল বোঝাই গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যের দল। নদীতে কাঠ বোঝাই নৌকো বেয়ে যাচ্ছে মাঝিরা—এ-সব ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে অন্যমনস্ক হতে চাইলেন দস্তয়েফ্‌স্কি কিন্তু যে উষ্মা ও বিরক্তি মনের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল তাকে থামাতে পারছিলেন না। বুঝি ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠতেই সংযম হারিয়ে ফেললেন তিনি।

তখন দস্তয়েফ্‌স্কির প্রসঙ্গ ছেড়ে নিজের প্রসঙ্গে এসেছেন তৎলেবেন, সামরিক

বিভাগের কথা বলছিলেন তিনি, বলছিলেন তাঁর নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। হঠাৎ দস্তয়েফ্‌স্কির কপাল কুঁচকে উঠল, বলে উঠলেন, 'এখানেই আমাকে নামিয়ে দাও ভাই, বাকি পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারব, আদলফ্‌ ইভানোভিচ্‌।' অসন্তোষটা সোচ্চার গলাতেই প্রকাশ করলেন তিনি, 'কেউ আমাকে কৃতার্থ করছে, আমাকে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র করছে ভাবলে বড্ড ঘৃণা হয়, মনে হয় এটা একটা জঘন্য অপমান।' তিনি কোচমানকে গাড়ি থামাতে বললেন।

তৎলেবেন বোকার মতন তাকিয়ে থাকলেন, ঠিক শুনেছেন কিনা সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলেন—'কী বললে?'

দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দিলেন না। তাঁর নিচের ঠোঁটের একটা সরু শিরা কেঁচোর মতন পাক খাচ্ছে টের পেলেন।

তৎলেবেন বুঝলেন তিনি শুনতে ভুল করেন নি তাঁর মুখ চোখ গরম হয়ে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি বোধ হয় টের পেলেন তিনি অন্যায় করেছেন তাই গলা নরম করে বললেন, 'আচ্ছা যাই' এবং এটুকু বলেই থামতে পারলেন না, যোগ করে দিলেন 'আবার আমাদের দেখা হবে।'

ক্রুদ্ধ লাল মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন তৎলেবেন, কোন জবাব দিলেন না।

তৎলেবেনের মনে আঘাত দিয়ে মুহূর্তের জন্যে দস্তয়েফ্‌স্কির খুব অনুশোচনা হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, না, তিনি কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে থাকতে ফিরে আসেন নি পিতার্সবুর্গে। তিনি কারো থেকে ছোট নন, অনুগ্রহভাজন নন, তিনি এই সব বালখিল্যদের থেকে অনেক অনেক বড়, তিনি রাশিয়ার সূর্য। হ্যাঁ, রাশিয়ার আকাশে সূর্য হয়েই জ্বলবেন একদিন অতএব গোড়া থেকেই মাথা খাড়া করে দাঁড়াবেন বই কি, উন্নত শির ঊর্ধ্বে তুলে রাখবেনই ত। সুতরাং 'আবার দেখা হবে' কথাটার মধ্যে যে দীনতা সেইটে নতুন করে বিঁধল তাঁকে, ওই কথা বলার জন্যে অনুশোচনা হল; কিন্তু এ বিষয়ে বেশিক্ষণ মন নিবিষ্ট রাখতে পারলেন না।

তৎলেবেন তাঁর মনের মধ্যেকার একটা মস্ত ঘা-কে ঘেটে ঘেটে রক্তাক্ত করে দিয়েছেন। বিবাহিত জীবনের যন্ত্রণাটা চনচনিয়ে উঠল তাঁর মনে। হা ঈশ্বর তিন তিনটা বছর! দস্তয়েফ্‌স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আহ্‌ তিনি যদি আগে জানতেন তাঁদের বিয়ের এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটবে। না তাঁরা কেউই

এ-বিয়েতে সুখী হতে পারেন নি। পিতার্সবুর্গ অব্দি অনুসরণ করে এসেছে ভারগুনফ্। ভারগুনফের সঙ্গে মারিয়ার সম্পর্কটাকে তিনি মেনেই নিয়েছেন, না মেনে নিয়ে উপায়ই বা কী ছিল। বিয়ে ত কয়েদ করা নয়। দেহে মনে একজন আর একজনের গোলাম হয়ে থাকবে বিয়ের উদ্দেশ্য কখনই তা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। একজনের স্বাধীনতায় আর একজনের হস্তক্ষেপের কোন এক্তিয়ার নেই, স্বামী স্ত্রী হলেও না। বিয়ের পবিত্র সম্পর্ক আর তার নিহিত তাৎপর্য রয়েছে সন্নিষ্ঠ ভালবাসায়। আসলে ভালবাসাই বিয়ের যথার্থ বন্ধন। সেই ভালবাসাই যদি না থাকল ত বিয়ে স্বতঃই বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন; সে-অর্থে আজ তাঁরা সত্যি বিচ্ছিন্ন। কেবল ডিভোর্সটা হয় নি এই যা।

ভারগুনফ্কে তিনি দোষ দেন না। বস্তুত তাঁদের মধ্যে বিয়ের পবিত্র সম্পর্ক আদপেই গড়ে ওঠে নি, গড়ে উঠতে পারে নি। বিয়ের রাতে বারনুলে তাঁর সেই মৃগীর ভয়ংকর আক্রমণটাই তার জন্যে দায়ী, তার জন্যেই তাঁদের মধ্যে আত্মিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার আগেই ব্যাহত বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেদিনের সে-বীভৎস দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মারিয়া মনের মধ্যে যে কঠিন আঘাত পেয়েছিল, যে ঘৃণা জেগেছিল তার মনে, তাঁদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার সেই মূল হেতু, এর জন্যে তিনি দোষ দেবেন কাকে!

ক্রমে ক্রমে ঘৃণা বিদ্বেষই পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে মারিয়ার মনে। এখন কথায় কথায় ঝগড়া শুধু, বিশ্রী কথা কাটাকাটি আর মনোমালিন্য কেবল। মারিয়া কখনোই তাঁকে বুঝতে চায় নি বুঝতে পারে নি। খাপ খাইয়ে নিতে পাবে নি তার প্রবহমান উদ্দীপনার সঙ্গে, তার বহুমুখী প্রবণতার সঙ্গে—তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্যতা, তাঁর প্রখর সংবেদনশীলতা সর্বোপরি তাঁর ব্যাসন-বাসনার সঙ্গে। বিবাহিত জীবনের সুখসচ্ছলতা আরাম, সংসারের বহিরঙ্গের দিকেই মারিয়ার ঝোঁক। তরলমতি সে, জীবনের গভীর উপলব্ধি ও তাৎপর্যের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। কোথায় যেন তার জীবনের মূলেই রয়েছে একটা ক্রোধ ঘৃণা, নিজেকে শুদ্ধ আর সব কিছুকে নষ্ট নস্যাৎ করে দেওয়ার নিষ্ঠুর ইচ্ছে।

শান্ত মুহূর্তগুলিতে তাঁদের মধ্যেকার অনৈক্য অসন্তোষ ও বৈষম্যগুলি ঘরের আবদ্ধ বাতাসে আর্দ্রতার মতন অদৃশ্য থাকে, তবু তখনও সে আর্দ্র বাতাসে বিদ্যুৎ সঞ্চারের ভয় থাকে। একটা সামান্য কথায় কি অতি তুচ্ছ কারণে

বেধে যেতে পারে সংঘাত কড়কড় আওয়াজ উঠতে পারে, বিদ্যুৎ চমকাতে পারে, পড়তে পারে বাজ।

ঝগড়ার সময় তাঁদের জিভের আর লাগাম থাকে না। যা মুখে আসে বলে একজন আর একজনকে। মারিয়া তিক্ত কণ্ঠে অনুযোগ দেন—'তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দেন—'তুমি যে একটি সুখের পায়রা সে কী আমি আগে জানতাম।'

ঝগড়াটা সাধারণত মারিয়াই বাধান প্রথম। কখনো ক্লান্ত, কখনো চিন্তান্বিত, কখনো সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন দস্তয়েফ্‌স্কিকে টেরা বাঁকা তিক্ত কথায় উত্তেজিত করতে থাকেন। নিজেকে শান্ত স্থির রাখার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাঁরও মাথায় তখন খুন চাপে, কিন্তু খুন করতে পারেন না বলেই তখন তাঁরও আর সংযম থাকে না জিভের। তিনিও তখন নোংরা ভাষায় তাঁকে অনর্গল গাল পাড়তে থাকেন। সেই মর্মান্তিক ঝগড়ার শেষ হয় মারিয়ার চোখের জলে। তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে কাঁদতে বসেন, আর দস্তয়েফ্‌স্কি দাঁতে দাঁত চেপে মৃতের মতন বিবর্ণ হয়ে বসে থাকেন আর এক কোণে। যে দুটি প্রাণ পরস্পরের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারতেন, এভাবে তাঁরা এক ছাদের নিচে এক ঘরের দুই প্রান্তে নির্বাসিত হয়ে থাকেন। কিছু দিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে তার পরে আর এক দিন আবার বেধে যায় কুরুক্ষেত্র। ফলে মারিয়া ক্রমশ হয়ে উঠেছেন খিটখিটে বেড়ালের মতন বদমেজাজী, আর দস্তয়েফ্‌স্কি ক্রমাগত ভুগে চলেছেন মৃগী রোগে। মৃগীর আক্রমণ এক একবার এমন সাংঘাতিক হয় যে তিনি দু'তিন সপ্তাহ আর বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। রোগ ঋণ আর মানসিক সন্তাপ নিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েন দস্তয়েফ্‌স্কি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন—আমারই দোষ, সচ্ছল সুখী জীবনের লোভ দেখিয়ে আমি তাকে বিয়ে করেছি। সম্ভ্রান্ত সমাজের দশজনের একজন হওয়ার আশা নিয়ে মারিয়া আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, আমি তার কোন আশাই পূর্ণ করতে পারি নি। ছোট একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্দিনী সে কেবল দৈন্যের দাহে পুড়ছে। তার রাগ তার অসন্তোষ স্বাভাবিক। অনুশোচনা হয় দস্তয়েফ্‌স্কির, আপসোস করেন তিনি। আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিযোগ অভিমানও মাথা খাড়া করে ওঠে তাঁর মনের মধ্যে—একী অদ্ভুত মহিলা, এতটুকু সহমর্মিতা সহানুভূতি নেই; অসহিষ্ণু মানুষটা কেবল নিজের কষ্ট, নিজের দুঃখটাকেই বড় করে দেখে, দেখে না যে আর

একজনও সমান দুঃখ সমান কষ্টই ভুগছে। সে কিছু তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে দূরে মজা করে বেড়াচ্ছে না। দেখ, লোকটা যে-সাধনায় প্রাণপণ করেছে তাতে সিদ্ধি লাভ করে কিনা, না, সে ধৈর্য সে সহিষ্ণুতা নেই মহিলার। অথচ সে আমার সহধর্মিনী, তাকে পাশে পেলে, বুকে পেলে আমি বল পাব প্রেরণা পাব, আমার সাধনা সত্য হয়ে উঠবে—কত আশাই না করেছিলাম!

বুকশূন্য করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। গা-ঝাড়া দিয়ে চারিদিকে তাকালেন তিনি। তুষার বর্ষণের কামাই নেই। আকাশ-মাটি জুড়ে যেন একটা ধূসর পর্দা টাঙ্গানো। তাঁর জীবনটাও এমনি একটা ধূসর তুষার প্রান্তর। যতদূর চোখ যায় সব শূন্য ফাঁকা। ক্লান্তি অপনোদন করবেন একটু জুড়িয়ে নেবেন তেমন একটি উষ্ণ আশ্রয় নেই কোথাও। একমাত্র আশ্রয় আজ তাঁর 'ভ্রেমিয়া'। 'ভ্রেমিয়া'ই আজ তাঁর বেঁচে থাকার প্রেরণা। শুধু তাই নয় আর্থিক ও আত্মিক অবলম্বনও বটে।

সরকারি দফতরখানায় পৌঁছে একটা অপরিচ্ছন্ন করিডোর পেরিয়ে একটা অগোছাল ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বুরো অব পাবলিকেশনের জেনারেল কাউনসিলরের ঘরের দরজায় আরও কয়েকবার ধর্ণা দিতে হয়েছে তাঁকে। এবারকার ব্যাপারটা তুচ্ছ। 'ভ্রেমিয়া'র পাবলিকেশন সারটিফিকেটটা দেখতে চেয়েছেন সাহেব। অকারণ হেনস্তা ছাড়া এ আর কিছু নয় অথচ পিতার্সবুর্গের সব প্রকাশককেই এই ধ্যানতারা পোহাতে হয়। দস্তয়েফ্স্কি একজন কেরাণীর হাতে কাগজটা তুলে দিয়ে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলেন। মস্ত গোঁফওলা একটা লোকও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকলো ঘরে। সে বসল না। দস্তয়েফ্স্কিকে দেখল দু' পলক তারপর বেরিয়ে গেল। জন ছয় লোক মস্ত ঘরটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বাইরে তাকালেন। তুষার-বৃষ্টির বিরাম নেই। বন্ধ কাচের জানালাগুলির অর্ধেকটাই বরফে ঢাকা। ঘরে সন্ধ্যায় অন্ধকারের মতন অস্পষ্ট আলো। তিনি সবাইর থেকে দূরে কোণে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। পিঠ ঠেকিয়ে দিলেন দেয়ালে। এখানে অনেকক্ষণ বসতে হবে।

শিল্পই শিল্পীর আশ্রয়। মুক্তি। ঋণ রোগ দাম্পত্য-অশান্তি তপ্ত মাটি থেকে অনেক উঁচুতে সেই শিল্পলোকে পৌঁছতে পারে না। বেঞ্চিতে বসেই তিনি তাঁর সদ্য আরব্ধ উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। কাহিনীটা ভাল করে না ভেবেই তিনি 'ভ্রেমিয়া'তে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসটি ছাপতে সুরু করে দিয়েছেন।

এখন অবসরে অন্যমনে কেবল উপন্যাসটির কথা চিন্তা করেন। মনের মধ্যে বারে বারে লেখেন কাটেন সাজান, আবার নূতন করে লেখেন। এ-উপন্যাসটির সাফল্যের ওপরেই তাঁর ভবিষ্যৎ। এ যদি বাজে হয়ে যায় ত তিনি স্বখাত সলিলে ডুবে যাবেন। সুতরাং এ-উপন্যাস নিয়ে তাঁর ভাবনার অবধি নেই।

এ-সময়ে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আমার ভাই এখন রীতিমত জ্বর-অবস্থা। কারণটা আমার উপন্যাস।...আমার সাহিত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর সাফল্যের ওপরে।"

আগেই বলেছি মারিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ঘটিত অভিজ্ঞতাই 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। তাঁর প্রণয় জীবনের সেই গোড়ার কথা বলতে বসে নিজের চরিত্রকেই তিনি মর্গের বিগতস্পৃহ ডাক্তারের মতন যদৃচ্ছা ছুরি চালিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তদর্থে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের বক্তা দরিদ্র ভানিয়া (ইভান পেত্রোভিচ=দস্তয়েফ্স্কি। নাতাশা ইখমেনেভা= মারিয়া। আর প্রিন্স ভালকফ্স্কির রূপবান ছেলে আলিওশা=ভাবগুনফ্।)

এ-বইয়ের মূল্য বক্তব্য: সুখের পথ দুঃখে আকীর্ণ। নায়িকা নাতাশা বলছে, 'ভানিয়া, দুঃখের মূল্যে সুখ কিনতে হবে আমাদের। দুঃখের চোখের জলে ধুয়ে সব যন্ত্রণা পবিত্র হয়।...আঃ, ভানিয়া, জীবন জুড়ে কত দুঃখ, কেবল দুঃখ। বুঝি দুঃখ দিয়েই জীবন গড়া।'

দস্তয়েফ্স্কি যেন বলতে চান, প্রেম আসলে এক মহৎ দুঃখেরই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। দুঃখের আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে ওঠাই প্রেম।

প্রেমের যে ত্রিকোণ সমস্যা ছিল মানুষ দস্তয়েফ্স্কির ব্যক্তিগত যন্ত্রণার বিষয়, শিল্পী দস্তয়েফ্স্কির হাতে তাই হয়ে উঠল দুঃখের দহনে খাঁটি সকল মানুষের চিরন্তন প্রেমের কাহিনী।

দস্তয়েফ্স্কি এই প্রথম নিজের বীণায় আপন সুরে আলাপ শুরু করলেন। ফলত তাঁর নিজের চরিত্রের মতনই জটিল হয়ে উঠল 'অপমানিত ও লাঞ্ছিতে'র প্লট ও কনটেনট। চরিত্রগুলিও কেউ সহজ রইল না। সকলেই দ্বিধা-দীর্ণ একযোগে দ্বৈত-বোধের কবলে পিষ্ট ও পীড়িত।

কাহিনীর নায়ক ও বক্তা ইভান পেত্রোভিচ হাসপাতালে রোগ-শয্যায় শুয়ে

শুয়ে সময় কাটানোর জন্যে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিতে'র কাহিনী লিখছে। লিখতে লিখতে সে এক জায়গায় মন্তব্য করছে: সে মরে গেলে তার এই পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি তার নার্সটির হাতে পড়বে। তাতে করে তার খুব উপকার হবে। গঁদ দিয়ে এই পাতাগুলি দরজা জানলায় সেঁটে দিলে নিদারুণ শীতেও তার আর ডবল পাল্লা লাগাতে হবে না।'

এ-মন্তব্য থেকেই অনায়াসে চেনা যায়, ইভান পেত্রোভিচ্ আসলে দস্তয়েফ্স্কি চরিত্রেরই দুর্বল অংশের চিত্র। ১৮৪০-এর দশকে যে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে তিনি ভুগেছেন ওই উক্তি তারই দীর্ঘশ্বাস। যে চারিত্রিক দার্ঢ্য ও স্থিতিস্থাপকতার শক্তি ব্যাধি, দুর্ভাগ্য ও হতাশার হাত থেকে তাঁকে পুনঃপুন রক্ষা করেছে, সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও জুগিয়েছে বল, নিজের চরিত্রের সে-দিকটি ইভানের চরিত্রে দেখান নি দস্তয়েফ্স্কি। তিনি তাঁর মৌল স্বভাবেরই একটা দুর্বল দ্বিধা-পীড়িত দিকের প্রতীক করেছেন ভানিয়াকে (ইভান পেত্রোভিচ্‌কে)।

ভানিয়া একজন লেখক। ভানিয়ার লেখক-জীবনের প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর নিজের লেখক-জীবনের প্রথম অধ্যায়ের কথাই বলেছেন। সেদিনকার দৈন্য, দুঃখ ও অসুখের কথা ভানিয়ার জবানীতে দলিল হয়ে আছে এ-উপন্যাসে। 'অভাজন' লিখে তিনি খ্যাতির যে শিরোপা পেয়েছিলেন সে-কথা যেমন স্বচ্ছন্দে লিখেছেন তেমনি 'দ্য ডবল' লিখে যে নিন্দা কুড়িয়েছেন ও তজ্জনিত নৈরাশ্যে ভুগেছেন অনায়াসে সে-কথাও স্বীকার করেছেন। বস্তুত মরার পরে তাঁর পাণ্ডুলিপির কাগজ দিয়ে দরজা জানলার ফুটো ফাটা বন্ধ করা হবে বলে তিনি সেদিনেরই নৈরাশ্য ও মর্মপীড়া প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি মারিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসাই যে নাতাশার প্রতি ভানিয়ার ভালবাসা হয়ে উঠেছে সে কথা আগেই বলেছি। তবু 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাস মারিয়া-দস্তয়েফ্স্কি প্রেমোপাখ্যান নয়; বরং সে-আধারে অধরা আরও অনেক কিছু ধারণ করে আছে উপন্যাসটি।

এই বই নিয়ে সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন নি কোন দিন, বইখানিকে দস্তয়েফ্স্কির দুর্বল রচনার পর্যায়ে ফেলে অবহেলাই করে গেছেন বরং। তার কারণ অবশ্য তাঁর পরবর্তী কালের অসামান্য সৃষ্টিগুলি। সেগুলির সাফল্য যদি চিরন্তনকে স্পর্শ না করত ত নিঃসন্দেহে এ-বইখানিই সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসার বিষয় হয়ে উঠত, কেন না 'অভাজন' থেকে সেমিপালাতিন্স্ক্-এ বসে লেখা উপন্যাসগুলি অব্দি তাঁর লেখাগুলির মধ্যে এটিই সবার সেরা। কিন্তু 'জাপিসকি ইজ পদ্‌পল্যে' (নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডার গ্রাউণ্ড) থেকে সুরু করে

'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' পর্যন্ত রচনাগুলির তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ। তৎসত্ত্বেও প্রণিধানযোগ্য; কেন না পরবর্তী শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির প্রতিবেশ পরিপ্রেক্ষিত, বিষয়-বিন্যাস, রচনা-শৈলী, চরিত্র-চিত্রণ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ সব—সমস্তরই প্রথম স্ফুরণ বা পূর্বাভাষ রয়েছে এ-বইতে। প্রেমের কোমল কান্তকাহিনী দস্তয়েফ্‌স্কির হাতে ভাল আসে না, তিনি সে-চেষ্টাও করেন নি, কেবল এ-বইখানি সেদিক থেকে তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সফল ব্যতিক্রমও বটে।

সনাতন ছকে বাঁধা ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী এটা নয়। অননুকারী শিল্পী বহু ব্যবহৃত সে সহজ পথে জান নি। নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছেন—উপন্যাসটিকে তিনি এক জটিল চতুষ্কোণে পরিণত করেছেন। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে তিনি একটা বৃত্তের আবর্তের মধ্যে পড়েছেন; সে-বৃত্তও যেন আসলে একটা পাপ-চক্র।

ভানিয়া নাতাশা ইখ্‌মেনেভাকে ভালবাসে। নাতাশা তার ছোটবেলাকার খেলার সাথী। সেই থেকে টান। আস্তে আস্তে সে-টান একদিন তন্ময় প্রেমে পরিণত হয়। নাতাশাও সর্বান্তঃকরণে সাড়া দেয় সে-প্রেমে। তবু ঘটনাচক্রে নাতাশা প্রিন্‌স ভালকফ্‌স্কির সুরূপ ছেলে নওল যুবক আলিওশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে-কথা সে ভানিয়ার কাছে স্বীকারও করে যেহেতু সে জেনে গিয়েছিল, এ-শরণাগত প্রেমিক ভালবাসা দিয়েই সুখী, প্রতিদান প্রত্যাশা নেই তার মধ্যে। যে আগ্রাসী প্রেম পুরুষের স্বভাবে স্বাভাবিক, ভানিয়ার মধ্যে তার ঐকান্তিক অভাব। এর জন্যে ভানিয়ার প্রতি নাতাশার বরং শ্রদ্ধাই বেশী, অনেক বেশী নির্ভরতা—এমন মানুষকে না ভালবেসেও পারা যায় না। অথচ যেন প্রত্যাশাহীন শরণাগত বলেই তাকে করুণার চোখে দেখে নাতাশা। আলিওশার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে তার সাহায্য নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ভানিয়াও নির্বিকার অকুণ্ঠিত মনে এগিয়ে আসে। সে তাকে বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করে। একা এক বাড়িতে পলাতক দিন যাপনের সময় তার দেখাশোনা করে। নাতাশার সঙ্গে আলিওশার যোগাযোগ রাখে, তাদের চিঠি পত্র আদান-প্রদান করে—আলিওশার হাতে নাতাশাকে তুলে দেওয়াই যেন হয়ে ওঠে তার ব্রত, এক পবিত্র দায়। এ-দায় সম্পন্ন করা ভানিয়ার পক্ষে প্রিন্‌স ভালকফ্‌স্কির বাধা সত্ত্বেও খুব একটা অসুবিধা হত না, যদি না আলিওশা আবার এক ধনী সপ্তদশী সুন্দরীকে ভালবেসে ফেলত।

দস্তয়েফ্‌স্কি রচিত সমগ্র চরিত্রের মধ্যে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-এর আলিওশা

একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম। আলিওশা যেন একটি চির-শিশু চরিত্র। এর যেন নিজের কোন ইচ্ছা-শক্তি কি ব্যক্তিত্ব নেই। সুন্দর সুঠাম এই যুবকের বালকোচিত মসৃণ লাবণ্যের প্রতি সব যুবতীই আকৃষ্ট হয়। অতি অনায়াসে একরকম বিনা চেষ্টায় মেয়েদের মন জয় করে ফেলে সে এবং যাকে যখন ভালবাসে সর্বান্তঃকরণেই ভালবাসে। এমনি তার স্বভাব যে, জয় করতেও যেমন তার বেশী সময় লাগে না, ভুলে যেতেও সে তেমনি সহজেই পারে। একানুরক্ত থাকার মতন মনের স্থৈর্য তার নেই, মনের ওপরে সে জোরও না। তা ছাড়া ভালবাসা তার কাছে কোন ইচ্ছার ব্যাপারও না। সে একটা স্বতঃস্ফূর্ত বোধ, যাকে যুক্তি দিয়ে সংযত করতে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে সে জানে না। আসলে কোন সুন্দর মুখ যদি তার মনে ছাপ ফেলে ত সে মুখের জন্যে সে এমনই দুর্নিবার টান বোধ করে যে, তার কাছে যুক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি সব দুর্বল অসহায় হয়ে পড়ে, কিংবা ওগুলো তার নেই যেমন শিশুর থাকে না। অথচ যখন সে যার প্রেমে পড়ে তখন তার প্রতি প্রেমে তার কোন খাদ থাকে না। শিশুর অকপট হৃদয় দিয়েই সে তাকে ভালবাসে। ভালবেসে সে তার সমস্ত গুণগুলিকে আসন করে পেতে দেয় তাকে। আলিওশা উদার, সহৃদয়, দয়ালু; ত্যাগ স্বীকার করার বেলাতেও তার ইচ্ছার মধ্যে কোন কপটতা থাকে না। নাতাশাকে সে যখন যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অকপটেই দিয়েছে—চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে নি সে ভিন্ন কথা। অবশ্য সে যে স্বার্থ সচেতন নয়, তাও না। কিন্তু সে স্বার্থপরতার পেছনে কোন মতলব থাকে না তার। মতলব আঁটতেও সে জানে না। তার আর একটা সমস্যা সে বুঝে উঠতে পারে না ভালবাসার এমন অপরিসীম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এক সঙ্গে সব মেয়ের সঙ্গে কেন সে প্রাণ ভরে প্রেম করতে পারে না। দু' হাতে শিশুর এক সঙ্গে সবকিছু ধরার চেষ্টা যেন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এ-সব চরিত্রকে রক্ত মাংসে জীবন্ত করে উপস্থিত করা, সন্দেহ নেই, একটা খুব জটিল কাজ।

আলিওশা নাতাশা ও কাতিয়া দু'জনকেই আত্যন্তিক ভালবাসে। সে ভালবাসা এমন যেন দু'জনকে একযোগে পেলেই সে যথার্থ সুখী হয়। সে ত আর সম্ভব নয়। অন্যপক্ষে এই দুই যুবতী দুই ভিন্ন ধাতুর মানুষ। ধনীর মেয়ে সপ্তদশী কাতিয়া অতিশয় সরল মেয়ে। সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা সে। আলিওশার জন্যে গৃহত্যাগী নাতাশার দুঃখ তাকে খুবই ব্যথিত করে। সে

চায় আলিওশা নাতাশাকেই বিয়ে করুক। আলিওশাকে পেয়ে সুখী হোক, দুঃখ ঘুচুক নাতাশার। কিন্তু নাতাশা যাকে জয় করতে চেয়েছে তাকে ভিক্ষা করে পেতে চায় না, কাতিয়ার হাতেই তুলে দিতে চায় সে তার প্রিয়কে। চরম ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত দুই প্রতিযোগিনীকে নিয়ে প্রেমের ত্রিকোণ সমস্যা সহসা চতুষ্কোণ হয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করে দেয়। পাঠক আরো বিমূঢ় হয় যখন নাতাশার মা-বাবার সমান্তরাল এসে দাঁড়ায় স্মিথ ও তার মেয়ের কাহিনী। স্মিথের মেয়ে তেরো বছরের নেলী হেঁয়ালীর মতন আচার-আচরণ, ভানিয়ার প্রতি তার প্রেমের উদ্রেক, কাহিনীর মূল চরিত্রগুলির সঙ্গে ভালকফ্‌স্কির যোগাযোগ,—সর্বোপরি শিথিল-চরিত্র মাসলোবোত্রভের ষড়যন্ত্র আর নেলীর গলায় বাঁধা চিঠি রহস্যকে আরও জটিল ছমছমে করে তোলে। কাহিনীর জট খোলে আলিওশা-কাতিয়ার বিয়ে ও নেলীর মৃত্যুতে। শেষ পর্যন্ত নাতাশা ও ভানিয়ার ভাগ্যে কী ঘটল আমরা জানছি না—উপন্যাসখানিতে অসম্পূর্ণতার এই দুর্বলতা ছাড়া আর কোন ক্রটি নেই। উপন্যাসের জন্যে প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে তিনি জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন; এই জীবন দেওয়ার কারিগরীতে দস্তয়েফ্‌স্কির কুশলতা অস্বীকার করার উপায় নেই! তাঁর পরবর্তী মহৎ ও বৃহৎ উপন্যাসগুলির বিশাল ছায়ার নিচে এ-উপন্যাসখানি উপেক্ষিত হয়ে আছে বলে এর উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় নি।

নারী-চরিত্র বিশ্লেষণে ও তাদের দ্বান্দ্বিক হৃদয় উন্মোচনে যে আশ্চর্য দক্ষতা পরবর্তী মহৎ উপন্যাসগুলিতে দেখিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'খুড়োর স্বপ্ন' উপন্যাসের মারিয়া আলেকসান্দ্রভনা মস্‌কালিওভা ও তার মেয়ে জিনার মধ্যে যাকে প্রথম আভাসিত হয়ে উঠতে দেখি আমরা, আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা নাতাশা ইখমেনেভার চরিত্রে তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে।

যে কোন উপন্যাসেরই আসল বিষয় হল চরিত্র। কাহিনীর বিন্যাস-কৌশল ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য যত দক্ষই হোক, রচিত চরিত্র সুচিত্রিত না হলে সবই মিথ্যে। আবার চরিত্র সুচিত্রিত হলেই হল না; লেখককে অবশ্যই তার মানস-মানুষদের নিহিত-অস্তিত্বকে উন্মোচন করে দেখাতে হবে—দেখাতে হবে, তাদের চিন্তা-ভাবনা তাদের কর্মে ও আচরণে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। নিরীক্ষার এই কষ্টিপাথরে যাচাই করলে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের সব ক'টি চরিত্রই সার্থক এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু মূল কয়েকটি চরিত্রের অসামান্য সাফল্যই যে উপন্যাসখানিকে সার্থক করেছে সেও ত অস্বীকার করার উপায় নেই।

দ্বিধা-দীর্ণ মানুষের চরিত্র আঁকতে লেখকের দক্ষতা এ-উপন্যাসে দেখতে পাই ভানিয়া, আলিওশা, নেলী ও নাতাশার মধ্যে। নাতাশাই তাঁর এ-অব্দি লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে সফল দ্বিধা-দীর্ণ নারী-চরিত্র। নাতাশা-জাতীয় নারীর মধ্যে ভালবাসা সব সময় কখনো এক ধাঁচের হয় না। ভালবাসা হয় শরণাগতি কিংবা প্রভুত্ব, আবার প্রায়শই তাতে মাতৃসুলভ আবেগের প্রাধান্য থাকে। নাতাশার মতন মেয়েরা উল্লিখিত বিরুদ্ধ-আবেগের টানা-পোড়েনে জেরবার হয়। নিজে কষ্ট পায় প্রিয়জনকেও কষ্ট দেয়। আলিওশার সঙ্গে নাতাশার যখন শেষবারের মতন বিচ্ছেদ ঘটল, নাতাশা তার মনের অবস্থা এ ভাবে প্রকাশ করেছে—'শোন ভানিয়া, আলিওশার সঙ্গে আমার প্রেম সমানের সঙ্গে সমান প্রেম ছিল না। মানে সাধারণত মেয়েরা যেমন করে পুরুষকে ভালবাসে তেমন নয়। আমি তাকে মায়ের মতন, সম্পূর্ণ মায়ের মতন ভালবেসেছিলাম।'

অর্থাৎ দু'টি আত্মা এক হয়ে একটি শিখার মতন জ্বলবে, তাদের ভালবাসার মৌল লক্ষ্য ছিল না তা। এমন কি ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল না তার। এই অদ্ভুত ভালবাসা ছিল অনুকম্পা, আত্মত্যাগ, দুঃখবহন ইত্যাদির এক বিক্রিয়া। তার সঙ্গে সমানুপাতে মিশে গিয়েছিল প্রভুত্বের পিপাসা আর যন্ত্রণা দেওয়ার নেশা। নাতাশা তার দ্বিদল মনের যৌথ প্রবৃত্তি দিয়ে চেয়েছিল আলিওশার সর্বময় কর্ত্রী হতে, তার জীবনের সম্রাজ্ঞী হতে। এমন কি তাকে তার প্রেমের বলি করতে চেয়েছিল সে। যেহেতু সে তাকে ভালবাসে, সে চেয়েছিল, তাকে ভালবেসে সুখ, তাকে যন্ত্রণা দিয়ে সুখ—এ-ভাবে সে তার ধর্ষকামী ভালবাসাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল বলেই সে বুঝি প্রথমে তার শরণাগত হয়েছিল, নিজেকে বলিরূপে অর্পণ করেছিল তার কাছে। ধর্ষকাম ও মর্ষকাম দু-ই যাদের মধ্যে প্রবল, পরবর্তীকালের উপন্যাসে তাদের আঁকতে দস্তয়েফ্স্কি আরও সূক্ষ্ম আরও গভীর মনস্তাত্ত্বিক কলা-কুশলীর দক্ষতা দেখিয়েছেন। সে-সব অসামান্য নারী-চরিত্রের কয়েকটি 'জুয়াড়ী' উপন্যাসের পলিনা আলেকসান্দ্রভনা, 'ইডিয়েট' উপন্যাসের নাসতাসিয়া, ফিলিপোভনা, 'ডেভিলস্' উপন্যাসের লিজা আর 'ব্রাদার্স কারামাজোভ' উপন্যাসের গ্রুশেনকা, কাতারিনা ইভানোভা ও লিজা খোকলাকোভা।

দস্তয়েফ্স্কি যে শুধু নাতাশার দ্বিদল মনের ভালবাসার সংকটকেই খুঁটে খুঁটে এঁকেছেন তা নয়, তার চরিত্রের অন্য দিকগুলির দিকেও সমান দৃষ্টি রেখেছেন; অধিকন্তু, সে সব দিকেও দক্ষ কারিগরির সূক্ষ্ম কাজের পরিচয় দিয়েছেন।

নাতাশার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন সেই নারীসুলভ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা কথাটায় আপত্তি থাকলে বলব সহজাত জ্ঞান—যাতে করে সে যাদের মধ্যে আছে তাদের চরিত্রকে স্বচ্ছ চোখে দেখতে পায়, বুঝতে পারে সে কীসের ওপরে ভর করে আছে, কোথায় তার যথার্থ স্থান।

আলিওশার সঙ্গে নাতাশার অল্প দিনের পরিচয়, দীর্ঘ দিন ধরে তাকে নানা দিক থেকে দেখার সময় পায় নি সে, তৎসত্ত্বেও সে তার ডাকে বাপ-মাকে ছেড়ে চলে এসেছিল ; কিন্তু তাই বলে সেই হঠাৎ প্রেমের উজ্জ্বল আলোয় তার প্রজ্ঞার চোখ ঝলসে যায় নি, সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল ; তাই নির্দ্বিধায় ভবিষ্যৎ বাণী করতে পেরেছিল : 'হ্যাঁ, আমি তাকে পাগলের মতনই ভালবেসেছি, তোমাকে তেমন করে ভালবাসতে কখনোই আমি পারি নি ভানিয়া। আমি জানি আমার মাথার ঠিক নেই। তার প্রতি আমার এই ভালবাসার সবটুকুই ভুল। আমি যেমন করে তাকে ভালবেসে ফেলেছি তেমন করে ভালবাসা আমার অন্যায়··· শোন ভানিয়া, আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, খুব সুখের সময়েও আমি অনুভব করতাম, দুঃসহ দুঃখ ছাড়া আর কিছুই আমি তার থেকে পাব না। কিন্তু কী করব, বল ? তার দেওয়া সকল কষ্টই যে আমার কাছে সুখের বলে মনে হয়।···'

এই দুঃখের মধ্যে সুখের স্বাদ, এই মর্ষকামের তৃপ্তিই টেনে ছিল তাকে, সেই তাড়নাতেই ঘর ছেড়েছিল সে। এ যেমন সত্য তেমনি আর এক সত্য সেই বালসুলভ নেশা, যে নেশায় বালকেরা হাতের মুঠোয় প্রজাপতি ধরে বাখে। তার মনের গূঢ় অন্য আর এক সত্য হল নিজের প্রেমের মহিমায় মহৎ হওয়ার ইচ্ছে। অথচ যাকে নিয়ে তার সেই ইচ্ছে পূরণের দুঃখের খেলা, তার মনের বয়স তখনও বিয়ে করার মতন পরিণত হয় নি। যাকে যখন দেখে তখন ভাল লাগার বয়স তখন তার। তাই নাতাশাকে যেমন ভাল লেগেছিল তার, তেমনি ভাল লেগেছিল পিতার মনোনীত পাত্রী কাতিয়াকে। কিন্তু তার সেই নারী-প্রীতি এই দুজনকে পেয়েই তৃপ্ত শান্ত ছিল না। তার বন্ধুরা যেহেতু ভালবাসা-বহির্ভূত দেহ ভোগে লিপ্ত হয়, দেখাদেখি—কৌতূহল মেটাতে সেও জোসেফিন, মীনা প্রভৃতি রাস্তার মেয়েদের ঘরে গেছে।

এমন পুরুষ যে যাকে দেখে তাকেই ভালবাসে ও আন্তরিক হয়ে ওঠে সে-ভালবাসায়, তাকে সকলকার কাছ থেকে কেড়ে এনে চিরদিনের জন্যে নিজের মুঠোয় করার ক্ষমতা পরীক্ষা যেমন নাতাশা করতে চেয়েছিল, তেমনি সে তার

চোখের ওপর দিয়ে আর একজনের কাছে যায় দেখে দুঃখ ভোগ করতেও চেয়েছিল। ভানিয়াকে বলেছিল—'দুঃখ খুঁড়ে খুঁড়েই আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের রাস্তা করতে হবে। নতুন নতুন যন্ত্রণার কড়ি দিয়ে তার দাম দিতে হবে। দুঃখের আগুনে পুড়েই সব কিছু নিখাদ হয়।'

নাতাশার এটা শুধু কথার কথা নয়। আলিওশাকে সুখী করার জন্যে শেষমেশ সে তাকে কাতিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিল। এ দেওয়া যে কী দেওয়া, যে দেয় সেই শুধু জানে—জানে ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারে অভ্যস্ত উদার হৃদয় রুশ ও ভারতীয় রমণীরা। এ-ঐতিহ্য রুশ ও ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

এ-উপন্যাসের আর একটি উল্লেখ্য নারী-চরিত্র কাতিয়া ফিওদোরোভ্‌না। সতর বছরের এই সুন্দরী কুটিলতা জানে না এবং বয়সের অধিক জ্ঞানী। নাতাশার সে সফল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তেইশ বছরের যুবতী নাতাশার মতন বয়স্ক-চিন্তা তার অজ্ঞাত। তার মধ্যে নাতাশার সেই দ্বিদল চিত্তের বিপরীত স্রোতাবর্তও নেই। আছে কেবল সহজ সহৃদয়তা। সে এত সরল যে নারী পুরুষের সম্পর্কের গুরুত্ব বা তার জীবনপ্রসারি প্রভাবও সে ধারণা করতে পাবে না। ফলত কাতিয়া যখন আলিওশাকে নাতাশার হাতে তুলে দিতে চায় তার দুঃখের চেয়ে নাতাশা যখন তাকে কাতিয়ার হাতে তুলে দিতে চায় তার দুঃখ অনেক বেশী গভীর এবং বাস্তব। কেন না সে জানে সে কী হারাচ্ছে। অবশ্য কাতিয়া-চরিত্র নির্মাণে দস্তয়েফ্‌স্কি সম্পূর্ণ সফল হন নি কিংবা অবহেলা করেছেন। হয়ত আসলে নাতাশার জীবনের সংকটকে কঠিন করার উদ্দেশ্যে এনেছিলেন কাতিয়াকে, সে-উদ্দেশ্য সফল করে কাতিয়া দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে অমনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ-বইতে জেরিমি স্মিথের মেয়ে তেরো বছরের নেলীর তুলনা নেই। নেলীর মধ্যেই রয়েছে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের মূল সূত্র। পূর্ণ নারীত্বে পৌছনোর আগে বয়ঃসন্ধিক্ষণে তার স্বপ্ন, কল্পনা ও ধারণাগুলি নিয়ে নেলীর যে জগৎ তাকে বিশ্লেষণ করতে দস্তয়েফ্‌স্কি দুর্লভ শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; অধিকন্তু নেলীর এক আকস্মিক ক্ষেপামির মুহূর্তে তার চিত্ত-বিকারের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য উন্মোচন করে এক যোগে তিনি উপন্যাসের আসল বক্তব্যের সঙ্গে কিশোর-চিত্তের আবেগ বেদনা আক্ষেপ ও ইচ্ছাকে নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতন সামনে এনে উপস্থিত করেছেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল নেলীর অসুখের সময়।…ডাক্তার নেলীকে ওষুধ খেতে

অনুরোধ করছেন কিন্তু নেলী ওষুধ খাবে না। কিছুতেই খাবে না। যতবার ডাক্তার তার মুখের সামনে ওষুধের চামচ ধরে, সে চামচের নিচে টোকা দিয়ে ওষুধটা ডাক্তারের মুখে গায়ে ছড়িয়ে দেয়। ডাক্তারটি অকৃতদার, দয়ালু ও স্নেহময়। তিনি আদৌ ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হন না। বারে বারে তিনি শিশি থেকে চামচে ওষুধ ঢেলে তার মুখের কাছে ধরেন। তাঁর চোখে ফুটে থাকে অকৃত্রিম পিতৃস্নেহ, ঠোঁটে লেগে থাকে মমতা মাখা হাসি। নেলী বারে বারে ওষুধ নষ্ট করে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে। তবু ডাক্তার নিরস্ত হন না দেখে নেলী এবার অবাক হয়, এবং সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।*

নেলীর এই অদ্ভুত ব্যবহারের বিশ্লেষণ করতে বসে দস্তয়েফ্‌স্কি শিশু-মনস্তত্ত্বের ওপরে তার অসামান্য দখলের পরিচয় দিয়েছেন, লিখেছেন, 'নেলী আশা করেছিল আমরা রাগ করব গালমন্দ করব। সেই মুহূর্তে নিজেরই অজ্ঞাতে সে হয়ত খুঁজছিল এমনই একটা অজুহাত যাতে করে সে প্রাণভরে কিছুক্ষণ হাউ-হাউ করে কাঁদতে পারে, কেঁদে-কেঁদে তার ছোট্ট বুকের যত অভিমান ব্যথা অস্থিরতা সব উজাড় করে দিতে পারে। এরকম মনের অবস্থা রুগীদের মধ্যে কি নেলীর মধ্যেই শুধু দেখা যায় না, আমিও কতবার নিজের অজ্ঞাতে অধীর আগ্রহ নিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়িয়েছি, চেয়েছি কেউ আমাকে অপমান করুক, এমন কথা কিছু বলুক যাকে আমি অপমান বলে মনে করি ও তার ওপরে মনের ঝাল মিটিয়ে নিই। মেয়েরা তেমনি করে ঝাল মিটাতে গিয়ে সত্যি-সত্যি কাঁদতে বসে যায়, তার মধ্যে বেশী সংবেদনশীলারা আবার ফিট হয়ে পড়ে।—মনে কোন রকম দুঃখ থাকলেই এ-রকম হয়, অথচ দুঃখটা যে কী সেটাও জানে না কিংবা প্রকাশ করতে চেয়েও পারে না।' এ-ভাবে একটি শিশু-মনকে বিশ্লেষণ করতে বসে সব বয়সের সব মানুষের মনকে এমনকি নিজের অন্তঃকরণকেও উন্মোচন করেছেন তিনি আর তা করতে গিয়ে উপন্যাসের মৌল সুরটিকেও তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। ব্যক্তি-চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রে; সমষ্টি-চরিত্র থেকে ব্যক্তি-চরিত্রে—এই অনায়াস ঘোরা-ফেরা ও তাতে করে উপন্যাসের মর্মটিকে পাঠকের মর্মে পৌঁছে দেওয়ার দুর্লভ দক্ষতা দস্তয়েফ্‌স্কির পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শেষমেশ আলিওশার বাবা প্রিন্স ভালকফ্‌স্কির কথা কিছু না বললে

* বিশ্ববিখ্যাত জাপানী চিত্র-পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া তার 'রেড বিয়ার্ড' চিত্রে এই চরিত্রটিকে সার্থক রূপ দিয়েছেন।

আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অর্থ ও সামাজিক মর্যাদার জন্যে গৃধ্রের মতন লুব্ধ এই মানুষটির কাছে আর কিছুরই কোন মূল্য নেই। মনুষ্যত্বের মর্যাদা, একনিষ্ঠ প্রেম সব কিছু তিনি তাঁর এই স্বার্থের দরগায় জবেহ দিতে পারেন। অনায়াসে দিয়েছেনও। এ-চরিত্রটি অবহেলার সৃষ্টি, যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি এর ওপরে লেখক, তথাপি এ-কাহিনীর পক্ষে এ-চরিত্রটিকে অপরিহার্য করে তুলতে পেরেছেন তিনি। এ-চরিত্রটির আর একটি উল্লেখ্য দান বিরোধীয় যুক্তি উপস্থাপনায়। ভানিয়ার মতন স্বপ্নচারী মানুষদের বাস্তব অবস্থা তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে নির্মম ভাষায় বলেছেন প্রিন্স ভালকফ্স্কি: '…তুমি ভীষণ গরীব। প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা আগাম নিয়ে খুচরো দেনা মিটিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে কোন মতে ধড়ে প্রাণ রাখার চেষ্টা কর। তুমি কেবল চা খেয়ে বেঁচে আছ, চা ছাড়া তোমার আর কিছু জোটে না। তোমার একটা ভাল শীতের জামা নেই, শীতে তুমি হিহি করে কাঁপছ…এই আলিওশা তোমার বাগ্‌দত্তাকে কেড়ে নিয়ে গেল আর তুমি শীলারের মতন তাদের জন্যে প্রাণপণ সব করে যাচ্ছ, তাদের সমর্থন করছ, সেবা করছ…তোমার এই মহৎ মনোভাবের ভণ্ডামিটি যেন একটু পান্‌সে ঠেকছে।…'

ভালকফ্স্কি চান ভানিয়া নাতাশাকে বিয়ে করুক। তা হলে কাতিয়ার সঙ্গে আলিওশার বিয়ের পথটা পরিষ্কার হয়। কাতিয়ার সঙ্গে আলিওশার বিয়ে হলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কাতিয়ার দু' লাখ টাকা তাঁর হাতে আসবে। শুধোলেন—'বল, তুমি নাতাশাকে বিয়ে করবে? যদি রাজী হও আমি তোমাকে টাকা দেব, সচ্ছল নিশ্চিন্ত থাকার মতন প্রচুর টাকা। কী, বিয়ে করবে? বল?'

'কী আর বলব, আপনি……আপনি একটা পাগল।' ভানিয়া জবাব দিল।

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে এক্ষুনি এক ঘা বসিয়ে দেবে।'

ভানিয়া পরে বলেছে—'ওকে একটা অতি ঘৃণ্য জীব বলে মনে হচ্ছিল। যেন মস্ত একটা মাকড়সা, ইচ্ছে করছিল টিপে একেবারে পিষে ফেলি। আমাকে বিদ্রূপ করতে খুব ভাল লাগছিল ওর। বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, বাগে পেয়ে আমাকে নিয়েও যেন তেমনি খেলছিল। আমার মনে হচ্ছিল প্রিন্স যেন এক ধরনের মজা পাচ্ছিল এই করে। সে-মজাটা যেন যৌন-সুখ-ভোগেরই সামিল।…তার নোংরামি, তার ঔদ্ধত্য, সুকুমার সব কিছুর প্রতি তার বিদ্বেষ

প্রকাশ—সব মিলিয়ে সে যেন বস্তুত তাঁর আভিজাত্যের মুখোশটাকেই আমার সামনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।'

এ-ধরনের কথাবার্তা বলে প্রিন্স কেন যে মজা পান তার ব্যাখ্যাও প্রিন্স নিজেই দিয়েছেন—'আমার চরিত্রের একটা দিক এখনও তুমি জান না ইভান পেত্রোভিচ্, সেটা হচ্ছে, এই বস্তাপচা গ্রাম্য সরলতা আর পাদ্রী-পাদ্রী ভাবের প্রতি ঘৃণা, এই ঘৃণা প্রকাশ করার আগে আমি খুব মজা করি, কোন চিরতরুণ শীলারকে পেলে আমি নিজেই ওই গ্রাম্য সরলতার, যাকে বলে পাদ্রী-পাদ্রী ভাব, তারই ভান করি তার সামনে; বেশ সহৃদয় ভাবে তাকে সমর্থন করে কথা বলি, তার পরেই হঠাৎ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যে তার সামনে আমার মুখোশ খুলে ফেলি। আমি আমার সেই গদগদ ভাব ঝেড়ে ফেলে দাঁত খিঁচিয়ে উঠি, অপ্রত্যাশিত ভাবে অবাক করে দিয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করি সেই আদর্শবাদী ভাবুকটিকে।'

অসহায় শিকার নিয়ে শিকারীর এই খেলার দৃশ্য দস্তয়েফ্‌স্কির আগেকার বইগুলিতেও পাই; কিন্তু সেখানে যা ছিল নিতান্তই খাদ্য-খাদকের ব্যাপার; এখানে তা এসে দাঁড়িয়েছে দার্শনিকতায়। এই বিরুদ্ধদ্বয়ের সাথক প্রয়োগ দেখতে পাই 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'তে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইভান কারামাজোভ্ ও আলিওশা কারামাজোভের তর্কের সময়ে। কিন্তু এই 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসে তার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য আরও সুন্দর, কারণ এখানে আছে স্বগত আলাপ। দস্তয়েফ্‌স্কি নিজে যে-বিরোধে ভোগেন—কখনো দারিদ্র্যের দম্ভে, কখনো তার লজ্জায়; কখনো ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতিতে কখনো তাঁর প্রতি বিদ্রোহে; কখনো যৌন-পিপাসায় কখনো অনীহায়—স্বগত মনের সেই সব বিপরীত কোটির যুক্তিগুলিকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির মুখে উপস্থিত করে আলোচনার মাধ্যমে তার সারবত্তা যাচাই করতে চেয়েছেন। 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-র বক্তা ভানিয়ার যে-নৈতিক পরাজয় তিনি আঁকলেন তাতে করে বোঝা যায়, যে-রোমান্টিক মানব-প্রীতির কথা প্রচার করতে চেয়েছিলেন তিনি 'অভাজন' উপন্যাসে; নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু সেখানে নূতন কোন তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারেন নি, কেবল ওই তত্ত্বের বিরুদ্ধে ভালকফ্‌স্কিকে দাঁড় করিয়ে নিজের সংশয় উচ্চারণ করেছেন।

'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাস নিয়ে এত কথা আমি একটু আগে ভাগে বলে ফেললাম। কেন না পাঠক জানেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর নূতন মাসিক পত্রিকা

'ভ্রেমিয়া'তে উপন্যাসটি সবে শুরু করেছেন। লিখতে শুরু করে গোটাটা ভেবে নেন নি ; এখন লিখছেন আর ভাবছেন—'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-র ভাবনা তাঁর সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে।

ওয়েটিং রুমে বসে তিনি সেই ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে আছেন, তখন ডাক পড়ল তাঁর। জেনারেল কাউনসিলর তাঁর সারটিফিকেট পরীক্ষা করে ফেরত দিয়েছেন। কেরানীর হাত থেকে সারটিফিকেটটি পকেটে পুরে এবার তিনি বাড়ি-মুখো রওনা হলেন।

পিতার্সবুর্গের এক নগণ্য অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিন তলায় দু'খানা ঘর নিয়ে সংসার পেতেছেন তিনি।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে মারিয়ার কাশির শব্দ কানে গেল তাঁর। দূর কোণের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন মারিয়া। শীর্ণ মানুষটির পরনে সেমিজ। অবিন্যস্ত চুলগুলি ছড়িয়ে আছে কাঁধের ওপরে। গত তিন মাসে মারিয়া আরও বেশী শীর্ণ হয়ে পড়েছে দেখে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন দস্তয়েফ্স্কি। কিন্তু বিষণ্ণতার সেই করুণ ছলছলে আর্দ্রতা মুহূর্তের বেশী থাকল না। মারিয়ার ক্রোধের উত্তাপে উবে গেল : দস্তয়েফ্স্কিকে দেখেই তিনি বারুদের মতন ফেটে পড়লেন :

'বিল, বিল, বিল! ধোবার বিল, মুদির বিল, দর্জির বিল। টাকা না। টাকা আসবে না কোথাও থেকে। মেয়েয়ের আধঘন্টা ধরে টাকা টাকা করে হামলা করে গেল। তার টাকা চাই। টাকা না পেলে সে কেলেঙ্কারী করবে। 'আমি আর পারি নে, পারি নে। আমি আর কত সইব!'

'কী মেয়ে মানুষরে বাবা!' দস্তয়েফ্স্কি স্বগতোক্তি করলেন। মারিয়াকে বললেন, 'ওকে ত আমি মাসের শেষের দিকে দেব বলে দিয়েছি। তবু কেন আবার আজ এল মেয়েছেলেটা।' দস্তয়েফ্স্কি মেয়েয়েরের ওপরে একটু বিরক্ত হলেন ; কিন্তু উপায় নেই তাঁকে শান্ত থাকতেই হবে, পাওনাদার যখন, দু' কথা শোনাবেই ত সে। মারিয়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, বেশ একটু উৎসাহের গলাতেই বললেন, 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-র শেষ কিস্তি 'ভ্রেমিয়া'তে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখো, বই হয়ে বেরিয়ে যাবে। তখন কিছু টাকা পাবই পাব। আমি ওর পরেই আর একটা বই শুরু করে দেব ভাবছি। এদিকে 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতিচারণ'ও বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে। এখন শুধু সময় চাই, লেখার সময়।'

'লেখ। লিখবেই ত, লেখা তোমার নেশা ; কিন্তু তার থেকে কী টাকা আসবে সে ত 'স্তেপানচিকোভো'র বেলাতেই দেখলাম।'

একটা নিদারুণ খোঁচা দিলেন মারিয়া। দস্তয়েফ্স্কি খুব আহত হলেন তবু সহ্য করতে হল। ১৮৫৯ সালে রুশ-সাহিত্যে দস্তয়েফ্স্কির পুনঃপ্রবেশ 'খুড়োর স্বপ্ন' আর 'স্তেপানচিকোভো' গ্রাম' নিয়ে। দ্বিধা সংশয় জড়তার হাতে লেখা সে-বই দু'খানি তাঁর জন্যে আনল ব্যর্থতা। টাকা আনল না। যে-প্রতিভার অহংকারে তিনি ভারগুনফ্কে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, অবজ্ঞা করেছেন জেনারেল তৎলেবেনের মতন উপকারীজনকে সেই প্রতিভা যে, মূষিক প্রসব করেছে তাঁর চেয়ে বেশী সে আর কে জানে! সেই লজ্জার ক্ষতে মারিয়া এখন নুন ছিটিয়ে দিলেন। জ্বালাটা বড় তীব্র হয়ে উঠল, কী অপমানটাই না তাঁকে করেছে প্রকাশক, বই বেরোনোর পরে তিনি টাকা চাইতে গিয়েছিলেন। পাবলিশার টাকা ত দিলেই না, উলটে বললে—'যে টাকাটা অ্যাডভানস দিয়েছিলাম ওঠাই বরং ফেরৎ দিয়ে যান। বই ঘরে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, কেউ কিনছে না।' কিন্তু তিনি তখন টাকা ফেরৎ দেবেন কোথা থেকে, সে-টাকা কবে সংসারের তপ্ত কড়াতে পড়ে তেলের মতন উবে গেছে।

দস্তয়েফ্স্কি মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে বললেন, 'লেখা ছাড়া আমি আর যে কিছু পারি ত মনে হয় না। তাই ওটা আঁকড়ে থাকতেই হবে আমাকে, লেখা আর 'ভ্রেমিয়া'ই আমার ভরসা। কিন্তু 'ভ্রেমিয়া' টাকা দেবে দূরে থাক ওর পেছনেই এখন টাকা ঢালতে হচ্ছে। আমাদের এটা এখন শুরুর সময়, এ-সময় টাকা না ঢাললে ত কাগজের উন্নতি হবে না। আর উন্নতি না হলে……'

'উঃ কেবল প্রতিশ্রুতি, কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, সেই সেমিপালাতিন্স্ক্ থেকে শুরু করেছ, ৎভেরে বসেও সেই স্বপ্ন দেখেছ কেবল আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। এখন এই পিতার্সবুর্গে এসেও সেই স্বপ্ন দেখা, কেবল স্বপ্ন দেখা আর প্রতিশ্রুতি দেওয়া; কিন্তু জিজ্ঞেস করি, শুধু স্বপ্ন দেখে, শুধু প্রতিশ্রুতিতে পেট ভরে কারো? সংসার চালাতে টাকা চাই, মানুষের মতন বাঁচতে টাকা চাই। তোমার দাদা আর তার জর্মন বউ কেমন দিন দিন ফুলছে আর আমরা? আমরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি কেবল।……'

দস্তয়েফ্স্কি বুঝলেন শ্রীমতী মেয়ের এই সব কথা বলে তাতিয়ে দিয়েছে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে গেছে মারিয়াকে।

'তুমি কী ভাব এই রকম একটা ইঁদুরের গর্তে বাস করে মানুষ কখনো খুশী থাকতে পারে!' মারিয়া রাগের মাথায় চেঁচাচ্ছিলেন। এবার তাঁর গলা

বুজে এল। কাশি শুরু হল তাঁর। বুকে হাত চেপে নুয়ে পড়লেন তিনি। বুকের ব্যথায় কুঁকড়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁট বেয়ে গয়ার গড়াতে লাগল, তবু তিনি থামলেন না। কাশির দমকটা একটু কমতে না কমতে আবার চীৎকার শুরু করলেন, 'এখানে কাউকে আমি আসতে বলতে পারি নে; আমি নিজেও কোথাও বেরোতে পারি নে। এই ইঁদুরের গর্তে কে আসবে, এই ঝিয়ের পোশাক পরে আমিই বা কার বাড়িতে বেড়াতে যাব। কাল রাস্তায় জেনারেল ভাগানস্কের সঙ্গে দেখা, তিনি এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যেন চিনতেই পারলেন না। এখানে এই দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে এই ত তুমি আমার হাল করেছ। এত বড় শহরে কেউ আমার বন্ধু নেই, আমার অস্তিত্বই কেউ জানে না।'

'অথচ তুমি নিজেই বলেছ তুমি বন্ধু চাও না, তুমি এখানকার মানুষদের ঘৃণা কর।'

'সত্যি ঘৃণা করি, হাজার বার ঘৃণা করি। নোংরা নোংরা নোংরা, তোমরা সবাই নোংরা। আমাকে বিয়ে করতে কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল। আমি কক্‌খনো তোমাকে বিয়ে করতে চাই নি। ভারগুনফের কথাই আমার শোনা উচিত ছিল। ইস, কেন যে আমি তাকে বিমুখ করলাম।'

'এখনও ত সময় সুযোগ আছে, যাও না তার কাছে।'

এই বিশ্রী রূঢ় কথাটা তাঁর কানে গেল না। তিনি তেমনি চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন 'এই হতভাগ্য ছেলেটা, পাশা, কী হাল তার, নেহাৎ না হলে নয় যা তাও তার ভাগ্যে জোটে না।'

'ভারগুনফ্‌কে বিয়ে করলে কী এর বেশী জুটত নাকি?'

'অন্তত তার সৎ বাপ ত একটা পুরনো কয়েদী হত না!'

'ঈশ্বর!' যেন বুলেট বিদ্ধ হলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, তিনি কপালে হাত রাখলেন।

মারিয়া তখনও বলে যাচ্ছেন, 'শুধু কী একটা পুরনো কয়েদী, একটা কদর্য মৃগী রোগী না! ফাঁকিবাজ, মিথ্যেবাদী জোচ্চোর।'

'থাম, থাম মারিয়া আর জিভ নেড়ো না।' ভারগুনফ্‌কে নিয়ে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করতে গিয়ে রাগে বেগুনী হয়ে থেমে গেলেন তিনি। একটু থেমে থেকে বললেন, 'কুজনেস্কে সেদিন তুমি কী বলেছিলে মনে আছে? ভারগুনফের সঙ্গে তোমার সেদিনের সম্পর্ক কি আমি জানি নে?'

'অসভ্য বর্বর!' চিৎকার করে উঠে থেমে গেলেন মারিয়া। দস্তয়েফ্‌স্কিও থামলেন। দু'জনে সরে গেলেন দু' দিকে।

দস্তয়েফ্‌স্কি এসে জানলার পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত অবসন্ন বিপর্যস্ত মানুষটির মন থেকে কিছুক্ষণ আগেকার উজ্জ্বল চিন্তাগুলি ম্লান হয়ে নিভে গেল। চিত্ত জুড়ে অন্ধকার। সহসা রাস্তার ওপারে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। মানুষটিকে চেনা-চেনা লাগছে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই ত তাকিয়ে আছে সে। কে মানুষটা, কোথায় দেখেছি! একটু চিন্তা করতেই মনে পড়ল, একটু আগেরই দেখা, পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েটিং রুমে এই মানুষটাই ত এসে তাঁর দিকে দু' পলক স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তা হলে স্পাই! তাহলে তার গতিবিধির ওপরে এখনও নজর রাখছে সরকার। এখনও তিনি নজরবন্দী। এ-বন্দিদশা বুঝি সারাজীবনেও ঘুচবে না তাঁর। পুরনো কয়েদীর ছাপ মুছে যাবে না তাঁর কপাল থেকে কোন দিন! আর একবার বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

তিন

উনিশ শতকের পঞ্চাশের সময়ে সামন্ততান্ত্রিক শোষণে নিরক্ত রাশিয়ার নিরাশ্রয় যৌবন উদ্‌বেল অস্থির; তখন মানবতাবাদের সে এক পরম সংকটের কাল। দস্তয়েফ্‌স্কির চোখের ওপরে অবিশ্বাসের ক্ষুব্ধ ঝড় ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে সনাতন ধর্মের মরচে-পড়া নঙর। চার্চের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিদ্রোহী যৌবন চ্যালেঞ্জ করেছে ঈশ্বরকে। ধর্মবিজ্ঞান আর অতিপ্রাকৃত দর্শনের শিকল ভেঙে সে এসে আত্মসমর্পণ করেছে প্রকৃতির বিধান ও প্রয়োজনবাদের কাছে। ঘোষণা করেছে, মানুষ দ্বিপদ প্রাণী, প্রাণী-ধর্মের স্বভাবে বিধৃত এই জগতের বাইরে অন্য কিছুতে তার নির্ভর নেই, তার কেউ প্রভু নেই, সে অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ—এ-ভাবে সনাতন বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন সে তখন অন্য আশ্রয়ের অভাবে নিরবলম্ব। অতিসংবেদনশীল দস্তয়েফ্‌স্কিও এ-যুগ-সংকটের শিকার হবেন, স্বাভাবিক। ফলত তিনি নীতিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতিবাদের বিষে আচ্ছন্ন হয়েছেন। 'অভাজন'-এর রোমানটিক্ আদর্শবাদী লেখক হয়ে উঠেছেন য়ুটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট্, বলেছেন, 'ঈশ্বর যদি না থাকে ত মানুষের কাছে দু'টো পথ খোলা—হয় সে নর-খাদক হবে, অথবা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করে সৌভ্রাতৃত্বের শান্তি অর্জন করবে। এই ঘোষণার ফলশ্রুতি আমরা দেখি বেলিনস্কির নিরীশ্বরবাদে

তাঁর আস্থা। এই আস্থাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল পেত্রাশেফ্‌স্কির বৈপ্লবিক গুপ্ত-সংস্থার শিবিরে—খৃশ্চিয়ান হিউম্যানিজম্ থেকে কম্যুনিজমে, যেখানে ঈশ্বরের স্থান নেই। ১৮৪৯-এ তিনি যখন মৃত্যুদণ্ড নিতে বধ্যমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, বুলেট-বিদ্ধ হবার সেই নির্মম জল্লাদ-মুহূর্ত ক'টি তাঁর ভিতরকার সনাতন-সংস্কার লালিত পুরনো মানুষটির মৃত্যু ঘটাল। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করবার সময় জন্মগ্রহণ করল তাঁর মধ্যে নূতন আর এক 'মানুষ'। 'নবজাত' মানুষটির জীবনে সেখানে ঘটল দু'টি ঘটনা। সেই দু'টি ঘটনাই তাঁর পরবর্তী জীবনের পরিণাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। সে-ঘটনা দু'টির একটি খৃষ্ট-দর্শন—Positive good man বা অনপেক্ষ সৎমানুষে বিশ্বাস। দ্বিতীয়, রাশিয়ার খাঁটি মানুষ, মাটির মানুষের সাহচার্য লাভ। কিন্তু অমৃতত্বে দীক্ষিত হয়েও তিনি ধ্যানস্থ হতে পারেন নি—নেতি ও ইতির সংশয়ের নির্দয় আগুনে ক্রমাগত পুড়তে হয়েছে তাঁকে। ১৮৭০ সালে তিনি মাইকফ্‌কে লিখেছিলেন: 'যে মূল প্রশ্নটি আমাকে সারাজীবন নিদ্রায় জাগরণে অনুক্ষণ দগ্ধ করেছে সে হল—ঈশ্বর আছে কি নেই?'···কিরিলফ্-এর কণ্ঠে তিনি বলেছেন—'যদি ঈশ্বর বলে কেউ না থাকে ত আমিই ঈশ্বর।'

অর্থাৎ ঈশ্বরের স্থান দখল করবে অয়স-কঠিন ব্যক্তিত্ব, সকল ভাল ও মন্দের, সকল বিধি ও বিধানের ঊর্ধ্বে দুর্জয় পৌরুষের শির সমুন্নত থাকবে। প্রভু সে, সব-কর্মেই তার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। এই প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর এক বিশ্বাসের-দাবি ও পেশ করেছেন, মানুষের প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রকৃতির অনুরূপ। ঈশ্বর ও মানুষের প্রকৃতিতে কোন ভিন্নতা নেই সুতরাং ঈশ্বর যদি না থাকে ত মানুষেরও অস্তিত্ব থাকে না। তার মানে 'পারফেক্ট্' মানুষ, Positive good man-ই হল ঈশ্বর। আর পারফেক্শানই মানুষকে নিহত করে। যেমন যীশু নিহত হয়েছেন। সুতরাং ঈশ্বরহীন জগতে মানুষের will to power-ই হবে সর্বশক্তিমান—অতিমানবতা মানুষকে হতমান করবে। ঈশ্বর না থাকলে অমরত্ব থাকে না। অমরত্ব না থাকলে জাগতিক সুখ-সম্ভোগটাই সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে। অভীপ্সার অন্যতম লক্ষ্য না থাকার জন্যে জাগতিক সুখের দাবিতে মানুষ বিদ্রোহী হবে, বিদ্রোহীদের দমন করে অতিমানব তাদের পোষমানা প্রাণীর পালে পরিণত করবে। লোহার ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সে শাসন করবে তাদের। তখন অবশেষে বিশাল এক উঁয়ের ঢিবি হবে, বাবিলোনের মিনারের মতন বিশাল—অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যে সেই দাসত্ব—ঈশ্বরের অথবা অতিমানবের। ঈশ্বরের নামে হোক কিংবা নিজেকে প্রেরিত-পুরুষরূপে জাহির

করে হোক, মানুষ মানুষের ওপরে প্রভুত্বের ছড়ি ঘোরাতে পারবে। মানে বিদ্রোহ ও দাসত্বই মনুষ্যজন্মের পর্যায়ক্রমিক পরিণাম। এই পরিণাম সূত্রে রাশিয়ায় তিনি জারতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'ঊনবিংশ শতকের শেষ হবে এক দারুণ সংকটের মধ্যে—'

সেকি আজকের এই দিনগুলিকে দেখে ?

*

নব-জাগ্রত জন-মানসের উৎসাহে উত্তাল হয়ে উঠেছে পিতার্সবুর্গ—টলছে কাঁপছে ফুটছে টগবগিয়ে। জন্ম হতে চলেছে এক নূতন যুগের। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পরিণাম ও অত্যাচারী জার প্রথম নিকোলাই-এর মৃত্যু জারতন্ত্রের কঠোর বিধানে যে-বিপর্যয় এনে দিয়েছিল, সে-কথা আগেই বলেছি। সে-বিপর্যয়ে হাল ধরতে এসে টাল সামলাতে উদারপন্থীদের উগ্র দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে জার দ্বিতীয় আলেকসান্দ্‌রকে, কথা দিতে হয়েছে, তিনি শাসন-সংস্কার করবেন। সে-প্রতিশ্রুতি মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। জার-শাসনের ত্রাস ক্রমশ উবে যাচ্ছে জনতার মন থেকে। এমন কী নাট্যকার অভিনেতাদেরও যেন আর ভয় ডর নেই।—জম-জমাট নাট্যশালায় পাদপীঠের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে সদম্ভে নাট্যকারের ঘোষণা উচ্চারণ করছে তার চরিত্র—'সময় এসেছে। রাশিয়া জুড়ে যত পাপ, এবার আগাছার মতন সব উপড়ে ফেলে দিতে হবে।' শুনে লাফিয়ে উঠছে শ্রোতার দল, চিৎকারে কাণ কালা করে দিয়ে জানাচ্ছে অভিনন্দন—উৎসাহে উল্লাসে অস্থির হয়ে উঠছে।

রুশ অসুরের যেন ঘুম ভেঙেছে। আস্তে আস্তে চোখ চাইতে শুরু করেছে সে। জনতার মুখে রাত দিন শুধু এক কথা—সংস্কার চাই, সব রকম সংস্কার করতে হবে। কাগজগুলি মানুষের এই নব-জাগ্রত চেতনার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। নব জীবনের এই নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে। প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছে সে। রেলওয়ে-ব্যাংক-জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী রাষ্ট্রীকরণ, লোকাল সেলফ গভরনমেণ্ট গঠন ইত্যাদির দাবি তুলে ধরছে পরিচ্ছন্ন যুক্তির জোরে। কবি সাহিত্যিক নাট্যকার প্রবন্ধকার—সংস্কারের আন্দোলনে সামিল হতে এগিয়ে এসেছেন সব স্তরের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা একবাক্যে দাবি তুলেছেন : মানুষকে শৃংখল মুক্ত কর, মানবতাকে মর্যাদা দাও।

রাশিয়া নূতন আশা নূতন স্বপ্ন নিয়ে আপন ভাগ্য জয় করবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দস্তয়েফ্‌স্কির কাগজও এ-আন্দোলনে মদৎ যোগাতে পেছিয়ে ছিল না। কিন্তু খুব সাবধানে। আইন বাঁচিয়ে। তাঁর ভয় যে-কোন সময় জারের পুলিশ এসে তাঁর কাগজ বন্ধ করে দেবে। কাগজ বন্ধ হলে তাদের দু'জনকে দু'টো পরিবার শুদ্ধু পথে বসতে হবে, উপোস দিয়ে মরতে হবে।

এ-সময়ে বিভিন্ন স্তরের ক্রমবর্ধমান সংঘবদ্ধ চাপে জার জনতার একটি দাবি মানতে বাধ্য হলেন। ১৮৬১-র ২৯ অক্টোবর ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করলেন তিনি। যদিও রাশিয়ার মাটি থেকে ভূমিদাস-প্রথার পাপ নির্মূল হতে তারপরেও অনেক দিন লেগেছিল, কাগজে পত্রে আবহমান কালের একটি জাতীয় কলঙ্ক ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠল সেদিনই। সেই সাফল্যের পটভূমিতে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল, সক্রিয় ও সবল হয়ে উঠল রাজনৈতিক প্রেরণা। ভূমিদাস-প্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাধিকরণকে মুক্তি দেওয়া হল প্রশাসনের বজ্রমুষ্টি থেকে; বিচারে জুরির ব্যবস্থাও স্বীকৃত হল। শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজান, ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল দরজা খুলে দেওয়া, ইত্যাদি সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তৎপরতা দেশের ছবি পালটে দিতে থাকল। দেশ অতীতের সব বন্ধন, পুরনো সব বাধা ছিঁড়ে মাড়িয়ে প্রবল উৎসাহে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। তাঁর কালের যৌবনের সেই বাঁধন ছেঁড়ার সাধনা, মুক্তির উল্লাস, ঐকান্তিক আশাবাদ ও নূতন এষণার স্বপ্ন দস্তয়েফ্‌স্কিকেও আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলেছিল। অবশ্য মাঝেমাঝেই তিনি দ্বিধায় ভুগছিলেন— কখনো রাজতন্ত্রকে সমর্থন করছিলেন, কখনো বিপ্লবীদের পক্ষ নিচ্ছিলেন। তরুণ র‍্যাডিক্ল্‌ আর নিহিলিস্টরা যখন নীতি ধর্ম ও ঈশ্বরকে একসঙ্গে অস্বীকার করে আঁকড়ে ধরছে বস্তুবাদকে, তখন বাম ও দক্ষিণে ক্রমাগত বিচলিত মানুষটি একবাব বিদ্রোহ করছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আর একবার শরণাগত হচ্ছেন বিশ্বাসের।

উপযোগবাদীরা (য়ুটিলিটারিয়ান) যখন সব রকম সমস্যাকেই অর্থনীতির গজ-কাঠি দিয়ে মেপে সরল ও প্রাঞ্জল করে দিচ্ছিলেন তখন তিনি প্রাতিস্বিক দর্শন ও মনস্তত্ত্বের জটিল পথে খুঁজছেন ব্যক্তির অস্তিত্বের মূল্য ও এ-পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা। এ-সব কাণ্ড স্ববিরোধিতা নিঃসন্দেহে; তবু কিন্তু স্ববিরোধিতার জন্যে স্ববিরোধিতা নয়। এর পেছনে রয়েছে অমোঘ এক আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস, এমন একটি সত্য আবিষ্কারের প্রেরণা, এমন একটি শেষ-উত্তরের প্রার্থনা যা কিনা হবে তাঁর নিজের জন্যে একান্ত সত্য,

হবে তাঁর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অবলম্বন। এই মৌল সমস্যার দিকে তাঁর অতন্দ্র লক্ষ্যই তাঁকে সারাজীবন স্ববিরোধী করে রেখেছিল। তিনি একজন ঝানু উকীলের মতন যখন যে-পক্ষ নিয়েছেন তখন সে-পক্ষকেই অকাট্য যুক্তিতে সপ্রমাণ করেছেন। 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর এলডার জোসিমার ঈশ্বরে অকুণ্ঠ বিশ্বাসকে যেমন তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন তেমনি ইভান ও দ্‌মিত্রি কারামাজোভের ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদকেও সুরক্ষিত করেছেন যুক্তির কঠিন কাঠামোর মধ্যে। তাই পাঠক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না মানুষটির কোন্‌ দিকে ঝোঁক, কোন্‌টা তাঁর শেষ কথা। বরঞ্চ শেষের শেষ কথা কখনো তিনি বলেন নি অথবা নেই, বলা যায় না। হয় উভয়ই সত্য, নয় কোনটাই সত্য নয় কিংবা উপলব্ধির জগতে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, সত্য প্রত্যেকের জন্যে আলাদা। দস্তয়েফ্‌স্কি কারো সত্যকেই নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। উদাহরণ স্বরূপ 'দ্য ইডিয়েট'-এর প্রিন্স মিশকিন ও রগোজিন—এদের কেউ তিনি নন, অথবা নিজের দ্বিদল সত্তার দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণাকে দুই চরিত্রে উদ্‌ঘাটন করে মোহ-মুক্ত হতে চেয়ে সকলের থেকে আলাদা 'আউট সাইডার' বা 'প্রোসক্রাইবড ম্যান' হয়ে ছিলেন আজীবন। ফলত র‍্যাডিক্যল্‌, নিহিলিস্‌ট্‌, মনারকিস্‌ট্‌, মডারেট কিংবা একসট্রিমিস্‌ট্‌, কেউ-ই তাঁকে স্বজন বলে ভাবতে পারে নি অথচ শত্রু বলতেও দ্বিধা করেছে অর্থাৎ এক রহস্যময় 'এনিগমা' হয়ে উঠেছিলেন তিনি সকলের কাছে!

অন্তঃপ্রকৃতির সেই কুহেলী, অসাধারণ বিশ্লেষণ-পটিয়সী বুদ্ধি ও সর্বপক্ষতা (নিরপেক্ষতা) সবার ওপরে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' আর 'মৃত্যুপুরীর স্মৃতি' রচনা দু'টির ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ তাঁকে জনপ্রিয়তার চূড়ায় তুলে ধরেছিল। কবি শিল্পী সাহিত্যিক ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেদিন তুর্গেনিয়েফ্‌ ও আরও দু' একজন রুশ-সাহিত্যের ঘাটের আকাশে দুপুরের সূর্য কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির খ্যাতি তাঁদের সে প্রতাপের ওপরেও ছায়া ফেলতে পেরেছে তখন। তখন তাঁকে ঘিরে তরুণ-রাশিয়ার দারুণ ভিড়। রহস্য-ঘেরা মানুষটির বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসছে সবাই। একটা সরু গলির মধ্যে ছোট্ট অফিস 'ভ্রেমিয়া'র, সেখানে অনুক্ষণ আনাগোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। তখনকার দিনে রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি কথাশিল্পীদের স্বরচিত রচনা পাঠের বাঁধা আমন্ত্রণ ছিল। সকলেই সাগ্রহে সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। সে-রেওয়াজে দস্তয়েফ্‌স্কিও সাগ্রহে সাড়া দিয়েছিলেন। যদিও

স্বরভঙ্গ ছিল, আবৃত্তির আর পড়ার ভঙ্গিটি ছিল তাঁর চমৎকার। সে বাবদেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁর খাতির ছিল খুব। তার ওপরে দস্তয়েফ্‌স্কির ছিল নূতনদের মনের কথা বুঝবার নেশা। সে-নেশার টানে তিনি নিজেও এগিয়ে আসতেন তাদের সামনে, আগ বাড়িয়ে আলাপ করতেন। ফলত 'ভ্রেমিয়া'র অফিস হয়ে উঠেছিল নূতন ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও বিস্তারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

এ-সময়েই দস্তয়েফ্‌স্কির পরবর্তী কালের বন্ধু ও জীবনীকার নিকোলাই স্ত্রাখফ্‌ তাঁর সাহচর্যে আসেন। 'ভ্রেমিয়া'র দফতরে সগ্য এসে তাঁর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি লিখেছেন: 'আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, ছোট-চুল আঁটো-খাটো পোশাক-পরা ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে এক সারিতে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অকুণ্ঠ গলায় আলোচনা করছে যৌন-বিষয়। সমাজ-ধর্মের সকল রকম বিধি-নিষেধ নস্যাৎ করে তারা যৌন-চর্যার ব্যভিচার-বিকৃতিগুলিকেও স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করছে। কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়ার প্রতিই দৃকপাত নেই তাদের। কোন কিছুকেই তারা অশ্লীল বলে মানছে না...।'

সারা দেশ জুড়ে যখন সকল রকম বিধি-বিধান ভাঙার সেই প্রবল বন্যা বইছে, এসে আছড়ে পড়ছে 'ভ্রেমিয়া'র অফিসেও, তখনও দস্তয়েফ্‌স্কি কিন্তু তাঁর সাধনায় অতন্দ্র। একলা মানুষ তিনি তাঁর কাগজের জন্যে দশটা মানুষের খাটুনি খাটছেন। সমকালীন লেখকদের কাছ থেকে লেখা চাইছেন, এমন কি কাগজের ভবিষ্যৎ ভেবে দু' চক্ষের বিষ তুর্গেনিয়েফের কাছেও লেখার জন্যে হাত পাতছেন, প্রুফ শোধরাচ্ছেন, প্রবন্ধ লিখছেন, শীত তুষার-বৃষ্টি ঝড় অগ্রাহ্য করে সারা শহর চষে ফিরছেন—গ্রাহক জোগাড় করছেন, এজেন্ট আর হকারদের উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রেস আর কাগজের ব্যবসায়ী সামলাচ্ছেন এবং এত সব করার পরে রাত জেগে লিখে যাচ্ছেন তাঁর ধারাবাহিক রচনার কিস্তি। এই অসীম মনোবল ধৈর্য ও পরিশ্রমের তুলনা নেই।

এই অতুলনীয় দৈহিক শ্রম-সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাসের জোরেই দুর্বল অসুস্থ স্নায়ুরোগী দস্তয়েফ্‌স্কি পেশাদার লেখক হতে পেরেছিলেন। রাশিয়ার তিনিই প্রথম পেশাদার লেখক এবং এর জন্যে তাঁর অহংকারও কম ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলতেন, 'আমার মতন উনুনে হাড়ি চাপিয়ে কেউ সাহিত্যের বাজারে সওদা করতে আসে নি রাশিয়ায়। তেমন সাহস আমার মতন কারো নেই।' তুর্গেনিয়েফ্‌, তলস্তয় গোনচারফ্‌ সকলেই ছিলেন সুখী-পরিবারের লোক। অঢেল আয় ছিল তাঁদের জমিদারির। সাহিত্য ছিল তাঁদের কাছে

অখণ্ড অবসরের চিত্ত-বিনোদন, উচ্চ কোটির চিন্তা-বিলাস। তাই দস্তয়েফ্‌স্কি এঁদের ঈর্ষা করতেন। এঁদের প্রতি তাঁর ঘৃণাও ছিল খুব। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন—'তাঁদের টাকার জন্যে লিখতে হয় না। তাঁদের গুনে গুনে হিসেব করতে হয় না বইয়ের কত কপি বিক্রি হলে দর্জির দেনা শোধ হবে কিংবা বাড়ির বাকি ভাড়া মেটান যাবে।'

সমালোচকেরা বলেন, ডিকেন্স আর বালজাকের মতন দস্তয়েফ্‌স্কিকেও টাকার জন্যে হন্যে হয়ে লিখতে হত বলে তাঁর লেখায় নানা শৈথিল্য, বাক্‌বাহুল্য ও অকারণ বিস্তার থেকে গেছে। তাঁর উপন্যাসের আয়তন নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অনেকে। সাময়িক কাগজে ধারাবাহিক লেখার জন্যেই এমনটি ঘটেছে বলে অনেকে দোষারোপ করেন।

কিন্তু তাঁরা একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতেন—দস্তয়েফ্‌স্কি সুযোগ পেলেও অন্য রকম কিছুই পারতেন না। ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে লিখলেও তাঁর লেখার ভঙ্গি, দীর্ঘ সংলাপ কিংবা স্বগতোক্তি, নাটকীয় প্রবেশ-প্রস্থান, বাক্যের জটিল ও তির্যক বিন্যাস কিছুকেই তিনি এড়াতে পারতে না; কেন না বেশ বোঝা যায়, আসলে এগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, তাঁর আত্মপ্রকাশের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা যদি না থাকত, যদি থাকত অঢেল অর্থ আর অবসর তখন এবং একখানা উপন্যাস তিনবার লিখলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ, তাঁর স্বভাবের চিহ্ন সবই অনুরূপ থেকে যেত তাঁর মধ্যে। কিন্তু এ-সব কথা এমন থাক। এখনকারকথা বলি।

দাদা মিখাইল দেখেন পত্রিকার প্রচার বিভাগ আর রাখেন আয়-ব্যয়ের হিসেব। সহকারী হিসেবে পেয়েছেন আপোলন গ্রিগোরয়েফ্-কে। শিথিল-চরিত্রের এ-মানুষটি অনেক কেলেঙ্কারির নায়ক। আবার দেনার দায়ে জেলও খেটেছেন কয়েকবার তবু দস্তয়েফ্‌স্কি এঁকে পছন্দ করেছেন কারণ, তিনি লেখেন ভাল। ভাষার ওপরে যেমন দখল, বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাসেও তেমনি পটুতা তাঁর। তা ছাড়া এসেছেন তরুণ দার্শনিক নিকোলাই স্ত্রাখফ্।

পিতার্সবুর্গের পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্যে শহরের কাগজগুলির দারুণ কাটতি তখন। তখন সবচেয়ে বেশী কাটছিল নেক্রাসফের উদারপন্থী কাগজ 'সমকাল' তারপরেই ছিল 'পিতৃভূমি'। তাই বলে দস্তয়েফ্‌স্কির 'সময়'ও পেছিয়ে ছিল না। দিন দিন বিক্রি বাড়ছিল, বিক্রয় সংখ্যা ওই দুই কাগজের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল তার। এ-সাফল্যই অবশ্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনমনীয় ধৈর্যের উৎস হয়ে উঠেছিল। বস্তুত ১৮৬০-৬২-র সময়টা এই প্রেরণার মধ্যেই মগ্ন হয়ে

থাকতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর রুদ্ধ আবেগ আর উজ্জ্বল বুদ্ধি 'ভ্রেমিয়া'র মধ্যে পেয়েছিল আত্মপ্রকাশের পরম সুযোগ আর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। ফলে পারিবারিক গ্লানি ও দুঃখ তাঁকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে নি বরং সে বোঝাকে সহনীয় ও বহনীয় করে তুলেছিল। সাফল্যই শক্তির চাবিকাঠি। নয় ত দস্তয়েফ্‌স্কির মতন রোগা-পটকা মানুষ দিনরাত উপুড় হয়ে পড়ে খাটতে পারেন, না কী খাটা সম্ভব!

সফল ও শক্তিমান লেখকদের দিকে সব দেশে সব কালে প্রকাশকদের একটা চোখ সতত সতর্ক হয়ে থাকে, যেমন করে হোক তাঁদের বই বাগাতে উৎসুক হয়ে থাকেন তাঁরা। লেখক যদি গরীব হন ত প্রকাশকের পোয়াবারো। অগ্রিম দাদনের নামে ঋণের দায়ে বাঁধতে আসেন তাঁকে। আর গরীব লেখক জেনে শুনে সে ফাঁদে বাঁধা পড়েন দস্তয়েফ্‌স্কিও পড়েছেন। সেই বাঁধন ছাড়ানোর সাধনায় তাই রুদ্ধশ্বাসে লিখতে হয় তাঁকে। দিনরাত লিখতে হয়। কিন্তু মানুষের মনোবল যতই অসীম হোক শারীর সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। সে মাঝে মাঝে বেঁকে বসে, বিশ্রাম চায়।

পেছনের গলির ছোট্ট দু'খানা আধা অন্ধকার ঘরে 'ভ্রেমিয়া'র অফিস। সেখানে সেলফ উপ্‌চে বই কাগজ ডেস্কগুলিতেও ডাঁই হয়ে উঠেছে। তারই পাশে একটা পুরনো সোফা। ক্লান্ত হলে ওখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কিন্তু বিশ্রাম বড় সহজে মিলে না। সব সময় লোক আসছে—মাছির মতন আসছে যাচ্ছে ভন্‌ ভন্‌ করছে। আগেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিড়ই বেশী। কবিতা গল্প প্রবন্ধ নিয়ে আসছে তারা; আনছে সভা-সমিতির খবর, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বক্তৃতার খসড়া। মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে এক কদমে এগিয়ে চলেছে, 'ভ্রেমিয়া'র অফিসে তারাও এসে হাজির হচ্ছে তাদের স্বাধীন বক্তব্য নিয়ে। গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিয়ে। চোখে নীল চশমা, গায়ে খাটো টাইট পোশাক, মাথায় বব চুল, মুখে সিগারেট, চলনে বলনে চেহারায় রীতিমত বিদ্রোহিনী এক একজন। ভাবখানা যেন দেশের জন্যে আদর্শের জন্যে সব কিছু করতে, সব সময় মরতে তৈরি। সংস্কারের সন্থ বাঁধন ছেঁড়া এইসব রমণীরা নি[illegible]ধ-ভালবাসার কথা অনায়াস-ভাষায় উচ্চারণ করছে, প্রচার করেছে বিবাহ-বন্ধনের নূতন তত্ত্ব।—মন্ত্র নয়, ভালবাসাই বিবাহের প্রকৃত বন্ধন। ভালবাসাই আসলে বিবাহ। যতক্ষণ ভালবাসা ততক্ষণই দাম্পত্য-জীবন। ভালবাসাহীন দাম্পত্য জীবনই ব্যভিচার।

এসব আলোচনা শুনে দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনীকার স্ত্রাখফের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি।

'ভ্রেমিয়া'র অফিসে যখন বাঁধন-ছেড়ার আগল-ভাঙার জেদের জোয়ার থৈ-থৈ করছে, সাহিত্যিক সাফল্য ক্রমাগত সঞ্চার করছে দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে সাহস আত্মবিশ্বাস ও আশা, তখন তাঁর ঘরের দৃশ্য বড় করুণ। তাঁর দাম্পত্য-জীবন ভেঙে পড়েছে। তিনি কেবল স্বামীর কর্তব্যটুকু রেখে আর সব সম্পর্ক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। অপরিণত বয়সের তরুণ-তরুণীদের জেদের চিন্তায় যা ভবিষ্যৎ, পরিণত বয়সের মানুষ দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনে তাই বর্তমান। ভালবাসা মরীচিকার মতন মিলিয়ে গেছে তাঁর জীবন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে হয়ে গেছে দাম্পত্য-জীবন। হয়ত ৎভেরেই কিংবা পিতার্সবুর্গে এসে মারিয়াই ভেঙে দিয়েছেন তাঁদের তাসের ঘর। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—দস্তয়েফ্‌স্কিকে তিনি ভালবাসেন না। তাঁর দেহ-মন তিনি ভারগুনক্‌কেই সমর্পণ করেছেন। সেই দাম্পত্য-জীবনের মৃতদেহ দস্তয়েফ্‌স্কি বয়ে চলেছেন আজ দু' বছর। দু' বছর পরে এখন মারিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একদা যা ছিল তাঁর সর্দিকাসি আজ তাই ক্ষয় রোগ হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি আর এখন ঘরের বার হচ্ছেন না। বেরোন যদি কখনো সে দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে অথবা অনেক দিনের জন্যে চলে যান কোন গ্রামে।

বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায়, তাঁর অফিসে আড্ডায় যৌন-বিষয়ে কলেজিনীদের কলকণ্ঠ-আলোচনা তাঁর অন্তরের ক্ষতকে রক্তাক্ত করবে, তাঁর ক্ষুধার্ত প্রবৃত্তিকে উসকানি দেবে, স্বাভাবিক। পিতার্সবুর্গে আসার আগে অব্দি তাঁর ভালবাসার জীবন ছিল পতিত প্রান্তর। সেখানে একটি মাত্র ছায়া-তরু পেয়েছিলেন তিনি। মরু-জীবনে সে একক ছায়া-তরুটিকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তার মধ্যে খুঁজেছিলেন তাঁর তাপিত-জীবনের শান্তি কিন্তু শান্তির বদলে মারিয়া তাঁকে দিয়েছিলেন জ্বালা। সে জ্বালা বুকে করে তবু তিনি তাঁকেই আঁকড়ে থাকতে, বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু মারিয়া যদি সুখের নীড়কে করে তোলেন তপ্ত কটাহ ত এই ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটি যাবেন কোথায়? তাঁরও ত মনের তৃপ্তি শরীরের আরাম বলে একটা কথা আছে। তা যদি না পান তিনি এত খাটবেন কেমন করে? অতএব তাঁর অবসরের সন্ধ্যা বিশ্রামের রাত কাটতে থাকল বাইরে। মারিয়ার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার যে নীতি-বোধ পর-নারীর সাহচর্যে আসার বাধা হয়েছিলেন এতকাল, মারিয়া নিজে হাতে সে-নীতি বোধের মূল সবলে উপড়ে ফেললে নিরবলম্ব

অসহায় মানুষটি অবশেষে স্খলিত হলেন ; দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতা চুটিয়ে পুষিয়ে নিতে থাকলেন বাইরে। খ্যাতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন খাতির বাড়তে লাগল, নিত্য নূতন পরিচয়ের দরজা খুলে যেতে থাকল দস্তয়েফ্স্কির, অকস্মাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বে দেখা দিল নিদারুণ পরিবর্তন। যে-ব্যক্তি একদা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সামনে যেতে সংকোচ বোধ করতেন, ভয় পেতেন, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতেন তাদের, তাঁরা এগিয়ে এলে পিছিয়ে যেতেন, আজ তিনি নিজে যেচে যাচ্ছেন তাঁদের কাছে। তরুণী সুন্দরীদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন—শুধু নিজের অফিসে বসে নয়, দাদার বাড়িতে, বন্ধুদের বাড়িতে এবং যত্রতত্র। দস্তয়েফ্স্কি কৈফিয়ৎ দিতেন, নারী-চরিত্র অনুশীলনের জন্যেই তিনি এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা করছেন যুবতীদের সঙ্গে। কৈফিয়তে যুক্তি আছে জেনেও দাদা অবাক হতেন একদা নারী-ভীরু মানুষটিকে এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠতে দেখে। বাড়ি যান না দিনের পর দিন এমন কি শহর ছেড়ে বাইরে পর্যন্ত চলে যান। এ-সময়ে যে-সব রমণী তাঁকে দারুণ আকর্ষণ করে ছিল তার মধ্যে আলেকসানদ্রা শুবের্তের নাম উল্লেখ্য। মহিলা ছিলেন ভারী চতুর, সুন্দর ও সুঅভিনেত্রী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শুবের্তের নিকটতম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শুবের্তের প্রতি তিনি তাঁর ভালবাসা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, তাই প্রশ্ন উঠলে বলতেন, 'শুবের্ত আমার বন্ধু, প্রেমিকা নয়।' অবশ্য আসল ব্যাপারটা তাঁর বন্ধু-মহলের আগোচর ছিল না। আলেকসানদ্রা স্থায়ী নীড় বেঁধে ছিলেন মসকোআয়। দস্তয়েফ্স্কি সুযোগ করতে পারলেই ছুটে যেতেন সেখানে, দু'-চার দিন তাঁর সঙ্গে না কাটিয়ে ফিরতেন না। পলিনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে অব্দি আলেকসানদ্রা শুবের্তই ছিলেন তাঁর মুখ্য আকর্ষণ।

দস্তয়েফস্কির নিন্দুকেরা এই অবাধ-সংসর্গের অপব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বুঝতে চান নি এটা কেবল মাত্র স্ত্রাখফে্র ভাষায় 'emancipation of the flesh' বাসনার নিরঙ্কুশ মুক্তি নয়—এমন সহজ কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে দস্তয়েফ্স্কি-চরিত্র তেমন সরলও নয়। জটিল, খুব জটিল ত বটেই অধিকন্তু ব্যথিত। প্রেমের পর্ব থেকে দাম্পত্য-জীবন অব্দি মারিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার গোটা অধ্যায়টা তাঁকে একটা পরম সত্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি নিদারুণ দুঃখ পেয়ে জেনেছিলেন—যৌনতার সঙ্গে সঙ্গোপনে জড়িয়ে থাকে যন্ত্রণা। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের এটা অজানা ছিল তা নয়, ভালবাসার সঙ্গে কষ্টের আঁচল বাঁধা এটা তাঁরাও জানতেন ; কিন্তু দস্তয়েফ্স্কির মতন মর্মে মর্মে টের পান নি বুঝি

কেউ, এমন মর্মান্তিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বুঝি ছিল না কারোরই। নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের মধ্যে বোদলেয়ারও দেখেছেন এই যন্ত্রণাকে, তিনি যৌন-সংসর্গকে আখ্যা দিয়েছেন 'শাস্তি' বলে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার সামিল করেছেন তাকে; পাওয়ার (মালিক হওয়ার) ইচ্ছাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'ক্ষতি করার,' 'কষ্ট সৃষ্টি করার' অধিকার বলে। বোদলেয়ার আরও বলেছেন, 'কামরতা নারীর কণ্ঠে যে কাতর শব্দ ওঠে, যে কান্না স্ফুরিত হয়, যার অর্থ যেন কেউ মারছে তাকে অত্যাচার করছে তার ওপরে—তার যে কোন তাৎপর্য নেই তা নয়, আসলে সে-কষ্টের স্বর পরম সুখেরই বেদনার্ত অভিব্যক্তি। কিন্তু বোদলেয়ারের যে-অভিজ্ঞতা দেহের দেয়ালেই সীমাবদ্ধ ছিল দস্তয়েফ্‌স্কি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন চিত্তবৃত্তিতে, বেঁচে থাকার সমস্যায়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সঙ্গে অত্যাচারের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দস্তয়েফ্‌স্কির শিল্পিমানস আগাগোড়াই আচ্ছন্ন করে ছিল। যৌন বিষয়ে তাঁর উপন্যাসগুলির প্রত্যেক নায়কের মনের গহনে গোপন থাকত দু'টি ইচ্ছে—হয় নত করা, নয় আনত হওয়া। এই ধর্ষ ও মর্ষকাম দস্তয়েফ্‌স্কি অন্যভাবে শিশুদের মধ্যেও দেখেছেন। ধর্ষকামী ছোট্ট মেয়ে প্রিন্সেস কাতিয়া নেতোচকা নেজভানোভাকে হাড়ে-মাসে জ্বালিয়ে খেত অথচ সে ছিল খেলার সাথীর প্রতি কাতিয়ার ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। আবার মর্ষকামী নেতোচকাও যে উৎপীড়িত হয়ে আনন্দ পেত, ওই ছোট্ট মেয়েটির প্রতি তার নিবিড় ভালবাসাই ছিল তার হেতু। 'অপমানিত ও লাঞ্ছিতে'র ভিখারী মেয়ে, নেলীই বা কী! তার উপকারী বন্ধু সহৃদয় ভানিয়াকে সে কত ভাবে ব্যস্ত অস্থির উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই, একবার তার আঙুল পর্যন্ত কামড়ে দিয়েছে, কিন্তু সে কী ঘৃণায় বিদ্বেষে? নাকি যে-ভালবাসা সে প্রকাশ করতে পারছে না তারই নির্মম তাড়নায়? 'জাপিসকি ইজ পদ্‌পোলিয়া' অন্ধকার খুপরি থেকে আলাপ ইংরেজী অনুবাদ 'নোটস ফ্রম দি আনডার গ্রাউণ্ড' উপন্যাসের নায়ক বলছে, 'ভালবাসা আসলে রয়েছে সেই উৎপীড়ন করার অধিকারের মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকাকে যা বিনা শর্তে দান করে।

মনস্তত্ত্বের এই বিষয়টি দস্তয়েফ্‌স্কির সব উপন্যাসেরই মৌল উপজীব্য; কেবল কোথাও মৃদু কোথাও তীব্র হয়ে উঠেছে এই যা পার্থক্য। তাই বলে পাঠক যেন না মনে করেন এটা তাঁর উপন্যাসে আকস্মিক ভাবে এসেছে অথবা পাঠকের মন টেনে রাখার একটা কৌশল মাত্র। কিংবা সব উপন্যাসেই এই বিষয়টি রয়েছে জেনে ভেবে নেবেন না যেন পুনরাবৃত্তি জনিত একঘেয়েমি রয়েছে তাঁর বইতে। এটা ঘটে

মিডিওকার লেখকদের বেলা, যাঁদের পুঁজি কম। দস্তয়েফ্স্কি ছিলেন দুর্লভ প্রতিভার শিল্পী, অভিজ্ঞতার বিশাল খনি একটা। প্রখর দৃষ্টির এই মানুষটির হাতে তাই প্রত্যেকটি রচনা—বিন্যাসে, শৈলীতে ও উপস্থাপনায় নূতন হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকটি বই পরস্পর থেকে এমন পৃথক হয়ে উঠেছে যে মনে হবে যেন তিনি প্রত্যেকবার নূতন কলমে নূতন কালিতে লিখেছেন তাঁর বই। তাই তাঁর লেখায় মাঝারি লেখকের মনোটনি নেই, জাত লেখকের কনট্রাস্ট আছে। থাকতে পেরেছে যেহেতু তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই রয়েছে ওই উপাদান; তিনি নিজেই ভুগেছেন দীর্ণ-মনোবৃত্তির ওই দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ও জটিলতায়। তাঁর প্রকৃতির মূলেই ওই সমস্যা বাসা বেঁধে ছিল বলেই তাঁর সব রচনাতেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের আকুল চেষ্টা স্বতই এসে গেছে। আর বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই জানেন যা স্বতঃস্ফূর্ত তা কখনো একঘেয়ে বা ক্লান্তিকর হয় না। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে নিজেকে যিনি ওজন করেছেন, শল্য-চিকিৎসকের মতন নিজেকে যিনি চিরে চিরে সমীক্ষা করেছেন তিনি কি কখনো একঘেয়ে হতে পারেন? সর্বোপরি তিনি ক্রীতদাসের মতন নয়, প্রভুর মতন লিখেছেন, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, তার মনোবিশ্লেষণের জন্যে কলম ধরেছেন। নিজেকে তিনি নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন ও যাচাই করেছেন; নিজের প্রত্যেকটি বোধ অনুভূতিকে অসংকোচে তুলে ধরেছেন। তদর্থে দস্তয়েফ্স্কির প্রত্যেকটি নায়কই বেনামিতে তিনি নিজে। প্রণয়িনী আপোলিনারিয়াকে তিনি যে কথা বলেছিলেন, 'ইগরোক্' (জুয়াড়ী) উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকেও ঠিক সেই কথাই বলেছে, 'তোমার ক্রীতদাস হতে পারলে আমি সুখী, সে আমার বিপুল আনন্দ।···পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকা, নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দেওয়া, কী আনন্দ কী সুখ!···শয়তান জানে হয়ত চাবুক খাওয়ার মধ্যেও আছে সেই সুখ। যখন তোমার পিঠে চাবুক পড়ে, পিঠের চামড়া ফেটে মাংস চিরে রক্ত বেরোয়, হয়ত তখনও এক ধরণের সুখ পাও তার মধ্যে।' এই মর্ষকামিতার কথা বলতে বলতে ধর্ষকামিতায় চলে এসেছেন তিনি, বলেছেন,'···বর্বর অপরিমিত-শক্তির মানুষ আবার অন্যরকম, তারা মেরে সুখ পায়, একটা মাছি মেরেও তাদের আনন্দ।' সাইবেরিয়ার কয়েদখানার দৃশ্য হয়ত তখন মনে পড়েছে, তাই বুঝি তিনি সখেদে বলেছেন 'মানুষ স্বভাবতই এমন নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী যে উৎপীড়ন অত্যাচার করতেও সে সুখ পায়।' 'ইডিয়েট' উপন্যাসে প্রিন্স মিশকিন রগোজিনকে বলছে, 'হেন জন নেই তোমার বিদ্বেষ আর ভালবাসার পার্থক্য বুঝতে পারে।' প্রবল

বাসনায় কাতর অস্থিরমতি নাসতাসিয়ার প্রেমের বলি হয়েছিল রগোজিন। যুবতী তাকে নিয়ে পোষমানা কুকুরের মতন খেলত অথচ সেই পরম পোষা মানুষটিই শেষমেশ খুন করে বসল যুবতীকে। 'পদ্রোসতক্' (এ রঅ য়ুথ) উপন্যাসের নায়িকা আম্মাকোভাকে খুবই ভালবাসত ভেরসিলফ্ কিন্তু সে ভালবাসা এমনই ঘৃণা আর শত্রুতার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হত যে, আম্মাকোভার আগেকার স্বামীর ছেলে তাই দেখে ভীষণ ক্ষেপে যেত। ছেলের সেই ক্ষেপামি দেখে একদিন আম্মাকোভার সে-কী উদ্দাম হাসি! সে-উদ্দাম হাসির অর্থ খুবই স্পষ্ট—অর্থাৎ ঘৃণা ও শত্রুতার মধ্যে দিয়ে উৎসারিত ভেরসিলফের গভীর প্রেম পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করত মর্ষকাম-অভিজ্ঞা রমণী আম্মাকোভো। 'ভেচনি মুঝ'-এর (দ্য ইটারন্যাল হাজব্যাণ্ড) নাতালিয়া ছিল আবার ধর্ষকামী। যুবতীর স্বভাবে পুরুষ বশ করার শক্তি যেমন ছিল তেমনি ছিল তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার নেশা। সে তার প্রণয়ীদের উৎপীড়ন করতে ভালবাসত অবশ্য উৎপীড়িতের যন্ত্রণা লাঘব করতেও সে এতটুকু কসুর করত না। 'বেসী' (দ্য পজেজ্‌সড) উপন্যাসের স্তাভ্‌রোগিন ভালবাসত একটি বিকলাঙ্গ মেয়েকে। সে তাকে বিয়েও করে ফেলল। স্তাভ্‌রোগিনের ভালবাসা বিশুদ্ধ প্রেম ছিল না, ছিল উপহাস আত্মাবমাননা আর এক ধরণের কৌতূহল। তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছিল মেয়েটাকে জব্দ করে রাখা এবং তার ওপরে দৌরাত্ম্য করার ইচ্ছে। 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' (দ্য ব্রাদার্স্ কারামাজোভ) উপন্যাসের বুড়ো কারামাজোভও দাসী চাকরানী আর অসহায় মেয়েদের মধ্যে নিজের তৃপ্তি খুঁজত; সেও ভাবত যারা অসহায় অবহেলিত, অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ে যাদের বাস, যাদের দিকে কেউ পারৎপক্ষে ফিরেও তাকায় না, তাদের যে-পুরুষ পছন্দ করে তারা তাকে পা-চাটা কুত্তার মতন ভালবাসে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এটা 'প্রেস্‌তুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে' (পাপ ও শাস্তি) উপন্যাসের স্ভিদ্রিগাইলফ্‌ও ভালই জানত। তার ধর্ষকাম ছিল দেহ-পীড়ন। সে তার বউকে ধরে চাবকাত আর তাই করতে সে যৎপরোনাস্তি মজা পেত। এ-হেন ব্যক্তিই আবার যখন টের পেল অনভিজ্ঞা যুবতীটির মনের ওপরেও তার প্রবল প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাকে মেয়েটা খুব ভালবাসে তখন সে আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠল। এমন সব প্রভুত্ব-বিলাস ও শারীরধর্ষণের দৃশ্য প্রায় সব উপন্যাসেই ছড়িয়ে আছে তাঁর। কিন্তু এটার ওপরে সবিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি 'বেসী' উপন্যাসে। এখানে ক্যাপটেন লেবিয়াদ্‌কিন তার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে তার বোনের পিঠের ছাল তোলে, নিকোলাই

স্তাভ্‌রোগিন দমবন্ধ উত্তেজনায় দেখে তার জন্যেই বার্চের ডালের মার খাচ্ছে বারো বছরের বাচ্চা মেয়েটা। শেষমেশ সেই বাচ্চা মেয়েটার ওপরেই পাশবিক অত্যাচার করে স্তাভ্‌রোগিন।

পরিণত বয়েসে দস্তয়েফ্‌স্কির যৌন-স্বভাবে উপরি-উক্ত সমস্তগুলি বিকৃত-বৃত্তির সমন্বয় ও প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর ভালবাসার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বেদনা ও দুঃখভোগের নেশা। নারী-সংসর্গের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দেহ-পীড়ন। আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতাজনিত সমস্ত রকম ভাবাবেগ।

১৮৮৩-তে দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনীকার স্ত্রাখফ্‌ দস্তয়েফ্‌স্কি সম্পর্কে তলস্তয়কে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি দস্তয়েফ্‌স্কিকে চিত্রিত করেছিলেন এই ভাবে, "…দস্তয়েফ্‌স্কির ছিল পশু-কাম। তাঁর কোন রুচি বোধ ছিল না এ ব্যাপারে। নারীর রূপ-লাবণ্যের জন্যে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না, সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করতেন না…।" এতবড় অভিযোগের সঙ্গে তাই বলে কেউ একমত হবেন না, কেন না, এ-বিচার আদৌ নিরপেক্ষ নয়। কারণ ইডিয়েট-এর নাসতাসিয়া ও আগলাইয়া বিশেষ করে 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'র গ্রুশেংকার মতন মনোহারিণীরাও তারই মরমী মনের সৃষ্টি। হয়ত স্ত্রাখফ্‌ বলতে চেয়েছেন, নারীর মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কি সৌন্দর্য কিংবা লাবণ্য দেখতে চাননি, কেননা সে-নারীর বহির্বস্তু। তিনি তাদের অন্তর্বস্তু দেখতে চেয়েছেন। তারই সন্ধানে তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সেই নিবদ্ধ নিগূঢ়-দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নারীর আত্মরক্ষায় অক্ষমতা, অসহায়তা, তার বশ্যতা শরণাগতি ও সহিষ্ণুতা। অন্য দিকে ভালবেসে দুঃখ পাওয়ার নেশা, প্রিয়-র কাছে নিজেকে অপাংক্তেয় করার ইচ্ছে, সুখের মধ্যে কষ্টকে, কষ্টের মধ্যে সুখকে ভোগ করার স্পৃহা। আসলে এগুলি তাঁর নিজেরই অন্তঃপ্রকৃতির দ্বিধাবিভক্ত দুই রূপ। তিনি যাদের ভালবেসেছেন কি যারা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, তাদের মধ্যে তিনি নিজের ওই দ্বিধাবিভক্ত অন্তর্বৃত্তিকেই প্রতিফলিত দেখেছেন, তারা যেন ছিল তাঁর অন্তঃকরণের আরশি। যে-সব নারী তাঁর এই আরশি হতে পারে নি তাদের তিনি ভালবাসেন নি, কি তারা তাঁকে আকর্ষণও করতে পারে নি।

তিনি তাঁর দ্বিখণ্ডিত অন্তঃপ্রকৃতির দুই বিপরীত মেরুতে সব সময় দুলতেন। কি স্ত্রীর সঙ্গে, কি প্রণয়িনীর সঙ্গে, কি রাস্তার মেয়েদের সঙ্গে অর্থাৎ যখনই যার নিবিড় সাহচর্যে এসেছেন তিনি, তাঁর ভিতরকার দ্বন্দ্ব সংঘাত দ্বিধা

দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। ফ্রয়েড তাঁর বন্ধু থিওডোর রাইখকে লিখেছিলেন, 'ভালবাসার ব্যাপারে দস্তয়েফ্‌স্কির অসহায় অবস্থাটা লক্ষ্য করেছ ত? ভদ্রলোক এ-ব্যাপারে বুঝতেন মাত্র দু'টো জিনিস, হয় পশুর মতন নিকৃষ্ট উপায়ে ভোগ অথবা মর্ষকামীর মতন কেবল দুঃখ পাওয়ার জন্যে আত্মসমর্পণ। 'দয়া পরবশ হয়ে ভালবাসার' নজিরও আছে অবশ্য।'

স্ত্রাখফ্‌ বলেছেন, দস্তয়েফ্‌স্কি নাকি তাঁর কুরুচির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে অহংকার করতেন। অধ্যাপক দিস্কোভাতফ্‌ তাঁকে বলেছিলেন, দস্তয়েফ্‌স্কি একদিন সগর্বে বলেছিলেন, একটা কুখ্যাত গোসলখানায় একটা বারো বছরের মেয়েকে নিয়েছিলেন তিনি, মেয়েটিকে নিয়ে পথে নেমে ছিল তার দাই।

দস্তয়েফ্‌স্কির কোন কোন জীবনীকার বলেন, ওটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা নয়। অন্য একজনের কথা নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে তিনি শ্রোতাদের অন্ধ সংস্কারের গভীরতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তবু অবশ্য সংশয় যায় না। কেন না দস্তয়েফ্‌স্কি বিশ্বাস করতেন, এগুলি 'মানবীয় প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।'* যদিও এ-প্রবৃত্তিগুলি তাঁর মধ্যে প্রশ্রয় পাচ্ছে জেনে ভয় ও সংকোচের অবধি ছিল না তাঁর। তিনি মানুষের মধ্যে অসুখের মতন বারবার এর আনাগোনা দেখেছেন। দেখেছেন তার প্রভাবে মানুষকে অস্থির অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে। তাই এ-বৃত্তিগুলির হাত থেকে পালাতে চাইতেন তিনি, এ-বৃত্তিগুলিকে মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে চাইতেন। অন্ধ শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁকে প্রতারণা করত, তিনি কৃতকর্ম বেঁফাস বলে ফেলতেন বন্ধুদের কাছে। বইতে লিখতেও কসুর করেন নি। 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' উপন্যাসের প্রিন্স ভালকফ্‌স্কি (যাঁকে আমরা 'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ্‌ ও 'বেসী'র স্তাভ্‌রোগিনের পূর্বসূরী বলতে পারি) একদিন ভানিয়াকে বলেছিলেন, 'যদি এটা কোনমতে সম্ভব হত—অবশ্য মানুষের প্রকৃতিই এমন যে এটা কখনো সম্ভব হবে না —আমরা সবাই যদি আমাদের গোপন কাজ-কারবারগুলি প্রকাশ্যে বলতে পারতাম, যেগুলি বন্ধুদের কাছে এমন কি কখনো কখনো নিজের কাছেও স্বীকার করতে ভয় পাই, উঃ তাহলে এমন বীভৎস গন্ধই না বেরত তার থেকে যে সে-গন্ধে গোটা

---

* 'DOSTOEVSKY AS A PERSON' প্রবন্ধে বরিস বুর্সভ কান্টীয় ভাষায় লিখেছেন, "Genius is a human being and nothing human is foreign to it." (Soviet Literature. NO. 10. 1971)

দুনিয়ার মানুষের দম বন্ধ হয়ে যেত। সে-দিক থেকে বিচার করলে আমাদের এই সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি সত্যি খুব ভাল। তার মধ্যে একটা সুচিন্তিত ব্যাপার আছে, আমি নীতি-টিতির কথা বলছি না। আমি বলছি, সতর্কতার কথা, সোয়াস্তির কথা। সে-দিক থেকে সামাজিক সুনীতি বোধটাও একটা সোয়াস্তি সন্দেহ নেই। আমি বলছি কি, এ-সব এ-সোয়াস্তির জন্যেই আবিষ্কার হয়েছে।'

ওপরের ওই কথাগুলি দস্তয়েফ্‌স্কি লিখেছিলেন ১৮৬১-তে। তার দু' বছর পরেই তিনি এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করলেন—সামাজিক নীতি-বিধির মধ্যে আত্মগোপন করে সোয়াস্তি পাওয়ার কথা যার আদৌ মনে থাকল না অথবা গ্রাহ্য কবল না। কিংবা ওই মিথ্যা-সংস্কারের নীতিবিধিগুলির মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে এল সে তার মন-গহনে লুকনো বাসনা ও গোপন কাজগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে। উঃ কী ভয়ংকর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত, কী করুণ বাস্তব অথচ বীভৎস চরিত্রই না তিনি আঁকলেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ। এই নায়ক তার বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিল এক অসহায় যুবতীর ওপরে। লিজাকে সে পেয়েছিল এক কুখ্যাত পল্লীতে। সেখানে সে লিজাকে নিয়ে নানা কুৎসিত ও নিষ্ঠুর মজা করত। অথচ এই হতভাগিনীকে সে যে ভালও বেসে ফেলেছিল পরম আতঙ্কের সঙ্গে সে-কথাও সে নিজের কাছে স্বীকার করেছে।

আসলে সত্যনিষ্ঠ শিল্পী নিজেরই অন্তরের গভীরে প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তিগুলিকে বাইরে বের করে এনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোতে পরীক্ষা সমীক্ষা করতে চেয়েছেন, এবং তাই করতে চেয়ে সামাজিক সংস্কার নিষেধের তোয়াক্কা করেন নি।

এ-পরীক্ষা নিরীক্ষার পাত্রী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিল অনেক কিন্তু তাদের কারো সঙ্গেই পলিনার তুলনা হয় না। তাঁদের সম্পর্ক এমন জটিল ও মর্মান্তিক হয়ে ওঠার কারণ ভাবাবেগ ও চিত্তবৃত্তিতে এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় উভয়েই ছিলেন প্রায় সমান স্তরে।

'ভ্রেমিয়া'র অফিসে পলিনার সঙ্গে যেদিন দেখা হল তাঁর তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, ওই যুবতীকে কেন্দ্র করে শুভ ও অশুভের, আনন্দ ও যন্ত্রণার কী ঝড় তুমুল হয়ে উঠবে তাঁর জীবনে?

চার

১৮৬১-র আগস্ট মাসে একদিন সকাল বেলা ভ্রেমিয়ার দফ্‌তরে, দস্তয়েফ্‌স্কির টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল এক যুবতী।

টেবিলে এলোমেলো ছড়ানো বই পত্রিকার ডাঁই, সামনে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় রাশিকৃত প্রুফ। দস্তয়েফ্‌স্কি ঘাড় গুঁজে প্রুফ দেখছিলেন। যুবতী তাঁর সামনে একটি পাণ্ডুলিপি রাখল।

'কী ?' চমকে উঠে মুখ তুললেন তিনি।

'একটি গল্প, আশা করি আপনার কাগজে জায়গা হবে।' মৃদু অথচ দ্বিধা নেই গলার স্বরে। দস্তয়েফ্‌স্কির চোখে চোখ রাখল সে। ঠোঁটে আত্মপ্রত্যয়ের এক চিলতে হাসি ঝুলে আছে; দস্তয়েফ্‌স্কি দেখছেন: রূপসীর বয়স বছর কুড়ি-একুশ হবে। লম্বা পাতলা শরীর। লাবণ্যের সঙ্গে রুক্ষতা মেশান শক্ত চেহারা। খাটো করে ছাঁটা ঘন ও গাঢ় লাল প্রায়-কৃষ্ণবর্ণ চুল। বিস্তৃত ঠোঁট। আধুনিকা—যেন শুধু বয়সে নয় মনেও। যেন সমাজ রাষ্ট্রের গতানুগতিক ধারার প্রতি অসন্তুষ্ট যারা সব কিছু ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর তাদের প্রথম সারির একজন। কিন্তু এ সব দস্তয়েফ্‌স্কি অন্যমনস্ক মনে দেখলেন, ভাবলেন, বিমনা-মানুষটির মাথায় তখন কাজের তাড়া।

যুবতী আবার কথা বলল, 'গল্পটা পড়ে দেখবেন।' স্বরে অনুরোধ কিন্তু সুরে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

দস্তয়েফ্‌স্কির অন্যমনস্কতায় এবার চিড় ধরল, যুবতীর প্রতি মনস্ক হলেন তিনি—'ও নিশ্চয়, পড়ব বই কি, যত্ন করে পড়ব।' বললেন, 'গল্পটি আমাদের কাগজের জন্য এনেছেন বলে ধন্যবাদ।' না পড়েই যেন ছাপবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন তিনি।

যুবতী এবার ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল, 'জানেন আমি আপনার সব লেখা পড়ি। আপনার 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত' পড়ে ফেলেছি, অপূর্ব বই। 'স্তেপানচিকোভো'ও চমৎকার—ফোমা-ফোমিচের মধ্যে আমি খাঁটি রুশী চরিত্রের স্বাদ পেয়েছি।'

'তুমি আগ্রহ করে আমার বই পড়েছ জেনে খুশী হলাম, ধন্যবাদ।' তিনি তাঁর প্রুফের রাশির দিকে তাকালেন, অসম্পূর্ণ কাজ তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল, মেয়েটিকে বুঝি বিদায় দিতে পারলে বাঁচেন।

কিন্তু মেয়েটির যেন যাবার নাম নেই. বললে, 'শুধু বই পড়েছি নাকি, আপনার লেখা আপনার মুখে শুনি নি ?'

'কোথায় ?'

'কোথায় আবার!' তিরস্কারের হাসি ও স্বর মেয়েটির গলায়। 'সেদিন য়ুনিভারসিটিতে 'মৃত্যু-পুরীর স্মৃতি' থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন না আমাদের ? উঃ শুনতে শুনতে সে কী উত্তেজনা আমাদের, কী বলব, একটা অজানা বীভৎস যন্ত্রণার জগতের খবর দিয়ে আপনি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন।'

'তোমাদের মুগ্ধ করতে পেরেছি, উত্তেজিত করতে পেরেছি ? ভাল খুব ভাল', অনিশ্চিত কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন তিনি। বললেন, 'আচ্ছা এবার এস।' যুবতীর সঙ্গে তিনিও সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এলেন, আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমার গল্প আমরা খুব চেষ্টা করব ছাপতে।'

রাস্তায় পা দেবার আগে যুবতী হাত বাড়িয়ে দিল। দস্তয়েফ্স্কি হাত তুলে নিলেন হাতে। নেওয়ার আগে দ্বিধা করলেন দু'পলক। এক পলকে করমর্দন শেষ করে হাত ছেড়ে দিলেন। যুবতী চলে গেল।

দেয়ালে ঝুলনো ছিল একটা আরশি। টেবিলে ফিরে যেতে যেতে সে-দিকে চোখ পড়ল তাঁর।—মস্ত কপাল, পরিচ্ছন্ন গোঁফ, সরল ভ্রূ-রেখা, চওড়া কাঁধ, চল্লিশ বছরের পুরুষ—যুবক (?) না, দস্তয়েফ্স্কি নিজেকে আজ আর যুবক ভাবেন না। তিনি চল্লিশ বছরের নানা কষ্টের আগুনে ঝলসানো এক অসুস্থ অ-প্রকৃতস্থ পুরুষ। কাজেই বিশ বছরের ওই জ্বলন্ত কয়লার মতন মেয়ে আপোলিনারিয়া প্রকোফ্য়েভনা সুস্‌লভার সঙ্গে তাঁর কখনো প্রেমের সম্পর্ক হবে সেদিনই তিনি তা ভাবতে পারেন নি। তাঁর ত ডন-জুয়ানের মতন রমণী-দর্পহারী লাবণ্য নেই। আরশির দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি নূতন করে জেনে নিলেন, চেহারা দিয়ে তিনি কোন যুবতীর মনোহরণ করতে পারবেন না।

তাঁর চেহারা ? দস্তয়েফ্স্কির সমকালীন লেখক ই. স্তাকেনশেনেইদার লিখেছেন—"দস্তয়েফ্স্কি আর যুবক নন তখন। তাঁকে ক্লান্ত মানুষ, রুগ্ন মানুষের মতন দেখাত। অনেকদিন রোগে-ভোগা নিরক্ত-হলুদ দেখাত তাঁকে। মুখে আঁকিবুকি রেখায় স্পষ্ট হয়ে থাকত দৈন্য, দুঃখ ও জেল-যন্ত্রণার চিহ্ন। প্রশস্ত কপালের নিচে চকচকে চোখে সব সময় থাকত সৃজন-চিন্তা ও নিবিড় বোধের গাঢ় দৃষ্টি। যে-কোন মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠার জন্যে অস্থির অথচ প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তির লাগামে বাঁধা যেন সব সময় শৃংখলিত রেখেছেন নিজেকে। তাই শান্ত, বেশ বিমর্ষ দেখাত তাঁকে। অন্তরের আবেগ সহজে প্রকাশ পেত না কিন্তু আবেগ-আক্রান্ত মুহূর্তে কথা বলার সময় কিংবা বিরক্ত হলে নিচের ঠোঁটটা

মুচড়ে মুচড়ে উঠত কেঁচোর মতন। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে ঠোঁট কামড়ে ধরতেন। দেহের রং বিবর্ণ-হলুদ হলেও বৃষস্কন্ধ দৃঢ়দেহী মানুষটিকে আমি যে-দিন প্রথম দেখি, আমার মনে হয়েছিল যুদ্ধ-ফেরৎ, জেল-খাটা, হাসপাতালে-থাকা যেন কোন পযুদস্ত সৈনিক।"

দস্তয়েফ্‌স্কি এসে নিজের চেয়ারে বসলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। যুবতীর কথা আর মনে রইল না তাঁর।

পলিনা তাঁকে এক আবেগ উচ্ছ্বসিত গাঢ় মমতার পত্র না লিখলে, তাঁর সঙ্গে আর দেখা না করলে, দ্বিতীয়বার আর তাকে মনেও পড়ত না, প্রেম-ঘটিত বিষাদ-যন্ত্রণায় দ্বিতীয়বার কষ্ট পেতে হত না তাঁকে।

এ পর্যন্ত দস্তয়েফ্‌স্কি মিশে এসেছেন অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, পলিনাতে এসে তার ব্যতিক্রম ঘটল। নীল-রক্তের নির্জীব মানুষদের হাত থেকে খসে লাল-রক্তের দুরন্ত জীবনের সাহচর্যে এলেন। পলিনার বাবা প্রকোফি সুস্‌লফ্‌ ছিলেন ভোলগা নদীর ধারে নিঝ্‌নি নভ্‌গোরোদ জেলার পাজিনো গ্রামের মানুষ। ধনী জমিদার কাউন্ট শেরেমৃয়েতেফের ভূমিদাস ছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের বুদ্ধির জোরে দাস-প্রথা উচ্ছেদের আগেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন; শুধু তাই না, ওই মনিবের অধীনেই একটা সম্মানের চাকরিও আদায় করে ছিলেন। কিন্তু চতুর ও পরিশ্রমী মানুষটি আত্মপ্রসাদে তুষ্ট হয়ে সেখানেই থেমে থাকেন নি, কর্ম-কৌশলে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছেন। ষাটের দশকে যখন পিতার্সবুর্গে এলেন তখন আর তিনি শুধু একজন ধনাঢ্য বণিক নন একটা বড় রকমের টেকসটাইল ফ্যাকটরির মালিকও বটেন। সুতরাং ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে তাঁর কষ্ট হয় নি। ছেলে মসকোআতেই শিক্ষা সাঙ্গ করে বাবার ব্যবসায়ে ঢুকেছে। মেয়ে দু'টি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে একজন ভর্তি হয়েছে আকাদমি অব মিলিটারি সারজারিতে। সে ছোট। নাম নাদেকদা। বড় পলিনা, আমাদের নায়িকা, ঢুকেছে পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ হেন পরিবারের মেয়ে ও আর্টের ছাত্রী বলেই যে পলিনা নয়া-জমানার সংস্কার-মুক্ত সমাজের খাঁটি প্রতিনিধি হবে, রক্তের দাবিই পাবে তার কাছে অগ্রাধিকার, স্বাভাবিক। সেই রক্তের দাবিতে সাড়া দিতেই যেন এগিয়ে এল পলিনা।

সেই প্রথম দিন অফিসে এসে গল্প দিয়ে যাওয়ার পরে আরও কয়েকবার পলিনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। কখনো মিখাইলের বাড়িতে, কখনো য়ুনিভারসিটিতে, কখনো কোন সাহিত্যের আসরে। শেষে একমাস পরে একদিন

একলা দেখা হল সেপটেমবরে। রাত তখন দশটা। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে। নির্জন অফিসে তন্ময় হয়ে লিখছিলেন তিনি, হঠাৎ একটা মৃদু সপ্‌ সপ্‌ শব্দ হতেই ফিরে তাকালেন।

'এই ত আপনি এখনও রয়েছেন, গুড্‌ ইভ্‌নিং।' ভেজানো দরজা দ্বিধা বিভক্ত হল, ফাঁক দিয়ে ভেসে এল ভিজে বাতাসের সঙ্গে মৃদু মধুর একটি স্বর। এবং সেই মুহূর্তে মিষ্টি একটি মুখও ফুটে উঠল সেখানে—'পলিনা?'

অবাক হলেন, খুশীও হলেন কিন্তু কেমন যেন বিহ্বলও হয়ে গেলেন তিনি। 'গুড্‌ ইভ্‌নিং, গুড ইভ্‌নিং' বলতে বলতে একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'এস এস। কী, খুব ভিজে গেছ বুঝি?' আশংকা প্রকাশ করলেন তিনি।

'ও কিছু না।' তাচ্ছিল্যের গলায় জবাব দিল সে। ওভার কোটটা খুলে ঝাড়া দিয়ে খুশীখুশী গলায় বলল—'আপনাকে এখন অফিসে পাব ভাবি নি, কী ভাগ্যি!' ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তার। কুঁড়ির মতন হাসিটা ফুলের মতন ফুটতে ফুটতে ছড়িয়ে গেল সারা মুখে।—'আপনি আমার গল্পটা ছেপেছেন। আপনি বড় ভাল, খুব ভাল। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই আমার।'

পলিনার দিকে তাকিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির মনে পড়ল মিখাইলের কথা—'এ তুমি কী গল্প প্রেসে পাঠাচ্ছ, এ আবার একটা গল্প হয়েছে নাকি?' দস্তয়েফ্‌স্কি কৈফিয়ৎ দিতে চেয়ে মিখাইলকেই সমর্থন করে বলেছিলেন, 'না, সাহিত্য বলতে যা বোঝায় এ গল্প তার ধারে-কাছেও নয় তবু ছাপতে দিলাম কেন জান, গল্প না হলেও জীবনের বাস্তব দিকটার উপলব্ধি আছে এতে। লেখিকা দুঃখী মানুষের অন্তর্বেদনা অনুভব করেছেন অবশ্য ভাসা ভাসা ভাবে।'

পলিনা তখনও বলে চলেছে—'ভ্রেমিয়ার মতন কাগজে আমার গল্প বেরিয়েছে, আহ্‌, কী যে অহংকার হচ্ছে আমার।'

পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল পলিনা এবার ঘাড় কাৎ করে হেসে উঠল। তার দাঁড়ানোর মাদক ভঙ্গিতে মদির হাসিটি যুক্ত হতেই চমকে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। পলিনার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর চোখ: ভারী নিতম্ব সরু কোমর পীন বক্ষ—আঁটো জামার চাপে যৌবনের রেখাগুলি ইঙ্গিতময়। দু'টি পা উরুর অনতিঊর্ধ্বে এসে স্কার্টের নিচে মিশে আছে, গোটা শরীর যেন বসন্তের একখানি রঙিন নিমন্ত্রণ-পত্র।

'গল্পটি চমৎকার হয়েছে,' অন্যমনস্ক গলায় বললেন তিনি। মন তখনও ভ্রমরবৃত্তি ভোলে নি। তিনি রূপসীর লাবণ্য দেখছেন, মসৃণ ত্বকের উজ্জ্বল বাদামী হলুদ বর্ণ দেখছেন; চোখ, হ্যাঁ এমন চোখ যার তাকেই বুঝি বলে বেড়ালাক্ষি।

'আমি আর একটা গল্প ভাবছি। মাথায় এসে গেছে প্লটটা।'

'বস না, বসে কথা বল।' দস্তয়েফ্স্কি লাজুক মুখে হাসলেন। বুঝতে পেরেছেন, আদ্দেক বয়েসী মেয়েটির সামনে কেমন বোকা-বোকা হয়ে গেছেন তিনি। 'আমার চল্লিশ বছর বয়েস', নিজেকে যেন সতর্ক করলেন তিনি, যুবতীর সারা অঙ্গ থেকে যৌবনের তাপ বেরোচ্ছে, জোয়ার বইছে, বসন্তের ওই উষ্ণ প্রস্রবণের বেগ বুঝি পা হড়কে দিতে চাইছে তাঁর।

'আমার গল্পটা সত্যি আপনার ভাল লেগেছে?' কৌতুকে কৌতূহলে টলটল করছে যুবতীর চোখ। চোখে ঠোঁটে গালে বার বার ঢেউ হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। 'আপনার লেখা কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগে।' পলিনা এখন বসতে বসতে বলল।

দস্তয়েফ্স্কিও বসলেন।

'আপনার 'অভাজন' (বেদনিয়ে লিয়ুদি) আমি পড়ে ফেলেছি অনেকদিন আগেই। এখন আপনার জেলের অভিজ্ঞতা পড়ছি পাগলের মতন। শুধু নিজে পড়ি না, যাকে পাই তাকেই পড়ে শোনাই আপনার ধারাবাহিক লেখাটি।' বুদ্ধি-প্রখর চোখ দুটি দস্তয়েফ্স্কির চোখে রেখে বলল—'অদ্ভুত, চমৎকার, এমন লেখা হয় না, এমনটি আর কেউ লিখতেও পারবে না। এ-অভিজ্ঞতা কারই বা আছে।' বলতে বলতে মহিলার চোখে রোশনাই জ্বলে। 'আমি আপনার 'নেতোচকা নেঝভানোভা'ও পড়ছি এখন। 'পিতৃভূমি' কাগজটার পুরনো ফাইল আমি জোগাড় করে ফেলেছি। আপনার নাম নেই তাতে; কিন্তু কে না-জানে ও-লেখা আপনার। অতুলনীয় লেখা।' বলার ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠ স্বর, স্বরে আবিষ্ট ভাব। বুদ্ধি আর আবেগ দু'টোই যেন যুবতীর অ-বশ্য।

'হুঁ, অনেকদিন আগেকার লেখা। অনেকখানি লিখে ফেলেছিলাম। সামান্যই বাকি ছিল। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না। বাধা পড়ল। তারপরে ত জানই, কত ঝড় গেল জীবনের ওপর দিয়ে। এখন আর ও-লেখায় হাত দিতে ইচ্ছে করে না। হাত দিলেও বোধ হয় আর লিখে উঠতে পারব না। সেদিনের মন মেজাজ আজ আর নেই।' নিজের কথার মধ্যে ডুবে যেতে

চাইলেন, অস্বীকার করতে চাইলেন যুবতীর যৌবনের টান ; কিন্তু না, মেয়েটা তাঁকে ভুলতে দিচ্ছে না। ওর তাপ ওর টান ওর দীপ্ত বিভা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ কী ওর স্বেচ্ছাকৃত ? ও কী নিজেকে সমর্পণ করতে চায় ওর শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়ে ? বুঝি চায়। দস্যু হয়ে উঠতে ইচ্ছে করল দস্তয়েফ্‌স্কির। কিন্তু না, না, বয়েসের বড় ব্যবধান। নিজেকে সবলে সংযত করলেন তিনি।

সেদিন এভাবেই তাঁদের সাক্ষাৎকার শেষ হল। অনেক গল্প করে শেষে বাড়ি চলে গেল পলিনা। দস্তয়েফ্‌স্কি আবার লেখায় মন দিলেন। কিন্তু এর পরে আর মন বসে কী! মারিয়ার কথা মনে পড়ে। খিটখিটে মানুষটা তাঁর সংসার-জীবনে কী বিষ ঢেলে দিয়েছে, ভাবেন। ভাবতে ভাবতে ব্যর্থ বঞ্চিত ক্ষুধার্ত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিমুখ হয়ে ওঠেন। পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত পড়ে থাকে। ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফেরেন তিনি।

কিন্তু পলিনাকে ভুলতে পারেন না। পলিনাই যেন ভুলতে দেয় না। সাহিত্যের আসরে বন্ধুদের আড্ডায় য়ুনিভারসিটিতে—তাঁর জীবন-বৃত্তের মধ্যে পলিনা বারে বারে এসে পা দিচ্ছে। যেখানে যখনই দেখেন তাকে, একটা অদৃশ্য অমোঘ টান অনুভব করেন, নিয়তিই যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে ফেলেছে তাঁদের।

আর একদিন আর একবার ওমনি এক বৃষ্টি-ভেজা রাত্তিরে 'ভ্রেমিয়া'র অফিসেই এসে হাজির হল পলিনা।

তাঁর এতাবৎকালের সব রচনা শেষ করে ফেলে শ্রদ্ধায় প্রশংসায় প্লুত হয়ে গেছে যুবতী, অস্থির হয়ে উঠেছে, তাই আর একবার তাঁকে একলা পাওয়ার জন্য ছুটে না এসে থাকতে পারে নি।

এবার সে আরও ঋজু আরও স্পষ্ট, ঘনিষ্ঠ ; বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই কোথাও। স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছে যেন বন্ধু, যেন অন্তরঙ্গ কেউ।

দস্তয়েফ্‌স্কিকে শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে প্রশংসা করতে করতে মুগ্ধ পাঠিকার চোখে কখনো জোনাকী-প্রদীপ জ্বলছে কখনো আবেগের মেঘে আর্দ্র হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। লেখক দেখছিলেন, যুবতী যেন খাঁটি ছাত্র-চরিত্র একটি। সত্তায় শুষে নিয়েছে সে ছাত্র-জীবনের সব বৈশিষ্ট্য—নির্ভয়, নির্বিকার, নিরুদ্বেগ, নিরঙ্কুশ কলেজিনীর খাম-খেয়ালীপনা যেন তার প্রকৃতি অব্দি দখল করে বসে আছে— কিংবা যৌবনের ধর্ম। মুহুর্মুহু সিগারেট খাচ্ছে, দুঃসাহসিক মন্তব্য করছে, সমাজ-সংসারের সব সংস্কার অস্বীকার করে দেহ-মনের সাধ মেটানোর কথা

অকপটে বলছে—অথচ সবকিছু জড়িয়ে সবকিছু ছাড়িয়ে একটা অব্যাখ্যেয় বিশেষত্ব মাঝে মাঝেই চকমকিয়ে উঠছে ওকে ঘিরে। ওর ওই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য যেন ক্রমশ অভিভূত করে ফেলছিল দস্তয়েফ্স্কিকে কিংবা একুশটা বসন্তের শুশ্রূষায় সমৃদ্ধ শরীরটা আকুল করছিল তাঁকে। তিনি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে হাত ধরে ফেললেন পলিনার। পলিনা হকচকিয়ে গিয়ে তাকাল তাঁর দিকে, দৃষ্টিতে তার বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা।

হঠাৎ পলিনার হাত ধরে ফেলতে পেরে বুকের মধ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস বোধ করলেন এবং তিনি কী বলতে যাচ্ছেন না জেনেই ঠিক করে ফেললেন কিছুই বলবেন না, বলা অসম্ভব। কারণ তন্মুহূর্তেই তিনি টের পেয়ে গেছেন, তাঁর মনের বাসনা কী, কোন্ দিকে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর অন্ধ আবেগ, সব বিধি-নিষেধ ডিঙিয়ে তিনি যেন এগিয়ে যেতে বেপরোয়া। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর স্নায়ু-শিরা টানটান হয়ে উঠেছে, রক্ত তপ্ত হয়ে সারা শরীরে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে, যেন তাঁর জ্বর হয়েছে। তিনি তাকে টেনে ঘরের আর এক কোণে ডিভানের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। পলিনা তার হাত গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল একবার। দস্তয়েফ্স্কি ছাড়েন নি। সেই থেকে তার হাত শিথিল হয়ে আছে তাঁর হাতে। পলিনার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। সে বেশ শান্ত। অথচ কী ঘটতে যাচ্ছে জানতে কৌতূহল, তার চোখেমুখে খানিকটা যেন ব্যস্ততাও বটে।

তার পরেই যেন ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে সে, সতর্ক করে দিতেই হয়ত ডাকল—'ফিওদর মিখাইলোভিচ্!' ডেকে চুপ করে গেল। দস্তয়েফ্স্কি পলিনার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা কাগজের ওপরে চোখ রাখলেন, দু'জনেই নিঃশব্দ। দস্তয়েফ্স্কির সর্বাঙ্গে তখন একটা বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষা কেন্নোর মতন সহস্র পায় পিল্পিল্ করে হাঁটছে। বাইরে বৃষ্টির অনর্গল শব্দ আর ঘরে অবিচ্ছিন্ন অস্থির নীরবতা—একটা অবাস্তব অবস্থা যেন। দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে একটা বোধ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, পলিনার চোখে তিনি আর মহান নায়ক নন, তুচ্ছ একটা ইঁদুর হয়ত। নিজেকে এমন তুচ্ছ এমন জঘন্য করে ফেলে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। এতক্ষণে আবার চোখ তুলে তাকালেন পলিনার দিকে। যা ভেবেছেন তাই। চোখে অবজ্ঞা যুবতীর, ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। তিনি এবার পলিনার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, বুকে মুখ চেপে ধরলেন।

'ফিওদর মিখাইলোভিচ!' অনুচ্চ কঠিন গলায় ডাক দিল পলিনা যেন নিশি-পাওয়া মানুষটাকে সজাগ করতে চাইল অথবা যে-কাজ তিনি করতে যাচ্ছেন তার দায়িত্ব বিষয়ে। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। মুক্ত করতে চাইল নিজেকে। দস্তয়েফ্স্কি তখন সজোরে তার জানু চেপে ধরেছেন—'দয়া কর, দয়া কর পলিনা, তোমাকে আমি চাই, আমাকে···তুমি ··'

নিজের আকুল কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল তাঁর, নিজের ওপরে বিরক্তির অবধি রইল না। তাঁর এক সত্তা আর এক সত্তাকে দেখছে আর হাসছে। তাঁর স্থিতধী সত্তার বিদ্রূপ তাঁর প্যাশান-বিমূঢ় আর এক সত্তা অনুপায় হয়ে হজম করছে। নিজের মধ্যেকার সেই দ্বন্দ্ব যখন দেখছেন তিনি তখন তাঁর ভারে পালিনা ডিভানের ওপর কাত হয়ে পড়েছে। এলোমেলো হয়ে গেছে তার পোশাক। সে-দৃশ্যের তাড়নায় তিনি আত্মদ্বন্দ্ব ভুলে গেলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন পলিনার ওপরে।

'না, ন্‌না,' পলিনা দুর্বল স্বরে বাধা দিতে দিতে আদিম ইচ্ছায় অভিভূত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বেচ্ছায় তখন আত্মসমর্পণ করল তাঁর কাছে।···

বাইরে অন্ধকার আর বৃষ্টি। ভিজা বাতাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে বন্ধ দরজার ওপরে।

নিঃশব্দ ঘর সহসা খিল্‌খিল্ হাসিতে মুখর হয়ে উঠে তক্ষুনি থেমে গেল। হাসিতে অবজ্ঞা ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য। চল্লিশ বছরের অক্ষম-ক্ষুধাকে লজ্জা দিয়ে পলিনা সোজা হয়ে বসল। দস্তয়েফ্স্কি বিড়বিড় করে অনেক সাফাই গাইলেন, মানসিক ও শারীরবৃত্তিক দিক থেকে সে-কৈফিয়ৎ সত্য হলেও পলিনা যেন গ্রাহ্য করতে চাইল না। শুধোল, 'সিগারেট আছে?' দস্তয়েফ্স্কি নিঃশব্দে সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন, সিগারেট ধরিয়ে পলিনা ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তার ঠোঁটে একটা হাসি ঝুলে আছে, কৌতুকের, প্রথম অভিজ্ঞতার, বুঝি অবজ্ঞারও।

দস্তয়েফ্স্কি সেই মুহূর্তে মনে করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কের এই বুঝি শেষ, কিন্তু না।

পরবর্তী কালে দস্তয়েফ্স্কি-কন্যা শ্রীমতী লিয়ুবভ্ তাঁর স্মৃতি-চারণে লিখেছিলেন:

"পলিনা আমার বাবাকে একটি সুন্দর কবিত্বময় পত্র লিখেছিল। সে চিঠিতে বাবাকে যে সে মনেপ্রাণে ভালবাসে অকপটে তা স্বীকার করেছিল। পলিনার চিঠি পড়ে বোঝা যায় বাবার প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার।

সে আত্মসমর্পণ করেছিল বাবার কাছে। পত্রখানা বাবাকে খুব উল্লসিত করেছিল, কারণ বাবা তখন যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। এমন সময়ে এমন আত্মবিস্মৃত ভালবাসার বড় প্রয়োজন ছিল তাঁর।…"

তার ডায়েরিতে সেদিনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে পলিনাও স্বীকার করেছিল প্রয়োজনটা।

সেই ঐকান্তিক প্রয়োজন সত্ত্বেও পলিনার ওই চিঠির যে জবাব তিনি দিয়েছিলেন, সত্যসন্ধ মানুষটির দ্বিধা-দীর্ণ সত্তার দ্বন্দ্বের সে-এক অতুলনীয় দলিল।

তিনি লিখেছিলেন, 'তুমি ভুল করে আমার প্রেমে পড়েছ, পলিনা। তোমার হৃদয় খুব উদার ; কিন্তু চল্লিশ বছরের নানা কষ্টের আগুনে ঝলসানো পুরুষের সঙ্গে বিশ বছরের স্বপ্নভরা আবেগ-আর্দ্র যুবতীর প্রেম মানায় কী ?'

পলিনা তার সযত্ন-রক্ষিত ডায়েরিতে এ কথাটাও টুকে রেখেছিল। শুধু চিঠিতে নয়, পলিনা লিখেছে, এ কথাটা ফিওদর আমাকে সামনা-সামনিও বলেছে অনেক বার।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ-কথাটা তিনি বার বার পলিনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন ? তাঁর স্বভাবের গভীরেই ত রয়েছে বেশী বয়সের মেয়েকে ভালবাসার ওই টানটা, আর এই অসমবয়সী প্রেমের টানা-পড়েনের কাহিনী নিয়েই ত তিনি রুশ সাহিত্যের আসরে আসেন এবং তাঁর নামে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। তাঁর সেই সফল প্রথম উপন্যাসখানার নাম পাঠকের জানা—'অভাজন'। তার নায়ক মাকার দেভুশকিনের বয়েস নায়িকা ভারভারার দ্বিগুণ। সেই প্রথম উপন্যাস 'অভাজন' থেকে শুরু করে তাঁর শেষ উপন্যাস 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ' অব্দি টেনে এনেছেন তিনি এই অসম ভালবাসার প্রসঙ্গ। 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ্'-এর পিতর কারামাজোভ, 'অপরাধ ও শাস্তি'র স্ভিদ্রিগাইলফ্, 'বেসী'র ভারসিলফ্ প্রত্যেকে ভালবেসেছে তার বয়সের অর্ধেক বয়সী মেয়েদের। এবং সে ভালবাসায় তারা প্রত্যেকেই অস্থির উন্মাদ আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য তিনি নিজে যখন প্রথম প্রেমে পড়লেন তখন তাঁর সেই প্রেমে এই অন্তর্গত-চরিত্রের পরিচয় মিলে না। কেন না মারিয়া ছিলেন মাত্র তাঁর থেকে চার বছরের ছোট। হয় ত তাঁদের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবার সেও একটা কারণ। এবং সে-ব্যর্থতা থেকেই তিনি জানতে পারেন তাঁর নিহিত প্রকৃতির যথার্থ পরিচয়।

অতএব বলতে গেলে সেই স্বভাবের টানেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন পলিনার দিকে, সত্য বটে পলিনাই এগিয়ে এসেছে আগে। এগিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু তিনিও যে পলিনার মধ্যে দুর্ণিবার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন সেও ত মিথ্যে নয়। তবে তিনি বয়েসের কথা উল্লেখ করে পলিনাকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন কেন? সে কী তবে ওই বৃষ্টির রাতের ব্যর্থ সংসর্গের ফলশ্রুতি? হয়ত তাই।

তার জন্যেই পলিনাকে ভুলতে, পলিনার কাছ থেকে পালাতে তিনি য়ুরোপ পাড়ি দিলেন। অবশ্য 'মৃত্যু-পুরীর স্মৃতি' বই আকারে ছাপা হওয়ার দরুন পাবলিশারের কাছ থেকে অগ্রিম আড়াই হাজার রুবল সে-সময় পেয়েছিলেন বলে, না পেলে কা করতেন জানি নে, পেয়ে কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। পলিনা আশা করেছিল দস্তয়েফ্‌স্কি য়ুরোপ বেড়াতে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। মারিয়া ভেবেছিলেন, তিনি অসুস্থ বলে তাঁকে যদি ফিওদর য়ুরোপ বেড়াতে নাও নিয়ে যায় অন্তত হাজার খানেক রুবল তাঁর হাতে দিয়ে যাবে এই অসুস্থ দারিদ্র্যের জীবনে কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা আনতে। অনেক দিন বাদে কিছু অর্থের মুখ একসঙ্গে দেখবেন মারিয়া। অথচ না, স্বার্থপরের মতন তিনি একাই য়ুরোপের পথে পা বাড়ালেন, একটা কোপেকও ছোঁয়ালেন না তিনি মারিয়ার হাতে।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? দেড় মাসের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে হল তাঁকে পিতার্সবুর্গে। আবার গিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়লেন, তার অসমবয়সী প্রেমের জটিল বিড়ম্বনার আবর্তে।

পাঁচ

য়ুরোপ বেড়িয়ে এসে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর সে অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখেন 'জিমনিএ জামেৎকি ও লেৎনিখ ভ্‌পেচাৎলেনিয়াক'-এ (১৮৬৩), যার অর্থ শীতের দিনে বসে গ্রীষ্মের স্মৃতিচারণ।

পুস্তকখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "য়ুরোপ বেড়ানোর বাসনা আমার বহু দিনকার। বলতে গেলে এ বাসনা আমার বালক বয়েস থেকেই। য়ুরোপের অ-লৌকিক পবিত্র ভূমি আমাকে সব সময় টানত।...এক কথায় বায়ু বদল, নূতন কিছু দেখা, বিরাট কিছুর একটা সামগ্রিক ধারণা অর্জন ইত্যাদির ঝোঁক আমার চিরকালের..."

শুধু এ জন্যেই য়ুরোপ তাঁকে টানত কী? দস্তয়েফ্‌স্কি য়ুরোপ-বেড়াতে বেরোবার অল্প ক'দিন আগে তুর্গেন্যেফ্‌ য়ুরোপ থেকে ফিরেছেন। এসেই শুনলেন দস্তয়েফ্‌স্কিও যাচ্ছেন য়ুরোপ-বেড়াতে। কিছু উপদেশ বিতরণের লোভ সামলাতে পারলেন না তিনি; একটি বিশিষ্ট হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন দস্তয়েফ্‌স্কিকে। সে-আসরে আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। দস্তয়েফ্‌স্কি নানা কারণে তুর্গেন্যেফ্‌কে সহ্য করতে পারতেন না, তুর্গেন্যেফ্‌-এর য়ুরোপ-প্রীতি তার অন্যতম। য়ুরোপ-প্রসঙ্গ উঠলে খাওয়ার টেবিলেই তুর্গেন্যেফের য়ুরোপ-প্রীতিকে আক্রমণ করলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, বললেন, "আমি বিশ্বাস করি না য়ুরোপের কাছ থেকে রাশিয়ার কিছু ধার করার আছে। আমি বিশ্বাস করি একদিন রাশিয়াই য়ুরোপকে, উহুঁ, তামাম তুনিয়াকেই নূতন কিছু দেবে।'

এ বিশ্বাস তিনি 'ভ্রেমিয়া'য় লেখা তাঁর প্রবন্ধেও প্রকাশ করেছেন। পরম প্রত্যয়ের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন— "সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে রুশ জাতি এক অনন্য ঘটনা।…য়ুরোপের আধুনিক সব জাতি থেকে তার চরিত্র আলাদা, উভয়ের মধ্যে এত বৈষম্য যে, কেউ কাউকে জানতে বুঝতে পারছে না…য়ুরোপের কাছে রাশিয়ার কিছু শেখার নেই বরং রাশিয়াই আনবে য়ুরোপের সামনে নূতন দিকদর্শন, জীবনের নূতন অঙ্গীকার।" এমন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার পরেও দস্তয়েফ্‌স্কির মনে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল 'যা বলছি তা ঠিক ত? ঠিক কিনা যাচাই করা হল না ত।' এই সন্দেহ তাঁকে বড় উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছিল; কিন্তু শুধু উদ্‌বেগের কি সাধ্য কাউকে দূর বিদেশে ঠেলে পাঠায়। রেস্ত চাই। সেই রেস্তই হঠাৎ তখন হাতে এসে গেল তাঁর। 'মৃত্যু-পুরীর স্মৃতি'-র রয়েলটি বাবদ প্রায় চার হাজার রুবল এক সঙ্গে পেয়ে গেলেন তিনি।

পলিনা ভেবেছিল দস্তয়েফ্‌স্কি তাকে তাঁর বিদেশে-ঘোরার সাথী করে নেবে। স্ত্রী ভেবেছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন স্বামী কিংবা বহুদিন দারিদ্র্য-তুঃখ ভোগার পরে এবার স্বামী সচ্ছলতার মুখ দেখলেন, তাঁর হাতেও একটা মোটা অংশ আসবে তার, রুগ্ন মানুষের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু পরম স্বার্থপরের মতন দস্তয়েফ্‌স্কি সকলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে য়ুরোপের দিকে পা বাড়ালেন ১৮৬২-র জুন মাসে।

কেউ কেউ বলেন দেশ দেখা-টেকা কিছু না, আসলে এক সঙ্গে একগাদা টাকা পেয়ে তাঁর মাথায় জুয়ার নেশা চেপেছিল, জুয়ার নেশা তাঁর সেই কলেজ-

জীবন থেকে ; কিন্তু সাধ মিটিয়ে জুয়া খেলার সাধ্য ছিল না এতকাল, এবার চুটিয়ে সে সাধ মিটিয়ে নেবেন বলে টাকার বাণ্ডিল পকেটে পুরে তক্ষুনি পালালেন, পাছে কেউ হাত পাতে বাগড়া দেয়, টাকা নিয়ে কারো সামনেই এসে দাঁড়ালেন না। যে দাদা নিজের সর্বস্ব পণ করে কাগজটা দাঁড় করালেন, প্রচার সংখ্যা তুললেন সাড়ে চার হাজারের ওপর, তাঁর কাছেও চেপে গেলেন মতলবটা, একটা কোপেকও সাহায্য দিলেন না তাঁকে। তিনি রাশিয়া থেকে জর্মনির রাজধানী অব্দি পাতা নূতন রেলে চেপে চলে এলেন ভিসবাদেন। একটা হোটেলে বিছানা সুটকেস রেখে আর দেরি করলেন না, এসে বসলেন রুলেত-টেবিলে।

জুয়া সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলেছেন—'জুয়াড়ী হওয়ার জন্যে যে-সব গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে আসল হল ধৈর্য, বিচার বুদ্ধি, সাহস আর অভ্যাস, সবার ওপরে মনের জোর।' অথচ এ-সব কোনটাই ছিল না তাঁর। অস্থির অব্যবস্থিত মানুষটা যৎপরোনাস্তি অমনোযোগী ও অধৈর্য ছিলেন—দু' একবার বাদে তাই তিনি বার বার হেরেছেন, প্রতিবার মোটা মোটা টাকা খুইয়েছেন। তবু জুয়ার টেবিল তাঁকে ক্রমাগত টেনেছে, সে-দুর্নিবার টান তিনি সহজে এড়াতে পারেন নি।

তাঁর প্রথম হারের কথা আমরা শুনি মিখাইলের লেখা চিঠিতে। দস্তয়েফ্‌স্কির চিঠির জবাবে মিখাইল লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের দিব্যি ফিওদর, তুমি আর জুয়া খেলো না। জুয়ার টেবিলে ভাগ্যের সঙ্গে লড়ব আমরা, সাধারণ মানুষ, তুমি কেন? তুমি প্রতিভাবান। তুমি প্রতিভা দিয়ে যা রোজগার করতে পারবে না, জেনো, তা জুয়ার টেবিলে ভাগ্য তোমাকে কখনো দেবে না। ভিসবাদেনে তুমি অনেক টাকা খুইয়েছ জেনে মর্মাহত হলাম।'

মিখাইলের দুঃখ স্বাভাবিক। অবশ্য দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁকে ভরসা দিতে কসুর করেন নি, 'ভয় কী, 'ভ্রেমিয়া'র সারকুলেশন চার হাজার দু'শ'। আরও বাড়বে। আমাদের অবস্থা সচ্ছল হবে।' কিন্তু কী করে হবে? মিখাইলের চিন্তা। এখনও অনেক ঋণ বাজারে। পত্রিকা যদি এখনকার মতন আরও দু' বছর চলে তখন আশা করা যায় ধারকর্জ শোধ হয়ে হাতে কিছু জমবে। তার জন্যে পত্রিকার পেছনে টাকা খাটাতে হবে না? গরু কী অমনি দুধ দেবে, খাবে না?

দরিদ্র ঋণ-গ্রস্ত মানুষটির টাকার প্রয়োজন সব সময়, তার ওপরে ছিল রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্ন। সেই টাকার ধান্দা, ধনী হওয়ার স্বপ্ন, আর জুয়ার নেশা জোট বেঁধে দস্তয়েফ্‌স্কিকে অন্ধ করে দেবে, স্বাভাবিক। তা ছাড়া তখন

পলিনাও কী একটা সমস্যা হয়ে ওঠে নি! অসম সেই ভালবাসার মোহ কাটাতে জুয়ার নেশায় ডুব দিলে দুর্বল-স্নায়ুর মানুষটিকে দুষব কী? দস্তয়েফ্‌স্কির আবার এক মহৎ দোষ ছিল, অতীত ভবিষ্যৎকে আদৌ তিনি আমল দিতেন না। অতীত নিয়ে ভাবা কি ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করা তাঁর ধাতে সইত না। তাঁর কাছে বর্তমানই ছিল সব। বর্তমানের সুখ এবং দুঃখটাকে এমন আঁকড়ে থাকতেন যে, নিকট ভবিষ্যৎও তুচ্ছ হয়ে যেত তাঁর কাছে। সেই তাঁর পরম বাস্তব যখন ভিসবাদেনের রুলেত-টেবিলে আচ্ছা চাটি দিল তাঁকে তিনি তক্ষুনি সেখান থেকে পালালেন।

নানা জায়গা ঘুরে এলেন লণ্ডন। সেখানে নির্বাসিত রুশ-বিপ্লবী হেরজেনের সঙ্গে দেখা করলেন। আটদিন লণ্ডনে থেকে এলেন পারী। পারী থেকে ডুশেলডর্ফ হয়ে রাইন পেরিয়ে এলেন জেনিভায়। এখানে দেখা হয়ে গেল স্ত্রাখফের সঙ্গে। দু' বন্ধুতে মণ্ট সেনিস হয়ে ইতালি এলেন তুরিন জেনোআ ফ্লোরেনস দেখলেন। তারপর বন্ধু পড়ে রইল পেছনে, দস্তয়েফ্‌স্কি আগসটের শেষে একাই স্বদেশে ফিরে এলেন। বেশ হতাশা নিয়েই ফিরলেন। য়ুরোপ সম্পর্কে তাঁর মনে একটা স্বপ্ন ছিল, তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। কেবল স্বপ্ন-ভঙ্গের যন্ত্রণাতেই ভুগলেন তিনি।

আবেগপ্রবণ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখকের চোখ য়ুরোপের ঐশ্বর্যে ধাঁধিয়ে যাওয়ার কথা। যেমনটি ঘটেছিল তুর্গেনিয়েফের বেলা। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির বেলা য়ুরোপের সে-চালাকি খাটল না। বাইরের জৌলুস আর পালিস দেখিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কিকে ভোলাতে পারল না য়ুরোপ।

স্ত্রাখফের কাছে দস্তয়েফ্‌স্কির মন্তব্য: পারী শহরটা বড্ড বোরিং, একঘেয়ে; জেনিভা বিবর্ণ মনমরা। তুরিনটা প্রায় পিতার্সবুর্গের মতন। ফ্লোরেনস সম্পর্কে তিনি অবশ্য কিছু মন্তব্য করেন নি। করবেনই বা কী, তিনি কী সেখানে দেখেছেন নাকি কিছু। ভিকতর য়ুগোর 'লে মিজেরাবল' সবে বেরিয়েছে তখন। ফ্লোরেনসে বইটা তাঁর হাতে পড়তে তিনি আর কোন দিকে তাকালেন না। ফ্লোরেনসে তিনি সাতদিন ছিলেন, হোটেলে বসে সে-সাতদিনে বিশ্বসংসার ভুলে চার খণ্ডের ঢাউস বইটা গোগ্রাসে গিললেন।

একদিন স্ত্রাখফ্‌ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত শিল্প-সংগ্রহ-শালা য়ুফিজী গ্যালারিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্তয়েফ্‌স্কি ক্লান্ত হয়ে হাই তুলতে থাকলেন। বিশ্ববিশ্রুত নানা ভাস্কর্য ও চিত্র-কৃতিত্ব আদৌ তাঁর মন টানতে

পারল না। আসলে বস্তুর বাহ্য-দৃশ্য চিত্রকল্পতা কোন দিনই দস্তয়েফ্স্কিকে মনোযোগী করতে পারে নি। তিনি মানুষের অন্তর্গত জীবন ও তার রহস্য নিয়ে এত বেশী চিন্তিত মগ্ন থাকতেন বলেই আর সব কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত।

এই তাচ্ছিল্যের ভাব তাঁর '……গ্রীষ্মের স্মৃতি'-তে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছেন। বুঝি যার কাছে মানুষ সব থেকে বেশী আশা করে তার কাছে কিছুই না পেলে সে বড় বেশী রুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়। সে অসন্তোষের স্বরই গুমরে উঠেছে তাঁর ওই দুই দেশের সমালোচনায়।

লণ্ডনে তিনি দেখেছেন একদিকে সুবেশ সচ্ছল বিলাসী ধনী ও আত্মসুখী সন্তুষ্ট পাদ্রীর দল আর অন্য দিকে ছিন্নবাস শীতার্ত নিরন্ন মানুষ। ধন-বৈষম্যের এই দৃশ্য—রাজপ্রাসাদের পাশাপাশি নোংরা বস্তি দস্তয়েফ্স্কির মন বিষণ্ণ করে দিয়েছিল। হে-মার্কেট এলাকার নরক সেই বিষণ্ণ মনকে এমন বিষিয়ে দিয়েছিল যে, সে-দেশের ভাল কিছুই আর তাঁর মনে ধরল না, দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। তিনি য়ুরোপ বেড়াতে এসেছিলেন সেখানকার মানুষের জীবনাযাত্রার চেহারা দেখার মন নিয়ে—তারা কী খায়, কেমন করে বাঁচে, সে-দেশের সরকার কেমন, তাদের দেশ শাসনের লক্ষ্য কী। এ সব দেখার জন্যে যতখানি ধৈর্য্য ও সময় দরকার, স্বীকার করতে হবে, দস্তয়েফ্স্কির তা ছিল না; কিন্তু যে-টুকুই তিনি দেখলেন জানলেন তাতেই তাঁর চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

পারী সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা লণ্ডন থেকে আরও তীব্র। বলেছেন, 'ফরাসীরা যেন মুনাফাখোর দোকানদার।' ফ্রান্সকে এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কারণ বুঝি ফরাসী-বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর বিশ্বাস। তিনি আশা করেছিলেন, দেখবেন, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে-মহান বাণী তুলে ধরে ছিল ফরাসী-বিপ্লব প্রত্যেক ফরাসীর চোখে তা নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। কিন্তু তিনি দেখলেন তার চিহ্ন মাত্র নেই কারো চোখে। বরং বুরজোআ-জনতার বেআবরু অর্থগৃধ্নু তাই চোখে পড়ল, চোখে জ্বলছে তাদের। 'এ জাতটা একটা অদ্ভুত জীব', বলে তিনি সোজাসুজি আক্রমণ করেছেন তাদের, 'এমন দাস্যবৃত্তি আর কোথাও দেখি নি আমি', তিনি লিখেছেন, 'অর্থই যে মানুষের পরমার্থ হতে পারে এখানে না এলে আমি জানতাম না। অথচ এক একটি মানুষ যেন বিনয়ের অবতার—নিজের কোলে ঝোল টানতেও বিনয়, চুরি করতে, খুন করতেও বিনয়। ঠোঁটে বিনয়ের

মধুর একচিলতে হাসি ঝুলিয়ে রেখে এরা অনায়াসে বাপকেও বাজারে বিক্রি করে দিতে পারে।'

তিনি অবাক হয়ে গেছেন এই মানুষগুলির ভয় ভীতি দেখে, যেন সর্বদাই কী এক শঙ্কায় এরা সন্ত্রস্ত, তিনি ভেবে পান নি, কিসের এত আশঙ্কা এদের মনে। 'যাদের তারা বঞ্চিত করে রেখেছে তারা রুখে উঠবে এই কী ভয়?' কিন্তু সেই বঞ্চিত প্রতারিত শ্রমিককুলকেও লক্ষ্য করে দেখেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'তারাও টাকার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, যেমন করেই হোক সঞ্চয় করতে হবে, সচ্ছল হতে হবে সেই যেন সবারই পণ। তবে? এমন জাতের মানুষদের থেকে বুরজোআদের এত ভয় কেন? তবে কী সমাজতন্ত্রকে ভয় করছে এরা, হয়ত তাই।' দস্তয়েফ্‌স্কি চিন্তা করেছেন, 'ওরা সমাজতন্ত্রকে যে ভাবে আক্রমণ করে কথা বলে তাতে সেই সাংঘাতিক ভীতিটাই প্রমাণ হয় বৈ কি!'

'কিন্তু য়ুরোপের সমাজতন্ত্রও যে বুরজোআতন্ত্রের থেকে ভাল কিছু নয়' এটাও ততক্ষণে জেনে গেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। 'স্বাধীনতা অর্থে ফরাসীরা বোঝে আইন বাঁচিয়ে যৎপরোনাস্তি স্বার্থসিদ্ধির অধিকার। আর স্বার্থসিদ্ধির সে-অধিকাব কেবল টাকার জোরেই সম্ভব জেনে সঞ্চয়কেই তারা সার করেছে জীবনে। সাম্যও সেই রকম: 'আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকুই তারা সাম্যবাদী। অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই তাদের। তাদের ধারণা হৃদয় নয় আইনই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্ষক। এই সামাজিক স্বার্থপর প্রকৃতি দেশের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ বিলিয়ে দিতে বাধা দেয়। এবং পশ্চিমী সমাজতন্ত্রের সমস্যাই হল সেখানে; যে-প্রেরণা আসা উচিত হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তা আসে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক হয়ে। সত্যিকারেব সৌভ্রাতৃত্ব সর্বস্ব ত্যাগের জন্যে হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। তলোয়ার হাতে যে-জাতি মানুষের কাছ থেকে সে-সৌভ্রাতৃত্ব আদায় করতে চায়, সে কিছুতেই হৃদয় জয় করতে পারে না। যেখানে হৃদয় নেই সেখানে সৌভ্রাতৃত্ব একটা মুখের কথা, শ্লোগান—একটা মুখোশ মাত্র; একটা নীরস আচার যার পেছনে একটা হীন স্বার্থের ষড়যন্ত্র সব সময় থাবা উঁচিয়ে থাকে। এমন দেশে সাম্যবাদ কখনো মাটিতে শেকড় ছড়াতে পারে না, বুরজোআ শ্রেণী-বৈষম্য সব ব্যাপারে সফরদারি করে সব সময়।'

য়ুরোপের এই পাপচক্রের দিকে তাকিয়ে নিজের দেশ সম্পর্কে চিন্তিত না হয়ে পারেন নি তিনি, কেন না তখন রাশিয়াতেও ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে।

দাস-প্রথা থেকে সদ্য-মুক্ত কৃষকরা স্বরাজ পেয়ে সামাজিক মর্যাদার লোভে অর্থলিপ্সায় ভুগছে তখন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'কোন জাতির পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ নয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে যার জন্যে সর্বনাশ অন্ধকার করে আসছে, তাঁর দেশেও কী তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? প্রোলেতারিয়েত্‌রা এখনও রাশিয়ায় সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে নি, উঠলে তখন সে কী বুরজোআ-বিরোধী পাপচক্রে পরিণত হবে?'

দস্তয়েফ্‌স্কি এই জিজ্ঞাসার যন্ত্রণা নিয়ে য়ুরোপ ঘুরে দেশে আসেন। সুতরাং বলতেই হবে সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর এ-ভ্রমণ হাওয়া-বদল মাত্র হয় নি কিছু চিন্তা-সমৃদ্ধও হয়েছে। সেই সমৃদ্ধির ফলই ফলেছে তাঁর পরবর্তী কালের মহান উপন্যাসগুলিতে। সে-প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসব।

এখনকার কথা এখন বলি। পিতার্সবুর্গে ফিরে এসে তিনি '…গ্রীষ্মের স্মৃতি' শেষ করে একটা দীর্ঘ গল্প লিখলেন। 'ভ্রেমিয়া'র প্রবন্ধ ছাড়াও ফাঁকে ফাঁকে চলল গল্প উপন্যাস লেখার কাজ। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি কোন দিনই নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে লিখতে পারেন নি, এখনও একাধিক দুশ্চিন্তা তাঁকে ব্যস্ত করে তুলল।

পারিবারিক শান্তি তাঁর কোন দিনই ছিল না, এখন তা আরও নিদারুণ হয়ে উঠেছে। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন মারিয়া, বিষ ঢেলে দিচ্ছেন কথায় কথায়ঃ তাঁর অভিযোগ, 'আমি কবে মরব, কবে তুমি আমার দায় থেকে রেহাই পাবে খালি সেই দিন গুনছ। আমার দিকে ফিরেও তাকাও না তুমি, আমার রোগ যে দিনে দিনে সাংঘাতিক হয়ে উঠছে, আমার যে ভাল চিকিৎসার দরকার, হাওয়া-বদল দরকার সে-দিকে তোমার এতটুকু নজর নেই। 'ভ্রেমিয়া'র জন্যে খেটে মরছ এটা তোমার একটা ডাহা মিথ্যা কথা, আসলে তুমি আর একটা মেয়েছেলে জুটিয়েছ, তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তা করে সময় কাটাচ্ছ। আমাকে দেখার বেলা তোমার সময় থাকে না, আমার শিয়রে একটু বসলেই তুমি ছট্‌ফট্‌ করতে থাক যেন কেউ তোমাকে বার্চের চাবুক দিয়ে মারছে। জানি, সব জানি আমি –….।' অতঃপর মারিয়া হাপুস নয়নে কাঁদতে বসেন।

শুধু মারিয়া নয় জানে অনেকেই, অনেকেই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, ঘনিষ্ঠ-মহলে প্রচার হতে বাকি নেই—বিদেশ-ঘুরে এসে দস্তয়েফ্‌স্কি আবার পলিনাকে নিয়ে মেতে উঠেছেন, প্রচারটা সর্বৈব সত্য। কিন্তু এতে দস্তয়েফ্‌স্কিরই যে সব দোষ তা আদৌ নয়, প্রেম কখনো এক তরফা হয় না এবং এ-ক্ষেত্রে উভয়ের আগ্রহই প্রবল, মতান্তরে পলিনার উৎসাহটাই যেন অত্যধিক। কারণ এই অসমবয়সী

প্রেমের ব্যাপারে দস্তয়েফ্স্কির বেশ একটু হীনমন্যতা ছিল। পলিনা এগিয়ে এসে তাঁর সেই ভয়টা মুছে দিয়েছে। পলিনার আগ্রাসী ইচ্ছার শুশ্রূষা পেয়ে তাঁর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন দস্তয়েফ্স্কি। ক্রমশ পৌরুষ ফিরে পেতে থাকলেন। এসময়ে পলিনার আর একটি গল্প ছাপা হল 'ভ্রেমিয়া'তে। অমনি গুনগুনিয়ে উঠল একটা গুজব, দস্তয়েফ্স্কির মতন বুড়োকে ভালবাসতে দায় পড়েছে পলিনার মতন বিশ বছরের মেয়ের। ওটা আসলে গল্প ছাপানোর জন্যে নকল ভালবাসার খেলা। তা না হলে ওর ওই রদ্দি গল্প কখনো 'ভ্রেমিয়া'র মতন প্রথম শ্রেণীর কাগজে বেরোত না। পুরুষ ভোলাতে জানে মেয়েটা।"

কিন্তু এ-গুজবে সত্য ছিল না এতটুকু। গল্প লিখত পলিনা; এবং সে-গল্প 'ভ্রেমিয়া'র মতন কাগজে ছাপা হলে অহংকার করত ঠিকই কিন্তু তার জন্যে সে দস্তয়েফ্স্কিকে ভালবাসার অভিনয় দিয়ে বশ করেছিল সে-কথা ঠিক নয়। ঠিক কথাটা তার ডায়েরিতেই লিখে রেখেছে পলিনা। এই বেপরোয়া মেয়ে ডায়েরি লিখতে বসে কোন কথা গোপন করেনি, কি সংকোচে থেমে যায় নি। তার বিপ্লবী-চেতনা এমনই প্রখর ছিল কিংবা দস্তয়েফ্স্কির নামের সঙ্গে নিজের নামটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবে বলে কাজটা করেছিল পলিনা; অবশ্য সাহস জুগিয়েছিলেন দস্তয়েফ্স্কি নিজেই। 'ইগ্রোক' (জুয়াড়ী) উপন্যাসে নায়ক নায়িকার বেনামিতে নিজেকে যেমন পলিনাকেও তেমনি বে-আবরু করে এঁকেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি, তাঁর সেই সাহসেই সাহস পাবে পলিনা, তার সংকোচ কেটে যাবে অকপট জবানবন্দী লিখতে পারবে, স্বাভাবিক।

দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে আপোলিনারিয়া পেয়েছিল এমন একজন লেখককে যাঁর খ্যাতি দিন দিন বাড়ছে, যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ক্রমশই রুশ-সাহিত্যকে কব্জা করে ফেলছে। অবশ্য দস্তয়েফ্স্কির দুর্লভ প্রতিভা অসাধারণ ধী ও বুদ্ধি সর্বোপরি তাঁর নৈতিক দার্ঢ্য যে সে সম্যক বুঝতে পেরেছিল তা নয়। কেবল সে তাঁর প্রতিভার উত্তাপ অনুভব করেছিল। পলিনার রোমান্টিক মনকে সেই উত্তাপই নিবিড় টানে এত নিকটে আকর্ষণ করেছিল, এগিয়ে এসেছিল পলিনা চল্লিশ বছরের গৃহ-প্রত্যাশী অসুস্থ মানুষটির দিকে। একজন অসাধারণ প্রেমিককেও পলিনা আবিষ্কার করেছিল দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে—দস্তয়েফ্স্কির মতন এক সূর্যস্পর্শী প্রতিভা তাকে ভালবাসে সেও ছিল তার এক দারুণ অহংকার। তা ছাড়া নিজের চরিত্রের প্রতিবিম্বও দেখেছিল সে তাঁর মধ্যে। পীড়ন করার ইচ্ছা ও পীড়িত হওয়ার বাসনা এক সঙ্গে একই সময়ে কাজ করত উভয়ের স্বভাবে।

অবশ্য এ দুই বৃত্তি দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে কতখানি প্রবল তখনও জানত না পলিনা। তখনও সে তাঁর কাম-বাসনার আসল চেহারা দেখে নি। দেখল দস্তয়েফ্‌স্কি বিদেশ ঘুরে এলে সে যখন আবার এগিয়ে এসে ধরা দিল। পলিনাকে নিজের করে একলা নির্জনে পাওয়ার জন্যে পিতার্সবুর্গের এক টেরেতে একটা ঘরই ভাড়া করে ফেলেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেখানে নিভৃতে উভয়ের অবসর-বিনোদন রাত্রি-যাপন চলছিল অব্যাহত ভাবে। ধর্ষ ও মর্ষকামী এই মানুষ দু'টি সেখানেই পরস্পরকে চিনল স্পষ্ট করে। পলিনা অনুভব করল, দস্তয়েফ্‌স্কি যেন তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলছে। দস্তয়েফ্‌স্কি অনুভব করলেন পলিনার প্রেমে তিনি যেন একেবারে কেনা গোলাম হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যেকার এই বোধ যতই প্রবল হয়ে উঠতে থাকল ততই একটা প্রতিরোধের অদৃশ্য প্রাচীর যেন ক্রমাগত উঁচু হতে থাকল উভয়ের মাঝখানে।

দস্তয়েফ্‌স্কি টের পেতে থাকলেন পলিনার মধ্যে কোথায় যেন আত্মহারা শরণাগতিতে অনীহা আছে, সে যেন ঠেকিয়ে রাখছে নিজেকে; তার ব্যক্তিত্ব যেন প্রেমের মধ্যে ডুবে গিয়ে অস্তিত্ব হারাতে অনিচ্ছুক। পলিনা যেন অলভ্য দুর্জয়, বুকের মধ্যে সম্পূর্ণ পেয়েও যেন মনে হয় অনেকখানিই সে দিল না। দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে এ ধারণা যতই মূল ছড়াতে থাকে ততই দুর্নিবার হয়ে ওঠে পলিনাকে সর্বাঙ্গে মনে সবটুকু এক করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সে-আকাঙ্ক্ষায় পলিনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ওঠেন দস্তয়েফ্‌স্কি। যে-মত্ততায় দস্তয়েফ্‌স্কির ক্ষুধা সর্বদাহী হয়ে ওঠে কখনো কখনো তা অসহ্য অসহনীয় লাগে পলিনার কাছে। তারই বিক্রিয়ায় আরও বেশী করে সে ভালবাসতে থাকে দস্তয়েফ্‌স্কিকে। এভাবে পলিনার মধ্যে প্রেম যত তীব্র হয়ে ওঠে ততই সে অসন্তুষ্ট হতে থাকে নিজের ওপরে, দস্তয়েফ্‌স্কির ওপরে। অসন্তোষ দু'দিক থেকে গ্রাস করতে চায় তাকে। প্রেমের প্রাবল্যে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে, করে ফেলছে এই এক রাগ, নিদারুণ অরুচি সত্ত্বেও দস্তয়েফ্‌স্কির বিকৃত-বৃত্তির কাছে হার মানতে হচ্ছে, আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে সেই আর এক রাগ।

সেই রাগে পলিনা একদিন বলেছিল—'যে প্রথা সবাই মেনে এসেছে চিরকাল, যে-ভঙ্গিকে স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছে সব মানুষ, সে-প্রথা সে-ভঙ্গিতে তুমি সন্তুষ্ট নও কেন, এ বিকৃতি কেন তোমার?

দস্তয়েফ্‌স্কি জবাব দিয়েছেন—'সব সংস্কার অস্বীকার করে দেহ-মনের সাধ মেটানোর কথা অকপটে তুমিই বলেছ, গতানুগতিক ধারার প্রতি তোমার

অসন্তোষ বার বার উচ্চারণ করেছ তুমি, সনাতন সব সংস্কার ভেঙে ফেলে দিয়ে নূতন পথে নূতন প্রথায় জীবন গড়ে তোলার কথা তোমার মুখেই শুনেছি বার বার, সে-সবই কী তবে মিথ্যে ?'

পলিনা উত্তর দিতে পারে নি তখন। তবু সে আহত বিরক্ত হয়েছে। আসলে দারুণ বৈপ্লবিক কথা গাল বাজিয়ে ঘোষণা করলেও নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে সনাতন রীতি পদ্ধতিগুলিকেই সে পছন্দ করত; সে-বিষয়ে সে রক্ষণশীল ছিল। কিংবা তার শারীরগঠন ও শালিনতা-বোধই এমন ছিল যে দস্তয়েফ্‌স্কির দাবি মেটাতে তা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। তবু যে পলিনা দস্তয়েফ্‌স্কির কুরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার কারণ দস্তয়েফ্‌স্কির দুরতিক্রম্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে-ব্যক্তিত্ব বেশীদিন বাধ্য রাখতে পারল না পলিনাকে। 'রাশিয়ার দ্য সাদ'-এর কাছে একটা রবারের পুতুলের মতন যদৃচ্ছা-ভোগের বস্তু হয়ে উঠতে জেদী যুবতীর মনে ক্রমশই যে-আপত্তি তীব্র হয়ে উঠছিল একদিন তাই সোচ্চার হয়ে উঠল তার গলায়।

দস্তয়েফ্‌স্কির এক অরুচিকর ভোগেচ্ছার তৃপ্তি দিয়ে বিরক্ত পলিনা রুষ্ট গলায় বলে উঠল—'তুমি আমাকে একটা সাধরণ রক্ষিতার মতন রেখেছ। একটা মাংসের ডেলার মতন ব্যবহার করছ আমাকে, ক্ষুধা পেলে বাচ্চা ছেলে যেমন খেলা ফেলে ছুটে আসে, 'ভ্রেমিয়া'র অফিস ফেলে তেমনি করে আমার কাছে ছুটে এস তুমি। আমাকে খাদ্যের মতন ব্যবহার করে ক্ষুধা মিটিয়ে চলে যাও, আর একজনের ক্ষুধা মিটছে কিনা জানতে চাও না। কাগজ নিয়ে, রোগা অক্ষম বউ নিয়ে তুমি সব সময়টা কাটিয়ে কেবল শরীর জুড়োতে এস আমার কাছে, ক্ষুধা পেলেই কেবল তখন আমার কথা মনে পড়ে তোমার। একটা ঝানু ব্যবসায়ীর মতন আমার সঙ্গে ব্যবহার করছ তুমি। ব্যবসায়ীর মতন সব কাজ রুটিন বাঁধা তোমার। আমার সঙ্গে অবসর কাটানও ওই রুটিনেরই ব্যাপার, হৃদয়ের সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। হৃদয়ের টানে সব কাজ ফেলে আমার কাছে ছুটে এস না কখনো তুমি। আসলে তুমি একটা ক্রিমিনাল।'

নিদারুণ সেই অভিযোগ শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। পলিনার সামনে হাঁটু পেতে বসে পড়লেন, বলে উঠলেন, 'পলিনা, পলিনা, এমন করে বলো না, আমি তোমাকে চাই, তোমাকে ছাড়া .....।'

'চুপ, মিথ্যে কথা বলো না, বুজরুকি ছাড়।' ধমকে উঠল পলিনা।

'বিশ্বাস কর, আমি সব ফেলে তোমার কাছেই রাত দিন পড়ে থাকতে

চাই। তুমি কী ভাব, বাড়িটা আমার খুব মজার জায়গা? মারিয়ার অসুখ দিন-দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে তার ঝগড়ার নেশা। আমাকে সে এতটুকু সহ্য করতে পারে না। তুমি কী ভাব আমি বাড়িতে যে-সময়টা থাকি সেটা ওই যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে ভালবাসি বলে?'

'তবে তুমি আমাকে বিয়ে করছ না কেন, কেন ওই ঝগড়াটে বউটাকে ডিভোর্স করছ না?'

'যে মানুষ বিছানায় পড়ে আছে, যার আয়ু করে গোনা যায়, তাকে ডিভোর্স করা আর না করা একই কথা না? একদিন যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, আজ ভালবাসা নেই বলে তাকে যদি এই দুঃসময়ে ত্যাগ করি সে-কি মনুষ্যত্বহীনতা হবে না? তুমিই বল, তখন তুমিই কী আমাকে পাষণ্ড বলবে না?'

পলিনা তখন চুপ করে যায়, শান্ত হয়। এভাবেই কাটতে থাকে দু'জনের দিন। আর ক্রমাগত অসন্তোষের ফাটলটা দু'জনের মধ্যে বড় হতে থাকে। কিন্তু সে-ফাটল যে এত তাড়াতাড়ি এমন সাংঘাতিক গভীর ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠবে দস্তয়েফ্স্কি জানতেন কী?

ছয়

তখন জানুয়ারি মাস (১৮৬৩)। রুশ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল পোল্যাণ্ড। তারা স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বসল। হঠাৎ যেন ফুট ফুটে রৌদ্রের আকাশ থেকে বাজ পড়ল রশিয়ার মাথায়। কারো মুখে আর টু শব্দটি নেই। উদারপন্থীরা হকচকিয়ে গেছে। শ্লাভোফিলদের ত কথাই নেই, জাতীয়তাবাদী এই দল রীতিমত উদ্‌ভ্রান্ত। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মোরাভিয়া, সারভো-ক্রোৎস পোল্যাণ্ড—পূর্ব-য়ুরোপের সমস্ত শ্লাভ-গোষ্ঠী—একধর্মরাজ্য-পাশে জারের নেতৃত্বে যারা এতকাল ঐক্যবদ্ধ সুসংহত হয়ে আছে তারা কী এখন স্ব-প্রধান হয়ে উঠবে, মহান শ্লাভজাতি কী গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পৃথগন্ন হয়ে যাবে, মিথ্যে হয়ে যাবে শ্লাভ-জাতীয়তাবাদ? শ্লাভোফিলরা মহা মুশকিলে পড়ে গেল। রুশ-জনগণের

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে তারা লড়াইতে নেমেছে সুতরাং কোন শ্লাভ-গোষ্ঠী যদি নিজের জন্যে স্বরাজ দাবি করে তা অস্বীকার করার পরামর্শ জার-সরকারকে দেয় কী ক'র তারা ? দিলে পোলরা তাদের বেইমান ভাববে না ? আবার এই সংহতি-সংহারের সমূহ বিপদে তারা যদি জার-সরকারকে মদৎ না দেয় জার-সরকার তাদের শত্রু ভেবে শাস্তি দিতে চাইবে না কি ? অথচ জারকে তারা বলেই বা কী করে—পোলদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দাও, গুলী চালাও, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দাও। অবশ্য জার কারো পরামর্শের অপেক্ষায় থাকেন নি। পোলরা জার-পুলিশের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে জার পুলিশ গুলী চালাল, রক্ত ঝরল, হত ও আহত হল উভয় পক্ষেরই অনেকে। রকম-সকম দেখে রাজনৈতিক দল ও চিন্তাশীল সমাজসেবীরা যখন বিমূঢ় বিভ্রান্ত তখন হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠলেন তুর্গেনিয়েফ্। আহত রুশ-সেনাদের সেবার জন্যে একটা মোটা চাঁদা পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন—বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খতম করাই এখন জার-সরকারের কর্তব্য। কাগজে দীর্ঘ চিঠি ছাপিয়ে তিনি জারের সমর্থনে রুশ-প্রেমীদের সক্রিয় হয়ে উঠতে আমন্ত্রণ জানালেন।

তুর্গেনিয়েফের এই ঘোষণা আরও সংকটে ফেলে দিল সকলকে, এখন জারকে সমর্থন জানাতেই হবে তাদের, নয় ত জার ধরে ধরে এক একজনকে জাহান্নামে পাঠাবেন। কাগজওলাদের সমস্যা হল সব থেকে বেশী - তাদের কাগজে-কলমে খত্ লিখে দিতে হবে, তারা কোন্ পক্ষে। 'ভ্রেমিয়া'র অফিসে এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হতে থাকল। তর্ক আর শেষ হয় না। দস্তয়েফ্স্কি জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে কয়েদ খেটে এসেছেন, এখনও তাঁকে চোখে-চোখে রাখছে জারের চর অতএব এ ব্যাপারে জারের বিরুদ্ধে কলম ধরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জারের পক্ষে লেখা আরও অসম্ভব, লিখলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির শত্রু হতে হবে তাঁকে, তা তিনি চান না অতএব পরামর্শ দিলেন, 'স্ত্রাখফ্, তুমি পণ্ডিত লোক, রাজনীতিটাও তুমি ভাল বোঝ সুতরাং এ বিষয়ে তুমিই একটা প্রবন্ধ লেখ।' সকলে তখন সমস্বরে সায় দিল, 'হ্যাঁ, স্ত্রাখফ্, তুমিই লেখ, তুমিই যোগ্য লোক।' সকলের অনুরোধে স্ত্রাখফ্ রাজী হয়ে গেলে দস্তয়েফ্স্কি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে পলিনার জন্যে ছট্ফটিয়ে উঠল তাঁর মন। কিন্তু ব্যস্ত মানুষের মনে ইচ্ছে জাগলেই তা পূর্ণ হয় না। লেখার দায় যদি বা আর এক জনের ঘাড়ে চাপাতে পারলেন, কাগজ বের করার বিরক্তিকর আর পাঁচ-রকম ঝামেলা কিছুতেই এড়াতে পারলেন না।

কাগজ প্রেস থেকে ছাপিয়ে বের করার পরে আরও দশ দিন কেটে গেল বাজারে ছড়িয়ে দিতে, গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে। তারপরে আর তাঁকে রোখে কে!

কিন্তু যে-মিলনের জন্যে তিনি ক'দিন ধরে এমন উম্মুখ হয়েছিলেন সে-মিলন সুখের হল না।

আগেই বলেছি, পলিনা দস্তয়েফ্‌স্কির বুদ্ধির দীপ্তিতে মুগ্ধ, তাঁর খ্যাতির জৌলুসে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে আশা-ভঙ্গের নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তার মন। দস্তয়েফ্‌স্কি তার দেহের ঘুম-ভাঙা তীব্র ক্ষুধার তৃপ্তি দিতে পারেন নি অধিকন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিব বিকৃত-রুচির পরিচয় পেয়ে পলিনার অতৃপ্ত মন বিরক্ত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। আবার কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ও জড়িয়ে গিয়েছিল সেই সঙ্গে—মানুষটা যেন কাপালিক এক ভয়ানক যাদুকর, সামনে যেতে ভয় করে অথচ পিছিয়ে আসতেও পারে না, কী এক প্রবল টানে পায় পায় এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়, হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার ওপরে, এ-জন্যে নিজেব ওপরেই বিরক্ত হয় পলিনা, নিজেকে ধিক্কার দেয়, আর নিজের প্রতি এই বিরক্তি ও ধিক্কার ঘৃণা হয়ে ওঠে যে-মানুষটার ব্যক্তিত্ব সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না, তাঁর ওপরে! বুদ্ধির জগতে উভয়ের মধ্যে দারুণ মিল থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত দু'জনের আত্মিক মিলনের পথে প্রবল বাধা হয় দাঁড়িয়েছিল। দিন পনর অদর্শনের পরে মিলিত হতে এসে সেই বাধার দেয়ালেই প্রবল ধাক্কা খেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। অনিচ্ছায় অথচ বিনা-প্ররোচনায় বল-প্রয়োগে দস্তয়েফ্‌স্কির বিকৃত-প্রবৃত্তি চরিতার্থের যন্ত্র হয়ে উঠে পলিনা যেন নিজের ওপরে ক্ষেপে গিয়েই হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে এসে পোশাক পরতে লাগল। মোমের বাতিটা টেবিলের ওপরে জ্বলছিল। হাওয়ায় শিখাটা কাঁপছে থরথর করে। সেই কম্পিত শিখার আলো ঢেউয়ের মতন গড়িয়ে গড়িয়ে পলিনার নগ্ন মসৃণ-ত্বকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে যেন পরতে পরতে উন্মোচন করে দিচ্ছিল তার রমণীয় শরীরের রহস্যময় উদ্‌ভাস। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে লালসা-অস্থির দস্তয়েফ্‌স্কি শুধোলেন—'কী হল তোমার পলিনা, তুমি এখনই চলে যাচ্ছ কেন?' দু' হাত বাড়িয়ে তিনি তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। পলিনা তাঁকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পায়ে মোজা পড়তে লাগল। মোজাটা উরু অব্দি টেনে এনে মসৃণ করতে করতে বলল, 'আমার কাজ আছে।'

'কাজ?' অবাক হলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'কী কাজ? সবে ত সন্ধ্যা, আমরা ত সবে এলাম এখানে।'

এসে-ই কী আর মুহূর্ত তর সইল তোমার? যে-জন্য এখানে আসা সে-কাজ ত সেরে ফেলেছ, আবার কী?'

'পলিনা, তুমি কী আমার ওপরে রাগ করেছ?'

পলিনার বলতে ইচ্ছে করেছিল, হ্যাঁ, রাগ করেছি, শুধু তোমার ওপরে না আমার নিজের ওপরেও, তুমি আমাকে নষ্ট করেছ, তোমার ওপরে আমার সেই রাগ, আমি তোমার আকর্ষণ ছিন্ন করে পালাতে পারছি না, নিজের ওপরে আমার সেই রাগ ; কিন্তু সে-সব কথা মুখে সে কিছুই উচ্চারণ করল না। উপুড় করা নগ্ন শরীরটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের পিঠের ওপর থেকে পেটি-কোটটা তুলে এনে একটা পাসপোর্ট বের করে মেলে ধরল দস্তয়েফ্‌স্কির সামনে। তার নীরব মুখে বিজয়িনীর উদ্ধত হাসি ঝুলছে তখন, যেন বলছে, কাপালিক, এত দিনে আমি তোমার নাগপাশ ছিন্ন করতে পেরেছি।

'কী এটা?'

'আমি পারী যাচ্ছি।'

'সে কী আমাকে ফেলে তুমি একা পারী যাচ্ছ?'

'আমাকে ফেলে তুমি একা য়ুরোপ ঘুরতে যাও নি!'

দস্তয়েফ্‌স্কি দু' হাতে পলিনাকে জড়িয়ে ধরলেন। 'আমাকে ক্ষমা কর পলিনা, আমি আর তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। আমি তোমার ছায়া হয়ে থাকব। ছায়া হয়ে ঘুরব তোমার সাথে সাথে। আমিও পারী যাব। এক সঙ্গে বেরোব আমরা।'

'তোমার ত হাজার কাজ। আমি তোমার অবসরের সঙ্গী মাত্র। যখন অবসর পাবে তখন এসো। পারীতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

পলিনা চলে যাচ্ছে, চলে যাবেই, একরোখা এই জেদী মেয়েটাকে তিনি আর রুখতে পারবেন না। দস্তয়েফ্‌স্কিও বিছানা থেকে নেমে এলেন, পোশাক পরে নিয়ে পলিনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

'আমাকে একটু সময় দাও পলিনা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। পাসপোর্ট পেতে একটু সময় লাগবে। পাসপোর্ট পেলে আর আমি মুহূর্ত অপেক্ষা করব না। 'ভ্রেমিয়া'র ভার মিখাইল আর গ্রিগোরুয়েফের ঘাড়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমরা মনের সুখে তখন মুক্ত পাখির মতন ঘুরে বেড়াব নানা দেশে, তোমাকে

নিয়ে আমার এখানকার এই গোপন-জীবন আর ভাল লাগছে না। তুমি বিশ্বাস কর পলিনা, আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি এখানে।' দস্তয়েফ্‌স্কি পলিনার হাত ধরল। পলিনা তাকাল তাঁর দিকে। তার চোখে অবিশ্বাস, বুঝি অবজ্ঞাও। বলল, 'আমি ত আর এক্ষুনি যাচ্ছি নে। টাকা চাই। বাইরে যাওয়ার টাকা এখনও আমার জোগাড় হয় নি।'

'ত অপেক্ষা কর। দু'জনে এক সঙ্গে যাব। তোমাকে টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। টাকার ব্যবস্থা আমি করব।'

কিন্তু সে-প্রতিশ্রুতি তিনি আর রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি জানবেন কেমন করে, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা তছনছ করে দিতে তাঁর মাথার ওপরে কালো হয়ে উঠেছে আসন্ন এক ঝড়ের মেঘ। পলিনাকে তার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে এসে পা দিতেই সর্বনাশের সেই ঝড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে।

মিখাইল, স্ত্রাখফ্‌ আর আপোলোন গ্রিগোরয়েফ্‌ দস্তয়েফ্‌স্কির অপেক্ষায় বসেছিলেন, তাঁকে দেখেই তিনজনে প্রায় এক সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফিওদর, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'ঈশ্বর জানেন, কত জায়গায় তোমাকে আমরা খুঁজেছি।' বললেন মিখাইল।

'কেন, কী, হয়েছে কী ?' তাঁদের প্রত্যেকের মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে দস্তয়েফ্‌স্কিও অজানা বিপদের ভয়ে শক্ত হয়ে উঠলেন।

'গবর্নমেণ্ট আর 'ভ্রেমিয়া' বের করতে দেবে না আমাদের। গ্রিগোরয়েফ্‌ জবাব দিলেন।

'মানে ?' যেন বজ্রাহত হলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'বন্ধ করে দেবার আগে আমাদের একটা ওয়ার্নিং দেবে না ? নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ থেকে গেছে। ক'মাস বন্ধ থাকবে কাগজ ?'

'মাস-ফাস নয়, জন্মের মতন।' মিখাইল বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

'বল কী, কী অপরাধ আমাদের ?' দস্তয়েফ্‌স্কি বসে পড়লেন।

'স্ত্রাখফের প্রবন্ধ ছাপা।' উত্তর দিলেন গ্রিগোরয়েফ্‌।

'ধ্যেৎ হতেই পারে না, ভুল করে উদোর-পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে।' দস্তয়েফ্‌স্কি এবার নিশ্চিন্ত গলায় বলে উঠলেন, স্ত্রাখফের 'চরম প্রশ্ন' প্রবন্ধটি ছাপবার আগে আমরা সেন্সারবোর্ড থেকে পাশ করিয়ে এনেছি। সেন্সারবোর্ড

পাণ্ডুলিপির ওপরে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটে নি। পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যাব আমরা। তাদের ভুল তারা নিজের চোখে দেখুক।'

'কিচ্ছু হবে না।' মিখাইল হতাশ কণ্ঠে বললেন।

'তোমরা বলছ কী, প্রবন্ধটা ত আমিও পড়েছি, তার মধ্যে রাজদ্রোহের কী আছে ত আমি দেখলাম না। স্ত্রাখফ্‌, তুমি কী বল, একটা লাইন, কি দু'একটা শব্দ…?'

'উহুঁ, লাইন ত নয়ই, কোন শব্দও না। শ্লাভোফিলরা বলে-না এমন একটা রাজনীতির কথাও আমি লিখি নি। ত ছাড়া সমস্ত প্রবন্ধটায় আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য হচ্ছে, গায়ের জোরে কোন গোষ্ঠীকে চিরদিন আয়ত্তে রাখা যাবে না। দরকার সাংস্কৃতিক প্রাধান্য। তা যদি আমরা লাভ করতে পারি ত পোলদের এই জেহাদী জিগির আর থাকবে না। উন্নততর সংস্কৃতির জোরেই আমরা তাদের অবনত রাখতে পারব। অতএব এ অস্ত্রটাতেই এখন আমাদের শান দেওয়া দরকার।'

'ব্যস, এই মন্তব্যটাকেই কদর্থ করে 'মস্কোভা গেজেট' আওয়াজ তুলল, 'ভ্রেমিয়া' পোলদের পক্ষে। তারা পোল-সংস্কৃতিকে রুশ-সংস্কৃতি থেকে বড় মনে করে। এই দেখ গেজেট।' মিখাইল গেজেটখানা এগিয়ে দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কির হাতে।

মুখ বিকৃত করে মিখাইলের হাতটা সরিয়ে দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, রুক্ষ গলায় বললেন, 'মওকা পেয়ে গেজেটওলারা একহাত নিয়ে নিলে আমাদের ওপরে?'

'না হে ফিওদর, গ্রিগোরিয়েফ্‌ বললেন, 'ওদের চিৎকারে কিছু হত না, মুশকিল বাধালে পারীর ওই 'রিভ্যু দে দু মোদে।' রুশ-বিরোধী ওই কাগজটা স্ত্রাখফের গোটা প্রবন্ধটাই হুবহু ছাপিয়ে দিলে, সঙ্গে জুড়ে দিলে জার-সরকারকে খানিকটা গালাগাল। আর যায় কোথা, সরকার ক্ষেপে আগুন; উসকানি দেওয়ার ত লোকের অভাব নেই!'

'আমরা আপীল করব।'

'তাই কর, ধরে-পড়ে কিছু হয় কিনা দেখ।' অথৈ জলে তৃণখণ্ডের মতন দস্তয়েফ্‌স্কির প্রস্তাবটাকে আঁকড়ে ধরলেন মিখাইল। কাগজের পেছনে সর্বস্ব ঢেলেছেন। কাগজটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাঁর ক্ষতিই হবে সব চেয়ে বেশী।

সেটা দস্তয়েফ্‌স্কিও জানেন। কাগজ না থাকলেও তাঁর লেখা থাকবে। এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক। লিখে তিনি রোজগার করতে পারবেন। কিন্তু

কাগজ না থাকলে এই মুহূর্তে তাঁরও আর কোন ভরসা নেই। তাঁর কপালেও উপোস লেখা। অথচ সপ্তাহ দু'ই ধরে সরকারের দফতরে দফতরে ধর্না দিয়েও তিনি কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না। কনিষ্ঠ কেরানী থেকে মিনিস্টার কমিশনার কাউনসেলার সকলেই মুখ ফিরিয়ে থাকলেন। সকল দুয়ার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তিনি 'ভ্রেমিয়া'র দফতর গুটোতে মন দিলেন। দুশ্চিন্তায় দুঃখে মৃগীর ব্যায়রামটাই শুধু বাড়ল না, সঙ্গে অনিদ্রা-রোগটাও এসে জুটল। দুর্দিনের ঝড়ে শরীর-মন এক যোগে যখন এভাবে চুরমার হচ্ছে তখন মারিয়ার অসুখটাও চাগিয়ে উঠল প্রবল হয়ে। ডাক্তার বললেন, বাঁচাতে হলে ওঁকে পিতার্সবুর্গের ভিজে বাতাস থেকে কোন শুকনো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। অগত্যা তাঁকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে কিছু টাকা ধার করতে হল। মারিয়াকে নিয়ে তিনি এলেন ভ্লাদিমির। সেখানে তাঁকে রেখে তিনি যখন আবার ফিরে এলেন তখন জুনমাস প্রায় কাবার। এতদিন পরে তিনি পলিনার খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় পেলেন ; ততক্ষণে পলিনা পারী রওনা হয়ে গেছে, রেখে গেছে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি :

"ফিওদর, মিখাইলোভিচ্, পারী যাচ্ছি। তুমি পাছে অস্থির হয়ে ওঠ তাই এই চিঠি। দেখা করেও যেতে পারতাম কিন্তু পাছে তুমি আবার বাগড়া দাও তাই দেখা করলাম না। আমি নিচের ঠিকানায় তোমার জন্যে কিছু দিন অপেক্ষা করব। আশা করি তুমি তাড়াতাড়ি আসবে।"

যার বাঁধন কেটে পালাতে চায় তাকেই আবার বাঁধন পরাতে ডাকে। যাকে ঘৃণা করে তাকেই ভালবাসে—ললিতে-কঠোরে, হিতে-বিপরীতে মেশা এই হল পলিনা-চরিত্র।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছুই করে উঠতে পারলেন না দস্তয়েফ্স্কি। 'ভ্রেমিয়া'র অফিস গুটোতেই অনেক সময় কেটে গেল। পাসপোর্ট পেতেও কম সময় লাগল না, তারপরে রইল টাকার প্রশ্ন। ধার-দেনা ইতিমধ্যেই গলা-সমান, নূতন ধার আর মিলে না কোথাও। শেষমেশ গিয়ে হাত পাতলেন 'দুঃস্থ লেখকদের সাহায্য ভাণ্ডার'-এর কাছে। এ-যাবত প্রকাশিত বইগুলি সিকিউরিটি রেখে ধার পেলেন দেড় হাজার রুবল। তখন আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ প্রায় শেষ। আর দেরি করা যায় না। আর দেরি করলেন না তিনি, সব সমস্যা ঝঞ্ঝাট পেছনে ফেলে পলিনার উদ্দেশে পা বাড়ালেন পারী। অথচ নেমে পড়লেন ভিসবাদেনে। এতেই বোঝা যায় জুয়ার প্রতি কী টান ছিল তাঁর, কী টান কী টান! সে-টানে প্রেমের টানেও কিয়ৎকালের জন্যে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। চার দিন তিনি থেকে

গিয়েছিলেন ভিসবাদেনে। হারতে হারতে জিততে জিততে হাতে যখন তাঁর লাভের কড়ি পাঁচ হাজার ফ্রাঁ তখন হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন আর না এবং তক্ষুনি তিনি পারীর উদ্দেশে গাড়িতে উঠে বসলেন। মনে আনন্দ আর ধরে না। পলিনা বড় পয়মন্ত মেয়ে, সুখের একটা মনোরম স্বপ্ন বুকে করে তিনি পারীতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু পলিনা-অন্ত প্রাণ হলেও মারিয়ার প্রতি কর্তব্য ভোলেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি। মারিয়ার হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ভিসবাদেন থেকেই জুয়ায়-জেতা টাকার পাঁচ শ' রুবল তাঁর বোন ভারভারা কন্সতান্তকে পাঠিয়ে দিলেন।

পারীতে পৌঁছেই তিনি পলিনাকে জানালেন, 'আমি এসে গেছি, অমুক হোটেলে উঠেছি, এক্ষুনি আসছি তোমার কাছে।'

যে পলিনা দস্তয়েফ্‌স্কিকে পারীতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখে এসেছিল, সেই পলিনাই আবার যখন শুনল তিনি পারীতে এসে গেছেন তক্ষুনি একটা চিঠি লিখে তাঁকে বারণ করলে, 'না তুমি এসো না।' সে চিঠির নকল আমরা পেয়েছি পলিনারই ডায়েরিতে।

"...তুমি বড় দেরি করে ফেলেছ, ফিওদর মিখাইলোভিচ্‌। এই কিছু দিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখতাম—আমরা দু'জনে ইতালি বেড়াতে যাচ্ছি। আর ইতালি যাব বলে ইতালি-ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কীসে কী হয়ে গেল। মুহূর্তে ওলটপালট হয়ে গেল সব। তুমি অভিযোগ করতে, আমি নাকি চট্‌পট্‌ হৃদয় দিতে পারি না। হৃদয় সমর্পণ করতে আমার নাকি খুব দেরি হয়। অথচ তুমি শুনে অবাক হবে, হঠাৎ-দেখা একজনকে হৃদয় দান করতে আমার একটা সপ্তাহও তর সইল না। দেখা মাত্র ভালবেসে ফেললাম, ভালবাসতে এতটুকু বেগ পেতে হয় নি মনের দিক থেকে। এমন কি প্রতিদানে ভালবাসা পাব কি না, সে কথাটা পর্যন্ত একবার চিন্তা করে দেখি নি। তুমি যখন প্রথম-দর্শনেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলে আমি তোমার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ঠিকই করেছিলাম; কিন্তু আমি কী তোমাকে দুষে ছিলাম? আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম কেন না, তুমি তখনও আমাকে ভাল করে চেন নি আর আমিও কী তখন আমাকে তেমন করে জেনেছি? বিদায় বন্ধু।"

এ চিঠি দস্তয়েফ্‌স্কির হাতে পৌঁছবার আগেই তিনি পলিনার উদ্দেশে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। চিঠি লিখেই পার পেতে চেয়েছিল পলিনা। এবার তাকে দস্তয়েফ্‌স্কির মুখোমুখি হতে হল। উদ্ধত অবিমৃষ্যকারী রমণী সেই সাক্ষাৎকারের তিক্ত মুহূর্তটিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে টুকে রেখেছিল তার জবানবন্দীতে।

"ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না, আমি বললাম, আমি ত চিঠিতে তোমাকে সব জানিয়ে দিয়েছি।"

"চিঠি ? কোন্ চিঠি ?" সে অবাক হল।

"কেন, তোমাকে আসতে বারণ করে চিঠি লিখি নি ?"

"আমি পাই নি ; কিন্তু কেন আসতে বারণ করেছ ?"

"কারণ যা হবার হয়ে গেছে।"

মাথা নুয়ে পড়ল ফিওদরের। দু' মুহূর্ত কথা বলতে পারল না সে, তারপর সামলে নিয়ে বলে উঠল, "পলিনা, আমাকে সব বল। সব কথা জানতে হবে আমাকে। চল কোথাও গিয়ে বসি।"

"চল, তোমার ফ্ল্যাটে যাই।" আমি বললাম।

"আমরা দু'জনে তাঁর ফ্ল্যাট এলাম। তাঁর ঘরে পা দেওয়া মাত্র সে মেঝেয় বসে পড়ল। আমাকে জড়িয়ে ধরল দু' হাতে। উরুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। "আমি জানি তোমাকে জন্মের মতন হারিয়েছি।"

কান্নার আবেগ কমলে সে তখন আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। নানা প্রশ্ন। "লোকটি কে ? কেমন দেখতে ? সুন্দর ? বয়েস ? নিশ্চয় যুবক ! খুব জমিয়ে গল্প করতে পারে ? কিন্তু তার যত গুণই থাক পলিনা, অবশ্য জেনো, আমার মতন এমন হৃদয় পাবে না আর কারো।"

অনেক্ষণ আমি তার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিলাম না।

সে আবার প্রশ্ন করল, "তুমি কী তাকে সর্বস্ব সঁপে দিয়েছ, পলিনা ?"

জিজ্ঞেস করো না, এ-প্রশ্ন তোমার মুখে মানায় না।" এতক্ষণে আমি জবাব দিলাম।

"কী মানায়, কী মানায় না, জানি না, তুমি জবাব দাও।" সে জেদ ধরল।

আমি তখন বললাম, "আমি তাকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছি, ফিওদর মিখাইলোভিচ্।"

"তাকে ভালবেসে তুমি কী সুখী ?"

"না।"

তুমি ভালবাস অথচ সুখী নও, তা কেমন করে হয় ?"

"সে আমাকে ভালবাসে না।"

"সে তোমাকে ভালবাসে না?" যেন নিদারুণ আঘাত পেয়েছে, চিৎকার করে উঠেছে ফিওদর। মুখ তুলে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে, "আর তুমি তাকে ক্রীতদাসীর মতন ভালবাসছ? বল, জবাব দাও, আমাকে জানতেই হবে, তুমি কী পৃথিবীর আর এক প্রান্ত অব্দি তার পেছনে ধাওয়া করবে?"

"না।" আমি জবাব দিলাম, "আমি দেশে ফিরে যাব।" আমার চোখ ফেটে জল এল।

একটু সামলে নিয়ে পলিনা শেষমেশ তাঁকে সবিস্তারে সব ঘটনা বলেছে।

পারীতে এসে পৌছবার কয়েক দিন পরে পলিনার সঙ্গে একটি যুবকের পরিচয় হয়। যুবকটি ডাক্তারী পড়ে। ডাক্তারী পড়তে সে স্পেন থেকে পারীতে এসেছে। নাম সালভাদোর। সু-দেহী বলিষ্ঠ গড়নের এই সগর্ব চেহারার ছাত্রটির ব্যবহার ছিল অতিশয় রমণীয় অর্থাৎ রমণীমনোহারী। ফলত পলিনা দ্বিতীয় বার চিন্তা করার আগেই তার প্রেমে পড়ে গেল। এবং প্রেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্ব দান করে বসল।

এই আকস্মিক ও তীব্র প্রেমের উৎসটা অবশ্য স্পষ্ট—দস্তয়েফ্‌স্কি ও সালভাদোরের মধ্যেকার বয়েস ও চরিত্রের পার্থক্য। তার বয়েসের দ্বিগুণ এক অসুস্থ পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তার ছিল প্রবল লজ্জা আর হীনমন্যতা। অধিকন্তু ওই বিশাল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মানুষটির সে স্ত্রী হতে পারল না, সে-ছিল তার আর এক নিদারুণ ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছিল। সেই ঘৃণাই ঠেলে দিয়েছিল তাকে ওই সুপুরুষ বলিষ্ঠ শরীরের আলাপী যুবকটির দিকে। যৌবনের প্রতি যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত টান পলিনা অস্বীকার করতে চায় নি। রাশিয়ার সংস্কারমুক্তি-আন্দোলনের নায়িকা নির্বন্ধ ভালবাসার মধ্যেই জীবনের সার্থকতার স্বপ্ন দেখেছিল। তার ওপরে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত সে সালভাদোরের মধ্যে পেয়ে গেছে সরল সহজ ভালবাসা সুতরাং অনায়াসে আত্মসমর্পণ করেছে, একবারও ভেবে দেখে নি প্রবাসী নিঃসঙ্গ এই ছাত্রটি এক ইচ্ছুক রমণীর মধ্যে সাময়িক সুখ খুঁজতে এসেছিল তার বেশী এতটুকু গুরুত্ব দেয় নি সে পলিনার ভালবাসাকে। অথচ দস্তয়েফ্‌স্কির ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পলিনা দেহে-মনে তার হয়ে যেতে চেয়েছিল সেই মুহূর্তে। কিন্তু সুখের মুহূর্তগুলি দ্রুত কেটে গেলে ক্ষণকালের নীড় ভেঙে দিতে ছাত্রটির পলকের জন্যেও দ্বিধা হয় নি। দস্তয়েফ্‌স্কি যে-দিন এসে দেখা করল পলিনার সঙ্গে, তারপরের দিনই

চিঠি পেল পলিনা। সালভাদোর লিখেছে, "আমি আর তোমার কাছে আসতে পারছি না। আমার অসুখ করেছে। ডাক্তার বলছে টাইফাস।"

সালভাদোর ভেবেছিল টাইফাসের কথা লিখলেই ওই সুখের পায়রাটি ভয় পাবে। তার হোটেলে আর আসবে না। কিন্তু ঘটনা ঘটল উলটো। চিঠি পেয়েই পলিনা ছুটে গেল তার কাছে। গিয়ে দেখে সালভাদোর স্যুটকেস বিছানা গোটাচ্ছে। কী ব্যাপার? না, তাকে আজই চলে যেতে হচ্ছে। আমেরিকা যাচ্ছে সে। এই সত্য স্বীকার করতে তার লজ্জা করছিল বলে ওই মিথ্যে লিখেছিল সে। খড়ের আগুনের মতন হঠাৎ লকলকিয়ে জ্বলে উঠে ভালবাসাকে এমন নিমেষে নিঃশেষে ছাই হয়ে যেতে দেখে পলিনার বুক মুচড়ে উঠল। চোখের জল কোনমতে ধরে রেখে সে ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। প্রাণ ভরে কাঁদল। অনেকক্ষণ কাঁদার পরে নিজেকে খুব হালকা ও সুস্থ বোধ করল। এবং তখনই আবার বেরিয়ে পড়ল।

কাল যাঁকে সে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল আজ তাঁরই দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। দস্তয়েফ্‌স্কি ধৈর্য ধরে সব শুনলেন, শেষে কী বললেন পলিনার ডায়েরিতে সে কথা এই ভাবে লেখা আছে:

"ফিওদর বলল, ও সব কথা ভেবে আর কী হবে, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এখন ভুলে যাও। আমি এসে সব নষ্ট করে দিলাম। অবশ্য সেইটে আকস্মিক আমি দৈবাৎ এসে পড়েছি। সালভাদোর যুবক। বিদেশে তার একজন প্রণয়িনীর প্রয়োজন হয়েছিল, ক্ষণকালের সুখের জন্যে সে তাকে পেয়েও ছিল। ক্ষণকালের বেশী সে তাকে চায়ও নি। এ-বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে সে সুযোগ খুঁজছিল। আমি হঠাৎ এসে পড়াতে সুযোগ পেয়ে গেল। এবং তৎক্ষণাৎ কেটে পড়ল।.........'

দস্তয়েফ্‌স্কির কথা শুনতে শুনতে পলিনার চোখ জ্বলে উঠেছে, বলে উঠেছে, 'ও যখন হাসতে হাসতে ওর আমেরিকা যাওয়ার কথা আমাকে বললে, আমার ইচ্ছা করছিল, ওকে আমি খুন করি।'

দস্তয়েফ্‌স্কি পলিনার কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, 'ও আলোচনা এখন থাক। তুমি শান্ত হও। স্থির হয়ে বস।'

পলিনা বলেছে, 'ঠিক বলেছ, ও একটা কেন্নোরও অধম। ঘৃণা করলেও ওকে মর্যাদা দেওয়া হয়।'

তখন দস্তয়েফ্‌স্কি পরামর্শ দিলেন, তাঁদের আর এখন প্যারী থাকা উচিত নয়।

তাদের এখন প্রস্তাবিত ইতালি সফরেই বেরিয়ে পড়া ভাল। 'আমরা দু'জনে ইতালি যাব। কিন্তু আর প্রেমিক প্রেমিকার মতন না, ভাই বোনের মতন, কেমন রাজী ?'

দস্তয়েফ্স্কি চিন্তা করে দেখলেন, যে-প্রেমিকা তাঁকে আর ভালবাসে না, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অনায়াসে অন্যের অঙ্কশায়িনী হতে পারে, তার সঙ্গী হয়ে থাকতে হলে ভাই বোনের অধিক আর কী সম্পর্ক হতে পারে তাঁদের ? দস্তয়েফ্স্কির ওই প্রস্তাব শুনে অদ্ভুত চোখ করে তাকাল পলিনা। ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক পলক রহস্যময় স্থির দৃষ্টি পেতে রেখে বললে, 'চল, আমি রাজী।'

ইতালির পথে তাঁরা পারী ছাড়লেন সেপটেমবরের চার কি পাঁচ তারিখে, সেই থেকে শুরু হল—পলিনার সঙ্গে তাঁর প্রেমের শেষ অধ্যায়, নারী-চরিত্র ও প্রেম সম্পর্কে নূতনতর অভিজ্ঞতা ; এই কষ্টিপাথরে নিজের চরিত্রটাও যাচাই হয়ে গেল তাঁর। নিজের এই বিচিত্র ও গভীর আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির বিখ্যাত চরিত্র-মালা : 'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ ও স্ভিদ্রিগাইলফ্ ; ইডিয়েট-এর প্রিন্স মিশ্কিন ও রগোজিন ; 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর দ্মিত্রি, ইভান, আলিওশা স্মেরদিয়াকফ্ ও জোসিমা ; 'বেসী'-র সিগালফ্, শাতফ্ ইত্যাদি ইত্যাদি। স্তাঁদাল তাঁর বাহাত্তরটি ছদ্মনামের মধ্যে নিজের চরিত্রকে গোপন রেখেছিলেন আর দস্তয়েফ্স্কি তাঁর সৃষ্ট শতাধিক নায়কের মধ্যে নিজের প্রকৃতি তথা মানব-চরিত্রকে উন্মোচিত করেছেন।

এ আলোচনায় আমরা পরে আসব, এখনকার কথা বলি। ইতালির পথে যাত্রা করে তাঁরা দু'জনে এসে যাত্রা ভঙ্গ করলেন বাদেন-বাদেনে। ভাই বোন হিসেবে হোটেলের খাতায় নাম লেখালেন। পাশাপাশি দু'খানা সিঙ্গল সীটের ঘর নিলেন। দু'ঘরের মাঝখানে একটা দরজা দেখে দস্তয়েফ্স্কি বললেন, 'এতে আর কী হয়েছে, শোবার সময় দরজার সিটকিনি তুলে দিও।'

যে তাঁকে আর ভালবাসে না তার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক বজায় রাখতে দস্তয়েফ্স্কি হয় ত আন্তরিক ছিলেন কিন্তু পলিনার মনে কী ছিল ? বিনা মন্তব্যে পলিনার ডায়েরি থেকে বাদেন-বাদেনে তাঁদের প্রথম রাত্রির চিত্রটি তুলে ধরছি :

"রাত দশটা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। আমরা ঘরে বসে তখন চা খাচ্ছি। দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পরে আমি বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলাম। চা-খাওয়া হয়ে গেলে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ফিওদরকে বললাম আমার পাশে বসতে। ক্লান্ত হলেও আমার মন প্রফুল্ল ছিল, আমার বেশ ভাল লাগছিল

তখন। আমি তার হাত তুলে নিলাম, অনেকক্ষণ হাত ধরে থাকলাম তার।··· এক সময় বললাম, 'পারীতে তোমার ওপরে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি ; তুমি ভেবেছ, আমি স্বার্থপরের মতন কেবল নিজের কথাই ভেবেছি। কিন্তু না, বিশ্বাস কর, তোমার ভাবনাও আমার মন জুড়ে ছিল, ফিওদর। পাছে তুমি আহত হও, দুঃখ পাও তাই কিছু বলি নি।"

হঠাৎ ফিওদর উঠে দাঁড়াল, যেন চলে যাবে এখন ঘর থেকে। পা বাড়াতেই খাটের নিচে আমার জুতোয় হোঁচট খেল সে। হোঁচট খেয়ে আবার সে বসে পড়ল আমার পাশে।

'কোথায় যাচ্ছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভাবছিলাম জানলাটা বন্ধ করে দেব।'

'বেশ ত বন্ধ করতে চাও দেও না বন্ধ করে।'

'থাক গে, খোলা থাকা না-থাকা একই কথা।' বলে একটু থামল ফিওদর, আবার বলল, 'তুমি জান না, এই মুহূর্তে আমার কী ইচ্ছে করছিল,' ফিরদরের গলায় একটা গাঢ় আবেগ ফুটে উঠল।

'কী?' প্রশ্ন করে আমি তার মুখের ওপরে চোখ রাখলাম। তার মুখে কেমন একটা হতবুদ্ধি-হতবুদ্ধি ভাব, বলল, 'তোমার পায়ে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার।'

'চুমু খাবে? পায়ে? কেন?' লজ্জায় সংকোচে আমি তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিলাম।

আমি ভাবছিলাম এবার পোশাক-আসাক ছেড়ে শুয়ে পড়ব। জিজ্ঞেস করলাম, 'ঝি-টা কী কাপ-ডিসগুলি নিয়ে যেতে আসবে এখন?'

'উহু', মাথা ঝাঁকিয়ে ফিওদর আমার দিকে তাকিয়ে এমন করে হাসল যে আমি খুব বিব্রত বোধ করলাম। আমি বালিশে মুখ গুঁজে রইলাম। খানিক পরে মুখ তুলে আবার জানতে চাইলাম ঝি-টা এখন আসবে কি না।

'বোধ হয় না।' ফিওদর জবাব দিল।

আমি তখন বললাম, 'তাহলে তুমি এখন তোমার ঘরে যাও আমার ঘুম পেয়েছে, আমি পোশাক ছেড়ে এখন শুয়ে পড়ব।'

'তাই শুয়ে পড়। শুভ রাত্রি।' বলে হঠাৎ ফিওদর নুয়ে পড়ে আমার মুখে চুমু খেল। আমাকে দু'হাতে বুকের মধ্যে সাপটে ধরল সে। আমি বাধা দিই নি, কয়েক পলকের জন্যে বরং শরীরটাকে শিথিল করে দিয়েছিলাম। তাকে

প্রলুব্ধ করতে, নাকি নিজেই লুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম ? তারপরে ওর উত্তেজিত শরীরটাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলাম আমি···"

দস্তয়েফ্‌স্কি তখন মুখ ফিরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন, কিন্তু তক্ষুনি শুয়ে পড়তে পারলেন না। খাটের ওপর বসে পলিনাকে পাওয়ার দুরন্ত বাসনায় পুড়তে থাকলেন। দু'ঘরের মধ্যেকার দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে তিনি দেখছেন। পলিনা একে একে তার শরীরের সমস্ত আবরণ খুলে ফেলে বিছানায় উঠে চাদরটা টেনে দিল গায়ে। দরজা ঈষৎ ফাঁক জানে পলিনা। জানে মানুষটা তাঁর ঘরে বসে তার নিবাবরণ হওয়া দেখছে তবু সে গ্রাহ্য করল না, কেন ? তবে কী এ তার নিঃশব্দ আমন্ত্রণ ? চিন্তা করলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল তাঁর। আবার এসে তিনি বসলেন পলিনার খাটের পাশে। পলিনা তাঁকে জায়গা দিতে চিৎ হয়ে শুলো। চাদরের ভেতর দিয়ে পলিনার শরীরের উঁচু নিচু ভাঁজগুলি মোমের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন। তাই দেখে প্রবল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেই উত্তেজনা লক্ষ্য করে মিটিমিটি হাসছিল পলিনা, বললে, 'আবার কেন এলে ?'

'না, মানে, এই এমনি, কী যেন ভাবলাম, কী ভেবে যেন !'

'না কিছু ভেবো না, যাও শুয়ে পড় গে। আমি এখন ঘুমোব।' বলে পলিনা তার একুশ বছরের যৌবন উদ্‌ঘাটিত করে মোমটা নিভিয়ে দিতে বালিশে কনুয়ের ভর রেখে শরীরটা এগিয়ে এনে মুখ বাড়াল।

দস্তয়েফ্‌স্কি মাতালের মতন টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।···

১৮৬৩র হেমন্তে এক ধূসর সন্ধ্যায় বেরলিন স্টেশনে পলিনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে অব্দি পলিনা তাঁদের ভ্রমণ-পথের সর্বত্র এই নিষ্ঠুর খেলাই খেলেছে কেবল। কখনো তাঁকে উত্তেজনায় অস্থির করে তারপর বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছে, কখনো ভক্তিমতী স্ত্রীর মতন আত্মসমর্পণ করেছে তাঁর ইচ্ছার কাছে, তাঁর ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ হয়ে সুখী হয়েছে। ভাই-বোন সম্পর্কটা একটা নিষ্ঠুর পরিহাসে পর্যবসিত করে দিয়েছে ক্রমাগত। কখনো তাঁরা দেহ ভোগে পশু হয়ে উঠেছেন, কখনো নৈষ্ঠিক প্রেমিক ব্রহ্মচারীর মতন সাত্ত্বিক থেকেছেন। ঘড়ির পেনডুলামের মতন এভাবে সুমেরু আর কুমেরুতে দুলতে দুলতে চলেছেন তাঁরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। ফলত সুখ কখনো ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির মনে। তিনি যে শুধু দেহ-মনের অতৃপ্তির যন্ত্রণায় জেরবার হয়েছেন

তাই নয়, এই অপব্যয়ী মেয়ে তাঁকে কঠিন আর্থিক কষ্ট দিতেও কসুর করে নি। দস্তয়েফ্‌স্কির সেই আর্থিক কষ্ট আর দেহ-মনের দহন-জ্বালা জুড়োতে ছুটে ছুটে গিয়েছেন রুলেত টেবিলে ; কিন্তু এবার আর ভাগ্যদেবী প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন না তাঁর দিকে, হারতে হারতে আর খরচ হতে হতে তাঁর হাতের রেস্ত যখন মাত্র এক শ' কুড়ি ফ্রাঁ-তে এসে ঠেকল তিনি তক্ষুনি পলিনাকে নিয়ে পা বাড়ালেন জেনিভার দিকে। জেনিভায় এসে ঘড়ি বিক্রি করলেন, এলেন তুরিনে। এবং ভারভারা কন্সতান্তকে লিখলেন, "মারিয়াব জন্যে তোমাকে যে টাকা পাঠিয়েছিলাম তার থেকে আমাকে একশ' রুবল ফেরত পাঠাও।" মিখাইলকে লিখলেন, "বিদেশে পকেট শূন্য হয়ে গেলে কী দশা হয় অবশ্যি অনুমান করতে পার। শিগ্‌গির কিছু টাকা পাঠাও।" দু'খানি চিঠি ডাকে ফেলে অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থাকলেন দস্তয়েফ্‌স্কি আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করতে থাকলেন এখনই বুঝি হোটেলের ম্যানেজার তাঁর সামনে একটা লম্বা বিল এনে হাজির করবে আর তখুনি জেনে যাবে তিনি নিঃসম্বল কপর্দকহীন। সে নিদারুণ অপমানের হাত থেকে বাঁচাল তাঁকে ভারভারা। পত্র পাওয়া মাত্র একশ' রুবল পাঠিয়ে দিলে তার কয়েক দিনের মধ্যে। মিখাইলের কাছ থেকেও এসে পড়ল একটা মোটা অঙ্কের টাকা। দস্তয়েফ্‌স্কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পলিনাকে নিয়ে এলেন জেনোয়া, ধরলেন রোমের জাহাজ।

সেপটেমবর শেষ হতে না হতে হাতের টাকা শেষ হয়ে গেল ; আবার দেখা দিল হোটেলের টাকা মেটানোর সমস্যা। এবার তিনি তুরিনের হোটেলের ঠিকানা দিয়ে স্ত্রাখফ্‌কে অনুরোধ করে পাঠালেন, আমার জন্য যে-কোন শ্রেণীর একজন প্রকাশক পাকড়াও। তার থেকে কিছু অগ্রিম রয়েলটি আদায় করে পাঠাও। হাতে একটা কোপেক নেই, বিদেশে বড় বিপদে পড়েছি। কথা দিচ্ছি আমার এই ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে উপন্যাস করে তার দেনা শোধ করব।"

কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে টাকা দিয়ে আজ আর কেউ ভুগতে চায় না, সবাই ঠেকে শিখেছে দস্তয়েফ্‌স্কি কথা দিতেই দড়, কথা রাখতে নয়। অনেক দুয়ার ঘুরে স্ত্রাখফ্‌ শেষ পর্যন্ত পাকড়াতে পারলেন বোবোরিকিনকে। তৃতীয় শ্রেণীর এই প্রকাশকটি দস্তয়েফ্‌স্কির মতন নামী লেখকের বই পাবার এটাকেই একটা মওকা ভেবে স্ত্রাখফের হাতে তিনশ' রুবল অ্যাডভান্স করল দস্তয়েফ্‌স্কিকে। তিন বছর বাদে এই ভ্রমণ কাহিনী 'ইগরোক' (জুয়াড়ী) উপন্যাসে রূপ পেয়েছিল

বটে কিন্তু সে বই আর বোবোরিকিনের ভাগ্যে জোটে নি, পেয়েছিলেন স্তেলফ্‌স্কি। সে কাহিনীতে পরে আসছি।

স্ত্রাখফ্‌কে টাকার জন্যে চিঠি লিখে দস্তয়েফ্‌স্কি পলিনাকে নিয়ে রোম থেকে গিয়েছিলেন নেপলসে, সেখান থেকে তাঁরা দু'জনে ফিরতি পথে জেনোয়ায় এসে উঠলেন জাহাজে। এই জাহাজেই দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে গেল দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে নির্বাসিত হেরজেনের। সমকালীন রাজনীতি নিয়ে হেরজেনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি খুব খুশী হলেন। ছেলেকে নিয়ে হেরজেন লেঘোর্নে নেমে গেলে অকটোবরের মাঝামাঝি আবার তাঁরা এসে পৌঁছলেন তুরিন। এসেই পেয়ে গেলেন স্ত্রাখফের পাঠানো বোবোরিকিনের তিনশ' রুবল। দস্তয়েফ্‌স্কির অবিলম্বে পিতার্সবুর্গ ফেরা দরকার তিনি জানেন কিন্তু হাতে টাকা পড়লে চিরদিনই তিনি কর্তব্যাকর্তব্য বোধ হারিয়ে ফেলেন, এবারও তাই ঘটল, জুয়ার নেশা চেপে বসল তাঁকে। উপন্যাস ডকে উঠল। পিতার্সবুর্গে না ফিরে রওনা হলেন হামবুর্গ। পথে পলিনার তাগিদে নামতে হল বেরলিন। এক সন্ধ্যায় বেরলিন স্টেশনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। হেমন্তের সেই ধূসর সন্ধ্যায় একটা নিষ্ঠুর অসমপ্রেমের চরম বিচ্ছেদ ঘটল সেদিন। পলিনা পারীর উদ্দেশে উঠে বসল ট্রেনে। দস্তয়েফ্‌স্কি চলে এলেন হামবুর্গ। জুয়ায় মজলেন তিনি কিন্তু সাতটা দিনও কাটল না, যে পলিনা তাঁকে চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করে গেছে তাকেই চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন টাকা পাঠাতে: 'আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি দয়া করে কিছু সাহায্য কর।'

চিঠি পেয়ে পলিনা সুসলোভা প্রথম ভীষণ চটে উঠেছিল, মরুক গে লোকটা, না খেয়ে রাস্তার ভিখিরীর হাল হোক, আমি কেন টাকা পাঠাতে যাব? কিন্তু পরক্ষণে রাগ পড়ে গেছে তার, ঘড়ি আর আংটি বেচতে গেছে দোকানে, তখন তার কতিপয় ফরাসী-বন্ধু বাধা দিলে, 'বেচবে কেন, বেচবার দরকার নেই, আমরা টাকা দিচ্ছি।'

সেই টাকা পাঠিয়ে দিলে পলিনা তাঁকে। টাকা পাঠাতে পেরে পলিনা অবশ্য বেশ আরাম বোধ করল। যাকে ভালবাসতে পারল না তার টাকায় দেশ ঘুরেছে বলে বুঝি কিঞ্চিৎ লজ্জা ছিল মনে মনে। টাকা পাঠিয়ে তাই পলিনা তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "লোকটা আমার জন্যে অনেক করেছে, তার কিছু করতে পেরে আমি এখন স্বস্তি পাচ্ছি।"

দস্তয়েফ্‌স্কি পলিনার টাকা পেয়ে আবার রুলেত-টেবিলে ছুটে গেলেন, এবার

বোবোরিকিনের দেওয়া তিনশ' রুবল উদ্ধার করতে পারলেন তিনি এবং কী শুভ-বুদ্ধি হল জুয়ার টেবিলে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেলেন না আর; জুয়ার লোভ সংবরণ করে হতাশ প্রেমিক ফিরে এলেন দেশে।

তারপর ১৮৬৫-র আগস্টের মাঝামাঝি আর একবার তাঁদের দেখা হয়েছিল ভিসবাদেনে, দিন কতক একসঙ্গে ছিলেনও তাঁরা কিন্তু ভাঙা কাচের মতন তাঁদের ভাঙা প্রেম আর জোড়া লাগে নি। পরস্পরকে তাঁরা আর কাছে টানতে পারেন নি; একে অন্যকে দোষারোপই করেছেন কেবল।

"তুমি আমার জীবনে গায়ের জোরে এসে অনধিকার প্রবেশ করেছ। তুমি ভ্রষ্টা করেছ আমাকে।" পলিনা কথায় কথায় দুষতো দস্তয়েফ্স্কিকে। সে তাঁকে দেখতে শুরু করেছিল লম্পট প্রেমিক হিসেবে। ১৮৬৪-র ডায়েরিতে পলিনা লিখেছিল, "আমি দস্তয়েফ্স্কিকে ঘৃণা করি; এই সেই মানুষটি যে আমার কৌমার্য-হনন করেছে।" আর দস্তয়েফ্স্কি ওই সময়ে একটা চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন,—"একদা তুমি স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে, তোমার অহমিকা সে-কথা ভুলতে পারছে না বলেই তুমি আজ আমার ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছ। এটাই বস্তুত 'নারী-চরিত্র'।" পলিনা যে কী মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল দস্তয়েফ্স্কিকে, ওই উক্তির মধ্যেই তা দলিল হয়ে আছে।

সাত

পলিনার দেওয়া দুঃখ দস্তয়েফ্স্কি কোন দিন ভুলতে পারেন নি। তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি কোন দিন। তাই নারী-চরিত্র আঁকতে কখনো তার ছাপ কখনো তার ছায়া কখনো তার প্রভাব স্বতঃই এসে পড়েছে সেই চরিত্রের মধ্যে। কিংবা ইচ্ছা করেই তাকে চরিত্রান্তরিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'জুয়াড়ী' থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী সব উপন্যাসে ইস্তক 'কারামাজোভ ভাইরা'-তে পর্যন্ত পলিনার ছায়া-শরীর প্রলম্বিত হয়েছে। একাধিক বার তিনি এমন নারী-চরিত্রও এঁকেছেন যে পুরুষের ঐকান্তিক আগ্রহের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত ও মোহগ্রস্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য আপনাকে সমর্পণ করেছে; শেষে নিজের সে দুর্বলতার কথা স্মরণ করে সেই পুরুষের ওপরে হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর ও নিজের ওপরে নিয়েছে মর্মান্তিক প্রতিশোধ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কল্পনার ওই

দ্বিধা-দীর্ণ নায়িকারা আসলে খুব নিকট থেকে নিভৃতে বসে খুঁটে খুঁটে দেখা বাস্তবের পলিনা ছাড়া আর কেউ নয়। পলিনা দস্তয়েফ্‌স্কিকে যেমন ভালবাসত তেমনই ঘৃণাও করত। তার এ দুই বৃত্তি এক যোগে দস্তয়েফ্‌স্কির ওপরে চরম হয়ে উঠেছে বার বার। তার থেকেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এ-শুধু পলিনার একার ব্যাপার নয়, সর্বজনিক, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এ-বৃত্তি সব মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। মানুষে মানুষে এ বিষয়ে কেবল তীব্রতার পার্থক্য। পলিনার চরিত্র থেকেই তিনি যেমন নারীর ধর্ষকামিতার স্বভাব আবিষ্কার করেছেন তেমনি পলিনার দেওয়া নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যে গভীর আনন্দ পেয়ে জেনেছেন পুরুষের দুঃখ-পাওয়ার সহজাত বাসনা বা মর্ষকাম। এই ধর্ষকাম ও মর্ষকামের সংঘর্ষে আর একটা বৃত্তির বিকাশও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'জুয়াড়ী'র সেই বিখ্যাত পংক্তিই তার প্রমাণ—'মিস্ পলিনা তার দাসী···মেয়েরা ওই রকমই। যে মেয়ে যত বেশী উদ্ধত, পুরুষের সে তত বেশী পদানত।'

কিন্তু না, এখানে এসেই থই হারায় নি দস্তয়েফ্‌স্কির অন্তর্দৃষ্টি, সে-দৃষ্টি নিজের বোধের অতলেও নেমে গেছে। তিনি দেখেছেন, প্রেমিকার হাতে অত্যাচরিত হয়েও সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখ কখনো নিষ্কণ্টক হয় না। তার মধ্যে প্রভূত জ্বালাও থাকে। জ্বালা বোধ করেছেন তিনি বার বার, পর্যুদস্ত অহমিকার জ্বালা পৌরুষের অপমান পুনঃপুন বিদ্ধ করেছে তাঁকে, ফলত মনের মধ্যে কেবলই ফুঁসে উঠেছে পরাজিত পৌরুষ, ধিক্কৃত অহমিকা। মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে ধর্ষকাম —অত্যাচার করার বাসনা। সে-বাসনা বাস্তবে চরিতার্থতা না পেয়ে পলিনার সঙ্গে চরম বিচ্ছেদের পরে রূপান্তরিত হয়েছে 'জাপিস্‌কি ইজ পদপোলিয়া' (পাতাল থেকে আলাপ) উপন্যাসে। পলিনা তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে তার শোধ নিয়েছেন তিনি তাঁর 'আমি' চরিত্রের হাতে বারবনিতা লিজাকে মর্মান্তিক মনঃকষ্ট দিয়ে। অর্থাৎ পলিনার কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন, ঘৃণা ভালবাসার সঙ্গে কী নিদারুণ জট পাকিয়ে থাকে। পলিনা নগ্ন করে দেখিয়েছে মানুষ-মনের সেই ক্ষুধা যার প্রতাপে মানুষ অত্যাচার করতে ও অত্যাচরিত হতে সমান উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর সে উন্মাদনার উৎসে থাকে কাম। মনুষ্য-স্বভাবের এই বৃত্তিগুলি দস্তয়েফ্‌স্কির পূর্ববর্তী লেখকদের চোখে যে কখনো পড়ে নি তা নয়; কিন্তু মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতিকে এই বৃত্তিগুলি কী যে ভীষণ প্রভাবিত করে দস্তয়েফ্‌স্কির মতন এমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে আর কেউ বিশ্লেষণ করেন নি। সন্দেহ নেই দস্তয়েফ্‌স্কি বিরল প্রতিভার মানুষ। তবু একথা মানতেই হবে,

পলিনার মতন বেপরোয়া যুবতী যদি দস্তয়েফ্‌স্কির সামনে এমন নিঃশেষে নিজেকে নিরাবরণ করে না ধরত ত জীবন রহস্যের অন্ধকার যবনিকা এত সহজে তাঁর চোখের সামনে থেকে সরে যেত না। এত সকালে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত না তাঁর গভীর-সঞ্চারী দিব্য-দৃষ্টি।

পরম দুঃখের মূল্যে কেনা সেই গ্রীষ্মের অভিজ্ঞতা শরীরী হয়ে উঠেছিল তাঁর 'জুয়াড়ী' উপন্যাসে। তদর্থে বলা যায় 'জুয়াড়ী' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এ-উপন্যাসের লাঞ্ছিত নায়ক ওই ১৮৬৩-র দস্তয়েফস্কি নিজে, নায়িকার ডাক নামটি অব্দি তিনি পালটান নি। বাস্তবের পলিনা সুস্‌লোভা উপন্যাসে হয়েছে পলিনা আলেকসানদ্রভনা। উপন্যাসের ফরাসী-চরিত্র দ্য গ্রিয়ে অনায়াসে পলিনা সুস্‌লোভার স্পেনিস প্রণয়ী বলে সনাক্ত করা যায়। তা ছাড়া উপন্যাসের বিভিন্ন তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত রুশী যুবতীদের প্রতি ওই ফরাসীর দুর্নিবার আকর্ষণের মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কির প্রতি পলিনার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটিকেই স্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না 'জুয়াড়ী' আসলে পলিনার জন্যে দস্তয়েফ্‌স্কির নিবিড় মায়ারই বিশ্লেষণ। আর ঐই মায়ার নিবিড় টানই তাঁর পরবর্তী শিল্প-সৃষ্টির-প্রেরণা।

পলিনা সুস্‌লোভার চরিত্রে দস্তয়েফ্‌স্কি আবিষ্কার করেছিলেন এক কর্তৃত্ব-পিপাসু নারীকে। তিনি তাঁর বোনকে লিখেছিলেন, "আপোলিনারিয়া একটি দারুণ দাম্ভিক মেয়ে। ওর অহংকার আর আত্মপ্রীতির সীমা পরিসীমা নেই। সে অন্যের কাছে সর্বস্ব দাবি করে কিন্তু তার জন্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও সে নারাজ। উপন্যাসের নায়িকাকেও দেখি, দ্য গ্রিয়ের কাছে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ঋণ সত্ত্বেও তার মনে এতটুকু কুণ্ঠা নেই। লজ্জা বোধও না।

অন্তর্দ্বন্দ্বে দর্পের বিপরীত কোটিতে থাকে হীন শরণাগতি। দ্য গ্রিয়ে পলিনা আলেকসানদ্রভনাকে ছেড়ে চলে গেলে সে স্বেচ্ছায় জুয়াড়ী আলেক্‌সেই ইভানোভিচের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে হেয় করতে এতটুকু দ্বিধা করল না। অথচ এই মানুষটিকে ভালবাসলেও তার প্রতি পলিনার ঘৃণারও অবধি নেই। তবে কেন এমন কাজ করল? না, সে নিজেকে হেয় করতে যেমন চায় তেমনি চায় সদর্পে প্রমাণ করতে যে, পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁয় বিকিয়ে যাওয়ার মেয়ে সে নয়।

ভালবাসার সেই উত্তাপে উৎসাহিত নায়ক রুলেত-টেবিলে গিয়ে বসে এবং ভাগ্যবশে সেদিন পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁই জিতে নিয়ে আসে।' তার মনে তখন

এই ভেবে পরম আনন্দ যে এই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ওই ফরাসীটার মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে পলিনা সদম্ভে চলে আসতে পারবে। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ জিতে সেই সুখে সে বুক ফুলিয়ে পলিনার কাছে আসে। সুখেই রাত কেটে যায় তাদের। কিন্তু পরের দিন কী এক বিতৃষ্ণায় পেয়ে বসল পলিনাকে ফরাসীটার বদলে নোটের গোছা আলেক্‌সেই ইভানোভিচের মুখের ওপরেই ছুঁড়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল জন্মের মতন। অর্থাৎ নায়িকার সেই দ্বিধা-দীর্ণ চরিত্রেরই প্রতিফলন আবার। এই প্রতিক্রিয়ার কারণ কী, না একদা সে স্বেচ্ছায় আলেকসেইর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সেই আত্মধিক্কার। সেই ধিক্কারই যদি তার প্রতি ভালবাসার অধিক হবে ত ফরাসীকে ছেড়ে আলেক্‌সেইর কাছে এসেছিল কেন ? না, শক্তি পরীক্ষা করতে। আলেক্‌সেইর ওপরে তার পূর্বতন প্রভাব, কর্তৃত্ব সমানই আছে কিনা যাচাই করতে। কিন্তু যেই নাকি আলেকসেই তাকে পঞ্চাপ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে কিনতে চাইল আহত নারীর দর্প অমনি ফুঁসে উঠল, সদম্ভে অতগুলি টাকা তুচ্ছ করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করল। যেমন ঘটেছিল 'পাতাল থেকে আলাপ' উপন্যাসের নায়কের বেলা। বেশ্যা লিজাকে নায়ক নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছিল এবং লিজাও তার অকৃত্রিম ভালবাসা অর্পণ করেছিল তাকে ; কিন্তু যে-মুহূর্তে নায়কের মনে হয়েছে লিজা তার গর্বিত প্রভুত্ব পিপাসার সুযোগ নিয়ে তার ওপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শরণাগত হয়েছে তখনই সে তাকে নিদারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। কি 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর নায়ক কি 'জুয়াড়ীর' নায়িকা উভয়ের মধ্যেই দস্তয়েফ্‌স্কির তৎকালিক দ্বৈত-মনোবৃত্তির প্রতিফলন দেখতে পাই। দ্বৈত-চরিত্রের মানুষের হৃদয়-বৃত্তিতে ভালবাসার জন্ম হয় বিরোধের মধ্যে দিয়ে কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা এক সময়ে ঘৃণা ও প্রেমের দুই বিপরীত প্রান্তে দ্বিধা হয়ে যায়, অথবা ঘৃণা থেকে ভালবাসা মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ভালবাসা ঘৃণার পঙ্কে নেমে আসে। ফলত এ ভালবাসা কখনো সুখের উৎস হয়ে ওঠে না। নিজের স্বভাবের দ্বৈত-বৃত্তি কেবলই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে মানুষটিকে। ভালবাসা শরণাগতিতে সার্থক হতে চায়, অহংকার শরণাগতিতে বাধা দেয় ; তার ফলেই ভালবাসার জীবন হয়ে ওঠে বিষময়—দ্বন্দ্ব-পীড়িত সেই বিষাক্ত জীবনেরই বিয়োগান্ত চিত্র 'জুয়াড়ীর' নায়ক আলেক্‌সেই ইভানোভিচ্‌ ও 'পাতাল থেকে আলাপে'র 'আমি'।

'জুয়াড়ী'র প্রথম পরিচ্ছেদে নায়ক আত্মবিশ্লেষণ করছে : আবার করে আমি নিজেকে শুধালাম—আমি কি তাকে ভালবাসি। আবার আমি দেখলাম, আমি

এর উত্তর দিতে সাহস পাচ্ছি না কিংবা বলা ভাল যদি হাজার বারও আমি ওই প্রশ্নের উত্তর দি-ই উত্তর দেব—"না, আমি তাকে ঘৃণা করি।" হাঁ, আমি তাকে ঘৃণা করি। ···আমি শপথ করে বলছি ওই সব মুহূর্তে আমি যদি হাতের কাছে একটা চাকু পেতাম নির্ঘাৎ ওর বুকে বসিয়ে দিতাম। কিন্তু এও স্বীকার করি আমার ভালবাসা পরীক্ষার জন্যে ও যদি বলত সমুদ্রে ঝাঁপ দাও আমি হয়ত তাও দিতাম···হাঁ পলিনা আলেকসানদ্রভনা কখনো কখনো আমাকে মনুষ্যেতর কিছু মনে করত।"

বস্তুত পলিনার কাছে পারীতে এসে এবং তারপরে ইতালি-বেড়ানোর সময়টায় পলিনা সম্পর্কে এই রকম মনোবৃত্তিই মনের মধ্যে তীব্র ভাবে অনুভব করেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি। অবশ্য এই বৃত্তিটা তিনি যে পলিনার সাহচর্যে এসেই জেনেছিলেন তা নয়। এটা সেমিপালাতিন্স্কে মারিয়ার সঙ্গে প্রেম করার সময়ই তিনি নিজের মধ্যে টের পেয়েছিলেন এবং সে বোধকে তখনই ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন সেমিপালাতিন্স্কে থাকতে ১৮৫৮ সালে লেখা 'খুড়োর স্বপ্ন' ও 'স্তেপানচিকোভো গ্রাম' উপন্যাস দু'টিতে। অবশ্য সে-উপন্যাসের চেয়ে এই 'জুয়াড়ী' উপন্যাসে প্রেম ও ঘৃণার দ্বৈত অস্তিত্বের নির্মম সংঘাত আরও স্পষ্ট আরও তীব্র। এবং এ উপন্যাস থেকেই এটা সব মানুষে সামান্য হয়ে দেখা দিল দস্তয়েফ্স্কির পরবর্তী সমস্ত রচনায়। কিন্তু পরের কথা থাক।

এখন ভিতরে-বাইরে লেখার তাগিদ চাবুক উঁচিয়ে থাকলেও পিতার্সবুর্গের মাটিতে পা রাখতে না রাখতে সংসার তাঁকে টেনে নিয়ে গেল তার জটিল আবর্তের মধ্যে। পিতার্সবুর্গে সপ্তাহ খানেকও থাকতে পারলেন না, ছুটতে হল ভ্লাদিমির। সেখানে শয্যাগত স্ত্রীর সংকটজনক অবস্থা। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে নবেম্বরের মাঝামাঝি তাকে নিয়ে চলে এলেন মসকোয়ার শুকনো আবহাওয়ায়; কিন্তু মসকোয়ায় এসে মারিয়ার রোগ গেল আরও বেড়ে। সারাটা শীত চলল যমে-মানুষে টানাটানি। মৃত্যু মারিয়াকে অল্পে অল্পে গ্রাস করতে থাকল। কয়েকবার পিতার্সবুর্গ আসা ছাড়া মারিয়ার বিছানার পাশ থেকে নড়লেন না দস্তয়েফ্স্কি। প্রথমে তিনি একলাই ছিলেন, শেষের দিকে এলেন মারিয়ার বোন। একদা যে-নারীকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলে জেনেছিলেন আজ তাঁর অন্তিম দিনে তাঁর প্রতি উদাসীন থাকতে পারলেন না দস্তয়েফ্স্কি। তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। কোন সংলোকের হয় ত এত ধৈর্য থাকত না। নিষ্পাপ চরিত্রের মানুষ হলে, যে-স্ত্রীর কাছ থেকে ভালবাসা পেলে না, নিজেও আব যাকে ভালবাসতে পারলে

না তার প্রতি নিরুদ্বেগ নিরুত্তাপ হতে পারত কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি ত তেমন না, স্ত্রীর কাছে ভালবাসা চেয়ে ব্যর্থ অধিকন্তু লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত তিনি পবিত্র দুঃখে ব্রহ্মচারীর মতন ক্ষয়িত হলেন না বরং পর-নারীতে আসক্ত ও সুখী হতে পাপ করলেন অথচ তার জন্যে অনুতাপে ভুগলেন না, এহেন মানুষের পক্ষে স্ত্রীকে ক্ষমা করা স্বাভাবিক। স্ত্রী যেমন তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন তিনিও তেমনি স্ত্রীর প্রতি অবিচার করেছেন অর্থাৎ তিনিও স্ত্রীর মতনই দোষী, সমান দোষী দু'জনে। অতএব স্ত্রীকে তিনি অনায়াসে ক্ষমা করতে পারলেন অপিচ উদার মানুষটির মন মুমূর্ষু স্ত্রীর জন্যে মমতায় ও করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠতে পারল। দস্তয়েফ্‌স্কি-চরিত্রে বৈশিষ্ট্যও এখানে। তিনি নোংরা পাঁকের অন্ধকারে অনেক দূর ডুবে গিয়েছিলেন সত্যি কিন্তু তাঁর হৃদয় সর্বদাই ছিল ঊর্ধ্বমুখ রৌদ্র-পিপাসু। শিশির ভেজা পদ্মের মতন স্নিগ্ধ ও নির্মল।

মারিয়ার ছেলে পাশা (পল ইসাএফ্‌) এত দিনে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। পড়া শোনাটা ভাল হবে ভেবে দস্তয়েফ্‌স্কি তাকে রেখেছিলেন একজন শিক্ষকের হেফাজতে। দু'জনে এক জায়গায় থাকত। দস্তয়েফ্‌স্কিই খরচ চালাতেন দু'জনের। বিদেশ ঘুরে এসে দেখেন যার ওপরে ভরসা করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন সে-ব্যক্তি পাশাকে লেখাপড়া না শিখিয়ে শিখিয়েছে অন্য বিদ্যে : কেমন করে সৎপিতার কষ্টার্জিত অর্থ আর ঘড়ি বোতাম আংটি এবং ঘরের দামী আসবাব বেচে ফুর্তিফার্তা করতে হয়, কোথায় কোন ধরনের পান ভোজন মেলে, কোথায় গেলে কেমন মজা লোটা যায় সব—সমস্ত। তার ওপরে আবার বয়স্ক মানুষটা রাস্তার মেয়েছেলে ঘরে এনে তাদের সঙ্গে রাত কাটাত। দেখে দেখে পাশারও ভয় ভেঙেছে সাহস বেড়েছে। দস্তয়েফ্‌স্কি বিদেশ থেকে এসে এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে মাস্টারকে তৎক্ষণাৎ তাড়ালেন বটে কিন্তু পাশার নষ্ট-চরিত্র পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। বাপের স্বভাবটা এত দিনে পুরোপুরিই সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। বংশের ধারা ধরে পাপের পথে হাঁটতে শুরু করেছিল সে। সেমিপালাতিন্‌স্ক্‌ থেকে এসে অব্দি পাশার পড়াশোনার প্রতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি তিনি কখনোই রাখতে পারেন নি, কেবল যাতে সে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, অর্থকষ্টে পড়াশোনার ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্যে প্রয়োজনেরও অধিক অর্থ ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি অভাবী দস্তয়েফ্‌স্কি। এমন কি নিদারুণ অভাবের মধ্যেও তার জন্যে একজন গার্ডিয়ান টিউটর রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু যার হবার নয় তার কিছুতেই হয় না। অল্প বয়েসেই পেকে উঠেছিল সে, দুর্জন সঙ্গে ষোল বছরে

এসে একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। নিষিদ্ধ-পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়; সেখানকার একটি মেয়েকে নিজের ফ্ল্যাটেও এনে রেখেছিল। মায়ের জন্যে তার কোন দিন টান ছিল না, এমনকি সহানুভূতিও না। এত যে অসুখে ভুগছেন তার মা তবু একবারটি চোখের দেখা দিতে আসছে না।

দস্তয়েফ্‌স্কি পাশার মাসিকে দুঃখ করে লিখেছিলেন 'ওর এতটুকু দায়িত্ব-জ্ঞান নেই। সব চাইতে দুঃখের কথা একজন রুগ্ন মহিলার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে তাই সে শেখে নি। অবশ্য মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা ভুগে ভুগে অত্যন্ত খিট্‌খিটে আর বদমেজাজী হয়ে উঠেছে···তাঁর জন্যে আমার কষ্ট-বোধ হয়; তার জীবন আদৌ গোলাপের বিছানা নয়···কিন্তু আমি জানি আজ আমাকে তার বড় প্রয়োজন, তাই আমি তার পাশে বসে থাকি ·'

গত ক'মাস ধরে পলিনার ক্রমাগত বিপরীত-ব্যবহারে বিধ্বস্ত দস্তয়েফ্‌স্কির দুর্গত স্নায়ু মুমূর্ষু স্ত্রীর যন্ত্রণা দেখে আর পাশার কুৎসিত কাণ্ড কারখানা শুনে এইবার একেবারেই ভেঙে পড়ল। ফলত মসকোআ আসার প্রথম সপ্তাহেই দু' দু'বার তাঁর মৃগীর আক্রমণ। তার একটা এমন দারুণ হয়েছিল যে টানা পনরদিন তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে। সে-ধকল সামলে উঠতে না উঠতে আবার চাগিয়ে উঠেছে পুরনো অর্শের ব্যামোটা সঙ্গে মূত্রস্থলীর প্রদাহ। না পারেন শুতে, না পারেন বসতে; যে একটু উঠে দাঁড়াবেন সে-শক্তিও পাচ্ছেন না। এ-অবস্থা চলল মার্চ অব্দি তারপরে রোগের প্রকোপটা কমল বটে কিন্তু তাঁকে একদম দুমড়ে মুচড়ে রেখে গেল। আর্থিক অবস্থার কথা না বলাই ভাল; তবে এ সময়টায় তাঁকে একেবারে উপোস দিয়ে থাকতে হয় নি, এটাই মন্দের ভাল।

পিতার্সবুর্গে যখন ফিরে এসেছেন তখনও বোবোরিকিনের তিনশ' রুবলের যৎকিঞ্চিৎ তাঁর পকেটে ছিল। নভেম্বর পড়তে না পড়তে আবার হাতে এল একটা মোটা অঙ্ক। মেসো কুমানিন আট বছর বিছানায় অচল হয়ে পড়েছিলেন। এ-সময়ে হঠাৎ মরে গিয়ে বাঁচালেন দস্তয়েফ্‌স্কিকে। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেলেন তিন হাজার রুবল। এর থেকে দুঃস্থ লেখকদের সাহায্য ভাণ্ডার থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করে দি্লেন তারপরেও মাস তিন চলার মতন টাকা হাতে থাকল। সে টাকা যখন ফুরলো, হাত পাতলেন এসে মিখাইলের কাছে। বোবোরিকিন যেন ওৎ পেতে ছিল, সেও এসে সামনে দাঁড়াল ঠিক সময় বুঝে, রেগে মেগে বলল, 'দূর বিদেশে টাকা নেই বলে যখন কুকুর-তাড়া খাচ্ছিলেন তখন তিনশ' রুবল দিয়েছিলাম আপনাকে, কথা দিয়েছিলেন একটা বই দেবেন

আমাকে, বই আজ অব্দি দিলেন না, আসলে আপনি মিথ্যুক, মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়েছেন। বই দেওয়ার মতলব ছিল না আপনার। আমিও আর এখন বই চাইনে, বইদেবেন বলে আর ঘোরাতে পারবেন না আমাকে, আজ এখনই আমাকে টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে, আমি টাকা না নিয়ে উঠছি না আজ। আজ টাকা না দিলে কাল রাস্তায় ধরে অপমান করব।' অসন্তুষ্ট জেদী মানুষটার হুমকি শুনে হকচকিয়ে গেলেন মিখাইল। দস্তয়েফ্‌স্কির সংসার খরচ ত দিতেই হল উপরন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে বোবোরিকিনের টাকাটাও শোধ করে দিলেন তিনি।

অথচ মিখাইলকে দেখে কে তার নেই ঠিক। 'ভ্রেমিয়া' বন্ধ হয়ে যাওয়া অব্দি তাঁর সংসারে দুরবস্থা চলছে। কিন্তু মিখাইল বড় শক্ত ধাতুয় গড়া। হাল ছাড়তে তিনি সহজে রাজী নন। একদিকে সংসার বাঁচাতে যেমন টাকার ধান্ধায় ঘুরছেন আর একদিকে তেমনি কাগজ বের করার জন্যে করেছেন প্রাণপণ। কিন্তু সরকার কঠিন। 'ভ্রেমিয়া' কিছুতেই বের করতে দেবে না সরকার, এমন কী নূতন নামে কাগজ বের করতে দিতেও তাদের দ্বিধা, বললে, 'কী নামে বের করতে চাও ?''

মিখাইল বললেন, 'প্রাভদা' (সত্য)।

সরকার শুনে শিউরে উঠে বললে, সত্য প্রকাশ মানে ত সত্যের নামে জারের নিন্দে প্রচার, না ও নাম চলবে না। মিখাইল তখন ভেবেচিন্তে অপেক্ষাকৃত নিরীহ একটা নাম বললেন, 'এপোখা' (যুগ)। এবার রাজী হলেন সরকার। অনুমতি দিলেন কাগজ বের করবার। মনের আনন্দে আর্থিক অনটন ভুলে আবার কাগজ নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন।

দীর্ঘ আট মাস কাগজে আঁচড় কাটেন নি দস্তয়েফ্‌স্কি। দাদা কাগজ বের করতে এবার তাঁকে লেখায় হাত দিতে হল। শুরু হল 'জাপিস্‌কি ইজ পদ্‌পোলিয়া', 'নোটস ফ্রম দ্য আণ্ডার ওয়ার্ল্ড' নামে ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাসখানি লেখা—এরই বাংলা নামকরণ করেছি আমি 'পাতাল থেকে আলাপ', পদ্‌পোলিয়া মানে অবশ্য সিঁড়ির নিচেকার অন্ধকার খুপরি।

কিন্তু কলম ধরেই মনের আনন্দে লিখতে পারলেন না, আড়ষ্ট কলম থেকে সহজে লেখা বেরোতে চায় না। আসলে আড়ষ্ট কলম নয়, তখনকার মনের অবস্থা। সেই অসাড় মনের অবস্থাটাই হুবহু এসেছে উপন্যাসের গোড়ায় :

আমি একটা অসুস্থ মানুষ একটা ঈর্ষাদুষ্ট মানুষ। মানুষের মন ভোলাব

তেমন কোন গুণ নেই আমার। মনে হয় আমার লিভারে একটা ব্যামো আছে কিন্তু কোথায় যে ব্যামোটা ঠিক বুঝতে পারি নে; ঠিক করে বলতে পারি নে কী আমায় কষ্ট দিচ্ছে। আমি এখন কোন ওষুধ খাচ্ছি নে, কোন দিনই ওষুধ খাই নি আমি। অবশ্য ওষুধ কি ডাক্তারের ওপরে আমার কোন রাগ নেই…না, বিদ্বেষবশেই আমি ওষুধ খাই নে। তুমি খুব সম্ভব এসব বুঝবে না। হুঁ, আমি বেশ জানি। বস্তুত, আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না এই ঈর্ষা দিয়ে আমি কার নাগাল পেতে চাই…আমার থেকে কে আর বেশী জানে যে, এই বিদ্বেষের বিষে নিজেকেই আমি বিষাক্ত করব, অন্য কাউকে না। সে যাই হোক, আমি যে ওষুধ খেতে চাইনে সে-কেবল বিদ্বেষবশেই। আমার লিভারে ব্যথা, থাক ব্যথা, ব্যথা আমাকে শেষ করে দিক।"

তাঁর মধ্যে যে অনির্বাণ যন্ত্রণার চিতা জ্বলছিল, সেই সর্বভুক আগুনের আঁচ রয়েছে 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর ওই শুরুতে। পাশের ঘরে কাশতে কাশতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে স্ত্রী, পিতার্সবুর্গে বসে সৎছেলে তাঁর কঠিন কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় করে চলেছে আর থেকে থেকে মৃগীর নির্মম আক্রমণ ক্রমাগত বিধ্বস্ত করে চলেছে তাঁকে—সবার ওপরে তুষের আগুনের মত জ্বলছে পলিনার দেওয়া প্রবঞ্চনার দুঃখ। এত সত্ত্বেও হয় ত কাবু হতেন না এই বজ্রকঠিন-মনের মানুষটি যদি সময়টা না-হত তখন শীতকাল। সব উত্তাপ কেড়ে-নেওয়া রাশিয়ার শীতকাল যে কী নিদারুণ, বিদেশী যাঁরা রাশিয়ায় না থেকেছেন, বুঝবেন না। সেই শীতের চেহারাটা দস্তয়েফ্স্কির ভাষাতেই বলি (ওই উপন্যাস থেকেই):

"তখন বরফ পড়ছে, আধ-ভেজা হলুদ নোংরা বরফ; ক্রমাগত বরফ পড়ে চলেছে, একবিন্দু কামাই নেই। আজ যেমন গতকালও তাই; তার আগের দিন তার আগের দিন—প্রতিটি দিনই সেই একঘেয়ে ঘটনা।"

সেই আর্দ্র বরফের হাড়-কাঁপানো শীতের দিনে বসে বুকে অনির্বাণ কষ্টের আগুন পুষে দস্তয়েফ্স্কি লিখেছেন, 'পাতাল থেকে আলাপ', বলেছেন, 'আমার ধারণা এই আর্দ্র বরফই আমার মনে এই কাহিনীর জন্ম দিয়েছে অতএব এই কাহিনীর নাম হোক 'আর্দ্র বরফের গল্প'। আর্দ্র বরফের এই গল্পের নামকরণ আগেই বলেছি তিনি করেছেন, 'পাতাল থেকে আলাপ'। অবশ্য আলাপ না বলে বলা ভাল স্বীকার-উক্তি কি জবানবন্দী। কাল্পনিক একজন শ্রোতাকে সামনে রেখে উপন্যাসের নায়ক 'আমি' জবানবন্দী দিয়ে যাচ্ছে।

রুশো তাঁর কনফেশনে আদি পাপকে অস্বীকার করেছেন। মানুষ স্বভাবত

সৎ, এ-কথা বলে তিনি ব্যক্তির চরিত্র-দোষের সব দায় সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন ; শেষমেশ বলেছেন, কেমন করে সৎ-সমাজে ব্যক্তি-চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক রাখা যায়। আর দস্তয়েফ্স্কি তাঁর 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ এর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, কলঙ্কিত মানুষকে পরিত্রাণ করা কোনও সৎ-সমাজেরই সাধ্য নয়।

উপন্যাসখানিতে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রকট সে হচ্ছে—রুশো এবং অন্য সমস্ত সনাতন সমাজতাত্ত্বিক দর্শন, যথা প্ল্যাটো, আরিস্ততল, হবস্, বেনথাম থেকে হেগেল ও স্টুয়ার্ট মিল সব্বাইর বিরুদ্ধে—এক বিপুল বিদ্রোহ।

দস্তয়েফ্স্কি না বিশ্বাস করেন ঈশ্বরে, না মৌল পাপে। তাঁর বক্তব্য, মানুষের ইচ্ছাবৃত্তিতে কোন কলুষ নেই। মানুষের স্বাভাবিক ও সুস্থ মনের অভিব্যক্তির ওপরে শিক্ষা-সংস্কৃতির নকল বহুবর্ণ-মুখোশ চাপিয়ে দিয়েছে নীতিবাগীশরা, তাঁদের হাতেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা নামক যুক্তিবাদ। আসলে সেই যুক্তিবাদের চোখেই বিকৃত ও রুচিগর্হিত ঠেকছে মানুষ-মনের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অভিপ্রকাশ। ওটাকে শিক্ষার শিকলে না বাঁধতে পারলেই অক্ষম আক্রোশে কপালে এঁকে দেওয়া হয় পাপী বা ক্রিমিনাল কথাটা। নিয়মে বাঁধা (নিরীহ) সভ্য-মানুষের সমাজ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের মনের জোর সহ্য করতে পারবে না বলে।

কিয়ের্কেগার্দের মৃত্যুর ন' বছর পরে ১৮৬৪-তে দস্তয়েফ্স্কির এ বই বেরোয়। তখন এই ডেনিশ-দার্শনিকের নাম কোপেনহেগেনের মানুষরাও ভাল করে জানে না অতএব দস্তয়েফ্স্কির এ-বই কিয়ের্কেগার্দ দ্বারা প্রভাবিত একথা সত্য নয় ; এমন কী দস্তয়েফ্স্কি তখন অব্দি নীৎশের নামও শোনেন নি। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, প্রবাসী-মনের এই প্রাতিস্বিক দর্শন দস্তয়েফ্স্কি তাঁর নিজের জীবন-বোধ থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন, কারো চিন্তার শরিকানা ভাগ করে নেন নি। বলতে গেলে দস্তয়েফ্স্কির জীবনই তাকে এই দর্শনে দীক্ষিত করেছিল।

এই উপন্যাসখানা নীৎশের হাতে আসে ১৮৮৭-তে। তার আগে নীৎশে দস্তয়েফ্স্কির নাম জানতেন না। জানতেন না, কিয়ের্কেগার্দ নামে একজন ডেনিশও তাঁর মতন চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তার মানে পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যের চেহারা পালটে দিতে উনবিংশ শতকের এই তিন যুগান্তকারী চিন্তা-নায়ক পরস্পরের থেকে দূরে অজ্ঞাতে একলা বসে একই দার্শনিক জীবন-বোধে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

কিয়েৰ্কেগার্দ ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কাছে হাজির হয়েছেন, আর দস্তয়েফ্‌স্কি নিয়ে এসেছেন গোটা বিশ্ব। তীব্র জীবন-বোধের ব্যাপারে ওই তিনজনই আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির আকাশ-মাটিতে ছড়ানো বিশালতার সামনে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, নীৎশের সামনে অভিভূত হই ভয়ে, কাপালিকের সামনে নবকুমারের অবস্থা হয় আমাদের। কিন্তু কেউ যদি কিয়েৰ্কেগার্দ পড়তে পড়তে দস্তয়েফ্‌স্কি পড়তে শুরু করেন ত তাঁর মনে হবে যেন একটা আবদ্ধ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি, একটা পাল-তোলা ছোট নৌকোয় এক বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে ভাসছেন। অথবা মনে হবে যেন কিয়েৰ্কেগার্দকে নিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি মজা করছেন। আবার এমনও মনে হতে পারে যে কিয়েৰ্কেগার্দ দস্তয়েফ্‌স্কির কলম থেকেই জন্মেছেন; কখনো কখনো নীৎশের অস্তিত্বকেও আবিষ্কার করতে পারব দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে।

দস্তয়েফ্‌স্কির 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর নায়ক বলছে—'একদিন গজদন্ত-মিনারবাসী সুখী মানুষও সুখে অস্থির অসুস্থ হয়ে রাস্তায় নেমে আসবে।' দস্তয়েফ্‌স্কির মতন নির্বাসনের কষ্ট দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগেন নি কিয়েৰ্কেগার্দ। তিনি ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান, অল্প বয়েসেই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, সুখী মানুষ। সত্যি, দেখা গেল এ-হেন মানুষও সুখে অসন্তুষ্ট; নিজের জীবনকে পদে পদে জটিল করে বেঁচে থাকাটাই কঠিন করে তুলেছেন। কিয়েৰ্কেগার্দ যখন নিজের কথা বলেছেন তখন সে-কথাগুলি 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর নায়কের কথাই হয়ে উঠেছে—ভাষায় প্রকাশ ভঙ্গিতে বোধের তাৎপর্যে কোথাও গরমিল নেই। উভয়ের মধ্যেই একটা অনন্যসুলভ নিজস্বতা সুস্পষ্ট। বস্তুত এই বইয়ের মধ্যেই দস্তয়েফ্‌স্কি সব প্রথমে খুঁজে পেলেন নিজেকে; এতদিন তিনি যা হাতড়ে বেড়িয়েছেন (জীবন-রহস্য) তাঁর জীবন-যন্ত্রণা তাই তুলে দিল এবার তাঁর হাতে। তাঁর আত্মবিকাশের এটাকেই তাই প্রথম সিঁড়ি বলব। সনাতন দর্শনের বিরুদ্ধে এই প্রথম জেহাদ উচ্চারণ করে দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর নিজের মাটিতে পা রাখলেন। ফলত এই বইখানা তাঁর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির ভূমিকা হয়ে উঠল। এ-রচনাটি মূলত এর আগের বছরে প্রকাশিত চের্নিশেফ্‌স্কির 'হোয়াট ইজ টু বী ডান?' বইখানারই প্রতিবাদ। চের্নিশেফ্‌স্কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন মানুষ-প্রকৃতি স্বভাবত ও মূলত সৎ। দস্তয়েফ্‌স্কি তার প্রতিবাদ করে দেখালেন: সদসৎ দু-ই মানুষ-প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও সহজাত। তার

একটা অংশ যেমন সৎ আর একটা অংশ তেমনি তার বিপরীত। সে জেনে বুঝেই সেই বিপরীতের অঙ্কশায়ী হয়।

মানুষ উইয়ের মতন নিরলস পরিশ্রম করে যেমন তিলে তিলে মহৎ কিছু গড়ে তুলতে চায় তেমনি নিজের হাতে তাকে গুড়িয়ে দিতেও ভালবাসে। মানুষ তার খামখেয়ালিপনার প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। ভালবাসে নিজের চরম ক্ষতি অবধারিত জেনেও পাপে ডুবে যেতে। আর এগুলি সে করে অন্যের তৈরি বিধি-বিধান ও নিজের তৈরি যুক্তি-বুদ্ধির নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেতে, দুয়ে দুয়ে চার হওয়ার অনিবার্য ফলকে অস্বীকার করতে। মানুষের স্বভাবের ভিতরে যে অরাজক দস্যু-সন্তানটি বাস করে তাকে অবহেলা অবজ্ঞা করার একটা মামুলি চাল চলে আসছে আবহমান কাল ধরে, সেই চালেই চাপা পড়েছিল ওই দস্যু সত্তা। দস্তয়েফ্‌স্কি এসে তাকেই এবার অন্ধকার থেকে টেনে এনে ধরলেন চোখের সামনে, যেমন করে চামড়ার নিচে ঢাকা অগোচর রক্তকে চামড়া চিরে দেখায় মানুষ।

বস্তুত ১৮৬৩-৬৪ সালে দস্তয়েফ্‌স্কি কঠিন আধ্যাত্মিক সংকটে ভুগতে ভুগতে সনাতন দর্শনের মধ্যে তার কোন দাওয়াই না পেয়ে সেই সনাতন নীতিবাদকেই অস্বীকার করে বসলেন, পাপ করার অধিকারকেই প্রতিপাদন করতে বদ্ধপরিকর হলেন তিনি। তথা আধুনিক মনস্তত্ত্বের সূত্রপাত হল, সৃষ্ট হল 'পাতাল থেকে আলাপ'—তাঁর হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার দলিল।

বইখানি দু'খণ্ডে বিভক্ত। সংশয় ও বিদ্রোহের দুই আগুনে জ্বলন্ত মানুষটি প্রথম খণ্ডে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিক পরিমণ্ডল পরিবেশন করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে নিবেদন করেছেন ঘটনার সংঘাতে ঘুলিয়ে ওঠা অস্তিত্বের যন্ত্রণার কাহিনী।

অবশ্যই সে-অস্তিত্বের যন্ত্রণার কাহিনী কেবল তাঁর একলার নয় এবং কেবল আস্তিত্বিকও নয়, অর্থ নৈতিকও বটে। উনিশ শতকে তখন অগণিত শোষিত মানুষের কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ। সে-দিন জাতীয় প্রাচুর্য ও গৌরব গণ্য হত দেশের মুষ্টিমেয় অ্যারিস্টক্র্যাট, নোবল ও রাজানুগ্রহভুগীদের অর্থ কৌলীন্যে। অবশিষ্টরা ছিল ভূমিদাস—ধনী ও বুদ্ধিজীবীর ভারবাহী পশু। এই বুদ্ধিজীবী ও সচ্ছলদের প্রাসাদ-সৌধ, নৃত্য, নাটক, ক্লাব ইত্যাদির অসুস্থ প্রাচুর্যের জাকজমকের মধ্যে শোষণ-পেষণের শাড়াশী-চাপে রুদ্ধশ্বাস অভাজনদের আর্তনাদ একমাত্র দস্তয়েফ্‌স্কিই শুনতে পেয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন 'সাংস্কৃতিক সংকটের' আসন্ন বিপদের কথা—সারা দুনিয়াকে গ্রাস করতে ওৎপেতে আছে ওই সংকট।

শুনে সমকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠ থেকে স্ফুরিত হল উপহাস, বললে, লোকটা প্রলাপ বকছে, লোকটা পাগল। তাই 'নোটস ফ্রম দ্য আনণ্ডার গ্রাউণ্ড'-এর নায়কের ভাগ্যে জুটল 'অসুস্থতা', 'অবাস্তব' ও 'উদ্ভট-কল্পনা' ইত্যাদি তিরস্কার। দস্তয়েফ্স্কির মর্যাদা চিহ্নিত হল—'a sick cruel talent' বলে। বললেন কট্টর সমালোচক নিকোলাই মিখাইলফ্স্কি।

ভাগ্যিস এপ্রিলের গোড়াতেই তিনি উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছিলেন নতুবা এই মূল্যবান রচনাটির দশা কী যে হত বলা কঠিন কারণ এপ্রিলের শেষের দিকে একদিন হঠাৎ নিদারুণ রক্ত-বমি করলেন মারিয়া, শেষে নির্জীব হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর নীল ছায়া ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সারা মুখে। পিতার্সবুর্গে জরুরী তার পাঠালেন পাশার কাছে। আত্মীয় স্বজন সকলকেই খবর দিলেন। মুখে সিগারেট হাতে বাগদত্তার আংটি পরম অনিচ্ছায় পাশা এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল। সে অস্থির, ভাবছে কতক্ষণে পালাবে। মারিয়াকে যখন জানানো হল পাশা এসেছে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। চোখে পড়ল একমাত্র ছেলে কী অবজ্ঞার চোখে দেখছে তাঁকে, ঠোঁটে কী অবহেলার হাসি; তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন এবং সারা জীবন যাকে তিনি কথার ছুরিতে কুচি কুচি করেছেন তাঁরই হাতখানা তুলে নিলেন হাতে।

দস্তয়েফ্স্কির হাতে হাত রেখে ১৮৬৪-র ১৬ এপ্রিল শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মারিয়া দ্মিত্রিয়েভনা। আবেগে রুদ্ধশ্বাস দস্তয়েফ্স্কির মাথা নুয়ে পড়ল মারিয়ার বুকে। একবুক ভালবাসা দু'হাতে ভরে যার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন তিনি, যাকে না পেলে জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে মনে করেছিলেন—সারা জীবন সে তাঁকে দিয়েছে শুধু গঞ্জনার জ্বালা। তবু আজ তার বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি, মনে হল কোথায় যেন এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল, সে-শূন্য আর কখনো বুঝি পূর্ণ হবে না। মারিয়া তাঁকে সুখ দেয় নি সে-কথা ভেবে নয়, তিনি যে তাঁকে কখনো সুখী করতে পারেন নি, ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করে বঞ্চনাই শুধু করেছেন, ভেবে হাহাকারে ভরে উঠল তাঁর বুক।

ঠিক করলেন আর রাশিয়াতে নয়, আবার বেরিয়ে পড়বেন তিনি বাইরে দূরে, অনেক দূরে চলে যাবেন আর ফিরবেন না। তবু পিতার্সবুর্গ তাঁকে টেনে নিয়ে আসে রেল-স্টেশনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, পিতার্সবুর্গের দিকে গাড়িটা হুইসিল বাজিয়ে চলে যাচ্ছে, তিনি টিকিট না কেটেই বাড়ি ফিরে আসেন।

পাশাকে লেখেন আমি পিতার্সবুর্গে আসব না আর; কিন্তু চিঠি ডাকবাক্সে না ফেলে ছিঁড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে দেন। মারিয়ার মৃত্যু-সংবাদ শুনে পলিনা সান্ত্বনার চিঠি দিয়েছে কিন্তু তাতে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটা উত্তাপ ছিল না; নিরুত্তর পড়ে থাকে চিঠিটা টেবিলের ওপর। অব্যবস্থিতচিত্ততার এই দিনগুলির জ্বালা পোহাতে পোহাতে অস্থির তিনি একদিন শেষমেশ পিতার্সবুর্গেরই টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলেন।

মে-র সুন্দর সকাল। শক্ত বরফ গলে জল হয়ে নামছে। প্রকৃতি আর্দ্র স্নিগ্ধ কী নয়নাভিরাম সবুজ! দুঃস্বপ্নের দিন পেরিয়ে এসে খুব হাল্কা বোধ করলেন তিনি। পাখির মত হালকা। নির্বন্ধ নির্ভার তিনি যে-দিকে চোখ যায় চলে যেতে পারেন। সামনের বাধা পেছনের টান এক আঘাতে সব চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে। সুখী, আমি সুখী, নিঃশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কিন্তু দুঃখ দিয়ে যার জীবন গড়া তার জীবনে সুখ আসবে কোথা থেকে! অবশ্য তিনি কিছুই জানেন না। এই উজ্জ্বল আকাশ নির্মল বাতাস আর প্রসন্ন সবুজের আড়ালে থেকে আর একজন যে তাঁকে আরো নির্মম আঘাত হানার জন্য ছুরি শানাচ্ছে সে ত তাঁর জানার কথা নয়।

আট

পিতার্সবুর্গে দু'টা মাসও সুস্থিরে কাটাতে পারলেন না দস্তয়েফ্‌স্কি। নিয়তির নির্মম ছুরি আর একবার আমূল বিদ্ধ করল তাঁর বুক। এবারকার আঘাতটা আরও গভীর আরও মর্মান্তিক। জুলাই মাস পড়তে না পড়তে মিখাইলের অনেক দিনকার লিভারের অসুখটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। তিনি শয্যা নিলেন আর সেই শয্যাতেই চোখ বুজলেন ১৮৬৪-র ১০ জুলাই। ঘাড়ে এসে পড়ল তাঁর বিধবা স্ত্রী আর চারটি সন্তান; শুধু তাই নয়, মিখাইলের রক্ষিতা ও তাঁর একমাত্র সন্তানের দায়ও তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল। নিতে হল তাঁর যাবতীয় ঋণ—প্রায় পঁচিশ হাজার রুবলের বোঝা। তা ছাড়া রইল 'এপোখা'—জেদের মাথায় যে-কাগজ বের করে মিখাইল ক্রমাগত লোকসান খেয়ে চলছিলেন। এই সব দায় দায়িত্বের ওপরে পাথরের মতন চেপে রইল মৃগীর ব্যামো। ব্যামোটা তাকে মাঝে মাঝে শয্যাগত করে রাখছিল তখন।

বন্ধুরা বললে, 'তুমি কেন দাদার এত এত ঋণের দায় আর সংসারের বোঝা

মাথায় করে নিচ্ছ ফিওদর? অন্তত নগদ ঋণের বোঝাটা ঝেড়ে ফেলে দাও। দাদার নাম দেউলে খাতায় তুলে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা।'

'ছিঃ ও কথা বলতে নেই। ও কথা বলো না। এ আমার নৈতিক দায়, এ দায় ঝেড়ে ফেলা যায় না। পৃথিবীতে দাদাই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। বুদ্ধি দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে অর্থ দিয়ে দাদা সারা জীবন আমাকে সাহায্য করেছে। যে-কোন বিপদে যখনই হাত পেতেছি, দাদা আমাকে বিমুখ করে নি। আমার জন্যে তাকে কী কষ্ট সংকট পোহাতে হয়েছে কখনো মুখ ফুটে তা বলে নি। আমি নিমকহারামী করতে পারব না ভাই।'

এই সততার দায় দীর্ঘ তের বছর বহন করেছেন দস্তয়েফ্স্কি। তেরো বছর বসে দাদার ঋণ শোধ করেছেন। আর সারা জীবন বহন করেছেন তাঁর তুই সংসারের বোঝা।

দাদার মৃত্যুতে দস্তয়েফ্স্কির নিঃসঙ্গতা বোধটা অসহায় ভাবে ফুটে উঠেছে বন্ধু ভ্রাঙ্গেলকে লেখা চিঠিতে। "...আমি অকস্মাৎ বড় একলা হয়ে গেছি ভাই। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। আমার গোটা জীবন দু' টুকরো হয়ে গেছে। তেতাল্লিশ বছরের প্রথম খণ্ডটা আমি পার হয়ে এসেছি; পেছন ফিরে সেদিকে তাকালে দেখি অফলা গাছের বিরল ছায়ার এক ধু-ধু প্রান্তর আর অবজ্ঞা অবহেলা বঞ্চনার শুকনো বালি কাঁকর। সান্ত্বনার কোন স্মৃতিই নেই সেখানে। আর দ্বিতীয় ভাগ? সামনে ছড়ানো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নিরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই জানি নে তার, সবই মনে হয় অপরিচিত নূতন। চারধারে সবই ঠাণ্ডা, মরুভূমি। আমাকে উষ্ণ করতে একটি হৃদয়ের উত্তাপও কাছে পিঠে নেই।"

একমাত্র পলিনাই পারত সেই উষ্ণ হৃদয় হতে, পারত দ্বিখণ্ডিত মানুষটিকে নিপুণ শুশ্রূষার কারিগরিতে অখণ্ড করে তুলতে। কিন্তু পলিনার সে-মন সে-মেজাজ ছিল না। মারিয়ার মৃত্যুতে সে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বোধ করে নি, মিখাইলের মৃত্যু ত তার কাছে কোন সংবাদই নয় বরং দাদার মৃত্যুতে দস্তয়েফ্স্কি উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদেছেন শুনে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে 'বুড়ো খোকার নেকামি' বলে। শেষে লিখেছে, তুমি যদি এখনও আমাকে তেমনি ভালবাস ত চলে এস পারীতে।

দস্তয়েফ্স্কি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি এখানে অনেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। পিতার্সবুর্গ ছেড়ে এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আমার।'

পলিনা লিখলে, 'আমার জন্যে তোমার ভালবাসা যদি অকৃত্রিম হত ত কোন ঝামেলাই তোমাকে পিতার্সবুর্গে ধরে রাখতে পারত না।'

পলিনা চেয়েছিল এই পুরুষসিংহকে কুকুরের মতন বশংবদ ক্রীতদাসের মতন নতজানু করে রাখতে, সেটা না পারার জন্যেই যেন এখন দস্তয়েফ্স্কির ওপরে যত ঘৃণা তার।

পলিনার শুভানুধ্যায়ীরা বললে, 'কেন, যাও না, দস্তয়েফ্স্কির পাশে বসে 'এপোখা'র ভার নাও। তুমি সাধারণ মেয়ে, ওই অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে নিজের অখ্যাত নামটাকে জড়িয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারা কম ভাগ্যের কথা নয়।'

কিন্তু অহংকারী মেয়ে সে-সৌভাগ্য পায়ে ঠেলে পারীতেই পড়ে রইল। পড়ে থাকবার আর এক কারণ নাকি ভয়। তার সন্দেহ ছিল, দস্তয়েফ্স্কির মতন মানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে নেই। এতদিনে সে নির্ঘাৎ অন্য কোন মেয়ের অঙ্কশায়ী হয়েছে। হয়ে থাকলে সে তাঁর দ্বিতীয়া হবে, সে-পরাজয় সইবে কেমন করে পলিনা!

অতএব একাই লড়ে চললেন দস্তয়েফ্স্কি, এই তাঁর নিয়তি, এর অন্যথা হবার উপায় নেই। হলে পাশাই মানুষ হত। এমন বোঝা হয়ে থাকত না তাঁর। বোঝা হয়ে উঠত না ছোট ভাইটাও। সে-ও এসে পাশে দাঁড়াতে পারত কিন্তু আন্দ্রেইও পাশার মতনই নষ্ট হয়ে গেছে। দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকে। মদের পয়সা যখন জোটে না দাদার কাছে হাত পাতে, দাদা না দিতে পারলে তাঁর ওপরে তম্বি করে। দস্তয়েফ্স্কির রাগ হয় না, মানুষটার শোচনীয় অধঃপতন দেখে দুঃখ পান কেবল; ও যখন যা চায়, যখন যা সামর্থ্য হয় দেন। সুতরাং কিস্তিতে কিস্তিতে দাদার দেনা শোধ করেই তাঁর নিস্তার নেই। সবার দাবিই মেটাতে হয়, মেটাতে হবেই। এবং 'এপোখা'কেও চালিয়ে যেতে হচ্ছে, চালিয়ে যেতে হবে। দাদা যা শুরু করে গেছেন তাকে এখনই শেষ করে দেন কী করে, তা ছাড়া এটা তাঁর একটা আত্মপ্রচারের আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমও বটে। কিন্তু কাগজটা আদৌ ভাল চলছিল না। মেরে কেটে মাত্র তেরশ কপি বিক্রি হয় বাজারে। প্রচার সংখ্যা এত অল্প হলে লাভ হবে কেন, গাঁটগচ্চাই যাচ্ছিল কেবল। মোটা টাকা দক্ষিণা না দিতে পারলে ভাল লেখকেরা লিখতে চান না। 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর কিস্তি ছাড়া তাই কাগজের আর কোন আকর্ষণ নেই। কাগজের ভবিষ্যৎ অতএব ক্রমশই অন্ধকার হয়ে উঠছে। যাঁরা অগ্রিম টাকা দিয়ে গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা নানা অনুযোগ অভিযোগ করে চিঠি দিচ্ছেন। কাগজ ক্রমশই পেছিয়ে যাচ্ছে। জুন সংখ্যা বেরোতে বেরোতে আগস্ট মাস

এসে গেল। ডিসেম্বর সংখ্যা কিছুতেই তিনি জানুয়ারির আগে বের করতে পারলেন না।

শুধু টাকার অভাব নয়, শারীরিক সামর্থ্যেরও অভাব তখন। মৃগীর সঙ্গে এসে জুটেছিল অর্শ আর আমাশয়, তিন ব্যামো এক সঙ্গে মিলে নিদারুণ কাবু করে ফেলেছিল তাঁকে। তবু মরণ-পণ জেদের বশে আরও আটমাস চালিয়ে গেলেন কাগজটা; তখন শেষ মার দিলে ক্যাশিয়ার। তহবিল তছ্রুফ করে পালিয়ে গেল সে। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। তাতে অবশ্য কারো বিশেষ ক্ষতি হল না বরং লাভ হল সাহিত্য-রসিকদের। তাঁদের ভাগ্য ফিরল। 'এপোখা'র পেছনে অর্থ শ্রম ও সময় ব্যয় করে রিক্ত অবসন্ন মানুষটি তাঁর আসল কাজ সাহিত্য-সাধনায় সময় ও মন দিতে পারছিলেন না, এবার 'এপোখা' বন্ধ হলে সে-সুযোগ এল। বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা বইখানাই তাঁর কলমে বেরিয়ে এল, তিনি 'পাপ ও শাস্তি' (প্রেসতুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে) 'রচনায় মন দিতে পারলেন।

কিন্তু 'এপোখা' বন্ধ হয়ে গেল বললেই সব কথা বলা হয় না, কেন না তাতে করে কেবল সম্পাদক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা, সময়, অর্থ ও স্বাস্থ্যের অপচয়ই কবুল করা হয়, তাঁর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের ওই সংকট-সংকুল ১৮৬৫-র প্রথম ক'টা মাস তাঁর 'শিল্পীর জীবন'-কে যে নূতন অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণকরে দিল সে-কথা বলা হয় না। বলা হয় না, আন্না করভিন্-ক্রুকফ্স্কায়া আর মার্থা ব্রাইনের কথা। ঝড়ের মেঘের মাথায় রুপালি রেখার মতন আশার আলো হয়ে হতাশ দস্তয়েফ্স্কির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ওরা দু' জন।

পশ্চিম রাশিয়ার এক দূর-অঞ্চল থেকে এক অপরিচিতা চিঠি লিখেছিল তাঁকে সেই বিগত গ্রীষ্মে। চিঠিতে নিজের পরিচয় দিয়ে সে লিখেছিল, "আমি এক বিশ বছরের মেয়ে। বাবা মা সাহিত্য-চর্চাটাকে সুনজরে দেখেন না তাই তাঁদের চোখের আড়ালে গোপনে সাহিত্য-চর্চা করি। আর এই যে গল্প পাঠাচ্ছি 'এপোখা'র জন্যে সে-ও তাঁদের অগোচরে! আমার নির্জন-চেষ্টার একটি ফসল আপনাকে পাঠালাম। কী হয়েছে, কেমন হয়েছে আপনি দেখুন।"

দেখা-দেখির কিছু ছিল না তখন। তখন পয়সা দিতে পারেন না বলে ভাল লেখা তাঁর কাগজে কেউ পাঠায় না। অতএব কাগজের পৃষ্ঠা ভরাতে যে-লেখাই পান ছাপছেন দস্তয়েফ্স্কি। 'স্বপ্ন' নামক ওই কাঁচা হাতের লেখাটিও তিনি ছেপে ফেললেন। সেই উৎসাহে কুমারী কন্যা তৎক্ষণাৎ আর একটি গল্প পাঠাল

দস্তয়েফ্‌স্কিকে। এবারকার গল্পটির বিষয় দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি: গল্পের নায়ক ধর্মের-টান আর নারীর ভালবাসায় দ্বিধা-বিভক্ত এক তরুণ সন্ন্যাসী। অক্ষম হাতে পড়ে গল্পটি যৎপরোনাস্তি মার খেয়েছে তবু তিনি সেটি ছাপলেন। এবং মেয়েটির কল্পনাশক্তিকে তারিফ করলেন, এমন একটি মৌলিক চরিত্র নিয়ে কত কীই না করা যেতে পারত। কত কীই না করা যায়। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দারুণ নাড়া দিল চরিত্রটি এবং তাঁর হাতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠার জন্যেই যেন তাঁর চিন্তা ও স্মৃতি আঁকড়ে রইল গল্পটি। এবং দীর্ঘ পনর বছর পরে 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' উপন্যাসে আলিওশা চরিত্রে সত্য ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠল সেই তরুণ সন্ন্যাসী। দক্ষ শিল্পীর সে এক অমর স্বষ্টি।

অপরিচিতা এই তরুণী লেখিকার নাম আন্না করভিন-ক্রুকফ্‌স্কায়া। এক বর্ধিষ্ণু রক্ষণশীল রুশী পরিবারের মেয়ে। থাকে দূর-দুর্গম এক অঞ্চলে। কেবল শীতের সময় মাস কয়েকের জন্যে বাপ মার সঙ্গে আসে পিতার্সবুর্গে, মস্কোআয়। পনর বছর বয়সেই এই সুন্দরীর মনে যৌবনের গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল। কিশোরী-সুলভ খেলা-ধুলোয় নিস্পৃহ সে তার ইংরেজ গভার্নেসের কাছে বসে বিদেশের রূপকথা শুনত। শুনতে শুনতে তার মন স্বপ্নে ভরে উঠত। এভাবেই সে স্বপ্ন-বিলাসী হয়ে ওঠে। তারপরে বয়েস বাড়লে তার চরিত্রে গভীরতা আসে, রাজনীতি নিয়ে পড়া শোনায় মন দেয় তখন। ভক্ত হয়ে ওঠে র‍্যাডিক্‌ল্‌ পার্টির। নিহিলিস্ট বলে রুশ-সরকারের হাতে যারা নিগৃহীত ও নিহত হন পিতার্সবুর্গ আর মসকোআর সেই সব বীর ছাত্র-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধায় ও মমতায় ভরে ওঠে তার মন। বাবাকে ধরে বসে, আমি পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব।

রক্ষণশীল বাপ শুনে আঁৎকে ওঠেন, কঠিন গলায় জবাব দেন, "সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বিয়ে না হওয়া অব্দি ঘরের বার হয় না, এটা যদি তোমার জানা না থাকে, জেনে রাখ।" জেদী মেয়ে মুখ গোমড়া করে চলে যায় এবং আরো বেশী করে খামখেয়ালী আর অবাধ্য হয়ে ওঠে।

এই মেয়ে ও তার বাবা-মাকে পাঠক দেখতে পাবেন দস্তয়েফ্‌স্কির অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'ইদিয়ত'-এ (ইংরেজি অনুবাদ—দ্য ইডিয়েট) আগলাইয়া ও তার বাবা-মার ভূমিকায়। আগলাইয়ার জন্য তাঁদের কি অশান্তি! তাঁরা এই অবাধ্য মেয়েটিকে নিহিলিস্ট ভাবেন, খেয়ালী ভাবেন। তাঁদের বাৎসল্য খেয়ালী কন্যার দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে থাকে। আগলাইয়ার মতন আন্না করভিন-ক্রুকফ্‌স্কায়ার বাবাও তার আধুনিক রুচির কাছে হার মানেন, তবু হালে প্রকাশিত

পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হবার সময় দেখে বেছে যাচাই করে তবে টাকা পাঠান। সেই সযত্ন বাছাই কাগজের তালিকায় 'এপোখা'রও নাম ছিল। আন্না সেই 'এপোখা' পেয়ে মহা খুশী। ঘরে বসে কিছু দিন ধরে গোপনে যা লিখছিল তার থেকে একটা পছন্দ করে 'এপোখা'য় ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিলে। তারপরের খবর আগেই বলেছি।

এবার একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটল। দস্তয়েফ্স্কির লেখা একখানা চিঠি গিয়ে পড়ল তার বাবার হাতে। সেদিন আবার আন্নার মায়ের জন্মদিন। সম্ভ্রান্ত অতিথি-অভ্যাগতে গিসগিস করছে বাড়ি। এমন দিনে বাপ-মায়ের হাতে পড়ার আগে তার চিঠিপত্র পিয়নের হাত থেকে নিয়ে লুকিয়ে ফেলার অবকাশ ছিল না। বাবার হাতে তার চিঠি পড়েছে শুনে আন্না ভয়ে শিটিয়ে উঠল। ভদ্রলোকের আবার হার্টের অসুখ। আন্নার নামে চিঠি! কার চিঠি? রাগে উত্তেজনায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল মেয়ে। কিন্তু রক্ষা বাবা একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারান নি; ধৈর্য ধরে বাইরের লোকদের চলে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করলেন; শেষে ডাকলেন মেয়েকে। সেই সর্বনাশা চিঠিতে ছিল 'স্বপ্ন' গল্পটার জন্যে অপরিচিতাকে পাঠানো যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার একটা ড্রাফ্ট্।

বাপ কঠিন গলায় বললেন, 'যে মেয়ে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করতে পারে। টাকা নিতে পারে অজ্ঞাত পুরুষের কাছ থেকে, সে সর্বনাশী সব পারে। আজ সে গল্প বেচে টাকা নিচ্ছে আর একদিন নিজেকে বেচে টাকা রোজগার করবে।' বাপের রাগ দিনসাতেক অব্দি চলল, সাতদিন তিনি মেয়ের মুখদর্শন পর্যন্ত করলেন না। তারপরে 'ইডিয়েট'-এর আগলাইয়ার বাবা জেনারেল ইএপানচিনের মতনই আন্নার বাবারও মেজাজ পড়ল। বাইরের রুক্ষ মেজাজের নিচে তাঁর মনটা ছিল নেহাৎই সরল ও নরম, স্নেহ প্রবণ। একদিন বাড়ির সকলকে ডেকে একত্র করলেন, মেয়েকে বললেন, 'আনো তোমার 'এপোখা'য় ছাপা গল্প, পড়, সবাই তোমার 'স্বপ্ন' গল্পটা শুনুক তোমার মুখে।'

এ ঘটনার পরের ঘটনা ঘটল পিতার্সবুর্গে। ১৮৬৫-র জানুয়ারিতে মায়ের সঙ্গে আন্না এল রাজধানীতে বেড়াতে। বাবা সাবধান করে দিলেন, 'খুব সমঝে চলবে। ওই সম্পাদক দস্তয়েফ্স্কি আমাদের জগতের মানুষ না, শুনেছি কোন্ এক সাংঘাতিক অপরাধে মানুষটি সাইবেরিয়ায় কয়েদও খেটেছে। অতএব খবরদার তার সঙ্গে মেলামেশা করবে না।'

কিন্তু পিতার্সবুর্গে এসে বাবার সে-নিষেধ আগ্রহ্য করতে এতটুকু দ্বিধা করল না মেয়ে। বাবা কাছে নেই তাই সাহস বেড়ে গেছে তার। এসেই চিঠি দিলে দস্তয়েফ্‌স্কিকে: "আমি পিতার্সবুর্গ এসেছি। অমুক জায়গায় আছি। দেখা পেলে ভারি খুশী হব।' চিঠি পেয়ে তেতাল্লিশ বছরের বিগতদার পুরুষ নওল কিশোরের মতন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ছুটে এলেন আন্নার সঙ্গে দেখা করতে। মা আর দু' জন জর্মন মাসির পাহারায় আন্না এসে বসল তার বৈঠখানায়, দস্তয়েফ্‌স্কির সামনে। দস্তয়েফ্‌স্কি প্রাচীন তিন গম্ভীর মহিলার মাঝখানে সুরক্ষিত সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন! এত যে বয়স আর এত যে অভিজ্ঞতা, তার কিছুই কাজে লাগল না—লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে রইলেন। কথাবার্তা হল তুচ্ছ, সামান্য! তাঁর খণ্ড ছিন্ন সংক্ষিপ্ত কখনো-কখনো অসংলগ্ন আলাপ কারো মনেই দাগ কাটল না। অল্পক্ষণ থেকেই উঠে পড়লেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

আন্নার দিদি এদিনটির কথা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন, "…আন্না ছুটে এসে তার বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে সে কী তার কান্না।…না চেহারায় জৌলুস, না কথাবার্তায় ধার—আন্নার হতাশার সীমা ছিল না।"

কিন্তু সে-হতাশা কেটে যেতেও দেরি হয় নি। অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বার এসে সে-হতাশা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিলেন তিনি। সেদিন বাড়িতে ছিল দু' বোনই কেবল। অতএব দস্তয়েফ্‌স্কি অসংকোচে মনের আগল খুলতে পারলেন। ঝরণার মতন তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলল তাঁর কথার স্রোত। দু' বোনই মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে। অচিরেই একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল তাঁদের মধ্যে। দস্তয়েফ্‌স্কি তারপর হামেশাই আসেন, গল্প-গুজব করেন, হাসেন হাসিয়ে মারেন আন্নাকে। অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল মধ্যবয়সী মানুষটি যৌবন-উচ্ছল যুবতীর প্রেমে মজেছেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি সম্পর্কে আন্না করভিনের ভয় ও ভাবনা যখন আর রইল না, শুরু হল তার স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টুমি আর খুনসুড়ি। দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে মজা করতে পারলে সে কিছুতেই ছাড়ে না। ঠিক সেই 'ইডিয়েট'-এর আগলাইয়া যেমন। কিন্তু 'ইডিয়েট'-এর প্রিন্স মিশকিনের সঙ্গে বাস্তবের নায়ক দস্তয়েফ্‌স্কির পার্থক্য এই যে, তিনি আন্নাকে যতই ভালবাসতে থাকেন ততই ঈর্ষায় সংশয়ে পুড়তে থাকেন। একদিন ত এই নিয়ে আন্নার মায়ের সঙ্গে কী তর্ক! মাদাম

ক্রুকফ্স্কায়ার ইচ্ছে, যেমন সব মায়েরই থাকে, ধনবান সুপুরুষ পদস্থ পাত্রে কন্যাদান। তিনি চান তাঁর মেয়ে সমৃদ্ধ সংসারের কর্ত্রী হবে, সম্ভ্রান্ত সমাজের গৌরব ভোগ করবে। পিতার্সবুর্গে এবার আসার সেই উদ্দেশ্য দস্তয়েফ্স্কির কাছে প্রকাশ করতেই তুমুল তর্ক বেঁধে গেল। দস্তয়েফ্স্কি প্রাণপণে প্রমাণ করতে চাইলেন—ধন নয় মান নয় প্রেমই বিয়ের প্রকৃত বন্ধন, মধুর বন্ধন, সোনার সুতোর বেড়ি; আর সব সমস্ত বন্ধনই ক্রীতদাসের শেকল, লোহার বেড়ি।

মাদাম ক্রুকফ্স্কয়ার সঙ্গে তাঁর সেই তর্ক 'ইডিয়েট' উপন্যাসে ইএপানচিন-দের বাড়িতে প্রিন্স মিশকিনের ভাষায় আর একবার পুনরাবৃত্তি করেছেন দস্তয়েফ্স্কি। সেদিনের সান্ধ্যবাসরে প্রিন্স মিশকিন এলোমেলো ও অসংলগ্ন যুক্তি দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালায়। প্রিন্স মিশকিনের সে বাগাড়ম্বর মাঝখানে থামিয়ে দেয় তার মৃগীর ব্যামো। হঠাৎ ফিট হয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে একটা দুর্লভ চীনামাটির ভেস ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি। মাদাম ক্রুকফ্স্কায়ার সঙ্গে তর্ক করার পরে তিনি কেবল ক্ষুব্ধ মনে ঘরের এক কোণে বসে সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন।

তার পরেই যে আন্নার সঙ্গে দস্তয়েফ্স্কির বিচ্ছেদ ঘটে তা নয়, দু'জনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা তার পরেও ছিল। দীর্ঘ দিন ছিল। কিন্তু বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা সেই অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়। সে যে কেবল মাদাম ক্রুকফ্স্কায়ার আপত্তির জন্যে, তা নয়, আন্না করভিনেরও দ্বিধা ছিল। দস্তয়েফ্স্কি পরে বলেছেন, "আন্না আমাকে ভালবাসত ঠিকই, খুব ভালবাসত আর শ্রদ্ধা করত; কিন্তু বিয়ে করে সার্থক হয়ে ওঠার মতন তীব্র ছিল না সে-শ্রদ্ধার ভালবাসা।" দস্তয়েফ্স্কির এ ধারণায় যে ভুল ছিল, তাঁকে বিয়ে না করার হেতু আন্না করভিনের যে অন্য কিছু ছিল, এ কথা অনেক দিন পরে সে নিজেই বলেছে। তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। দস্তয়েফ্স্কিও ততদিনে বিয়ে করে ফেলেছেন। তার নামও আন্না—আন্না গ্রিগোরিয়েভনা। অন্য পুরুষের স্ত্রী হওয়ার পরেও আন্না করভিন দস্তয়েফ্স্কির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল, দু' জনের মধ্যে হামেশাই পত্র লেখালেখি চলত। মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎও হত। সে-সূত্রে আন্না করভিনের সঙ্গে আন্না গ্রিগোরিয়েভানার পরিচয় হয়। দু'জনে দেখা হলেই সে গ্রিগোরিয়েভনাকে খুঁটে খুঁটে দেখত। কী দেখত, কেন দেখত সে-কথা আন্না কারভিন লিখেছিল তার দিদিকে—

"......ত্যাখ দিদি, লক্ষ্য করে দেখলাম, নিজের বলে গ্রিগোরিয়েভনা তার এতটুকু ব্যক্তিত্বও আর আলাদা করে রাখে নি। ফিওদরের কাছে সে সম্পূর্ণ

আত্মসমর্পণ করেছে, বলতে গেলে নিজের গোটা জীবনকেই সে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা কেবল ফিওদরকে ঘিরে, তার আর দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই, সে যেন একেবারে ফিওদরময় হয়ে গেছে। আমিও ফিওদরকে কম ভালবাসি নি, কিন্তু আমি পারলাম না, আমি পারি নি, অমন করে শরণাগত হওয়ার সাধ্য ছিল না আমার। অসাধ্য হয়েছিল কারণ ফিওদরের দাবি ছিল প্রচণ্ড, সে দাবির বিপুল চাপ আমার মন সহ্য করতে পারত না, সে আমাকে নির্মম ভাবে আকর্ষণ করত, আমার সত্তা ব্যক্তিত্ব শুদ্ধ যেন সে গ্রাস করতে চাইত আমাকে। আমি শিউরে উঠতাম। তার সামনে আমি কিছুতেই আমার ব্যক্তিত্বকে আলাদা করে রাখতে পারতাম না। এভাবে আত্মহারা হয়ে ডুবে যেতে আমার ভয় করত। আমি সরে এসেছি।”

আমরা এখন বুঝতে পারছি মাদাম ক্রুকফ্‌স্কায়ার অনিচ্ছা নয়, দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতই তাঁদের বিচ্ছেদের হেতু। ওই চিঠিতে আন্না করভিন নিজের অনেকখানি ও আন্না গ্রিগোরয়েভনার বুঝি সব-খানিই উদ্‌ঘাটন করেছে। দস্তয়েফ্‌স্কির দ্বিতীয় পত্নী আন্না নিজেব ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, যা মারিয়া কিংবা পলিনার পক্ষেও সম্ভব হয় নি, দস্তয়েফ্‌স্কিব সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে নিজেকে তাঁর সঙ্গে একাকার করে মিশিয়ে দিতে না পারলে বুঝি দস্তয়েফ্‌স্কির সর্বগ্রাসী ভালবাসা তৃপ্ত হয় না, বুঝেছিল আন্না করভিন, তার প্রথম যৌবনের সহজাত বোধ দিয়ে অনুভব করেছিল,—সাহিত্যখ্যাতি কিংবা অসামান্য প্রতিভা কোনটাই প্রেমের জন্যে উত্তম প্রতিশ্রুতি নয়, এঁদের সঙ্গে প্রেম কবা যায় সত্য কিন্তু নিজের পৃথক সংজ্ঞা বজায় রেখে সুখী হওয়ার জন্যে ঘর বাঁধা যায় না। তাই সে বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্বপরায়ণ মেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল; কিন্তু তার সেই ক্ষণকালের সাহচর্য দিয়ে সে সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছে দস্তয়েফ্‌স্কির নারী-চরিত্রে অভিজ্ঞতা। এমন একটি নারী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না ঘটলে বুঝি দস্তয়েফ্‌স্কির মহান সাহিত্য-কর্মে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যেত।

অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি মার্থা ব্রাউনের মতন একটি নারী তাঁর জীবনে না আসত। বস্তুত ‘এপোখা’র সাফল্যই এখানে। ‘এপোখা’ চালাতে গিয়ে তিনি অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন, অনেক মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন কিন্তু সে সব ক্ষয় ক্ষতি সুদে আসলে শোধ করে দিয়েছে ‘এপোখা’ ওই দু’টি অসাধারণ চরিত্রের সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির পরিচয় করিয়ে দিয়ে।

মার্থা ব্রাউনের আগের জীবনের কথা কেউ জানে না ; দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে তার পরিচয়ের পরের ইতিহাসও কেউ যত্ন করে ধরে রাখে নি। তাই এমন একটি নির্বন্ধ মানুষের ঘাত প্রতিঘাতের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে দস্তয়েফ্‌স্কির ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবনীকার স্ত্রাখফ্‌-ও বিশেষ কিছু খবর জোগাতে পারেন নি। যেটুকু তার বিষয়ে জানা গেছে তাতে করে মনে হয়, অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র রুশীপরিবারের মেয়ে ছিল সে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাতৃ-ভাষা সে দারুণ ভাল লিখতে পারত, ভাষার ওপরে দখল ছিল তার ঠিক সাহিত্যিকের মতন। দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অল্প আগের অধ্যায়ে নানা পুরুষের প্রশ্রয়ের ছায়ায় যুরোপের পথে পথে ঘুরছিল সে। দস্তয়েফ্‌স্কিকে লেখা তার একখানা চিঠিতে সে দিনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, সে যখন অসট্রিয়া আর প্রুসিয়া বেড়াচ্ছে তখন তার পুরুষ ছিল একজন হাঙ্গেরিয়ান। তার পরেই মার্থা একজন ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর হাতে পড়ে। তার সঙ্গে সে স্থইটজারল্যাণ্ড, ইতালি, স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা অঞ্চল ঘোরে—সে ঘোরার কখনো নিবৃত্তি ছিল না। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়ায় চেপে কেবলই পথ চলেছে তারা, নাকি কে বা কারা ওই ঠগ ইংরেজকে খুন করতে পিছু নিয়েছিল তার। মাস সাতেক ওই রকম নিরুদ্দেশ নিরবচ্ছিন্ন ঘুরে বেড়ানোর পথে হাত বদল হয়ে সে পড়ল গিয়ে এক ফরাসীর হাতে, সে তাকে নিয়ে ফ্রান্স থেকে যায় বেলজিয়াম, সেখান থেকে হল্যাণ্ড।

পরবর্তী কালে তার এই ভবঘুরে জীবনের কথা চিঠিতে দস্তয়েফ্‌স্কিকে জানাতে বসে মার্থা কবুল করেছে—'অভিজ্ঞতা লাভের জন্যেই জীবন, সেদিন এই ছিল আমার বিশ্বাস।' সেই বিশ্বাসের কড়ি গুণতেই, না কি আসলে ভবঘুরে জীবনের নেশাই তাকে ঘরছাড়া করেছিল, নামিয়ে দিয়েছিল এই খামখেয়ালের পদ-যাত্রায় কে বলবে। তা এই পথ-চলার খেয়ালেই সে ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছিল, ক্রমশ একেবারে নিচের তলায় যেখানে মানুষ সব হারিয়ে সম্বল করে কেবল অভাব আর অসম্মান। এই অভাব আর অসম্মান চরমে ওঠে তার বেলজিয়ামের পথে এবং হল্যাণ্ডে।

এখানে এসে তার পুরুষ পুলিশের চোখে সন্দেহের মানুষ হয়ে ওঠে। হয় ত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থাকবে কিংবা অন্য কিছু ঘটে থাকবে তার, কেন না মার্থা একলা রোতারদাম থেকে চলে আসে, যেতে বাধ্য হয় ইংলণ্ডে। তখন তার হাতে একটা ফাদিং অবশিষ্ট নেই। তার ওপরে নূতন সমস্যা তার ভাষা

যেমন কেউ বোঝে না, সেও বোঝে না কারো ভাষা। এমন দেশে চারটা বছর কাটাতে হয়েছিল তাকে। সে-চার বছরের বিস্তারিত ইতিহাস নিঃসন্দেহে কৌতূহল জাগাবার মতন কিন্তু তার সামান্যই জানতে পারা গেছে। মার্থার চিঠিতে মাত্র এইটুকুই উল্লেখ ছিল যে, সে-চার বছর তার আদৌ একঘেয়েমিতে কাটে নি, নিদারুণ সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিন গেছে তার। কখনো সুন্দর বিছানায় পরম আদরের মধ্যে যেমন ঘুমিয়েছে, কখনো তেমনি রাত কাটাতে হয়েছে তাকে নদীর পাড়ে কিংবা কালভার্ট কি পুলের ওপরে। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু'দিন জেলও খেটেছে সে। এবং তার চেয়েও গুরুতর অবস্থা গেছে তার একদল জালিয়াতের পাল্লায় পড়ে। সেখান থেকে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে আশ্রয় পেয়েছে মেথডিস্ট্‌ মিশনারিদের করুণার ছায়ায়। তাঁরা তাকে সংজীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন বালটিমোরের এক নাবিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। ব্রাউন পদবীটা সেই স্বামীর থেকেই পেয়েছিল মার্থা। অবশ্য স্বামী তাকে পদবীর বেশী আর যে কিছু দিতে পেরেছিল এমন মনে হয় না; স্বামীর সংসার সে বেশীদিন করতে পেরেছিল তাও না। কেন না কিছুদিন পরেই নাকি সে ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পালানোর কারণটা মার্থা কোন দিন কারো কাছে প্রকাশ করে নি। নানা পথ পেরিয়ে, নানা মানুষের হাত ধরে সে যখন আবার স্বদেশে ফিরতে পারল, পা রাখল পিতার্সবুর্গের মাটিতে তখন ১৮৬২-র বছরটা প্রায় শেষ হতে চলেছে।

তখন আর তার পথ চলার নেশাও নেই; ক্লান্ত পাখির মনে যেন নীড় বাঁধার আশা। অবসন্ন সে একটু আশ্রয়ের আরাম পেতে আকুল। কিন্তু আরাম শান্তি ছিল না তার কপালে! নীড় বাঁধার আগ্রহে এবার সে যার রক্ষিতা হল সেই সাংবাদিক গর্স্‌কি একটা পাঁড় মাতাল পুরুষ। টাকাকড়ি যৎকিঞ্চিৎ যা রোজগার করে মদের কড়ি জোগাতেই তা ফুরিয়ে যায়। অতএব মার্থার দুঃখের অন্ধকার রাত আর পোহায় না, আলোর আশা আলেয়া হয়েই থাকে। ওই সাংবাদিক গর্সকি মাঝে মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কির কাগজে লিখত। সেই সুবাদে মার্থার সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির পরিচয় ও 'এপোখা' কাগজে তার চাকরি। কাজ তার ইংরেজি থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ 'এপোখা'র জন্যে রুশ-ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া।

দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে মার্থার পরিচয় আন্তরিক হয়ে ওঠে যখন সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। দস্তয়েফ্‌স্কি তখন প্রায়ই তাকে হাসপাতালে দেখতে যেতেন। তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন, উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিতেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি সব সময় হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারতেন না, তখন তিনি চিঠি লিখতেন। উভয়ের মধ্যে এ-ভাবে অনেক পত্র বিনিময় হয়েছিল। সে-পত্রাবলীর কেবল দস্তয়েফ্‌স্কির লেখাগুলিই পাওয়া গেছে কারণ এগুলি পরম যত্নে মার্থা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। মার্থার পত্র দস্তয়েফ্‌স্কি রাখেন নি কিংবা রেখেছিলেন পরে হারিয়ে গেছে। তবে এটুকু জানা গেছে মার্থার সঙ্গে দস্তয়েফ্‌স্কির মূল বন্ধন ছিল কৃতজ্ঞতার। দস্তয়েফ্‌স্কি মার্থার জন্যে মনের মধ্যে আন্তরিক করুণা পোষণ করতেন। সেই করুণাই ক্রমশ মমতা ও প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি মার্থাকে বিয়ে করার প্রস্তাব। যেমন 'ইডিয়েট' উপন্যাসে প্রিন্স মিশকিন বিয়ে করতে চেয়েছিল নাসতাসিয়াকে। সে যা হোক মার্থার পক্ষে দস্তয়েফ্‌স্কিকে বিয়ে করা সম্ভব হয় নি। বাধা ছিল আইনের। রুশ-বিধানে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্মতি ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারত না। আর মার্থাও জানত না তার বালতিমোরের নাবিক-স্বামী তখন কোথায়। অগত্যা দস্তয়েফ্‌স্কি প্রস্তাব দিলেন, "তুমি গর্সকিকে ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে থাক। যে-চিঠিতে দস্তয়েফ্‌স্কি এ-প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তার উত্তরে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল মার্থা। কালের নিষ্ঠুর হাত থেকে উদ্ধার করে সৌভাগ্য হাত বাড়িয়ে তা পরবর্তী কালের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল বলে, নিদারুণ দুঃখে পোড়া এক অসহায় রমণীর নিঃস্বার্থ প্রীতি, অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও স্বচ্ছ বাস্তব বুদ্ধির খানিকটা পরিচয় পাঠককে উপহার দিতে পারছি—

"……আমি তোমাকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারব কি পারব না জানি না, জানি না যার ওপরে ভিত্‌ করে স্থায়ী বন্ধুত্ব তৈরি হয় আমাদের মধ্যে সেই আত্মিক ঐক্য গড়ে উঠেছে কি ওঠে নি; তবু বিশ্বাস কর, আমি চিরকাল তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তার কারণ, ক্ষণকালের জন্যে হলেও কিংবা কিছুদিনের জন্যে—তোমার বন্ধুত্ব ও প্রীতি পাওয়ার যোগ্য মনে করেছিলে আমাকে। আমি হলপ করে বলছি, এই যে আমি প্রাণ খুলে সরল মনে তোমাকে চিঠি লিখছি, আর কারোকে আর কোন দিন এমন করে লেখার সাহস পাই নি আমি। আমার এই অহংকারের উৎসাহকে ক্ষমা করো, পিতার্সবুর্গে ফিরে এসে অব্দি গত দু'বছর আমার ওপর দিয়ে ভয়ানক ঝড় বয়ে গেছে: দুঃখ হতাশা আর বিরক্তি আমার অন্তরাত্মাকে হিংস্র জানোয়ারের মতন নখে নখে ছিঁড়েছে। এহেন অবস্থায় আমি তোমার মতন সৎ সহিষ্ণু বিবেচক উদার ও শান্ত মানুষের সাহচর্যে এসেছি; সে যে আমার কী আনন্দ তুমি বুঝবে না। আমার প্রতি তোমার এই করুণা দীর্ঘস্থায়ী

হবে কি মুহূর্তে ফুরিয়ে যাবে, আমি ভাবছি না। ওতে আজ আর আমার কিছু যায় আসে না। আজ আমি যে-কোন পার্থিব সাফল্যের চেয়ে বড় মনে করি তোমার বন্ধুত্ব। তুমি আমাকে পতিত বলে পরিত্যাগ করো নি। আমার এই অকিঞ্চিৎ জীবনে যে যোগ্যতা আমি কল্পনাও করতে পারি নি তুমি আমাকে সেই সম্মানের আসনে বসাতে চেয়েছ।"

'ইডিয়েট' উপন্যাস যিনি পড়েছেন, পত্রখানি শেষ করা মাত্রই তাঁর মনে পড়বে সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ। প্রিন্স মিশকিন বলছে, "নাসতাসিয়া, আমি তোমাকে পবিত্র রমণী জেনেই গ্রহণ করতে চাইছি, রগোজিনের রক্ষিতা জেনে নয়।" শুনে সচকিতা রমণী আকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'এমন কথা আজ অব্দি কেউ আমাকে বলে নি। পুরুষ কেবল আমাকে কিনেছে আর বেচেছে, আমার প্রণয় প্রার্থনা করে নি কোন ভদ্রলোক।"

বোঝাই যাচ্ছে মার্থার উপরি উক্ত পত্রাংশই ওই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসখানির স্মরণীয় অধ্যায়ের প্রেরণা। এমন কি মার্থাই যে এখানে নায়িকা নাসতাসিয়ার বেশে এসে হাজির হয়েছে এ কথা বললেও নিশ্চয় কারো আপত্তি উঠবে না। আরও একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা সরল হবে।—মার্থার যে চিঠির অংশ আমি ওপরে উল্লেখ করেছি ওটি ১৮৬৫-র জানুয়ারির শেষের দিকে লেখা। তারপরে না দস্তয়েফ্‌স্কির, না মার্থার—কারোর চিঠি-পত্রই আর পাওয়া যায় নি। এতে করে অনুমান করা যায়, হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে এসে মার্থা দস্তয়েফ্‌স্কির প্রার্থনাই পূর্ণ করেছিল। তাঁর কাছে থাকছিল এসে এক সঙ্গে। আবার ওই ১৮৬৫-র বছরটাতেই দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে চলছিল আন্না করভিন-ক্রুকফ্‌স্কায়ার রাগ-অনুরাগের পালা। দস্তয়েফ্‌স্কির জীবনে সে গেছে এক নিদারুণ ঝড়ের বছর। মারিয়া মরে যদি বা তার মুক্ত করে গেল, দাদা মিখাইল মরে গিয়ে ততধিক দাগা দিয়ে গেল, চাপিয়ে দিয়ে গেল নিদারুণ বোঝা—ঋণের আর তার পরিবার পালনের। তাছাড়া 'এপোখা' চালানোর দায়, ছেলেকে নিয়ে ঝামেলা, সর্বোপরি নিজের রুগ্নদেহের জ্বালা। এমন ঝড়ের দিনে, 'হাত ধরে মোরে নিয়ে চল সখি' বলে যারই হাত ধরতে চেয়েছেন সে-ই সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। আর যাই হোক আকণ্ঠ ঋণে ডুবন্ত মানুষকে, অমন পোড়-খাওয়া অকাল-জীর্ণ মানুষকে কোন্ যুবতী বিয়ে করতে চাইবে? তাই বলছিলাম, নিরাশ্রয় হৃদয় নিয়ে চরম অর্থকষ্টে বড় অন্ধকার দিন কাটছিল তাঁর তখন।

তিন বছর পরে তিনি যখন 'ইডিয়েট' লিখতে বসেন তখনও তাঁর তিন বছর

আগেকার দ্বিধা-দীর্ণ হৃদয়ের ক্ষত তেমনই টাটকা। অতএব সেই ক্ষত-লাঞ্ছিত অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠল 'ইডিয়েট'-এর উপজীব্য। আগেই বলেছি ১৮৬৫-তে তিনি একযোগে ভালবাসছেন দুটি মেয়েকে—একজন সদ্য ফোটা ফুলের মতন নির্মল আর একজন দলিত পিষ্ট কীটদষ্ট বাসি ফুল। এই দুই ভালবাসার মধ্যে কোন সাদৃশ্য সামঞ্জস্য ছিল না। আমরা শুনি সব ভালবাসাই নাকি এক; কিন্তু সে যে কত বড় ভুল তার প্রমাণ দিয়েছেন দস্তয়েফ্স্কি নিজেকে প্রিন্স মিশকিনের ভূমিকায় উপস্থিত করে: প্রিন্স মিশকিন আগলাইয়া আর নাস্তাসিয়াকে ভালবাসছে এক সঙ্গে। তারা দু'জন বাস্তবের আন্না করভিন-ক্রুকফ্স্কায়া আর মার্থা ব্রাউন ছাড়া আর কে? অবশ্য আগলাইয়ার মধ্যে দস্তয়েফ্স্কির দ্বিতীয়া স্ত্রী আন্না গিগোরিয়েভনা ও নাসতাসিয়ার মধ্যে পলিনা সুস্লোভাকেও দেখতে পাই অর্থাৎ দস্তয়েফ্স্কি তাঁর পরিচিত রমণীদের মনোবৃত্তিগুলি থেকে তিল তিল করে তথ্য তুলে এনে তাঁর উপন্যাসে তিলোত্তমা চরিত্র নির্মাণ করেছেন; কিন্তু 'ইডিয়েট'-এর ঘটনা সংস্থাপনার মধ্যে ১৮৬৫-র বছরটাতে তিনি যে-আত্মিক যন্ত্রণায় ভুগেছেন তারই মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক ইতিবৃত্ত নিপুণ বিস্ময়ের কারুকৃতিত্বে রূপান্তরিত হয়েছে যে তাতে কোন তর্কের অবকাশ নেই'।

তা সে পরের কথায় পরে আসব, এখন মার্থার কথা শেষ করি, অবশ্য শেষ করেই বসেছিলেন দস্তয়েফ্স্কি। কেন না মার্থাকে মিস্ট্রেস হিসেবে পেলেও, যে-আত্মিক ঐক্যের কথা মার্থা তার পত্রে উল্লেখ করেছিল সেটা কল্পনাতেই থেকে গেছে তাঁদের। তাঁদের মিলিত জীবনে সত্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভগ্ন-স্বপ্ন মার্থার পক্ষে তা দেওয়াও সম্ভবপর হয় নি। আন্না করভিন-ক্রুকফ্স্কায়াও দিতে রাজী হয় নি। ফলে মার্থাকে পেয়েও দস্তয়েফ্স্কির শূন্য হৃদয়ের হাহাকার থেকেই গেছে। সে-হাহাকারের আগুনে কাঠ যুগিয়েছে 'এপোখা'র অচল অবস্থা, আর্থিক দৈন্য, পাওনাদারদের জেল-খাটানোর হুমকি—সর্বোপরি শারীরিক অসুস্থতা—অর্থাৎ আগুনের বেড়ার মধ্যে পড়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছেন তখন দস্তয়েফ্স্কি আর প্রাণপণে প্রার্থনা করছেন মুক্তির। তিনি পালাতে চাইছেন আবার য়ুরোপে। বেড়ানোর নেশা তাঁর চিরকালের—কারণগুলি পাঠকের জানা, জুয়াখেলার ঝোঁক, নূতন নূতন মানুষ দেখা আর বিদেশের থেকে কিছু আনকোরা অভিজ্ঞতা অর্জন। তা ছাড়া তাঁর একটা অন্ধ-বিশ্বাস ছিল, য়ুরোপে গেলে তাঁর মৃগীর প্রকোপটা কমবে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ত আর য়ুরোপ পাড়ি দেওয়া যায় না রেস্ত চাই।

সেই রেস্ত দিতে রাজী হলেন ধনী প্রকাশক স্তেলফ্‌স্কি। ১৮৬৫-র ২ জুলাই তিনি তাঁকে উদারতা দেখাতে তিন হাজার রুবল্‌ই রয়ালটি বাবদ অ্যাডভান্স দিয়ে দিলেন; কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে তিনি ভাল করেই জানতেন কিনা তাই মৌখিক নয়, আদালতের স্ট্যাম্প আঁটা কাগজে লিখিয়ে নিলেন শর্ত। নানা শর্তের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ছিল, ১৮৬৬-র ১ নভেম্বরের মধ্যে অন্যূন ষাট হাজার শব্দের একটা নূতন উপন্যাস লিখে দিতে হবে। যদি ওই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তিনি উপন্যাসটি লিখে দিতে অপারগ হন ত তিনি অতীতে যত লেখা লিখেছেন এবং ভবিষ্যতে যত লিখবেন তার সমস্তরই আইনসম্মত প্রকাশক হবেন স্তেলফ্‌স্কি ও তার বাবদে দস্তয়েফ্‌স্কি আর একটা কোপেকও পাবেন না। অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার রুবলের বিনিময়ে দস্তয়েফ্‌স্কির অতীত ভবিষ্যতের সব রচনার স্বত্বাধিকারী হয়ে যাবেন ওই শাইলক স্তেলফ্‌স্কি; কিন্তু শাইলক নয়, স্তেলফ্‌স্কি তখন ত্রাতা, ঈশ্বর-প্রেরিত দূত। যে-কোন শর্তে তিন হাজার রুবল তখন দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে যেন সাতরাজার ধন। খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ শর্তনামায় সই করলেন। শুনে শিউরে উঠলেন বন্ধুরা। অলক্ষ্যে হাসলেন নিয়তি।

নয়

গোটা ভবিষ্যৎ মর্টগেজ রেখে তিন হাজার রুবল ঋণ পেলেন বটে দস্তয়েফ্‌স্কি কিন্তু নিজের জন্যে হাতে রাখতে পারলেন মাত্র একশ' পঁচাত্তর রুবল। পাওনাদাররাই কেড়ে কামড়ে নিয়ে গেল সিংহভাগ। যা পড়ে থাকল তারও অনেকখানি তুলে দিতে হল মিখাইলের বিধবার হাতে। তারপর পাছে আর কেউ হাত পাতে আর কারোকে দিতে হয় তিনি ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসলেন। ওই সামান্য রেস্ত নিয়ে বিদেশে বেরনো যায় না, তিনি জানতেন, ত কেন বেরিয়ে পড়লেন? তাও এত জায়গা থাকতে ওই ভিসবাদেন? উত্তরটা স্পষ্ট। নিষ্ঠুর ভাগ্যের নিদারুণ মার খেয়ে নাস্তানাবুদ মানুষটা রুলেত-টেবিলকেই শেষ ভরসা ভেবেছিলেন। সেই ভরসাতেই···হাঁ, অনেকে বলেন, পলিনা সুস্লোভার সঙ্গে আবার দেখা হবে জেনেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সে-কথা স্বীকার করেও স্বচ্ছন্দে বলা যায় ১৮৬৩-র আগস্টের প্রসন্ন-ভাগ্য তাঁকে হাতছানি দিচ্ছিল, সেবার সেখানে তিনি তিরিশ হাজার ফ্রাঁ জিতেছিলেন। দস্তয়েফ্‌স্কির সেই থেকে

ধারণা পলিনা বড় পয়মন্ত মেয়ে, সেবার পলিনার সঙ্গে পারীতে দেখা করতে যাওয়ার পথেই না অতটাকা হাতড়াতে পেরেছিলেন রুলেত-টেবিল থেকে। এবারও সেই আগস্ট মাস, এবারও পলিনা ভিসবাদেনে আসছে অতএব…

কিন্তু গিয়ে দেখেন পলিনা তখনও এসে পৌঁছয় নি। ভিসবাদেনে পৌঁছতে পৌঁছতে পলিনার আরও তিন দিন কেটে গেল। আর সেই তিন দিনের মধ্যে যে-আশার বাতি বুকে জ্বেলে তিনি ভিসবাদেনে এসেছিলেন সে- বাতি তেল পলতে শুদ্ধ্ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সব খুইয়ে তিনি যখন শ্মশানের শিব হয়ে বসে আছেন তখন আগস্টের পনরয় এসে হাজির পলিনা।

পলিনাকে দেখা মাত্র দস্তয়েফ্স্কির প্রথম কথা, "কী আছে দাও, রুলেত-টেবিলে সব খুইয়ে ফরির হয়ে বসে আছি।"

পলিনার উত্তর, 'অথচ তুমিই আমাকে দেবে, আমি তোমার কাছেই পাব ভরসায় ছিলাম। আমার হাতও একেবারে শূন্য।'

'যাক গে যাক্, টাকার কথা ভেবো না,' হাত নেড়ে তিনি টাকার ভাবনা উড়িয়ে দিলেন, 'ও হয়ে যাবে। লিখে আমি সব ঋণ শোধ করব।' হঠাৎ যেন বিশ্বাসে ভরে উঠলেন তিনি, 'লিখেই আমি অনেক টাকা উপার্জন করব; কিন্তু তার জন্যে চাই উৎসাহ,' উপেক্ষিত নায়ক আর একবার প্রস্তাব রাখলেন, 'পলিনা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।' করুণ গলায় নিবেদন জানালেন, 'সেই বিচ্ছেদের পরে এই আবার দেখা। এতদিনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে আমি ভুলতে পারি নি। তুমি আমার হও পলিনা।'

'না।' পলিনা আগেকার মতনই দস্তয়েফ্স্কির প্রস্তাব বাতিল করে দিল।

'বুঝতে পারছি,' দস্তয়েফ্স্কি আহত গলায় বলে উঠলেন, 'একদিন তুমি যে নিজের দেহের টানে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলে সে-স্বেচ্ছাদানের দুর্বলতা তুমি ভুলতে পারছ না, তার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছ না বলেই আজ আমার ওপরে তার শোধ নিচ্ছ।'

এভাবে কথায় কথায় দু'জনের ঝগড়া বেধে গেল। দস্তয়েফ্স্কি রেগে উঠে সেই পুরনো অভিযোগেরই পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তুমি কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করলেও সে বিয়ে টিকবে না। তুমি যাকে ভালবাসবে তাকেই ঘৃণা করবে আবার, এই তোমার চরিত্র। আজ যাকে বিয়ে করবে তিনদিন যেতে না যেতে তাকেই তোমার দু'চক্ষের বিষ মনে হবে, শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ত্যাগ করে চলে যাবে তাকে।'

শুনে পলিনাও রেগে উঠল, 'যাই যাব, তাতে তোমার কী? আমার বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযোগ তা আমি সত্যি বলে মানি নে, তাই বলে সে-অভিযোগ অস্বীকারও করতে চাই নে আমি। তোমার উর্বর মস্তিষ্কে যা আসে তাই ভাব তুমি, তাই নিয়ে বসে থাক।'

পলিনা শেষ কথা বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন; তারপরেও তাঁরা ভিসবাদেনের দিনগুলি এক হোটেলে একঘরে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না আলাদা ঘরের ভাড়া গোনবার কড়ি নেই তখন তাঁদের।

রুলেত-টেবিলে সব খুইয়ে তক্ষুনি তিনি ঋণের জন্যে নানা জনের কাছে পত্র লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে জেনিভায় হেরজেনকে আর বাদেনে তুর্গেনিয়েফ্‌কেও চিঠি দিয়েছিলেন,—অন্তত শ'খানেক রুবল ধার দাও। হেরজেন একটা কোপেকও দিলেন না অধিকন্তু পাঠালেন দীর্ঘ উপদেশামৃত। তুর্গেনিয়েফ্‌ চিরকাল দস্তয়েফ্‌স্কিকে তুচ্ছ করে এসেছেন, তাঁকে আরও ছোট করে দেবার এবারকার সুযোগটাও তিনি ছাড়লেন না, পঞ্চাশ রুবল পাঠিয়ে দিলেন।

সেই পঞ্চাশ রুবল নিয়ে পলিনা আগস্টের একুশ তারিখে চলে গেল পারী। আর দস্তয়েফ্‌স্কি সেই নিরুপায় অবস্থার মধ্যেই পড়ে রইলেন ভিসবাদেনে। তাঁর এমন অবস্থা তখন যে তাঁকে আর ধারে খেতে দিতে চাইছে না হোটেল, এমন কি রাতে ঘরে একটা মোমবাতি দিতেও তারা অস্বীকার করছে। নিজের সেই দুরবস্থা জানিয়ে পলিনার কাছেই আবার টাকার জন্যে লিখলেন তিনি, 'জান পলিনা, দিনরাত একটা ইজি-চেয়ারে পড়ে থাকছি, আর কেবল বই পড়ছি। উঠছি না, নড়ছি না, পাছে খিদের জ্বালা বেড়ে ওঠে।' কিন্তু পলিনা তার কোন জবাবই দিলে না। দেবে যে সময় কই তার! পারীতে ততক্ষণে তার নূতন পুরুষ জুটে গেছে যে! সে তাকে নিয়েই মত্ত তখন।

অনন্যোপায় দস্তয়েফ্‌স্কি শেষমেশ মসকোআর 'রসকি ভিসনিক' (রাশিয়ান মেসেনজার) পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারস্থ হলেন। "রসকি ভিসনিক" তখন বাজারে সব চেয়ে চালু ও সব চেয়ে পয়সাওলা কাগজ। তদর্থে সম্পাদক কাৎকফ্‌ তখন রুশ-সাহিত্যের মা-বাপ। যার তার লেখা নেন না আর তুর্গেনিয়েফ্‌, তল্‌সতয়ের লেখা পেলে অন্য কোন লেখকের দিকে ফিরেও তাকান না। আর ওই দু'জনের লেখা ত বলতে গেলে একরকম বাঁধাই ওই কাগজে। একবার অবশ্য কাৎকফ্‌ দস্তয়েফ্‌স্কির কাছেও লেখা চেয়েছিলেন। 'একটা গল্প দিও ফিওদর মিখাইলোভিচ্‌।' কিন্তু সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি

দস্তয়েফ্স্কি। সেই থেকে দস্তয়েফ্স্কির ওপরে কাৎকফ্ অসন্তুষ্ট। জেনেও দস্তয়েফ্স্কি, উপায় নেই বলে তাঁকেই লিখলেন, 'একটা দারুণ উপন্যাস মাথায় এসেছে, হয়ত এটাই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখা, সব-সেরা উপন্যাস। তোমার কাগজে লেখাটা ধারাবাহিক বের করবে কী? যদি করো ত শ'তিনেক রুবল অগ্রিম পাঠাও। বিদেশে অর্থের অভাবে বড় মুশকিলে পড়েছি।'

কাৎকফ্ চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'যদি পত্রিকার প্রতি চার-পাতার জন্যে এক'শ পঁচিশ রুবল নিতে রাজী হও ত জানাও, আমি তোমার উপন্যাস ছাপব।'

চিঠি পেয়ে দস্তয়েফ্স্কি রাগে লাল হয়ে উঠলেন, "শয়তান," ঠোঁট কামড়ে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'তুরগেন্য়েফ, হলে তাঁকে প্রতি ফলিওপেইজের জন্যে আড়াইশ রুবলের কম দিয়ে পারতে না। তলসতয় কম-সে-কম তিনশ' রুবল আদায় করে ছাড়ত। আর আমার বেলা কিনা এই খুদকুঁড়ো! আমি অভাবে পড়েছি, বিপদে পড়েছি, আমি যেচে এসেছি, তাই! আচ্ছা দেখে নেব।' চিঠিখানা তিনি দুমড়ে মুচড়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তক্ষুনি কাগজ টেনে চিঠি লিখলেন, 'হাঁ, তোমার শর্তেই রাজী। পত্র পাঠ তিনশ' রুবল পাঠাও।'

কাৎকফ্‌কে তিনি যখন প্রথম চিঠি লেখেন তখন ভাবেন নি, লিখব বললেই দুম্ করে টাকা দিতে রাজী হয়ে যাবেন কাৎকফ্, তাই তিনি তাঁর সেমিপালাতিন্স্কের অসহায় নিঃসঙ্গ দিনগুলির একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু ব্যারন ভ্রাঙ্গেলকেও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তখন কোপেনহেগেনে রুশ-দূতের সেক্রেটারী। ভ্রাঙ্গেল মাঝে মাঝে দস্তয়েফ্স্কিকে চিঠি লিখতেন, জানতে চাইতেন, তিনি কেমন আছেন, কী লিখছেন। অথচ সত্যিকার শুভানুধ্যায়ী জেনেও তিনি বড় একটা গুরুত্ব দিতেন না ওই সব চিঠি-পত্রের। অনেক চিঠি উত্তর দেবার আগেই অবহেলায় হারিয়ে যেত, অনেক চিঠির তিনি দায়সারা উত্তর দিতেন, কখনো কখনো অবশ্য খুব আন্তরিক হয়ে উঠতেন চিঠিতে কিন্তু সে কালেভদ্রে। আজ বিভূঁই বিদেশে কপর্দক শূন্য হয়ে তাঁকেই দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন, অনুশোচনা ও পরিতাপ জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। আর মনে মনে বলেছেন, বন্ধু আমি একটা নীচ স্বার্থপর, অপদার্থ।

পত্র পেয়ে ভ্রাঙ্গেল তক্ষুনি একশ' রুবল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে একখানা আন্তরিক চিঠিও, "তুমি এক্ষুনি কোপেনহেগেন চলে এস। এলে ভীষণ খুশী হব।"

সেই চিঠি আর টাকা কাৎকফের চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসেই পেলেন তিনি; কিন্তু ততক্ষণে একমাত্র হোটেলের ধারই হয়েছে ওই টাকার দ্বিগুণ। টাকার গন্ধ পেয়ে হোটেলওলা ছুটে এল ও সব ক'টা টাকা কেড়ে নিয়ে অবশিষ্ট টাকার জন্যে নির্মম হয়ে উঠল। এই বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন একজন রুশী যাজক, তিনি ভিসবাদেনেই থাকছিলেন তখন। তিনি হোটেলের পাওনার জামিন হলেন ত বটেই অধিকন্তু নগদ কিছু টাকাও ধার দিলেন তাঁকে। এভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মানুষটি চলে এলেন কোপেনহেগেনে, কাৎকফের টাকার জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না। অবশ্য তিনি চলে যাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাৎকফ্‌ তাঁকে তিনশ' রুবল পাঠিয়েছিলেন। সে-টাকা দস্তয়েফ্‌স্কিকে না পেয়ে ফেরৎ চলে গেছে দস্তয়েফ্‌স্কির পিতার্সবুর্গের ঠিকানায়।

কোপেনহেগেনে দস্তয়েফ্‌স্কি ছিলেন এক সপ্তাহ। সেখান থেকে সমুদ্র-পথে সোজা চলে এসেছেন পিতার্সবুর্গ। জাহাজের টিকিটটা ভ্রাঙ্গেলই কেটে দিয়েছেন। নিশ্চয় আরও কিছু নগদ রাহা-খরচাও দিয়ে থাকবেন। কিন্তু জাহাজ এসে পিতার্সবুর্গ পৌঁছলে দেখা গেল পকেটের সব টাকা ঝেড়ে দেওয়ার পরও খানাপিনা বাবদ আরও পাঁচশিলিং বাকি থাকছে। লজ্জার মাথা খেয়ে অগত্যা তাঁকে বলতে হল, 'ক্যাপটেন সাহেব, যিনি আমাকে কোপেনহেগেন থেকে টিকিট কেটে পিতার্সবুর্গ পাঠিয়েছেন কোপেনহেগেনে গিয়ে ও-পাঁচ শিলিং তাঁর কাছ থেকেই নিও, আমার কাছে আর কিছু নেই।'

এই যে অসময়ের কাণ্ডারী পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ১৮৭৩ সালে যখন তিনি ফিরে এলেন পিতার্সবুর্গ, দস্তয়েফ্‌স্কির পাশে বসে সেদিন পুরনো ঘনিষ্ঠতার এতটুকু উত্তাপ টের পেলেন না। ঋণের হিসেব কসতে, ঋণ শোধ করতেই ব্যস্ত তখন দস্তয়েফ্‌স্কি, বন্ধুত্বের এতটুকু স্বীকৃতি দিতেও যেন তার কুণ্ঠা। বড় মর্মাহত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন সেদিন ভ্রাঙ্গেল। তিনি জানতেন না, কোনদিন টেরও পান নি, দস্তয়েফ্‌স্কির অন্তর্লীন বোধের ভিতরে একটা হীনবৃত্তি কাজ করে—তাঁকে যাঁরা ধার দেন, অসময়ে উপকার করেন তাঁদের প্রতি তাঁর মনে একটা উপেক্ষা সঞ্চিত হতে থাকে, তিনি তাঁদের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারেন না। এই মনোভাবটা সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করে ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অসম্মান করে। বোঝাতে চায়, তোমরা এক অসামান্য প্রতিভাকে অর্থ সাহায্য করে নিজেরাই ধন্য হয়েছে, তার জন্যে আবার কৃতজ্ঞতা কিসের!

তা কোপেনহেগেন থেকে পিতার্সবুর্গে জাহাজে করে ফেরার ফলে একটা মস্ত

কাজ হল তাঁর। 'পাপ ও শাস্তি' (প্রেসতুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে) উপন্যাসের প্রথম পরিকল্পনাটা নোট করে ফেলতে পারলেন। ওটা মাথায় এসেছিল ভিসবাদেনে, উপবাসের দিনগুলিতে। অবশ্য তার বীজটা মনের মাটিতে পড়েছিল অনেক আগেই, সেই সাইবেরিয়ার কয়েদখানার খুনী মানুষদের মধ্যে থাকতে থাকতে, তাদের আচার-আচরণ দেখতে দেখতে। সে বীজ অঙ্কুরিত হল' এবার ভিসবাদেনে যখন যৎসামান্য সম্বল ঘড়ি আংটি কোট বিক্রি করতে পণব্রোকারের দোকানে দোকানে ঘুরছেন আর দেখছেন, ওই সুদখোর কুসীদজীবীগুলি কী ভাবে মানুষের গলা কাটতে চায়। দেখতে দেখতে ওই অবিবেকী মানুষগুলির ওপরে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হয়। কী আশ্চর্য একশ' টাকার জিনিস রেখে দশটাকা দিতে চায় তাও আবার একমাসের সুদ আগাম কেটে রাখবে!—মানুষের মাথায় খুন চাপে না তখন! একবার এক বুড়ি পণব্রোকারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাঁর মাথায়ও খুন চেপে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল হতেন যদি তখন অল্প বয়েসের মাথা-গরম মানুষ, য়ুনিভারসিটির ছাত্র অথবা ওরলফ্‌—সাইবেরিয়ায় চেনা সেই ঠাণ্ডা মাথার খুনী ত নির্ঘাৎ মাথা ফাটিয়ে দিতেন ওই বুড়িটার।……তখনই হঠাৎ মাথায় ঝলক দিয়ে ওঠে প্লটটা। সত্যি যদি কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত ও তাঁর মতন আত্মানুসন্ধী ছাত্র প্রতিবেশের পরোক্ষ চাপে এমনই একটা কাণ্ড করে বসে ত তার প্রতিক্রিয়ায় কী অবস্থা হয় মানুষটার, কী পরিণাম ঘটে তার জীবনের। প্রশ্নটা মনে আসতেই দস্তয়েফ্‌স্কি দেখলেন—সমস্যাটাকে এগো (অহং)-এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যাচাইয়ের কাজে খাটানো যেতে পারে, আসলে ওই ত হচ্ছে (এথিকস ও মেটাফিজিকসের) নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার দায়। আরও একটা দায় আছে, সে-দায় অর্থগৃধ্নু বুরজোআ সমাজের শোষণে নিঃস্ব সাধারণ মানুষের ক্রমাগত নিরক্ত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস রচনা।

আধুনিক রাশিয়ার বুদ্ধি-জীবী লেখক আলেক্‌সেই নিকোলায়েফ্‌ তাঁর 'দস্তয়েফ্‌স্কি ও আমাদের যুগ' প্রবন্ধে (সোভিয়েৎ দেশ, ২২ সংখ্যা ১৯৭১) লিখেছেন: "অর্থ আর বিকারগ্রস্ত বুর্জোআ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা মানুষের আত্মার ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যাটিই হল দস্তয়েফ্‌স্কির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পাপ ও শাস্তি'র মর্মবস্তু। এখানে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা হয়েছে মনকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করার মতো একটি সামাজিক ট্রাজেডি হিসেবে। উপন্যাসটির কাহিনী ও ঘটনাপ্রবাহের বিস্তার লাভের অভ্যন্তরীণ যুক্তি পরম্পরার মধ্যে দিয়ে

এবং তার চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে দস্তয়েফ্স্কি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার আর তার শ্রেণী-সমাজের প্রকৃতিটাই এমন যে তা মানুষকে অপরাধের পথে চালিত করে : হয় তুমি অন্যকে মারো, আর না হয় তুমি নিজেই মরবে। বেরিয়ে আসার কোন পথ আছে কি ?”

ওই দুই সূত্র ধরেই শিল্পিমন চিন্তার জাল বুনতে থাকে। উপবাসের দিনগুলিতে ইজি-চেয়ারে অনড় শুয়ে থেকে কাহিনীর কাঠামো গড়তে থাকেন তিনি।—বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র তরুণ রাসকলনিকফ্ অস্তিত্বের মৌলিক শর্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অব্যাখ্যেয় এক জটিল প্রেরণায় এক বুড়ি কুসীদ-জীবিনীকে খুন করল ও ঠিক তখনই বুড়ির বোন ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় তাকেও নিকেশ করে দিতে বাধ্য হল। খুন করে বুড়ির সোনাদানা টাকাকড়ি নিয়ে সে সকলের আগোচরে পালাতে পারল বটে কিন্তু ও-গুলি কোন কাজে লাগাতে মনের দিক থেকেই কোন সায় পেল না, এক গোপন জায়গায় মাটির নিচে পাথর-চাপা দিয়ে রাখল সব। এই খুনের দায়ে রাসকলনিকফ্কে গ্রেফতার করার মতন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তদন্তকারী গোয়েন্দা-অফিসারের হাতে ছিল না কিন্তু রাসকলনিকফের রহস্যময় আচার-আচরণ ও তার একটি পূর্ব-প্রকাশিত রচনা সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠল। তবু প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অভাবে, শুধু সন্দেহবশে তাকে গ্রেফতার করতে পারছিলেন না সংশ্লিষ্ট অফিসার, তিনি প্রাণপণে কেবল প্রমাণ খুঁজছিলেন। রাসকলনিকফ্ তাই গ্রেফতার এড়িয়ে থাকতে পারছিল, থাকতে পারতও ; কিন্তু কৃতকর্ম গোপন রাখতে চেয়ে সে দেহে-মনে যে-প্রবল চাপ সহ্য করছিল, ততক্ষণে তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, শেষমেশ আর টিকতে না পেরে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই গিয়ে স্বীকারোক্তি করে বসল। বিচারে তার শাস্তি হল আট বছরের জন্যে সাইবেরিয়ার জেলে নির্বাসন। তার নির্বাসনের সঙ্গী হয়েছিল সোনিয়া। এই অসহায় মেয়েটি মাতাল বাপের সংসার বাঁচাতে বেশ্যা হতে বাধ্য হয়েছিল।……খুন করার জন্যে রাসকলনিকফের মনে এতটুকু অনুতাপ ছিল না, নির্বাসনের দিনগুলি কাটছিল তার কেবল নিজেকে তিরস্কার করে, কেন সে তার দেহ-মনের প্রভু হতে পারে নি, কেন সে সাময়িক দুর্বলতার কাছে নতি স্বীকার করেছিল, কেন স্বীকারোক্তি করতে গিয়েছিল সে ? অপরাধ প্রমাণ হলে শাস্তি পেতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি কি ভয় ছিল না, সে পালাতেও চায় নি কখনো, কিন্তু নিজের দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল তার, নিজেকে জয় করতে পারল না সে, এই তার আপসোস, সাইবেরিয়ায়

এই আপসোসেই সে মাথা খুঁড়ছিল কেবল। এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল তার এক নিদারুণ অসুখে ভুগে ওঠার পর। সোনিয়ার প্রভাবে তার প্রত্যাবর্তন ঘটল পবিত্র জীবনে।...... জাহাজে বসে তিনি কাহিনীর এই কাঠামোটা মোটামুটি নোট করে ফেললেন। অঙ্কুরিত হল বিশ্বসাহিত্যে এক চিরকালের আধুনিক রচনা।

পিতার্সবুর্গে এসে কাৎকফের তিনশ' রুবল হাতে পেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি কিন্তু নিজের প্রয়োজনে লাগানোর সময় পেলেন না। মিখাইলের বিধবা এসে হাত পেতে দাঁড়াল। কিন্তু ভিক্ষুকের মতন নীরবে নয়। এমিলা পাওনাদারের মতন সরবে ঘোষণা করল, 'উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমার স্বামীর দশহাজার রুবল তোমার বাবদেই খরচ হয়েছে, ওই টাকা তুমি আমাকে অবশ্যি ফেরত দেবে। আরও দেবে, দীর্ঘ দিন তোমাকে আমার স্বামী যে সাহায্য করেছে তার সব—সমস্ত, আমাদের উপোষ দিয়ে রাখার কোন এক্তিয়ার নেই তোমার।'

দাদার দুই সংসারের বোঝা বইবার, তাঁর পাহাড়-প্রমাণ ঋণ শোধ করবার কোন সামাজিক কী আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না দস্তয়েফ্‌স্কির, কেবল বিবেকের তাগিদে সে-বোঝা মাথায় করে নিয়েছিলেন তিনি. আর তার জন্যে পাওনাদারের হুমকি আর এমিলার রুক্ষ ভাষা তাকে শুনতে হয়েছে সারা জীবন। সারা জীবন এই অপমান বহন করেছেন তিনি। না এমিলা, না তার সন্তান কেউ কোনদিন তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। ছেলেরা বরং প্রকাশ্যেই তাঁকে উপেক্ষা করে চলত। কিন্তু এ-দুঃখ তাঁকে আদৌ স্পর্শ করত না। সহস্র দুঃখের বেড়াজালে ঘেরা মানুষটির কাছে ওই দুঃখ ছিল সমুদ্রে শিশিরবিন্দু।

পিতার্সবুর্গে পা দিতে না দিতে আবার তার সেই মৃগীর অসুখটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ক্রমাগত জেরবার করে চলল তাঁকে। প্রথম আক্রমণে পাঁচদিন বিছানায় পড়ে থাকার পরে যদি বা উঠতে পারলেন, পরের দিনই আবার কাত করে ফেলল তাঁকে ওই বিষম ব্যাধি, তিনদিন আর চেতনা থাকল না। এমনি করে দু' পাঁচদিন পরপর পাঁচ সাতটা ধাক্কা।

এই অসুখের খবর দিয়ে তিনি ভ্রাঙ্গেলকে লিখেছিলেন, '......তবু আমি থামছি না। একটু যখন মাথা খাড়া করতে পারছি তখনই লিখতে বসছি। কাৎকফ্‌ এই উপন্যাসের জন্যে আমাকে তিনশ' রুবল অ্যাডভান্স পাঠিয়েছিলেন ভিসবাদেনের ঠিকানায়, আমি তখন তোমার কাছে কোপেনহেগেনে। সে-টাকা সেখান থেকে ফেরত চলে এসেছে পিতার্সবুর্গের ঠিকানায়। আমি এসে পেয়েছি.

টাকাটা কিন্তু না, নিজের জন্যে তার থেকে একটা কোপেকও রাখতে পারি নি··· আমার পকেট এখন গড়ের মাঠ···'

অর্থাৎ অর্থকষ্ট আগের মতনই চলছে তখন; তখন তিনি থাকেন ছেলের সঙ্গে। নষ্ট-চরিত্র ছেলে তখন একেবারে জাহান্নামে গেছে। তবুও মারিয়ার স্মৃতির প্রতি তিনি কঠিন হয়ে উঠতে পারেন না, অতএব তার অপব্যয়ের কড়িও যোগাতে হয় তাঁকে। ঋণের টাকা এভাবে কুৎসিত পথে নষ্ট হতে দেখে তিনি মর্মাহত হন তবু সয়ে যান, চুপ করে থাকেন। আর এই দুঃখ অশান্তি অর্ধাহার রোগের কষ্ট ভুলতে লেখা নিয়ে ডুবে থাকেন। এই দুর্যোগের অন্ধকারে তখন তাঁর একমাত্র আশার আলো 'পাপ ও শাস্তি' রচনাটি। দীর্ঘদিন বসে বসে তিনি কাটছেন, জুড়ছেন, নূতন করে লিখছেন আর বুকের ভিতরে একটা সুনিশ্চিত বিশ্বাস জেগে উঠছে, এই সৃষ্টিই তাঁকে পার করে দেবে সব দুঃখ দারিদ্র্য অপমান অশান্তি - পৌঁছে দেবে সৌভাগ্য ও সম্মানের কূলে। অনন্য-চিত্ত শিল্পীর কাছে তাই সব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় - যেন শ্মশানে শবাসনে কোন ধ্যানমগ্ন সিদ্ধাই, কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না।

এভাবে ঐহিক সমস্যাগুলিকে অবহেলা করতে পেরেছিলেন বলেই 'পাপ ও শাস্তি'র প্রথম বারোটা পরিচ্ছেদ 'রসকি ভিসনিক'-এর জানুয়ারি সংখ্যাতেই এক সঙ্গে ছাপা হতে পেরেছিল। অবশিষ্ট অংশ গোটা বছরভর কিস্তেতে কিস্তিতে বেরিয়েছে।

কিন্তু খুব সহজে লিখতে পারেন নি তিনি। একে ত অত্যন্ত দুরূহ রচনা তার ওপরে শুধু মৃগী নয় অভাব নয়, মিখাইলের দুই সংসার আর পাওনাদারও রয়েছে— সকলে মিলে চারধার থেকে যেন রাক্ষসের মতন গ্রাস করতে চাইছে তাঁকে! অনন্যোপায় হ'য়ে তিনি পিতার্সবুর্গ থেকে পালিয়ে চলে এলেন মসকোআয়। নিদারুণ গরমে ও সঙ্গী সাথীর অভাবে এখানেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, আবার পালালেন কয়েক মাইল দূরের এক অরণ্য-অঞ্চল, লিউব্লিনোতে। সেখানকার বনের ছায়ায় এক গ্রামে থাকত তাঁর বোন ভেরা।

ভেরা ইভানোভার বাড়িটি ছিল আত্মীয় স্বজনে জমজমাট। তাদের অধিকাংশই ছিল আবার কিশোর ও তরুণ। তারা সারাদিন তাঁকে ঘিরে থাকত আর সারারাত ঘিরে থাকত তাঁকে নিঃশব্দ অন্ধকার; সেই অন্ধকার নির্জনে মোমের বাতি জ্বালিয়ে তিনি মগ্ন হয়ে লিখতেন উপন্যাস। 'পাপ ও শাস্তির'-র তখন পঞ্চম খণ্ড চলছে।

তখন দু' বছর হয়ে গেছে মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা মারা গেছেন। আন্না করভিন-ক্রুকফ্স্কায়ার সঙ্গে প্রেমের পালাও শেষ। শেষ জবাব দিয়ে চলে গেছে সে। তবু তখনও কিন্তু দস্তয়েফ্স্কির ঘর-বাঁধার স্বপ্ন মরে নি। অবশ্য মরে গেছে মর্ষকাম, ধর্ষকাম, শিশু-কাম ইত্যাকার বিকৃত-বৃত্তিগুলি, কাম-কৌতূহলও নিবৃত্ত হয়েছে। মনে জেগেছে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনের বাসনা। বিয়ে করবেন, সংসার পাতবেন মনে মনে আশা তাঁর। সেই আশার পলতে উসকে দিলে তাঁর বোন। ভেরার কাছে থাকে তখন ভেরার স্বামীর বোন এলেনা পাভলোভনা ইভানোভা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে অত্যন্ত সাধারণ এই রমণীর রূপ যৌবন ছিল আর ছিল সারল্য। বোনের ননদিনীটির সঙ্গে মিশেছেন তিনি। বুঝেছেন, সংসারের দায় দায়িত্ব নেওয়ার দক্ষতা আছে এই মেয়ের। তার বেশী আজ আর কোন মেয়ের কাছে তাঁর চাওয়ার নেই, পাওয়ারও না।

ভেরা যখন জিজ্ঞেস করলে, 'দাদা, কেমন লাগছে এলেনাকে তোমার?' দস্তয়েফ্স্কি জবাব দিয়েছেন, 'মন্দ না।'

বোন বলেছে, 'তবে তুমি ওকে বিয়ে কর দাদা।'

'সে কী করে হয়, ওর যে স্বামী আছে।'

'সে আর ক'দিন। দেখছ না, কী কঠিন অসুখে ভুগছে। ও আর বছর খানেক টেঁকে কিনা সন্দেহ।'

বোনের কথায় দস্তয়েফ্স্কি উৎসাহ পেলেন, প্রস্তাব রাখলেন, 'এলেনা, তোমার যদি অমত না থাকে, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

এলেনা 'হাঁ' কি 'না' কোন স্পষ্ট জবাব দিলে না। দস্তয়েফ্স্কি ধরে নিলেন মৌনই সম্মতির লক্ষণ।

কিন্তু সেই লাজুক মৌন-মনটিকে মুখর করে তুলবার সময় পেলেন না তিনি। দুয়ারে তখন শমন এসে দাঁড়িয়েছে। দারুণ বিভীষিকার চেহারা তার। ভয়টা ছিল, সেইদিন থেকেই ছিল। ঘুমিয়ে ছিল কিংবা তিনি নিজেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বেশী দিন ঘুমিয়ে থাকে নি। জেগে উঠেছে। জেগে উঠে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থেকেছে তাঁর দিকে। তবু আমল দেন নি তিনি, গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর 'পাপ ও শাস্তি' রচনায় কোন বাধা আসুক তিনি চান নি। দু'হাতে সব ভয় ঠেলে রেখেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'পাপ ও শাস্তি' একটি অমূল্য রচনা হয়ে উঠছে। এ-বই লিখে শেষ করে তিনি যদি

মরেও যান কিংবা তাঁর অবশিষ্ট ভবিষ্যৎ কেউ জন্মের মতন কিনেও নেয়, তাঁর কোন দুঃখ নেই, কেন না, এই একখানা বই তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রেখে দেবে। সেই বিশ্বাসের দুঃসাহসে ভর করে জুলাইয়ের অর্ধেকটা পার করে দিলেন। শেষের দু'মাস বোনের গ্রামের বাড়িতে খুব কষে হৈ-চৈ করলেন। একটা কৌতুক-নাটক লিখে বাড়ির সকলে মিলে অভিনয় করে মজাও লুটলেন ; কিন্তু তারপর আর থাকতে পারলেন না। মাথায় কোন প্লট আসছে না। চোখের সামনে নায়ক নায়িকার বদলে কেবল সর্ষেফুল দেখছেন। রাতভর পায়চারি করেন আর রাত-পাখির ডাক শোনেন—না হয় এটা লেখা, না হয় ওটা ভাবা।

এমন সময় বন্ধু মিলিউকফের একটা কড়া চিঠি এসে হাজির হল,"কী করছ তুমি লিউব্‌লিনোতে বসে। ওই বজ্জাৎ পাবলিশারটা তোমার এ-যাবৎ লেখার তাবৎ স্বত্ব মেরে দিক, তোমার রাত-জাগা, রক্ত জল-করা সৃষ্টির সব মুনাফা ভোগ করুক আর তুমি মাথা-খারাপ হয়ে পাগলা-গারদে যাও, এই কী ইচ্ছে তোমার ?"

চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেপ্টেম্বরের তখন পুরো দু'টো সপ্তাহও আর অবশিষ্ট নেই। পিতার্সবুর্গে পা দেওয়া মাত্র তিনবন্ধু মাইকফ, মিলিউকফ্‌, দল্‌গোমস্তিএফ্‌ এসে ঘিরে ধরল তাঁকে।

দুশ্চিন্তায় সংকোচে জড়সড় দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'আমি যে কিছু ভাবি নি ভুলে থেকেছি কি অবহেলা করেছি তা নয়, অনেক চিন্তা করেছি ; কিন্তু ওই যে উপন্যাস, 'পাপ ও শাস্তি' ওই আমার কাল হয়েছে, আমাকে এমন ভাবে মজিয়ে ফেলেছে বইটা যে আমি কিছুতে আর নূতন কোন প্লট মাথায় গুছিয়ে আনতে পারি নি। অন্য কিছু ভাবতে গেলেই মাথায় কুয়াসা ঘনিয়ে উঠেছে, মনে হয়েছে মাথাটা ভর্তি যেন সাদা কাগজের গুঁজি। সেই সাদা কাগজের গুঁজির মধ্যে বরফের কুচির মতন ছড়ানো ছিটানো কোন কাহিনী যে নেই তা নয়—ওই যে বোবোরিকিনকে উপন্যাস দেব বলে টাকা নিয়েছিলাম, সে ত আর লেখা হয় নি, বোরোরিকিন ত টাকাই ফেরত নিয়ে গেল, ভাবলে লোকটা উপন্যাস ত দিলেই না বুঝি টাকাটাও মেরে দেবার তালে আছে। যাক গে সেই যে প্লটটা শিকেয় উঠল ত উঠল, এখন নামাতে গিয়ে দেখি না হাওয়া ; মানে মাথার মধ্যে বরফ কুচির মতন হাওয়ায় উড়ছে কেবল, কিছুতেই দানা বাঁধছে না, কিছুতেই···মানে ···মানে···" তোৎলাতে তোৎলাতে দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'এই অল্প সময়ের মধ্যে ওটাকে গুছিয়ে লিখতে পারব না, ছোটখাটো করলে ত চলবে না। ষাট হাজার শব্দ হওয়া চাই কিন্তু সে ত চাট্টিখানিক কথা নয়।'

'নয়ই ত, তাই বলে সর্বস্ব খোয়াবে নাকি? কাহিনীটা বল। প্লটটাকে তিন ভাগ করে আমরা তিনজনে লিখতে বসে যাই; তুমিও খানিকটা লেখ। লেখা হয়ে গেলে ম্যানাসক্রিপটের তলায় তুমি নাম সই করে দেবে।'

'ধ্যুস, তাও কখনো হয়! অত সহজ হলে ত বেঁচে যেতাম।' দস্তয়েফ্‌স্কি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'তোমরা ভাবছ স্তেলফ্‌স্কির মতন ধুরন্ধরকে ওই করে বিদায় করা যাবে? তিন রকমের হাতের লেখা দেখে সে বুঝবে না, তাকে ঠকানো হয়েছে?'

'তাও বটে, ত এখন কী উপায়?' তিন বন্ধুই উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন তাঁর দিকে। এদিকে মাত্র একটা মাস বাকি, পয়লা নবেম্বরের মধ্যে উপন্যাস লিখে দিতে না পারলে তোমাকে একটা মোটা টাকা জরিমানা দিতে হবে, আর পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যেও যদি দিতে না পার তোমার সব লেখার পূর্ণ স্বত্ব চিরদিনের জন্যে স্তেলফ্‌স্কির।

দস্তয়েফ্‌স্কি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উপায় দেখছি নে।'

মাইকফ্‌ লাফিয়ে উঠে বললে, 'ঠিক আছে, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেছে। একমাসের মধ্যে লেখা হয়ে যাবে তোমার দেখো।'

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে মাইকফের দিকে তাকালেন, দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'কী বুদ্ধি?'

'ডিকটেশন। তুমি ডিকটেশন দেবে।'

'ধ্যুস, উপন্যাস আবার ডিকটেশন দিয়ে লেখা যায় নাকি! কত ভাবতে হয়। ভাবতে ভাবতে লিখতে হয়, লিখতে লিখতে···তা ছাড়া কত কাটাকুটি হয়, কেটে নূতন করে জুড়তে হয় তবে না একটা উপন্যাস দাঁড়ায়।'

'তবে তুমি মর!' বন্ধুরা চটে মটে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি তখন অনুপায় হয়ে বললেন, 'বেশ না হয় ডিকটেশন দিলাম, কিন্তু ডিকটেশনটা নেবে কে?'

মাইকফ বললেন, 'সে ব্যবস্থা আছে। তুমি শুনেছ বোধ হয় অধ্যাপক ওলখিন স্টেনোগ্রাফী শেখার একটা স্কুল খুলেছেন। একসপার্ট স্টেনো তৈরি হচ্ছে সেখানে। তুমি ওলখিনকে একটা চিঠি লিখে দাও। গোটা পঞ্চাশ রুবল দিলেই একমাসের জন্যে একজন ভাল স্টেনো পেয়ে যাবে তুমি সেখান থেকে। ওলখিনই বেছে ভাল একজনকে পাঠাবেন।'

দস্তয়েফ্‌স্কি গালমন্দের ভয়ে এবার আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না কিন্তু

মনের মধ্যে আশঙ্কায় কুঁচকে রইলেন, ওলখিন যে লোকটাকে পাঠাবে সে যদি মদো মাতাল হয়, দায়িত্ব জ্ঞানহীন অলস যদি হয় সে…সে যদি ..তার যদি… নানা অশুভ সম্ভাবনা মাথায় ভিড় করে এসে এক লহমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল তাঁকে।

জীবনে তিনি বহু জুয়া খেলেছেন এবং জিতেছেন কদাচিৎ, হেরেছেন অনেকবার ; কিন্তু তাতে করে কোনদিন দুঃখ হয় নি, হতাশা আসে নি, কেন না যত হেরেছেন ততোধিক কি অনেক অনেক বেশী লিখে রোজগার করেছেন কিন্তু এবারকার জুয়ার চেহারা অন্যরকম, পণ ভিন্ন। এবার তিনি পণ রেখেছেন তাঁর অবশিষ্ট ভবিষ্যৎ। এবার হেরে গেলে তাঁর এতকালের স্বপ্ন, বলতে গেলে এই জন্মটাই বরবাদ হয়ে যাবে—স্তেলফ্‌স্কি কিনে নেবে তাঁকে। তার অর্থ তাঁর অবশিষ্ট জীবনের মৃত্যু…ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি, সহসা তাঁর মুখের পেশী টানটান হল, জোনাকী জ্বলে উঠল চোখের তারায়—না, হারলে চলবে না, কিছুতেই হারতে পারেন না তিনি, জুয়াড়ী দস্তয়েফ্‌স্কি প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, বললেন, 'হাঁ তাই হোক। ডিকটেশনই দেব। ওলখিনকেই লিখব চিঠি।'

বন্ধুরাও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দেখে খুশী হলেন তাঁরা। পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এই ত চাই ব্রাদার, এই ত চাই। তোমার সাহস ফিরে এসেছে। আসবেই, কারণ সাহসই যে প্রতিজ্ঞা।'

কিন্তু বন্ধুরা চলে গেলে আবার তিনি বিমর্ষ হয়ে গেলেন, না, এবার আর হতাশায় কী আত্মবিশ্বাসের অভাবে নয়, বরং প্রবল এক আশায় ও বিশ্বাসে জ্বলছিলেন তিনি। মনে পড়ে প্রথম যৌবনে, সেই সতর বছর বয়েসে, ব্যক্তি-মানসের গভীরে নিহিত নিগূঢ় রহস্য তাঁকে প্রবল আকর্ষণ করেছিল, তাতে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ঘরছাড়া বিবাগী এক বৈরাগী তেইশ বছরের কবি ইভান শিদ্‌লফ্‌স্কি।

জীবন সম্পর্কে তখন তাঁর কতটুকু বা জ্ঞান। তিনি তখন স্বপ্ন দেখতেন কেবল। 'রোমানটিক ড্রিমার' ছিলেন তিনি। হঠাৎ সে-সময়ে কোথা থেকে এসে চাবি হাতে হাজির তাঁর সামনে ওই উদাসীন মানুষটি, যে-জগতে তিনি বাস করেন তাঁর অন্তঃপুরের দরজা খুলে দিলেন তিনি, কালো পর্দা সরিয়ে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য তুলে ধরলেন তাঁর সামনে। চমকে উঠলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, অভিভূত হলেন, অস্থির হলেন। সে-অস্থির অসোয়াস্তি বাড়তে বাড়তে এমন

হল যে, ব্যবহারিক জীবনের সাফল্য, বড় চাকুরে হওয়ার সাধ, মিথ্যে হয়ে গেল; তাঁর কাছে বড়, সব চেয়ে বড় হয়ে উঠল জীবন-রহস্যের আকর্ষণ, সে-আকর্ষণে তিনি কলেজ ছেড়ে পথে নেমে এলেন, বরণ করে নিলেন দারিদ্র্যের জীবন; জীবন-পথে দুঃখ ও যন্ত্রনাকেই করে নিলেন সঙ্গী। নিয়তিই যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে, জীবন-রহস্য যেখানে খোলা পুঁথির মতন অনাবৃত অনাদৃত পড়ে আছে—আয় দেখবি আয়: ওমস্ক-এর জেলে, সাইবেরিয়ার নিদারুণ জীবন ভুগতে নিয়ে এল।

সেইখানে দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে ওরলফের। অনুরূপ চরিত্রের আরো অনেকের সঙ্গে। ফলত তাঁর যত পুরনো সংস্কার প্রচলিত রীতি-নীতি ও আচরণ-বিধি এবং সনাতন বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দীক্ষিত হলেন তিনি নূতন মন্ত্রে। নিয়তি তাঁকে পৌছে দিলে সদসদের প্রচলিত ধারণার সীমান্তে। তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল এক নূতন দিগন্ত। 'পাপ ও শাস্তি'র নায়ক রাসকলনিকফের খুনের অপরাধের উৎসে রয়েছে সেই যন্ত্রণা-শুদ্ধ উপলব্ধি 'Good' সৎ-এর আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি—যে 'সৎ'-এর প্রকাশ ঘটে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতিতে নয়, স্বাধিকার (সেলফ অ্যাসারশন) প্রতিষ্ঠায়। রাসকলনিকফ্ চরিত্রের ধারণা তাঁর মনে এসেছিল ওমস্ক জেলের হাসপাতালে খুনী ওরলফকে দেখে। এই খুনী বিনা প্ররোচনায় নিতান্তই ঠাণ্ডা মাথায় শিশু ও বৃদ্ধদের গলা কেটেছে। 'মৃত্যু-পুরীর স্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, "এমন অয়স-কঠিন মানুষ আর কখনো আমি দেখিনি ··রক্ত মাংসের সমস্ত দুর্বলতা মানুষটা জয় করেছে · শরীরের ওপরে মানুষটার দারুণ প্রভুত্ব, মনটা পাথরের মতন কি তারও চেয়ে বেশী শক্ত, কোন শাস্তি কোন অত্যাচারকেই মানুষটা গ্রাহ্য করে না, পৃথিবীতে যেন তার ভয় করবার কিছু নেই। সে দুনিয়াটাকে যেন অনুকম্পার চোখে দেখত। আর দস্তয়েফ্স্কির দিকে যখন তাকাত, তাঁর মনে হত, যেন ওরলফ্ তাঁকে ভাবছে একটা পোষমানা, দুর্বল, দয়ার পাত্র, অত্যন্ত হীন একটা প্রাণী—যেন পোকা মাকড়। স্পষ্টতই দস্তয়েফ্স্কির আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল ওরলফ্—যার কোন কিছুতেই মানসিক ভারসাম্য টলে না, যে শরীরের ওপরে পরিপূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করেছে, সদসদের প্রচলিত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, যাকে জাগতিক কোন হিসেবের মাপকাঠিতেই পরিমাপ করা যায় না তাকে সাধারণ মানুষ সকলেই ভয় করবে, স্বাভাবিক। এবং স্বভাবতই এই বিচিত্র অন্তঃপ্রকৃতির মানুষটা তাঁর সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলতে পেরেছিল। সে হয়ে উঠেছিল

দস্তয়েফ্স্কির দিনরাত্রির ভাবনা—একটি জটিল অঙ্ক—যার ফল বের করতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—সেই অস্থিরতারই ফলশ্রুতি রাসকলনিকফ, যে ওরলফের মতন আপন ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে খুন করল কিন্তু ওরলফের মতন অয়স-কঠিন হয়ে উঠতে পারল না, থেকে গেল (দস্তয়েফ্স্কির মতন) দুর্বল, সন্দিগ্ধ, 'সদসদের প্রচলিত অনুশাসনের শেকল ছিঁড়তে না-পারা' উদভ্রান্ত মানুষ। এই দুর্বল ও উদ্ভ্রান্ত রাসকলনিকফকে তথা দস্তয়েফ্স্কিকে যে-প্রশ্ন ব্যাকুল করেছিল, (ব্যাকুল করেছিল নীৎশেকে) 'পাপ ও শাস্তি'র সেই হচ্ছে মূল দার্শনিক প্রশ্ন (এথিক্যাল কোশ্চেন)।···

এই প্রশ্নের আয়নায়ই ফুটে উঠেছিল উনিশ শতকের দ্বন্দ্বদীর্ণ মানুষের যন্ত্রণা-বিকৃত মুখ। দস্তয়েফ্স্কিই সব প্রথমে সেই আলোড়িত সময়ের সমাজচ্যুত অনিকেত মানুষের যথার্থ প্রতিমা দেখালেন আমাদের। সেই মানুষের প্রতিমা যে অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত, আত্ম বিশ্লেষণে নির্মম ইচ্ছার অভাব ও সত্তার জাড্যে অভিশপ্ত, যে আপন যন্ত্রণার ক্ষরিত রক্তে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।······

এই সব মানুষের মনোবিকলনের দক্ষতায় দস্তয়েফ্স্কির খ্যাতি ভুবন-বিদিত। ফ্রয়েডের অনেক আগে, মনোবিকলকদের সকলের আগেই তিনি মানুষের প্রচ্ছন্ন-মনের গভীরে ডুব দিয়েছেন, অতিপুঙ্খ অনুশীলন করেছেন শিশু কিশোর যৌবনের মন। তাঁর অন্তঃবীক্ষক দৃষ্টি পাগল আধ্পাগল খুনীর নিভৃত চিত্ত-বৃত্তি আবিষ্কার করেছে। আত্মহত্যার কারণ ও ক্রিয়ার ক্রমবিকাশের ধারাও তাঁর সূক্ষ্ম বিচারের চুল-চেরা বিশ্লেষণে বিধৃত। যেমন ব্যক্তি-জীবন তেমনি সমষ্টি-জীবন তথা পরিবার ও প্রতিষ্ঠান তাঁর বিশ্লেষণী-সমীক্ষা থেকে রেহাই পায় নি। কিন্তু মহান শিল্পীর ধ্যানী-মন এই সব মনোবিশ্লেষণী দক্ষতা পেছনে রেখে প্রবেশ করেছে এসে মানুষের দুরধিগম্য আত্মার রাজ্যে যেখানে ফ্রয়েড কোন দিন পথ খুঁজে পান নি। আসলে ফ্রয়েড ছিলেন ডাক্তার, মানুষের মনের ওপরে তিনি খুঁজেছেন শারীরবৃত্তিক প্রভাব; 'ঈড' তথা তমোগুণকেই তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন সেখানে—দস্তয়েফ্স্কির দৃষ্টি সেই পাঁকের উর্ধ্বে নির্মল রৌদ্রের আকাশে অনন্তে প্রসারিত হয়েছে। ফ্রয়েড ছিলেন অবচেতন মনের মনস্তাত্ত্বিক আর দস্তয়েফ্স্কি হলেন প্রতিস্বিক অস্তিত্বের মনোবিকলক, না, তারও অধিক, তিনি হলেন সামগ্রিক মনুষ্যত্বের দ্বান্দ্বিক বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক—তিনি খুঁজেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিবিশ্বক ঐক্য; মানুষের সঙ্গে মানুষের অনিবার্য বিরোধের মধ্যেও অপরিহার্য সহাবস্থানের সূত্র। তাঁর দিব্য-ভাবনা

মানুষের সত্তার গভীরে নির্মল সৌভ্রাতৃত্বের নির্মাল্য আবিষ্কার করেছে। শিল্পে মানুষকে এই সর্বোত্তম দানের জন্যেই রাশিয়ার মানুষ তাঁর জীবিত কালেই তাঁকে 'প্রফেট' বলে বুকে টেনে নিয়ে ছিল।

আসলে দস্তয়েফ্স্কির সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব রচনার বহিরঙ্গ মাত্র, আসলে মনস্তত্ত্ব তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় কেবল। তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি মানুষের অন্তঃকরণে, তাঁর নৈতিক-জীবনে। তিনি প্রসঙ্গত নিজেই একবার বলেছিলেন, "আমাকে লোকে মনস্তাত্ত্বিক বলে; কিন্তু তা সত্যি নয়। আমি যথার্থ অর্থে বাস্তববাদী। তার মানে, আমি মানুষের মনের ভিতরকার শড়ক অলি-গলি খুঁজে বেড়াই ও সবিস্তারে তার হদিস দিই সবাইকে।"

মানুষ সম্পর্কে দস্তয়েফ্স্কির নিজস্ব একটা মতবাদ আছে। সেই মতবাদের জন্যেই তাঁর রচনার এমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও শিল্প-দক্ষতা নিযুক্ত করেছেন মানুষের নৈতিক প্রকৃতি নির্ণয়ে। এবং সেই নির্ণীত মানদণ্ডে মানুষের মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত দেখতে চেয়েছেন। 'পাপ ও শাস্তি' লিখতে লিখতে সেই অভীপ্সিত ভাবনায় তিনি আরও বেশী মগ্ন, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—তাঁর মনে যে-দার্শনিক প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তর চাই।

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর উদ্ধারের আসন্ন মুহূর্তে এসে উপন্যাস অসমাপ্ত হয়ে আছে : রাসকলনিকফের আত্মসংবরণে ব্যর্থতা ও সমস্যার কাছে আত্মসমর্পণ কী তার নিজের দুর্বলতাবশত নাকি মানুষের মধ্যেই আছে একটা দৈব-পবিত্রতা যা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে অ-নৈতিক (সদসদের উর্ধ্বে) অতি-মানুষ (Dionysian Superman) হওয়ার চূড়ান্ত ইচ্ছাকে অসম্ভব করে দেয়? যদি সমস্ত 'বাস্তবের' উৎস হয় মানুষের এগো, ত বাইরে থেকে চাপানো অনুশাসন ও চরিত্রনীতি কী করে প্রাধান্য পায়, কার্যকরী থাকতে পারে? তা ছাড়া সব শেষে কী মানুষকে নিজের কাছেই শেষ-কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, নিজের মুখোমুখিই দাঁড়াতে হয় না শেষ-বিচারের আসামী হয়ে? অতএব নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই (will to power) কী শেষ-কর্তব্য হয়ে ওঠে না মানুষের? ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জিজ্ঞাসা উত্তর খুঁজছে 'পাপ ও শাস্তি' উপন্যাসের মধ্যে, আর তিনি কিনা সেই সব ঐকান্তিক জীবন-জিজ্ঞাসার সামনে এসে মুখ ফের'তে বাধ্য হচ্ছেন, মন দিতে বাধ্য হচ্ছেন অন্য রচনায়! প্রতিকারহীন এই অবিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোরও তাঁর জায়গা নেই! স্বকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করছেন তিনি। তাঁর বিমর্ষ হওয়ারই কথা।

কিন্তু বিমর্ষ হয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন তিনি? শিয়রে শমন যে ভয়ংকর মূর্তি ধরে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

তিনি ওলখিনকে চিঠি লেখার জন্যে কাগজ কলম টেনে নিলেন। মুখখানা তখনও ক্ষোভে থম থম করছে, ভয়ও সেখানে কম নয়। সর্বস্ব পণ রেখে তিনি যে-বাজী ধরেছেন সে-বাজীতে যদি হেরে যান ত কী সর্বনাশ হবে তার, কী সর্বনাশ কী সর্বনাশ! সে-সর্বনাশের কথা ভেবে কেনই বা তিনি সিটিয়ে উঠবেন না, এত কাল যিনি অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে এসেছেন, সামনে এখনও যিনি অন্ধকার দেখছেন, তিনি জানবেন কেমন করে, তিমির-বিদার উদার-অভ্যুদয় হতে চলেছে তাঁর জীবনে। আসন্ন হয়েছে তাঁর জীবনে পালা-বদলের পালা। এ তাঁর নিয়তি ছাড়া আর কারো জানারও কথা নয়। বস্তুত সে এক অভাবনীয়ের আবির্ভাব।

চতুর্থ পর্ব

এক

যেন ওপরওয়ালা ওলখিন পাঠান নি, যেন জন্মান্তরের সুকৃতিই হাতে ধরে আন্না গ্রিগোরিয়েভনা স্নিৎকিনাকে দস্তয়েফ্‌স্কির দুয়োরে এনে হাজির করল।

দুর্লভ ভাগ্যই বলতে হবে, নিজেই স্বীকার করেছেন আন্না, 'এত সুখ যে আমার কপালে ছিল আমি জানতাম না। আমি এখন শুধু সেই সুখের দিনগুলি বুকে করেই বেঁচে আছি, আমি এখনো সেই আঠার শ' ছেষট্টি—আশিরই মানুষ।' —১৯১৪-১৫য় এ-কথা বলেছেন শ্রীমতী আন্না। তখন তাঁর বয়েস সত্তর। আন্নার মৃত্যুর পরে (অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় ১৯১৮-র ৯ জুন তিয়াত্তর বছর বয়েসে তিনি মারা যান) তাঁর স্মৃতি-কথার রুশ-সংস্করণ বেরোয়। সে-বইয়ের সম্পাদক লিওনিদ্‌ গ্রসমান মাঝে মধ্যে আন্নার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে আসতেন। একদিন ঘরে ঢুকে দেখেন টেবিলের ওপরে গুচ্ছের চটি চটি নূতন অপেরার বই ছড়ানো।

'এগুলো কী ?' লিওনিদ্‌ জিজ্ঞেস করলেন।

আন্না তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তবে শোন কাণ্ড, ফিওদরের একটা বইয়ের গীতিনাট্য-রূপ দিয়েছে এক তরুণ নাট্যকার, সেটা আবার শিগ্‌গিরই মঞ্চস্থ হতে চলেছে মারিয়াইন্‌স্কি থিয়েটারে। অথচ বইয়ের যে একজন স্বত্বাধিকারী আছে, তাঁর অনুমতিও যে পাওয়া দরকার সে-খেয়াল নেই ছেলের। আমি তাই কথাটা স্মরণ করিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলাম তাকে। চিঠি পেয়ে সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। ক্ষমাটমা চেয়ে শেষে তার নিজের লেখা এই একগাদা বই দিয়েছে আমাকে। যাওয়ার সময় সে তার অটোগ্রাফের এল-বামটা আমার সামনে ধরে বললে, একটা সই করে দিন। আমি কলম তুলেছি, তখন বললে, আমার এই এলবাম আমি সূর্যের নামে উৎসর্গ করেছি, যা-কিছু লিখবেন সূর্য-সম্পর্কেই লিখবেন কিন্তু। আমি তৎক্ষণাৎ লিখলাম, 'আমার জীবনের সূর্য—ফিওদর দস্তয়েফ্‌স্কি।' লিখে নাম সই করে দিলাম। বল লিওনিদ্‌, এ-ছাড়া আমি আর কী লিখতে পারতাম, অনেক চিন্তার পরেও কী এ ছাড়া অন্য কিছু আমি লিখতে পারতাম ?'

সত্যি তিনি আর কিছু, অন্য কিছু লিখতে পারতেন না। দস্তয়েফ্‌স্কি সত্যি তাঁর জীবনের সূর্য ছিলেন। এই সূর্যের দীপ্তিতে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যায় সেই সত্তর-আঠার বছর বয়েসেই। সাহিত্য-প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার

সূত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকে। গ্রিগরি স্নিৎকিন্‌ ছিলেন সরকারী দফতরের একজন না-বড় না-ছোট পদের কেরানী। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। পিতার্সবুগের শহরতলিতে পাশাপাশি দু'খানি ছোট ছোট বাড়িও করেছিলেন। দুই মেয়ে এক ছেলে আর স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার পেতেছিলেন এক বাড়িতে আর একটা বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়েছিলেন। ভদ্রলোক প্রথম যৌবনে ভালবেসে ফেলেছিলেন এক অপেরা-নায়িকাকে। তরুণী হঠাৎ মারা গিয়ে ভদ্রলোককে চল্লিশ বছর উদাসীন করে রাখে। সেই তখন থেকে পড়ার নেশা আর নাটক দেখার নেশা। চল্লিশ বছর বয়েসে সাতাশ বছর বয়েসের এক শিক্ষিতা সুন্দরী ফিন রমণীকে বিয়ে করার পরেও সে-নেশা থেকে যায় তাঁর। অপেরার নেশা কমে এলে বইয়ের নেশা বেড়ে যায়। মেয়েকেও সেই নেশা—পড়ার নেশা ধরিয়ে দেন তিনি। বাবার কাছেই আন্না প্রথম নাম শোনেন দস্তয়েফ্‌স্কির। বাবার বইয়ের শেলফ থেকেই তাঁর এতাবৎ প্রকাশিত বই সব পড়ে ফেলেন। অজ্ঞাতসারে সেই থেকেই বুঝি আন্নার কাছে দস্তয়েফ্‌স্কি সূর্য হয়ে ওঠেন, সেই থেকেই বুঝি আন্না সূর্যমুখী।

আন্না তাঁর সেই সূর্যমুখী মনের খবর টের পেলেন ওলখিন যখন এসে প্রস্তাব রাখলেন তাঁর কাছে।

আন্না আনডার গ্রাজুয়েট কোর্সের (জিমনাসিয়ার) শেষ পরীক্ষায় রুপোর মেডেল নিয়ে বেরিয়ে এসে টিচার্সট্রেনিং নিচ্ছিলেন, তখন শুনতে পেলেন স্টেনোগ্রাফি, সাঙ্কেতিক লিপি, নামে একটা নূতন বিদ্যে শেখানো হচ্ছে, শিখতে পারলে মাস্টারীর চেয়ে ভাল লাইন হবে সেটা। আন্না তক্ষুনি এসে ভর্তি হলেন সিক্‌স্থ্‌ গ্রামার স্কুলে প্রফেসর প. ম ওলখিনের সর্টহ্যাণ্ড ক্লাসে। বুদ্ধিমতী মেয়ে ছ'মাসেই গোটা বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললেন, তখনই তাঁর মিনিটে একশ'টি নির্ভুল শব্দ লেখার হাত। এমন ছাত্রীকেই ওলখিল দস্তয়েফ্‌স্কির জন্যে পছন্দ করবেন, স্বাভাবিক।

তখন মাত্র ছ'মাস হয়েছে বাবা মারা গেছেন (২৮ এপ্রিল ১৮৬৬)। বাড়ি ভাড়ার টাকায় কোন মতে সংসার চলছে তাঁদের। তাই একমাসের কাজের জন্যে পঞ্চাশ রুবল লোভনীয় মজুরী না হলেও টাকাটা তাঁর প্রয়োজন ছিল বই কী, তবু ওলখিনের প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিতে সে-জন্যেই রাজী হন নি আন্না, তার পেছনে অন্য একটা আগ্রহও প্রবল কাজ করেছিল। সে-আগ্রহ দস্তয়েফ্‌স্কির সান্নিধ্যে আসার। যাঁর বই পড়তে বসলে তাঁর দিন-রাত্রির পার্থক্য মনে থাকে

না, মুগ্ধ-মন চোখের পলক ফেলতে পর্যন্ত ভুলে যায় তাঁর সেই প্রিয় অতি-প্রিয় লেখকের তিনি কাজে লাগবেন এ-ভাগ্যকে তিনি পূর্ব জন্মের সুকৃতি বলেই মনে করলেন ও সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল যেন নিয়তি এ-জন্যেই তাঁকে স্টেনোগ্রাফি শিখতে ওলখিনের স্কুলে টেনে এনেছিল। রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক, তাঁর পরম প্রিয় লেখক দস্তয়েফ্স্কি—নামটা মনে মনে উচ্চারণ করে বার বার শিউরে উঠেছেন আন্না।

কেউ আসবে বলে তার জন্যে অনির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে দস্তয়েফ্স্কি অত্যান্ত অস্বস্তি বোধ করেন। ফলত চিন্তা ভাবনার খেই হারিয়ে যায়, লেখায় পড়ায় মন বসে না, তাই সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে সময় জানানোর কালে তিনি পরিষ্কার বলে দেন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেও না, পরেও নয়। ওলখিনকেও তাই লিখেছিলেন তিনি: ৪ অকটোবর সাড়ে এগারোটায় সময় আপনার স্টেনোগ্রাফারকে পাঠাবেন। তার এতটুকু আগেও না, পরেও নয়।

ঠিকানা শুদ্ধ্ সেই নির্দেশনামাটি হাতে করে ৩ তারিখ বাড়ি ফিরলেন আন্না। কিন্তু সারা রাতে এতটুকু ঘুম এল না বিশ বছরের মেয়ের চোখে। একটা নাম-না-জানা আনন্দের সঙ্গে একটা নাম-না-জানা ভয় এসে সারারাত তাঁকে মাছির মতন খুঁটল কেবল। উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে রাত না পোহাতেই উঠে পড়লেন ও এগারোটার অনেক আগেই পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে।

প্রথম দিনের সেই সাক্ষাতের কথা আন্নার স্মৃতি-কথার ভাষায় বলি: "আমি গোসতিনি দ্ভরে এসে আমার বয়েসের সঙ্গে মানায় এমন একটা পোর্টফলিও কিনলাম আর কয়েকটা উড-পেনসিল। এগারোটার আগেই আমি কেনাকাটা শেষ করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। বলশয়া মেস্চানস্কায়া ধরে স্তলিয়ার্নি লেনে পড়লাম। কত পরিচিত রাস্তা, তবু মনে হচ্ছিল যেন একটা অচেনা নূতন পথে হাঁটছি। সত্যি ত নূতন পথ—জীবনের এই অনিশ্চিত নূতন পথে হাঁটতে আমার বুক কাঁপছিল। ঠিক এগারোটা পঁচিশ মিনিটে আমি এসে তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। মস্ত বড় বাড়িটার ছোট ছোট ফ্ল্যাটে নানান পেশার মানুষের ঘরকন্না—কেউ মিস্ত্রি, কেউ দোকানদার, কেউ দালালী করে, কলম-পেশার চাকরি করে কেউ কেউ। সদ্য পড়া 'পাপ ও শাস্তি'র নায়কের আস্তানাটা মনে পড়ল। এমনই একটা পাঁচমিশেলী মানুষের জনতায় ঠাসা বাড়ির চিলে কোঠায় থাকত নায়ক রাসকলনিকফ্। সদয় দরজায় একজনকে

দেখতে পেয়ে জানতে চাইলাম, তেরো নম্বর ফ্ল্যাটটা কোথায়? সে চারতলার একটি জান্‌লা দেখিয়ে দিলে। বিশ্রী অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আমি চারতলায় উঠে এলাম। দরজার কড়া নাড়তেই একটি মধ্য-বয়সী মেয়েছেলে বেরিয়ে এল। তার কাঁধে যত্ন করে জড়ানো একটা খোপকাটা সবুজ রংয়ের শাল। 'পাপ ও শাস্তি'র মাতাল মারমেলাদফের দারিদ্র্যের সংসারে ঠিক এই রকম একটা শস্তা শাল ছিল পরম অহংকারের জিনিস। সে কী এই ঝিয়ের শাল দেখেই লেখা! বেশ মজা লাগল ভাবতে।

'কাকে চাই?'

ঝিয়ের জিজ্ঞাসার জবাবে বললাম, 'তোমার কত্তাকে বল গে, পিতর ওলখিনের কাছ থেকে একজন এসেছেন, এখন আমার আসার কথা। উনি জানেন।'

ঝি আমাকে একটা ঘরে এনে বসতে বলে চলে গেল। তখনো বসি নি। মাথার স্কার্ফটাও খুলে উঠতে পারি নি তখন, হুট করে একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। আমারই বয়েসী হবে। উস্কখুস্ক একমাথা চুল, খোলা বুক, পায়ে স্লিপার। একলা ঘরে অপরিচিত মুখ দেখে চমকে উঠল সে, একটা অস্ফুট শব্দ করে তক্ষুনি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি জড়সড় হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। খাবার ঘর। ঘরের আসবাব-পত্র অত্যন্ত সাধারণ। দেয়ালের গায়ে বড় বড় দুটো আলমারি আর একটা দেরাজ-আলমারি জানলার নিচে। আলমারিটা ক্রুশে-বোনা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। অন্য দেয়ালের গায়ে একটা সোফা। সোফার ওপরে দেয়ালে আঁটা রয়েছে একটা ঘড়ি। ঘড়িতে তখনই সাড়ে এগারটা বেজেছে। নিশ্চিন্ত হলাম। এতটুকু আগেও না পরেও না ঠিক নির্দিষ্ট সময়টিতে আসতে পেরেছি আমি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না-ফেলতে দস্তয়েফ্‌স্কি এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে এনে তাঁর পড়ার ঘরে বসিয়ে আবার তখনই বেরিয়ে গেলেন। পরে বুঝলাম, ঝিকে চায়ের কথা বলতে গিয়েছিলেন। এ-ঘরটায় বেশ বড় বড় দু'টো জানলা, আকারেও বেশ বড় ঘরটা। আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে সেদিন বেশ আলোও ছিল ঘরটায়। পরে দেখেছি, ঘরটা আসলে অন্ধকার হয়েই থাকে অধিকাংশ সময়—অন্ধকার আর নিশ্চুপ। কেমন একটা মন-মরা ভাব। এখানে ঢুকলে কেউ বিষণ্ণ বোধ না করে পারে না। চোখে পড়ল, বিপরীত দেয়ালের গায়ে একটা নরম সোফা বাদামী কভার দিয়ে ঢাকা, মনে হল বেশ জীর্ণ। সোফার সামনে লাল সুতোর তোয়ালে দিয়ে ঢাকা একটা গোল টেবিল। টেবিলের ওপরে

একটা বাতি। খান তিনেক এলবাম তার পাশে। টেবিল ঘিরে কয়েকখানি গদি আঁটা চেয়ার। সোফার ওপরে দেয়ালে ঝুলছে একজন মহিলার ফটো। মহিলার চেহারা শীর্ণ। পরনে কালো পোশাক মাথায় কালো বনেট। মনে মনে বললাম, নিশ্চয় দস্তয়েফ্স্কির স্ত্রী। তখনও জানিনে তিনি মৃতদার। দুই জানলার মাঝখানে কালো ফ্রেমে বাঁধানো একটা মস্ত আরশি। আরশিটা ডানদিকের জানলার দিকে বেশী সরে থাকায় বিশ্রী দেখাচ্ছিল। জানলার ওপরকার দু'টো বড় বড় চীনা ভাজ ছাড়া অবশ্য আর কিছুই সুশ্রী নয় এবং নিত্যপ্রয়োজনের অধিকও নয়। লেখকের ঘর বলে বেশীর মধ্যে একটা লেখার ডেস্ক্ রয়েছে। ডেস্কের অল্প দূরে একটা গদি-আঁটা সবুজ বনাতে মোড়া লম্বা সোফা, তার পাশে ছোট একটা টেবিলে কাচের জাগে জল। ওখানে বোধ হয় দস্তয়েফ্স্কি ঘুমোন। আমি দু' চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছিলাম চারধার। মনে ধরে এমন কিছু নেই কোথাও। নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে যা থাকে এখানেও তাই।..."

অবশ্য একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়েছিল আন্নার—শিশুর চিৎকার হৈ-চৈ ঢোলক বাজানোর শব্দ নেই। তিনি একলা বসে আশা করছিলেন যে-কোন মুহূর্তে ওই ফটোর মানুষটি সামনের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবেন। কিন্তু তার বদলে চা নিয়ে ঢুকল ঝি। তার পেছনে পঁয়তাল্লিশ বছরের পুরুষটি এসে বিবর্ণ পটভূমি আড়াল করে দাঁড়ালেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্যে পরিবেশের দৈন্য আর মনে থাকল না তাঁর।

আন্না লিখেছেন, "দেখা মাত্রই আমার মনে হয়েছিল, ওঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিন্তু যখনই কথা বলতে শুরু করলেন বয়েস তাঁর আশ্চর্য ভাবে নেমে এল, বেশ যৌবন-দীপ্ত ও জীবন্ত দেখাতে থাকল, মনে হল, সাঁইত্রিশ আটত্রিশের বেশী বয়েস হবে না মানুষটির। খাড়ায় মাঝারি কিন্তু খুব টান হয়ে চলেন বলে লম্বা মনে হয়। রগের দু'পাশে অনেক দূর চুল উঠে গেছে, তার ডান ভাগটা চাঁদির চুলে ঢাকা। চুলের রং ঈষৎ লালচে, পমেড দিয়ে যত্ন করে পাট-করা। কিন্তু আমাকে যা সব থেকে অবাক করেছে সে তাঁর চোখ। বাঁ চোখটির রং বাদামী, মণি উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক। কিন্তু ডান চোখটি একেবারে অন্য রকম—মণিটি বিবর্ণ আর এমনই বেঢপ বড় যে চোখের সাদা অংশটা প্রায় সবটাই তার তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। পরে জেনেছি, মৃগীর ফিট হয়ে একবার একটা ধারাল জিনিসের ওপরে পরে চোখে দারুণ চোট পেয়েছিলেন।

চোখের-ডাক্তার ওই চোখটা পরীক্ষা করবার সময় বেশী অ্যাট্রোপিন দিয়ে ফেললে মণিটা ওই রকম বিবর্ণ আর অস্বাভাবিক বড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে গভীর এক রহস্যের আভাস জড়িয়ে থাকত সব সময়। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছিল, এ-মুখ যেন চেনা, কোথাও দেখেছি এর আগে। শেষে মনে পড়ল, কোন একটা কাগজে ছবি দেখেছিলাম। আমার সামনে তিনি এসে যখন দাঁড়ালেন, তাঁর গায়ে ছিল নীল রংয়ের পুরনো সুতোর জ্যাকেট কিন্তু তার কলার আর কাফ ছিল নিখুঁত সাদা।..."

দস্তয়েফ্‌স্কি কী বলেন শোনবার জন্যে আন্না যখন চুপ চোখে তাঁকে দেখছেন তখন কী বলে আলাপ শুরু করবেন চিন্তা করতে গিয়ে চিন্তা ভুলে তিনিও দেখছিলেন আন্নাকে। লম্বা আর পাতলা গড়নের মেয়েটির ডিমের আকৃতি মুখের ধাঁচটি বেশ মিষ্টি, ধূসর চোখের তারা দুটিও সুন্দর। বিশেষ করে দৃষ্টি যেমন গভীর তেমনি তীক্ষ্ণ। প্রশস্ত কপাল সরু থুতনি আর দীঘল নাকের শুরুতে মৃদু স্ফীতির জন্যে মুখে অন্য-থেকে-আলাদা একটা বিশেষত্ব ফুটেছে। দাঁতগুলি মসৃণ বেশ চকচকে, আর চুল—উচ্ছল অজস্র মেঘলা-চুলের ওপরে কী ভেবে তিনি একটু বেশীক্ষণই তাকিয়ে রইলেন।

অস্বস্তিতে আন্না একটু নড়েচড়ে উঠলে দস্তয়েফ্‌স্কি মুখ ফেরালেন, একটা চেয়ার-টেনে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমার নাম কি?'

'আন্না গ্রিগোর্‌য়েভনা স্নিৎকিনা।'

'কেন তুমি শর্টহ্যাণ্ড শিখতে গেলে?'

'অবস্থা আমাদের অবশ্য এমন নয় যে চাকরি করতেই হবে। তবু আর পাঁচজন আধুনিকা মেয়ের মতন আমিও চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে। উপার্জন করার সমর্থ্য না থাকলে কী স্বাধীন হওয়া যায়?' আন্না বলল।

দস্তয়েফ্‌স্কি শুধোলেন, 'কত দিন শর্টহ্যাণ্ড শিখছ?'

'ছ' মাস।'

আমার উত্তর শুনে তিনি যেন একটু হতাশ হলেন, বললেন, 'আচ্ছা দেখি তুমি কেমন শর্টহ্যাণ্ড শিখেছ।' 'রুসকি ভিসনিক'-এর একটা সংখ্যা টেনে নিয়ে 'পাপ ও শাস্তি'র থেকে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

'অমন হুড়হুড় করে পড়লে হবে কেন', আমি বাধা দিলাম, 'যেমন করে লোকে কথা বলে সে ভাবে পড়ুন।'

ডিকটেশন দিয়ে উপন্যাস লিখতে হবে, যা তিনি কোন দিন করেন নি, তাও আবার একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, তবু যদি মনে মনে কাহিনীটার একটা খসড়া করে ফেলতে পারতেন।—ভাবনা-চিন্তায় আগে থেকেই অস্থির হয়ে ছিলেন তিনি। স্টেনোগ্রাফারকে দেখে, 'এক্ষুনি ডিকটেশন দিতে হবে' চিন্তা করে আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, সেই উদ্বেগ ও অস্থিরতার জন্যে শব্দগুলি তাঁর মুখে খইয়ের মতন ফুটছিল। আন্না বাধা দিতেই সচেতন হলেন তিনি। সহজ গলায় পড়তে লাগলেন। একটা প্যারা পড়া হলে থামলেন, বললেন, 'এবার আমাকে পরিষ্কার করে লিখে দাও।' তিনি উঠে পায়চারি করতে লাগলেন, আর সিগারেট টানতে থাকলেন মুহুর্মুহু। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে সামনে এসে বললেন, 'কী এতক্ষণ লাগে নাকি সর্টহ্যাণ্ড থেকে ভাষায় আনতে?' অবশ্য তক্ষুনি শেষ কথাটা লিখে শেষ করে আন্না খাতাখানা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। তিনি পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, 'ইস্ এ কী করেছ,' খাতাটা টেবিলের ওপরে রেখে দেখাতে লাগলেন, 'এই গ্যাখ, ক'টা সেমিকোলান বাদ দিয়েছ, এখানে একটা শব্দ বাদ পড়েছে, এখানে একটা অ্যাকসেণ্ট হবে, দেও নি। এমন ভুল করলে কী করে চলবে।' তিরিক্ষি মেজাজ করে তিনি ধমকে উঠলেন।

আসলে এটা যে দস্তয়েফ্স্কির অস্থির উদ্বিগ্ন মনের ঝাল ওঁর ওপরে ঝাড়ছেন আন্না বুঝবেন কী করে, তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। মনে মনে বুঝলেন, এখানে সুবিধে হবে না। 'না হলেই ভাল,' আন্না ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলেন। হঠাৎ তখন দস্তয়েফ্স্কির গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠল। একটু আগের তিরিক্ষি মেজাজ আর নেই। অবাক হয়ে তাকালেন আন্না দস্তয়েফ্স্কির কথা শুনে, 'আমি গল্পটা কিছুতেই মাথার মধ্যে গুছিয়ে তুলতে পারছি নে। কী যে উপায় হবে, এদিকে নবেম্বরের পয়লা তারিখটা রাক্ষসের মতন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তিনি দু'হাতে মাথা টিপে ধরলেন। তবু আন্নার অসন্তোষ গেল না, মনে মনে বললেন, 'এ মানুষটির সঙ্গে কেউ কাজ করতে পরেবে না। ঠিক করলেন, বলবেন, গল্পটা মাথায় আসুক, গুছিয়ে ফেলুন, তখন ডাকবেন, তখন আসব।' এই বলে কেটে পড়বেন আর আসবেন না। তখনই দস্তয়েফ্স্কি বলে উঠলেন, 'দেখ এ-বেলায় আর উপন্যাস শুরু করা যাবে না, এ-বেলা থাক্, তুমি ও-বেলায় এসো, সন্ধ্যা আটটায় আসবে, আমি ভতক্ষণ চিন্তা করি।'

নিঃশব্দে আন্না উঠে দাঁড়ালেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি বলে উঠলেন, 'গ্যাখ, তুমি বেটাছেলে নয়, একটি মেয়ে, ওলখিন আমাকে একজন মেয়ে-স্টেনো পাঠিয়েছে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি।'

'কেন বলুন, তো ?' আন্না একটু অবাক হয়েছেন।

'কেন আবার কী, ব্যাটা ছেলে হলে নির্ঘাৎ মদোমাতাল হত, তুমি নিশ্চয় মদ খাও না।'

'হ্যাঁ, ও ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' আন্না মনে মনে রাগ করে বললেন।

'তা বলে সিগারেট খাও নিশ্চয়, তোমাকে সিগারেট দেই নি, নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

'আমি সিগারেটও খাই নে।'

'সে কী আধুনিক মেয়ে!…'

'আমি আধুনিক সন্দেহ নেই কিন্তু আধুনিক হলেই সিগারেট খেতে হবে কেন ? মেয়েরা সিগারেট খায় এটা আমি পছন্দ করি নে।'

শুনে দস্তয়েফ্‌স্কি দারুণ স্বস্তি পেলেন। 'বেশ, বেশ, খুব ভাল, শুনে খুশী হলাম।' দস্তয়েফ্‌স্কির মুখে চোখে সত্যিই খুশী ফুটে উঠল। পলিনা সুস্লোভা, আন্না করভিন ইত্যাদির পরে সব আধুনিকাদের ওপরেই তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, আন্না গ্রিগোরুয়েভনার রুচি বুদ্ধি সে-আস্থা ফিরিয়ে আনল তাঁর মনে। আদর্শবতী এ-মেয়ের ওপরে ভরসা রাখতে পারবেন তিনি। আশায় ভরে উঠল তাঁর মন, বললেন, 'চায়ের সঙ্গে তোমাকে কিছুই দেওয়া হয় নি, নাও, বস, একটা নাশপাতি খাও।' বলে তিনি টেবিল থেকে তুলে নাশপাতির ঠোঙাটা সামনে ধরলেন। অনিচ্ছা প্রকাশ করে আর কথা বাড়াতে চান না আন্না, নিঃশব্দে একটা নাশপাতি তুলে নিলেন। দস্তয়েফ্‌স্কিও নিলেন একটা। দু' জনেই মচ্‌মচ্‌ করে নাশপাতি চিবোতে লাগলেন। এ ভাবে নাশপাতি খেতে খেতে আন্নার মনের ক্ষোভ অসন্তোষ অনেকখানি হালকা হল ; তবু বিদায় নিয়ে আন্না যখন বেরিয়ে এলেন তাঁর মনে হল আর ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবার আর কোন উৎসাহ নেই তাঁর মনে।

এই দিনকার সেই মনের অবস্থা অনেক দিন পরে স্মৃতি-কথায় উল্লেখ করতে বসে তিনি মন্তব্য করেছেন, "সেদিন প্রথম সাক্ষাতের দিনে তিনি আমার মনে যে-নৈরাশ্য আর অসন্তোষের ছাপ ফেলেছিলেন আমার জীবনে তার আগে বা পরে তেমন আর কেউ পারে নি। আমি সেদিন আমার চোখের সামনে

দেখেছিলাম, দারুণ অসুখী একজন মানুষকে। দুশ্চিন্তা-জর্জর মানুষটি যেন উদ্বেগে মরে যাচ্ছিলেন—পরম কোন সম্পদ হারালে যেমন হয়, কিংবা যেন মাথায় বাড়ি দিয়ে কেউ ভীষণ কোন সর্বনাশ করে গেছে তাঁর। আমি যখন তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার উচ্ছল সুখের মেজাজ তখন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। চূর্ণ-আশা বুকে নিয়ে দুঃখ-পিষ্ট আমি নীরবে পথ হাঁটছিলাম…।"

আন্না বাড়ি অনেক দূরে। বাড়ি চলে গেলে সেদিন আর ফিরে আসা হত না। এবং সেদিন না এলে আর কোন দিনই হয়ত আসা হত না তাঁর। কিন্তু যা না-ঘটবার তা ঘটল না ও যা-ঘটবার তার অন্যথা হল না। অর্থাৎ দস্তয়েফ্স্কির বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই আন্নার মনে পড়ল কাছে-পিঠেই রয়েছে তাঁর মাসির বাড়ি। তিনি সেই মাসির বাড়িতেই এসে উঠলেন। তাঁর মাসি, মাসতুতু বোন, দিদিরা যখন শুনল আন্না দস্তয়েফ্স্কির বাড়ি থেকে আসছেন, দস্তয়েফ্স্কি তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কথা বলেছেন, হাঁ হয়ে থাকল সবাই, রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক এই পুঁচকে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করেছেন, আবার অনেকক্ষণ বসে কথাও বলেছেন—আন্নার দিকে তাকিয়ে চোখে পলক পড়ে না কারো, গলা দিয়ে স্বর ফোটে না। দেখে মজা লাগল আন্নার। তখন তিনি মোক্ষম কথাটা বলে ফেললেন, 'জান, এখন থেকে আর তিনি কষ্ট করে নিজের হাতে লিখবেন না। তিনি গড়গড় করে বলে যাবেন আর আমি তর্‌তর্ করে সাঙ্কেতিক লিপিতে টুকে নেব।'

'ইস্, তা হলে ত তুই বিখ্যাত হয়ে যাবি রে আন্না, দস্তয়েফ্স্কির নামের সঙ্গে তোর নামটাও যে জুড়ে যাবে জন্মের মতন।' দিদি গলা জড়িয়ে ধরল আন্নার 'আমার যে কী ঈর্ষা হচ্ছে না ভাই, ইচ্ছে হচ্ছে তোকে গলা-টিপে মেরে ফেলি।'

আন্না হেসে উঠলেন, 'তার বদলে তুই যে কেবল আদরই করছিস আমাকে, তোর আদরের চোটে আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে রে।'

সেই দম-বন্ধ আদরের মধ্যে অবশিষ্ট দিনটা কাটল আন্নার। তারপরে পশ্চিমের সূর্য যখন বার্চের বনে ঢলে পড়েছে, তার কমলা রং আলো তেড়ছা হয়ে এসে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে, তখন উঠলেন আন্না, তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। তখন তাঁর মনে আর গ্লানি নেই তার বদলে একটা মধুর আত্মপ্রসাদ সেখানে দুরন্ত শিশুর মতন হাত পা ছুঁড়ছে কেবল।

ঠিক আটটায় আবার আন্না ঢুকল এসে দস্তয়েফ্স্কির পড়ার ঘরে। তখন আর তাঁর মধ্যে একটু আগেকার উচ্ছলতা নেই। গম্ভীর হয়ে পেশাদার স্টেনোর

মতনই বসলেন তাঁর জায়গায়। প্রয়োজনীয় কাজটুকু করবার জন্যেই তিনি তৈরি তখন, তখন অতিরিক্ত আর কোন কিছুতে তাঁর ঔৎসুক্য নেই। তাঁর পেনসিল ধরা থেকে বসার ভঙ্গি, কথা-বলার ঢং, সব কিছুর মধ্যে পেশাদার ভাবটা সব সময় সোচ্চার করে রাখলেন। রাখতে হবে। যদি সসম্মানে স্টেনোর চাকরি করতে হয় মেয়েদের ত সম্ভ্রম ও স্বাতন্ত্র্যের একটা বেড়ায় ঘিরে রাখতে হবে নিজেকে। ওটা কাউকে ডিঙোতে দেওয়া চলবে না। ভারী মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন ওলখিন।

আন্না ওঁর কাছে নিজেকে গম্ভীর ও বৃত্তিসুলভ স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন, ফলে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই দস্তয়েফ্‌স্কির প্রশংসা পেয়েছিলেন আন্না; তাঁর মনে আন্না সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তৈরি হয়েছিল। ধারণাটা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল অবশ্য নিহিলিস্ট মেয়েরা! আন্না তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন, "তিনি নিহিলিস্ট মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ওই সব মেয়েরা সংস্কার-মুক্ত হওয়ার নামে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠত বলে তাদের ওপরে ওঁর একটা ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। অথচ সেই বয়েসেরই আর একটি মেয়েকে দেখছেন তিনি যে আধুনিকা হয়েও তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি স্বতঃই আমার ওপরে খুশী হবেন, স্বাভাবিক। দস্তয়েফ্‌স্কি এবারও আমাকে চা খাওয়ালেন, চায়ের সঙ্গে মীট-রোল। তারপর একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, সিগারেট খাও '

আমি যথারীতি গম্ভীর গলায় বললাম, 'আমি সিগারেট খাই নে, বলি নি আপনাকে?'

'ও, ঠিক ঠিক।' তিনি লজ্জিত হয়ে হাত টেনে নিলেন। শুধোলেন, 'তোমার নাম কি?'

কী আশ্চর্য ভুলো-মন, আমি মনে মনে হেসে আবার আমার নাম বললাম।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, স্বগত উক্তির মতন আমার নাম উচ্চারণ করতে করতে বললেন, 'আমার কিছু মনে থাকে না, তুমি বলেছিলে বটে,—আন্না, আন্না গ্রিগোরয়েভনা স্নিৎকিনা।'

'উঠলেন যে বড়, ডিকটেশন দেবেন না?' আমি কী জন্যে এসেছি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

তিনি সংকোচে জড়সড় হয়ে গেলেন, 'কী জান, ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারি নি এখনো।' বলতে বলতে পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে এসে বসলেন

আমার সামনে আর ডিকটেশন দেওয়ার বদলে আমার সম্পর্কে নানা কথা জানতে চাইলেন ও একসময়ে নিজের কথায় চলে এলেন, নিজের অতীত, মর্মান্তিক অতীত নিয়ে গল্প করতে লাগলেন। তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন কথকতার দক্ষতা আর আন্তরিকতা ছিল যে, জেলের অত্যাচার আর নৃশংসতার কথা শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। 'মৃত্যু-পুরীর স্মৃতি' পড়ে আমি একলা ঘরে বার বার শিউরে উঠেছিলাম ; এখন ভুক্তভোগীর নিজের মুখে শুনতে শুনতে সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম।

তাঁর কথাতেই হঠাৎ আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম, 'নিজের দুঃখের ইতিহাস বলে তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিয়েছি, নাও এবার ডিকটেশন নিতে তৈরি হও।' যেন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতেই তিনি উপন্যাস তৈরি করে ফেলেছেন।

তর্‌তর্‌ করে অনেকখানি ডিকটেশন দিলেন তিনি। তারপর এক সময়ে থেমে বললেন, 'আজ আর না। আজ তুমি যাও। যেটুকু ডিকটেশন দিলাম কাল তা লিখে নিয়ে এসো, কাল বারটায় এসো।'

আমি কাগজ পেনসিল গুছিয়ে নিলাম। তিনি আমাকে সিঁড়ি অব্দি এগিয়ে দিতে এলেন। সিঁড়ির সামনে এসে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, তুমি সিগারেট খাও না, মদ ছোঁও না, রুজ পমেড ব্যবহার কর না—আধুনিকার কোন ব্যসনই নেই তোমার, ত সুন্দর দেখানোর জন্যে পরচুলা পর কেন ? তোমার মাথায় কী চুল নেই ?'

এমন একটা বেয়াড়া ব্যক্তিগত প্রশ্নে যে-কোন মেয়েরই মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা ; কিন্তু আমার ভারী মজা লাগল। বেশ অহংকারও বোধ করলাম। তক্ষুনি আমার ঘন ধূসর রেশমের মতন মসৃণ চুলের গোছা মুঠোয় করে বলে উঠলাম, 'টেনে দেখুন, এটা পরচুলা নয়, আমারই মাথার নিজস্ব আদি ও অকৃত্রিম চুল।' বলতে বলতে অবশ্য স্বরে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ না করে পারি নি।

কিন্তু সে-উষ্মা তাঁকে স্পর্শ করল না কিংবা গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর চোখে তখন শিশুর বিস্ময়। বলে উঠলেন, 'বটে এত সুন্দর চুল তোমার, তোমার নিজের চুল এত সুন্দর !' তিনি মুগ্ধ-চোখে আমার চুল দেখছিলেন। আমি তখন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছি।"

সেই থেকে নিত্য নিয়মিত ডিকটেশন দিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। ডিকটেশন দেওয়ার সময় চিন্তা করতে গিয়ে যাতে সময় নষ্ট না হয়, আগে ভাগেই

ডিকটেশনের বিষয় মনে মনে কিংবা ডায়েরিতে তৈরি করে রেখেছেন। ফলে কাজ আশাতীত দ্রুত এগিয়ে চলেছে—নিয়মিত বেলা বারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত। সেই সাংকেতিক লিপি নিয়ে আন্না বাড়ি ফিরেছেন, দিনের সেই নোট রাতে বসে প্রতিলিপি করছেন। এই করে উনত্রিশ অকটোবর শেষ হয়েছে উপন্যাস।

আন্নার সঙ্গে পাশার প্রথম বিরোধ দেখা দেয় কাজ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই। একদিন বাড়ি ফেরার পথে পাশা এসে পথ আগলে দাঁড়াল তাঁর।

'দেখা মাত্রই ছেলেটাকে আমি চিনলাম,' আন্নার স্মৃতি-চারণে উল্লেখ আছে, "প্রথম দিনই কয়েক পলকের জন্যে ওকে দেখে'ছিলাম, তারপরে এই দ্বিতীয়বার। এখন সামনাসামনি দেখে মনে হল দূরের চাইতে কাছেই যেন ছেলেটা আরও বেশী বিরক্তিকর। তামাটে মুখটা কেমন কালচিটে-মারা। চোখের কালো তারার চারধারের সাদা রং বিবর্ণ-হলুদ। অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার জন্যে দাঁতের সাদা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ গলায় ছেলেটা আমাকে বললে, 'তুমি জান আমি কে? আমি তোমাকে আমার বাবার পড়ার ঘরে দেখেছি। তোমরা কাজ করছিলে বলে ঢুকি নি। আমার বড্ড কৌতূহল হচ্ছে, তুমি কী কর ওখানে।'

বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম, 'আমি শর্টহ্যাণ্ডে ডিকটেশন নিই।'

'শর্টহ্যাণ্ডটা কী ব্যাপার বলত, ভাবছি আমিও শর্টহ্যাণ্ড কোর্সটা নেব কিনা।' বলতে বলতে ছেলেটা অসভ্যের মতন আমার পোর্টফলিওটা টেনে নিল আমার হাত থেকে, খুলে দেখতে লাগল। আমি ছেলেটার বেয়াদপিতে এমনই রেগে গিয়েছিলাম যে পোর্টফলিওটা চেপে ধরে রাখতেও আমার ঘেন্না করেছিল।

'কী সব হিজিবিজি আঁকিবুকি ধ্যুস!' অবজ্ঞায় পোর্টফলিওটা একরকম ছুঁড়েই দিলে সে আমার দিকে।'

পাশা তখনও জানত না এই শিশু-দেবদারুর মতন সরল শীর্ণ মেয়েটার সামনেই তাকে একদিন মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হবে এবং সেদিনটি সুদূর নয়। অবশ্য আন্নাও জানতেন না। দস্তয়েফ্‌স্কিই কী জানতেন! ভবিষ্যৎ কেউ জানতে পারে না।

আন্না তখনও জানেন না এই ছেলেটি দস্তয়েফ্‌স্কির সৎপুত্র। ডিকটেশন দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্তি কাটাবার অবসরে দস্তয়েফ্‌স্কি আন্নার সঙ্গে গল্প

করতেন। গল্প আর কী, নিজের জীবনের দুঃখের দিনগুলি আন্নার সামনে ধরে নিজে দেখতেন, আন্নাকে দেখাতেন। যেন দু'জনে মিলে একটা দুঃখের ইতিবৃত্ত পড়তেন। তাইতেই সব জেনেছেন আন্না, একে একে দস্তয়েফ্স্কির জীবনের সব বৃত্তান্ত শোনা হয়ে গেছে তাঁর। কেবল পলিনা সুস্লোভার কথাটাই বলেন নি তিনি। সেই গোপন গল্পটা আন্না জেনেছেন অন্য সূত্র থেকে আর তখন তাঁর বুঝতে বাকি থাকে নি সেই অকথিত বৃত্তান্তটিই তাঁকে বিবৃত করেছেন তিনি উপন্যাস আকারে, যেটা ধরা পড়েছে তাঁর হাতে সাঙ্কেতিক লিপিতে। এই 'জুয়াড়ী' যে নিজের জীবন নিয়েও জুয়া খেলতে পারেন জেনে অবাক হয়েছেন আন্না; কিন্তু একদিন যে তাঁকে এই জুয়ার জন্যেই আতঙ্কগ্রস্ত হতে হবে তা তখন তিনি জানবেন কী করে? পলিনা সুস্লোভার কথা যেমন চেপে গেছেন, তেমনি চেপে গেছেন তিনি তার হতদরিদ্র অবস্থার কথা, ওটা তাই বলে আন্নার চোখে চাপা থাকে নি। নিত্য একজনের বাড়ি এলে তার আর্থিক অবস্থা কেউ না বললেও টের পাওয়া যায়। যেমন একদিন এসে আন্না দেখলেন, একটা জানলা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, বুঝলেন চাইনিজ ভাজের একটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দস্তয়েফ্স্কি বলেছিলেন, সাইবেরিয়ার কোন্ বন্ধু নাকি তাঁকে ওই দু'টো উপহার দিয়েছিলেন। মূল্যবান বলেই শুধু নয় দুঃখের দিনের স্মৃতি বলেই এই দু'টো তাঁর খুব প্রিয় জিনিস। সেই প্রিয় বস্তুর একটি হঠাৎ কোথায় গেল? ভেঙে গেল? ভেঙে গেলে ত উনি নিশ্চিয় খুব দুঃখ পেয়েছেন! সেই দুঃখের কথা তুলে আন্না আপসোস করতে গেলে তিনি নিঃসংকোচে বলে বসলেন, 'ভাঙে নি, ভীষণ টাকার দরকার পড়েছিল, বেচে দিয়েছি।'

আর একদিন খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে পড়াব ঘরে যাচ্ছেন দেখেন, ডিনার টেবিলে প্লেটে প্লেটে কাঠের চামচ। আন্না কৌতুক করে বললেন, 'আজ বুঝি আপনারা বাক-হুইটের পরিজ খাবেন? শুনেছি ওটা কাঠের চামচে খেতে খুব ভাল লাগে।'

'তুমি ভুল করছ আন্না', দস্তয়েফ্স্কি নির্দ্বিধায় শুধরে দিলেন তাঁকে, 'রুপোর চামচগুলি বেচে দিয়েছি, বড্ড টানাটানি চলছে কিনা।'

'এমন লোক দেখি নি আমি', স্মৃতি-চারণ করেছেন আন্না, "দারিদ্র্যের কথা অনায়াসে বলে ফেলতেন তিনি, যেন মজার কথা বলছেন।"

এভাবে ঘরোয়া কথাবার্তা চলে আর এগিয়ে চলে 'জুয়াড়ী' উপন্যাস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দু'জনেও এগোন। এগিয়ে আসেন দু'জন দু'জনের কাছাকাছি।

সযত্ন ব্যবধান জিইয়ে রাখার চেষ্টা যে কবে শিথিল হয়ে গেল আন্না জানতেও পারেন নি।

একদিন দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন (তখন 'জুয়াড়ী' শেষ হতে তার বেশী বাকি নেই) আমি বড্ড মুশকিলে পড়েছি। জান আন্না, ঠিক করে উঠতে পারছি নে কোন্‌টা করব, একটা কিছু আমাকে করতেই হবে এটা ঠিক; কিন্তু কোন্‌টা? তাঁর গলার স্বর অস্বাভাবিক, তাঁকে খুব বিচলিতও মনে হল।

আন্নার মনে আশংকা জাগবে, স্বাভাবিক, দুঃখী মানুষটি আবার কোন সংকটে পড়ল কে জানে। আন্নাও বিচলিত হলেন। চোখে ভয় ও প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন তিনি দস্তয়েফ্‌স্কির দিকে।

দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'পূর্বদেশে চলে যাব, কন্‌স্তান্তিনপ্‌ল্‌ কি জেরুসালেমে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাব, না য়ুরোপে গিয়ে জুয়ায় মজব, অবশিষ্ট জীবন কেবল জুয়া খেলব অথবা বিয়ে করব, বিয়ে করে একটা সুখের সংসার পাতব? কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে, অথচ কিছু একটা করতেই হবে।'

শুনে আন্না কপাল কুঁচকোলেন। বিবাগী হয়ে যাওয়া কিংবা জুয়াড়ী হওয়া কোনটাই সুস্থ ব্যাপার মনে হল না তাঁর। তা ছাড়া এই বয়েসের পুরুষরা হামেশাই বিয়ে করছে, দেখছেন আন্না তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও অনেকে এ বয়েসে বিয়ে করেছে, তিনি জানেন, বললেন, 'বিবাগী হয়ে যাওয়া কি জুয়ায় ডুব দেওয়া কোন কাজের কথা নয়', আন্না তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'বিয়ে করুন, বিয়ে করে সংসার-জীবনে সুখী হতে চেষ্টা করুন, ওটাই আপনার দরকার এখন।'

'তুমি মনে কর, আমি এখনও বিয়ে করতে পারি? এখনও আমার বিয়ের বয়েস আছে? এই বয়েসের পুরুষকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে?' আন্নার মুখে চোখ রেখে তিনি মুহূর্ত থামলেন, 'আচ্ছা, যদি বিয়ে করি, কী রকম মেয়ে আমার বিয়ে করা উচিত বল ত? খুব চতুর চালাক মেয়ে, নাকি বেশ শান্তশিষ্ট সেবাপরায়ণ'?

'ও, নিশ্চয়, খুব চতুর-চালাক মেয়ে বিয়ে করবেন আপনি, সেটাই মানানসই হবে আপনার পক্ষে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি যে আন্নাকে কোন্‌ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন আন্নার খেয়াল নেই।

'উহুঁ,' দস্তয়েফ্‌স্কি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি যদি পছন্দ করি, করব একজন নরম-মনের শান্ত-স্বভাবের মেয়েকে ; বেশ দয়ালু হবে সে, আমাকে ভালবাসবে, আমার সব দোষ ক্ষমা করবে।'

আন্না লিখেছেন, "বিয়ের প্রশ্ন নিয়ে এ-ভাবে কথা পাক খেতে খেতে প্রসঙ্গটা শেষ অব্দি আমার সম্পর্কে উঠল। দস্তয়েফ্‌স্কি জানতে চাইলেন, আমার কেন এখনো বিয়ে হয় নি। আমি বললাম (মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম), 'দু'টি পুরুষ এ-ব্যাপারে খুব এগিয়ে এসেছেন আমার কাছে ; কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি খুব, কিন্তু ভালবাসতে পারি না। দেখেছি, তাঁদের কাউকেই ভালবাসা যায় না।'

দস্তয়েফ্‌স্কি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ, ঠিক, বিবাহিত-জীবনে সুখী হতে হলে শ্রদ্ধাটাই যথেষ্ট নয়, ভলবাসাও চাই, ভালবাসতে না পারলে বিয়ে করা যায় না, উঁহু।'

আজ আন্না নিজেকে সুন্দর করে সাজালেন। বাবার মৃত্যু-শোকের কালো পোশাক ছেড়ে ফেলে পরলেন ঈষৎ রক্তাভ হালকা বেগুনী রংয়ের আপাদ-বিস্তৃত সিল্কের পোশাক। ওই রংয়েরই স্কার্ফ বাঁধলেন মাথায়। কোট পরলেন। অনেকক্ষণ ধরে রেশমী চুলে চিরুনি বুলোলেন, তারপর প্রতিলিপির তাড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গতকাল দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর 'জুয়াড়ী' উপন্যাসের শেষ নোট দিয়েছেন। উপন্যাস শেষ হয়ে গেছে গতকাল। অনেক রাত জেগে আন্না সেই নোট থেকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। আজ তাঁর দীর্ঘ একমাসের প্রথম চাকরি-জীবনের শেষদিন। চার তলায় ওঠার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আচমকা একটা বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আন্নার বুক খালি করে।

আন্নাকে দেখেই দস্তয়েফ্‌স্কি মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বাঃ আজ তোমাকে ভারী সুন্দর লাগছে ত ; তোমার পাতলা শরীর এই হালকা পোশাকে আশ্চর্য দীঘল দেখাচ্ছে।'

'আজ ৩০ অক্টোবর'।*

---

* পুরনো গণনায় ৩০ অক্টোবর ও নূতন গণনায় ১১ নবেম্বর দস্তয়েফ্‌স্কির জন্মদিন।

'আমার জন্মদিনের তারিখটি তুমি মনে রেখেছ ?'

'শুধু জন্মদিন নয় পণ-রক্ষারও দিন—দু'য়ে মিলে এক অবিস্মরণীয় দিন আজ ; তাই আজ আমি আমার শরীর থেকে শোকের চিহ্ন মুছে ফেলেছি।'

'তোমাকে ধন্যবাদ আন্না।'

দস্তয়েফ্‌স্কির চোখের ভাষায় বুঝি অন্য কথা ছিল। লাজুক মেয়ে লাল হয়ে উঠলেন। মাথা নিচু করে পাণ্ডুলিপি তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'হাতে আরও একটা দিন আছে তাই পণ রক্ষা করতে আজই ছুটব না স্তেলফ্‌স্কির কাছে, আজ সবটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেব। তুমি বস। আমি আসছি।'

একটু পরেই ফিরে এসে পঞ্চাশ রুবলের নোট বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সামনে, 'নাও আন্না, তুমি আমার যে-উপকার করেছ তার তুলনায় এ-টাকা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।'

আন্নার হাত কাঁপছিল, হাত সরছিল না নোট ক'টা নিতে। কাঁপা গলায় বেশ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'টাকাটা থাক এখন। আপনার চায়না ভাজ রুপোর চামচ এখনও বন্ধক।'

'কিচ্ছু ভেবো না, ওসব আমি বেচে দিয়েছি, এ-টাকা তোমাকে নিতে হবে। আর এখনই বিদায় নিলে চলবে না কিন্তু। তোমাকে আমি ছুটি দিচ্ছি নে সহজে। আমার 'পাপ ও শাস্তি'র শেষ অংশ এখনও লিখতে বাকি। ওটা আমি তোমাকে ডিকটেশন দেব আন্না। কেমন রাজী ?'

(আন্নার ডায়েরির কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি এবার)

" 'জুয়াড়ী' শেষ হয়ে গেছে আর দস্তয়েফ্‌স্কির কাছে আসতে পারব না। আমার দিনগুলি ফাঁকা হয়ে যাবে। শত কাজ দিয়েও সে-শূন্য আর ভরে তুলতে পারব না ভেবে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার ; নূতন প্রস্তাবে খুশীতে ভরে উঠল মন, উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম রাজী হব না মানে, আপনার কাজ পেলে আমি আর কোন কাজ করতেই বরং রাজী হব না।'

'সত্যি !'

আমার উচ্ছ্বাস যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি, যেন বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না তাঁর। অবশ্য তাঁকে সাহস দেওয়ার সময়ও পেলাম না আমি। তখনই ঘরে ঢুকেছেন একজন মহিলা। দস্তয়েফ্‌স্কি পরিচয় করিয়া দিলেন, 'ইনি আমার দাদার বিধবা স্ত্রী। আর এমিলা, ইনি হচ্ছেন আমার স্টেনো

আন্না গ্রিগোরয়েভনা ' এমিলা আমার দিকে এমন চোখ করে তাকালেন যেন আমি একটা জঘন্য জীব। ভীষণ বিরক্ত লাগল, দারুণ রাগ হল আমার। সেদিনই আমি এমিলা ফিওদরোভনাকে চিনেছিলাম, বুঝেছিলাম, এ মহিলার সঙ্গে আমি কোন দিন খাপ খাইয়ে চলতে পারব না।

তাঁর ভাইয়ের বউয়ের ওই রুক্ষ ব্যবহারে দস্তয়েফ্‌স্কিও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাকে অপেক্ষা করতে বলে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি; কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার সান্নিধ্য আমার অসহ্য লাগছিল। আমি দু' তিনটে কথার পরেই বিদায় নিলাম। আমার মনের আনন্দটুকু কেড়ে নেওয়ার জন্যে আমি কিছুতেই এমিলাকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

দস্তয়েফ্‌স্কি আমার পেছনে পেছনে এলেন—'তোমার বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে বলেছিলে, কবে যাব বল, আগামী কাল ?'

'না আগামী কাল আমি বাড়ি থাকব না, আমায় দিদির বাড়ি যেতে হবে।'

'তা হলে পরশু দিন।'

'না পরশু আমার শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশ আছে।'

'নবেম্বরের দু' তারিখ ?'

'বুধবার ত ? ও-দিন আমি থিয়েটার দেখতে যাব।'

'তার মানে আমি তোমার বাড়ি যাই এটা তুমি চাও না।'

এবার আমি হেসে ফেললাম, এমিলার ওপরকার রাগটা ওঁর ওপর ঝাড়তে পেরে সুখী হলাম, বললাম, 'আপনি তিন তারিখে আসুন, বেস্পতিবার সন্ধ্যে ৭টায়।'

'বেস্পতিবার! অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে ?'

অজ্ঞাতসারে তিনি যে তাঁর মনের এক গোপন কথা প্রকাশ করে ফেললেন, তিনি হয়ত তা জানলেন না কিন্তু আমি জানলাম জেনে সুখে বুক ভরে উঠল আমার।

কিন্তু আপসোসে আর অসন্তোষে দস্তয়েফ্‌স্কি যে জলে মরছিলেন সেটা ত আর আন্নার জানার কথা নয়; তার জন্যে অবশ্যি আন্নাও দায়ী নন। জীবনের চরম জুয়া খেলায় হেরে যেতে যেতে অবশেষে জন্মদিনে সেই পণ-রক্ষা করতে পেরে তাঁর তৃপ্তির অবধি ছিল না। সে-আনন্দে আন্না ও আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে জন্মদিন পালন করবেন বলে দামী ওভারকোটটা বন্ধক দিয়ে টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন। সব ভেস্তে দিলে

এমিলা। কিন্তু সে-রাগ প্রকাশ করার ত উপায় নেই। তাই এমিলা, তার ছেলেমেয়েরা ও পাশা যখন তাঁকে তাঁর জন্ম দিনের শুভেচ্ছা জানাতে এল তিনি হাসিমুখ করে তাকালেন তাঁদের দিকে। শেষে মাইকফ্‌ স্ত্রাখফ্‌কে নিয়ে বন্ধু ক'জন এলে ক্ষুন্ন মনে বেরিয়ে গেলেন হোটেলে। আন্নার অভাবে একটা আসন আর তাঁর মনের অনেকখানি শূন্য হয়ে থাকল। অবশ্য দুঃখ খানিকটা ঘুচল স্ত্রাখফের চৌকস আলোচনায়, বন্ধুরা সকলেই সেই আলোচনায় স্ত্রাখফ্‌কে সমর্থন করে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আলোচনার প্রসঙ্গ ছিল 'রসকি ভিসনিক'-এর 'পাপ ও শাস্তি'র এ-যাবৎ প্রকাশিত অংশ। তাঁর কঠিন তপঃলব্ধ উপন্যাসখানির প্রশংসা তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনলেন। মনটা অনেকখানি শান্ত হল। সেখান থেকে ফিরে এসে অনেক রাত অব্দি ও পরের দিন দুপুর পর্যন্ত 'জুয়াড়ী'র বিভিন্ন অংশ সংশোধন ও সংযোজনে ব্যস্ত থাকলেন তিনি; তারপরে ছুটলেন স্তেলফ্‌স্কির মুখের ওপরে পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে দস্তয়েফ্‌স্কিকে সারাজীবনের জন্যে কিনে নেওয়া কারো সাধ্য নয়।

স্তেলফ্‌স্কিও কী তা জানতেন না। জেনেই তিনি সপ্তাহখানেক আগে থেকেই পিতার্সবুর্গ থেকে হাওয়া। কেউ জানে না তিনি কোথায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

সেদিনটা মনে রাখার মতন। এমন কদর্য দিন সচরাচর হয় না। তছ্‌নছ্‌ করে হাওয়া বইছে, পৃথিবী অন্ধকার করে ঝরছে তুষার। বরফের কাদায় দুর্যোগের রাস্তা সপ্‌সপ্‌ করছে। তারই মধ্যে বেরিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। মোটা ওভারকোটটা গতকালই বাঁধা দিয়েছেন, পাতলা ওভারকোটে এ-ঠাণ্ডা ঠেকে না। তিনি টুপীটা কপাল অব্দি টেনে, কোটের কলারে কান অব্দি ঢেকে মাথা হেঁট করে দ্রুত হাঁটছেন। বাজারের বই-পাড়ায় স্তেলফ্‌স্কির অফিস অনেক দূর। তবু একটা ছেকড়া-গাড়ি ধরতে ভরসা পেলেন না, এই দুর্যোগের মওকায় গাড়োয়ানরা যা-খুশী ভাড়া দাবি করে বসতে পারে, কিন্তু সে-দাবি মেটানোর রেস্ত তাঁর নেই। তাই এই দুর্যোগ মাথায় করেই তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে।

একটা পুরনো বাড়ির একতলায় অফিস। দস্তয়েফ্‌স্কি এসে কাউণ্টারে দাঁড়াতেই কাউণ্টারের ও-দিক থেকে একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কাকে চাই?'

'আমি এই ম্যানাসক্রিপটা স্তেলফ্‌স্কিকে দিতে এসেছি। আজ এটা তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার কথা।'

'কিন্তু তিনি ত এখানে নেই।'

'অথচ এটা যে আজই তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার শেষ দিন।'

'আমাকে এ-কথা বলে কোন লাভ নেই। আসছে হপ্তায় আসুন। মিস্টার স্তেলফ্‌স্কি এক হপ্তার জন্যে বাইরে গেছেন।'

'বেশ ত, তার হয়ে আপনি রাখুন, রেখে একটা রসিদ দিন।'

'আমি ম্যানাসক্রিপট রাখতে পারি নে। আমার ওপরে ম্যানাসক্রিপট রাখার হুকুম নেই।'

'কিন্তু এটা অন্য ব্যাপার, লিখিত শর্ত মতন আজ এটা স্তেলফ্‌স্কির হাতে দিতেই হবে।'

কিন্তু কর্মচারীটির সেই এক কথা, 'আপনি দয়া করে আসছে হপ্তায় আসুন।'

'আসছে হপ্তা কী বলছেন মশাই', দস্তয়েফ্‌স্কি চিৎকার করে উঠলেন, আগামী কাল আসলেও চলবে না। এ-ম্যানাসক্রিপট আজই আপনাকে রাখতে হবে, রেখে একটা রসিদ দিতে হবে।'

লোকটা এবার ক্ষেপে উঠল, 'না, রাখব না, আপনি যান, আপনাকে আমি চিনি না।'

'বটে ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসানোর মতলব?'

'আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই, এত চেঁচাচ্ছেন কেন? বেরিয়ে যান এখান থেকে।' গাট্টাগোট্টা একটা লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

'বুঝতে পেরেছি, স্তেলফ্‌স্কি, আঁটঘাট বেঁধেই পালিয়েছেন। তাঁর পরামর্শেই তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আচ্ছা দেখে নেব।"

রাগে তড়পাতে তড়পাতে দস্তয়েফ্‌স্কি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। কিন্তু কী করবেন কোথায় যাবেন বুঝতে পারলেন না। মনে মনে কেবল চিৎকার করতে থাকলেন, 'শয়তান, শয়তান, তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলে দূরে বসে মজা দেখছ!' কিন্তু এর প্রতিকার কী, কী হলে তিনি রক্ষা পাবেন বুঝে উঠতে না পেরে দ্রুত পায় সামনের দিকে হেঁটে চললেন, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন কিছুই তাঁর বোধের মধ্যে নেই। মারখাওয়া কুকুর যে-ভাবে ছোটে তিনি প্রাণপণে ছুটছেন তখন। শেষমেশ এক জায়গায় এসে তাঁকে থামতে হল। এখানে রাস্তাটা ডাইনে বাঁয়ে দু'ভাগ হয়ে চলে গেছে। এখন তাঁকে চিন্তা করতে হবে কোন্ দিকে যাবেন, কেন যাবেন; কিন্তু এ দু'টো প্রশ্নের উত্তরই তাঁর অজ্ঞাত। তাই বেকুবের মতন চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সেই তখন চোখে পড়ল থানা, সামনে থানা, হঠাৎ মনে হল এই বেইমানির জন্যে

পুলিশ কী কিছু করবে না, শয়তানকে তবে কে শায়েস্তা করবে? তিনি থানায় এসে ঢুকলেন। থানা-অফিসারকে স্তেলফ্‌স্কির চক্রান্তের কথা বুঝিয়ে বললেন সব। থানা-অফিসার তাঁর বিবর্ণ মুখ দেখে আর বিপন্ন অবস্থার কথা শুনে হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপি নিলেন, আর একটা রসিদ লিখে দিলেন তাঁকে। বললেন, 'যান, এবার নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। আমরা সাক্ষী দেব আপনি যথাসময়ে আমাদের হাতে ম্যানাসক্রিপট জমা দিয়েছেন।' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। মলিন আকাশ, দুরন্ত বাতাস আর অফুরন্ত তুষার-বর্ষণের মধ্যেও যে পথ-হাঁটতে এত আনন্দ, দস্তয়েফ্‌স্কির জানা ছিল না।

এক নবেম্বরের সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা তিন তারিখে আন্নার বাড়িতে বসে বেশ জমিয়ে গল্প করলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। বৈঠকী গল্পে দয়েফ্‌স্কির দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সকলে উৎকর্ণ হয়ে তাঁর গল্প শুনল। নানা গল্পে অনেকক্ষণ মুগ্ধ করে রাখলেন তিনি সবাইকে। সবাই বলতে আন্নারা দু'বোন এক ভাই ও মা। ছোট্ট পরিবার—ভদ্র শান্ত অমায়িক—পরিবেশটি বেশ ভাল লাগল তাঁর। উঠতে ইচ্ছে যাচ্ছিল না তবু উঠতে হল। উঠবার আগে আর একবার আন্নার কাছ থেকে কথা আদায় করলেন 'পাপ ও শাস্তি'র অবশিষ্টাংশের ডিকটেশন নেবেন আন্না। এখন তিনি আন্নার মায়ের অনুমতিও চাইলেন। আন্নার আপত্তি না থাকলে তিনি অমত করবেন কেন? মাথা কাত করে তিনি হাসলেন কেবল। প্রফুল্ল মনে দস্তয়েফ্‌স্কি বেরিয়ে এলেন আন্নার বাড়ি থেকে; কিন্তু কিছু দূর এসে থমকে দাঁড়ালেন; তাই ত, আন্না ডিকটেশন নিতে আসবে বলল বটে কিন্তু কবে আসবে তারিখ ত বলল না। অথচ তক্ষুনি আবার ফিরে যেতে লজ্জা করল তাঁর। অগত্যা বাড়ি ফিরে এলেন। মনের মধ্যে সেই থেকে একটা অশান্তি ছট্‌ফট্ করছিল। দু'দিন কোন কাজেই মন বসাতে পারলেন না। মনে হল একমাসেই ডিকটেশন দেওয়াটা এমন রফ্‌ত হয়ে গেছে যে, আর এক লাইনও বুঝি কোনদিন তিনি নিজে হাতে লিখতে পারবেন না। পারবেন না ত পারলেনই না। কাগজ কলম ছুঁড়ে ফেলে আবার এক সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলেন। দু'দিন যেতে না যেতে মানুষটিকে বিনা নিমন্ত্রণে আবার হাজির হতে দেখে সবাই অবাক হল বটে কিন্তু তাই বলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না। দস্তয়েফ্‌স্কি এবার আন্নার কাছ থেকে তারিখ আদায় করে আনলেন। "আজ ছ' তারিখ। কাল সাত। না কাল না। কাল আমার এক ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। পরশু থেকে।

পরশু আট তারিখ থেকে আমি যাব।" আন্না কথা দিলে তিনি খুশী হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে সেই রাতেই তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটার অর্থ খুঁজে না পেয়ে দুর্বল স্নায়ুর মানুষটি ধৈর্য হারিয়ে বসলেন। লেখাপড়া শিকেয় উঠল। তিনি কেবল পায়চারি করতে থাকলেন। আট তারিখ সকালবেলা তাঁর ধৈর্য আর বাঁধ মানছিল না। একবার সিঁড়ির গোড়া অব্দি যান আর একবার ঘরে আসেন, জুতোর শব্দ শুনলে কান খাড়া করেন। এই করে বেলা বারোটা বাজলে আন্না এসে হাজির হল।

'এতক্ষণে এলে তা হলে, এস এস।' দস্তয়েফ্‌স্কি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন। পড়ার ঘরে নিয়ে এসে নিজে হাতে তাঁর কোট খুলে নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে দিলেন। আন্না অবাক চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তাঁকে। তিনি এসে আবার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন তাঁকে চেয়ারে।

চেয়ারে বসে আন্না শুধোলেন, 'কী হয়েছে বলুন ত, ব্যাপার কী?'

'কিছু না, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে এ-ই মাত্র।'

'না, আরও কিছু আছে, অন্য ব্যাপার কিছু, শুধু আমাকে দেখে আনন্দে আপনি এমন করছেন? কক্‌খনো না। বলুন না, কী ব্যাপার?'

দস্তয়েফ্‌স্কি হাসলেন, 'ব্যাপার যদি বল সে অতিশয় তুচ্ছ।'

'বেশ তুচ্ছ ব্যাপাটাই শুনি।'

'শুনে ঠোঁট বাঁকিও না কিন্তু। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। জান, আমি যা স্বপ্নে দেখি তা সত্যি হয়, খানিকটা দৈববাণীর মতন। আসলে ওই স্বপ্নের কথাটা তোমাকে বলব বলেই ছট্‌ফট্‌ করছিলাম।'

'বলুন শুনি।' আন্না চোখভরে কৌতূহল নিয়ে তাকালেন।

'ওই যে গোলাপ কাঠের বাক্সটা দেখছ', তিনি আঙুল বাড়িয়ে একটা বাক্স দেখালেন, 'আমার সাইবেরিয়ার জেল-জীবনের বন্ধু ভেলিখানফ্‌ ওটা আমাকে উপহার দিয়েছিল। ওটা আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ। ওর মধ্যে আমি আমার যাবতীয় লেখাপত্তর ডায়েরি মেনাসক্রিপট রাখি। তা ছাড়া থাকে বন্ধুদের চিঠি আর আমার বিশেষ প্রিয় কিছু টুকিটাকি জিনিস। স্বপ্নে আমি ওই বাক্সটা খুলে কাগজ-পত্র ঘাটাঘাটি করছি হঠাৎ নক্ষত্রের মতন উজ্জ্বল ছোট্ট একটি বস্তু আমার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। আবার তক্ষুনি হারিয়ে গেল। আবার, আবার—বারে বারে সে কাগজপত্রের ফাঁকে ফাঁকে

তারার মতন ফুটে উঠে মিলেয়ে যায়, যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তখন একে একে সব কাগজ আমি তুলে ফেললাম। তখন আর লুকোবে কোথায়? মুঠোর মধ্যে ধরে ফেললাম।'

'আকাশের তারা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন?'

'তারা নয় তারার মতন জ্যোতির্ময় ছোট্ট একটি হীরে।'

'কী করলেন ওটা নিয়ে?'

'স্বপ্নের সেইটেই হল দুর্ভাগ্যের ভাগ। হীরেটাকে নিয়ে কী যে করলাম, মনে করতে পারছি নে। অন্য স্বপ্ন এসে সব এলোমেলো করে দিলে।'

'লোকে কিন্তু স্বপ্নকে উলটো দিক থেকে বিচার করে, বলে, ভাল দেখলে মন্দ ফল দেয়।'

'উহুঁ আমার বিশ্বাস এটা খুব শুভ-স্বপ্ন, সৌভাগ্যের ইঙ্গিত।' বলেই মন খারাপ করে ফেললেন দস্তয়েফ্‌স্কি, 'কিন্তু তুমি বলছ, মন্দ ফল দেবে, ভাল কিছু ঘটবে না? একটা মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখলাম কেবল?'

দস্তয়েফ্‌স্কিকে বিমর্ষ হতে দেখে আন্না বিব্রত বোধ করলেন, 'ওটা আমার শোনা কথা, আসল কথা আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে জানি নে, তা ছাড়া স্বপ্নে আমি বিশ্বাসও করি নে।'

'তুমি স্বপ্ন দেখ না?'

'দেখি বৈকি।' আন্না হেসে উঠলেন, বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার স্কুলের হেড মিস্ট্রেস এসে আমার স্বপ্নে উদয় হন। সেকেলে পোশাক পরা রাশভারি মানুষটি আমাকে গাল-ভরা বক্তৃতা শোনান। আর মাঝে মধ্যে স্বপ্নে দেখি একটা হলুদ বেড়াল। একবার একটা বেড়াল আমাদের বেড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল আমার গায়ে। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। সেই ভয়ই হলুদ বেড়াল হয়ে স্বপ্নে এসে হাজির হয় মাঝে মাঝে।'

'তুমি একটি খুকি, ছোট্ট খুকি তুমি।' দস্তয়েফ্‌স্কি হেসে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারে গিয়েছিলে কাল?'

'গিয়েছিলাম না আবার।' আন্না খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন, 'খুব চমৎকার কাটল কালকের দিনটা, দারুণ খাওয়া দাওয়া হল, তারপর জমিয়ে আড্ডা। য়ুনিভারসিটির ছাত্র ছিল দু'জন, যা গল্প করতে পারে না, হাসিয়ে মারছিল কেবল।'

'তাই বুঝি!' দস্তয়েফ্‌স্কির মুখখানা বিবর্ণ ও গম্ভীর হয়ে উঠল

আন্না তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনি কী করছিলেন সারাদিন? কোথাও আড্ডা দিতে যান নি? একটা উপন্যাস শেষ করে নিশ্চয় নির্ভার হয়ে গল্পগুজব করে বেড়াচ্ছেন।'

'মোটেই না। দস্তয়েফ্‌স্কি নড়েচড়ে বসলেন, 'বরং অবসর পেয়ে বেশ একটা জমাটি গল্পের প্লট তৈরি করে ফেলেছি।'

'বটে, নূতন গল্প! বলুন না প্লটটা কী? দস্তয়েফ্‌স্কিকে খুশী করতে আন্না অতিরিক্ত আগ্রহে সামনে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিলেন।'

'দস্তয়েফ্‌স্কি কিঞ্চিৎ সংকুচিত হয়ে গিয়ে বললেন, গল্প ত বলব কিন্তু শেষটা কী হবে এখনও যে বুঝে উঠতে পারছি নে। মসকোআয় হলে আমার ভাগ্নী সোনেচকার পরামর্শ চাইতাম. এখন ভাবছি তোমার সাহায্য নেব।'

আন্না মনে মনে দারুণ অহংকার বোধ করলেন, একজন বিখ্যাত লেখক গল্পের জট ছাড়াতে তাঁর সাহায্য নিচ্ছেন, চাট্টিখানি কথা নয়।

'আপনার উপন্যাসের নায়কটি কে, কী করে সে?' আন্না গোড়া থেকেই গল্পের মধ্যে চলে যেতে চাইলেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি হেসে বললেন, 'একজন ছবি আঁকিয়ে, না, তরুণ চিত্র-শিল্পী নয়, বয়স্ক মানুষ, এই ধর আমার বয়েসী।'

'বলুন শুনি কাহিনীটা।' কৌতূহলে ফেটে পড়লেন আন্না।

দস্তয়েফ্‌স্কি তখন তাঁর মতলবটাকে গল্পের আদলে ফেলতে লাগলেন। নিজেকে গল্পের আড়ালে সযত্নে গোপন রেখে এগোতে লাগলেন তিনি। বললেন, 'শিল্পী একজন অকালবৃদ্ধ মানুষ, একটা হাত তার অবশ হয়ে গেছে, সে-যন্ত্রণায় নিদারুণ ভুগছে সে। আর ভুগে ভুগে হয়ে উঠেছে মনমরা আর সন্দেহবাতিক। কিন্তু তার শিল্পিমনটি খুবই নরম ও অনুভূতি-প্রবণই থেকে গেছে। মনের সেই নরম সুন্দর অনুভবকে সে প্রকাশ করতে পারছে না সেই হয়েছে তার জ্বালা, তার আর এক জ্বালা তার ব্যর্থতা। যে-ভাবরূপকে সে রংয়ে রেখায় মূর্ত করতে চায়, যেমন করে চায় তা কিছুতেই পেরে ওঠে না, কল্পনা ক্যানভাসে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না। ফলত, সে কেবল সেই অক্ষমতার যন্ত্রণাই নিরবধি পায়, কষ্ট পায় আর খিটখিটে হয়ে ওঠে। অথচ মানুষটি কিন্তু আসলে সহৃদয় অমায়িক মিশুক···।'

দস্তয়েফ্‌স্কি নিজেকে যতই গোপন করুন গল্পের মধ্যে, আন্নার বুঝতে বাকি থাকে না এ তাঁরই জীবনের অতীত দিনের কথা। যে-কথাগুলি তিনি 'জুয়াড়ী'

লেখার ফাঁকে ফাঁকে ছিটেফোঁটা করে বলেছেন তাঁকে এখন তাই সুশৃংখল সংবদ্ধ গল্প হয়ে উঠেছে তাঁর মুখে। নিজের জীবনটাকে অন্যের গল্প করে তোলার অসাধারণ দক্ষতা মানুষটির। আন্না মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন···শৈশবে মা বাবা হারানো, পাঁচজনের অবহেলা, অর্থাভাব, ঋণ, সৃষ্টির ব্যর্থতা ইত্যাদি শুনতে শুনতে আন্নার মুখখানি করুণ হ'য়ে উঠল। বললেন, 'আপনি আপনার নায়কের ওপরে এমন অকরুণ হয়ে উঠেছেন কেন?' আন্নার মনে হল যেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর অতীতদিনের কষ্টটাকে বড় বেশী বাড়িয়ে দেখছেন।

'তোমার বুঝি নায়ককে ভাল লাগছে না?'

'বরং উলটো, ভীষণ ভাল লাগছে। এত দুঃখ কষ্টে অন্য মানুষ দারুণ অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, গোটা মানুষজাতের ওপরে তার বিদ্বেষের অবধি থাকে না; কিন্তু আপনার নায়ক এখনও মানুষের ওপরে বিশ্বাস রাখে, এখনও সে মানুষকে ভালবাসে, সাধ্যমত তাদের উপকারে লাগতে চেষ্টা করে। অথচ বুঝতে পারি নে নায়কের ওপরে কেন যেন আপনার খুব রাগ, কেবল অবিচার করছেন তার ওপরে। এটা সত্যি বড় আপসোসের কথা।'

'না না, রাগ নয় আমি শুধু বলতে চাইছি প্রতিকূল পৃথিবীর নিষ্ঠুর অবিচারের মধ্যে থেকেও মানুষটি এখনও তার মনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, এখনও সে উদার স্নেহপ্রবণ, এখনও তার ভালবাসার শক্তি বজায় আছে।'

দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর গল্প বানিয়ে চলেছেন, চলতে চলতে শেষমেশ এসে পৌঁছলেন সেই সংকটের জায়গায় যেখানে গল্প ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় থেমে গেছে। দস্তয়েফ্‌স্কি আন্নার মুখের ওপরে চোখ পেতে বললেন, 'নায়কের জীবনে একটি যুবতী এসে উপস্থিত হয়েছে। যুবতী তোমারই বয়সী কিংবা দু'এক বছরের বড়। তার ডাকনামও আমি ভেবেছি রাখব আন্না। নামটি বড্ড মিষ্টি।'

আন্না করভিত-ক্রুকফ্‌স্কায়া মনে মনে নামটি সম্পূর্ণ করলেন আন্না গ্রিগোরিয়েভনা। কেন না দস্তয়েফ্‌স্কির মুখেই শুনেছেন সম্প্রতি তার কাছ থেকে তিনি একটি চিঠি পেয়েছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজী হয় নি অথচ সে নাকি নিজে মুখে স্বীকার করেছে দস্তয়েফ্‌স্কিকে সে এখনও ভালবাসে অতএব এ-নায়িকা আন্না করভিন-ক্রুকফ্‌স্কায়া ছাড়া আবার কে!

'আমার গল্পের নায়িকা', 'দস্তয়েফ্‌স্কি গল্প নিয়ে এগোচ্ছেন, 'কিন্তু নায়কের থেকে একেবারে আলাদা প্রকৃতির। শুধু বয়েসে কম নয়, কম-বয়সের

প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর অথচ শান্ত নম্র বুদ্ধিমতী। বেশ সহৃদয়ও বটে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশাতেও বেশ সপ্রতিভ ও চতুর।

'আর খুব সুন্দরীও নিশ্চয়।' আন্না মুচকি হেসে যোগ দিলেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আমার নায়িকা সুন্দরীর দলে পড়ে না। তাই বলে মিয়োনো চেহারাও নয় তার, ত্বকে যৌবনের লাবণ্য আছে। মুখখানিও মিষ্টি।'

'বড্ড বেশী রং চড়িয়ে আঁকছেন আপনার নায়িকাকে।' আন্না হাসলেন।

'উঁহু আমার চেনা মানুষ, আমি তাকে ভাল করে জেনে শুনেই নায়িকা করেছি। জানই ত আমার সব উপন্যাসের নায়ক নায়িকা আমার চেনামহলের লোক। অচেনা কাউকে নিয়ে আমি গল্প তৈরি করতে পারি নে। যাক, গল্পটা শোন, আমার আরটিস্ট নায়ক শিল্পিমহলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, জমায়েতে, মজলিসে নায়িকার সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পাচ্ছিল। আর যতই মেলামেশা করছিল ততই ভালবাসছিল আর যত ভালবাসছিল ততই তার প্রত্যয় দৃঢ় হচ্ছিল যে, এই মেয়েকে পেলে সে সুখী হবে; কিন্তু নিজের বয়েস আর অক্ষমতার কথা ভেবে কেবলই নিরাশ হয়ে যাচ্ছিল। বস্তুত নিরাশ না হয়েই বা কী উপায় ছিল—সে বয়স্ক, সে রুগ্ন, ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন কী দিতে পারবে সে ওই উচ্ছল প্রাণবন্ত তরুণীকে? তরুণী যদি তাকে ভালবাসা দেয় সে কী তার পক্ষে ত্যাগস্বীকার হবে না? বিয়ের পরে তরুণী কী হতাশায় ভেঙে পড়বে না? রুগ্ন ঋণগ্রস্ত বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়েছে বলে অনুশোচনা করবে না? তা ছাড়া ভালবাসতেই বা যাবে কেন তাকে ওই বয়েসের মেয়ে, এমন অসমবয়েসী ভালবাসাও কী কখনো হয়? মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা অসম্ভব নাকি? তুমি কী বল, তোমার মতটা আমি জানতে চাই।'

'আমার মতে অসম্ভব নয়। বরং আমার বিশ্বাস এটাই বাস্তব। কেন না আপনার বর্ণনার নায়িকাকে ত মাথামোটা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে না, ভালবাসার অভিনয় করছে সে। বরং দেখা যাচ্ছে তার একটা সহানুভূতির মন রয়েছে, ভালবাসায় সাড়া দিতেও জানে সে, ত কেন সে আপনার শিল্পীর প্রেম উপেক্ষা করবে? সে গরীব সে রুগ্ন, তাই? হোক না, তাতে কী, টাকা থাকলেই আর অসীম স্বাস্থ্য থাকলেই ভালবাসবে নইলে ভালবাসবে না এমন কোন মাথার দিব্যি আছে নাকি, ভালবাসা কী কোন শর্ত নাকি? আর ত্যাগস্বীকারেরই বা কথা আসে কিসে? মেয়েটি যদি তাকে সত্যিকার

ভালবেসে থেকে সে নিশ্চয় সুখী হবে, কোন দিনই তার মনে আপসোস জাগবে না। আসলে ভালবাসা ত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার, নিজের সব কিছু বিলীন করে দেওয়ার সুখ। সে-সুখ থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করবে কে?'

যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমনই বিচলিত গলায় দস্তয়েফ্‌স্কি শুধোলেন, 'তুমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর, তুমি যা বললে? তারপর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কয়েক পলক চুপ করে থাকলেন শেষে মরিয়া হয়ে বললেন, 'আচ্ছা তার জায়গায় নিজেকে কল্পনা কর ত,' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল তাঁর তবু থামলেন না, বলে চললেন, 'ধর আমিই সেই আরটিস্ট, আর তুমি সেই নায়িকা, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমার স্ত্রী হতে বলছি তোমাকে, বল তোমার কী উত্তর হবে এখন।'

রুদ্ধশ্বাসে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করে ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়লেন তিনি, তাঁর মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল।

আন্না তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, "এতক্ষণে আমার সংশয় সত্য হল, এতক্ষণে তিনি গল্পের আড়ালে যে-কথা গোপন রেখেছিলেন এবার সরাসরি তা উপস্থিত করলেন! আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে থাকলাম। অনুভব করলাম, এখন যদি আমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাই কী অন্যরকম কিছু বলি ওঁর আত্মমর্যাদায় ভয়ানক আঘাত করা হবে সুতরাং তখন ও সেই মুহূর্তে আমি আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে ফেললাম, নিঃশ্বাসের স্বরে বললাম, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে সারাজীবন ভালবাসব।......'

দু'জনে মুখোমুখি গভীর সুখেসুখী সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি পার হয়ে আসতে দু'জনেরই অনেক্ষণ সময় লাগল। তারপর ঠিক হল পরের দিন দস্তয়েফ্‌স্কি যাবেন আন্নার বাড়ি এবং সন্ধ্যাটা সেখানেই কাটাবেন। আসলে প্রস্তাবটা পাড়বেন তিনি আন্নার মায়ের কাছে।

দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে ফেরার সময় দস্তয়েফ্‌স্কি বললেন, 'আন্না, এখন আমি বলতে পারি আমার স্বপ্নের সেই হীরেটি কোথায়!'

'কী, তোমার স্বপ্নের শেষটুকু মনে পড়েছে নাকি?'

'উহুঁ, কিন্তু আমি শেষ অব্দি হীরেটিকে হাতে করতে পেরেছি, এখন থেকে সারাজীবন ওটিকে আমি যত্ন করে ধারণ করে থাকব।'

আন্না খিলখিল করে হেসে উঠলেন, 'তা হলে বলি শোন, আমায় যদি তুমি ওই হীরের টুকরো মনে করে থাকো ত মহা ভুল করেছ, আমি হীরের টুকরো নই, তুচ্ছ একটি পাথর কুচিমাত্র।'

'যাই বল, আমি জানি, এবারে আর আমি ভুল করি নি।'

তিন

না এবারে আর তিনি ভুল করেন নি। অবশ্য গোড়ায় সংশয় ছিল—বয়েসের ব্যবধান দাম্পত্য জীবনে না কোন বিপর্যয় আনে। কিন্তু আন্না বলেছিলেন, 'আমার বয়েসটাকে ভয় করো না। দেখো আমিও দেখতে দেখতে বুড়ি হয়ে যাব।'

কিন্তু তা কি হতে পারে কেউ! কুড়িতেই কেউ বুড়ি হয় না, পঁচিশে তিরিশেও না। কিন্তু আন্না তাঁর পোশাকে-আসাকে কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে এমনই রাসভারী হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁদের বয়েসের ব্যবধানটা কিছু দিন পরে আর কারো নজরে পড়ত না।

কিন্তু কিছু দিনের হলেও সেই ইতিহাসটা কম দীর্ঘ আর কম মর্মান্তিক নয়। অল্প বয়েসের সুকুমার মনটাকে নিয়ে অনেক বিনিদ্র-রাতের একলা-বিছানায় চোখের জল ঢালতে হয়েছে, দুঃখের তুষের আগুনে ধিকি ধিকি পুড়তে হয়েছে অনেক দিন। বিয়ের আগেই শুরু হয়েছিল বিচ্ছেদের ষড়যন্ত্র।

দস্তয়েফ্স্কি ও আন্না পরামর্শ করেছিলেন, বিয়ের খবরটা তাঁরা এখন চেপে যাবেন। সেই বিয়ের দিন কি দু'দিন আগে খবরটা জানাবেন সবাইকে; কিন্তু তবু কেমন করে যেন দস্তয়েফ্স্কি-পরিবারের সবাই জেনে গেল খবরটা। পাশাই এল সবাইর আগে কৈফিয়ৎ তলব করতে: 'বাবা, এ কী কাণ্ড শুনছি, তোমার কী এখনো বিয়ের বয়েস আছে, নাকি সেই স্বাস্থ্য আছে তোমার, তাও কিনা বিয়ে করতে যাচ্ছ তোমার বয়েসের আদ্দেক ওই পুঁচকে মেয়েটাকে!'

ছেলের ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি, কিছুক্ষণ তিনি কথা বলতে পারলেন না, চুপ-চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কেবল, যেন ওর কথাগুলির কোন মানে খুঁজে পাচ্ছিলেন না অথবা উত্তর। ছেলে কিন্তু তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, বললে, 'বাবা, তুমি কী তোমার দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে গেছ? আমি রয়েছি, জ্যাঠাইমা রয়েছে, তার ছেলে-মেয়েরা আছে, তুমি আমাদের খরচ চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ, নূতন সংসার পাতলে তোমার কী দশা হবে ভেবেছ?'

দস্তয়েফ্স্কি প্রায় শেষ রাত অব্দি 'পাপ ও শাস্তি'র খসড়া নিয়ে কাটিয়েছেন। তারপর যদি বা একটু শুয়েছিলেন ঘুম আসে নি, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল, সে-তন্দ্রা ভেঙে যেতে তিনি এই সবে উঠে বসেছেন। অন্য সময় হলে তিনি কী

বলতেন কে জানে, এখন তাঁর মাথায় খুন চেপে গেল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এক্ষুনি তুমি আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও।'

পাশার আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার কী, বলার কথা তার বলা হয়ে গেছে, সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দস্তয়েফ্‌স্কিও বসে পড়লেন; কিন্তু বসে থাকতে পারলেন না, চেয়ার থেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। রোগটা যদি হয় মৃগী ত এত বড় আঘাতের পরে আর তার সুস্থ থাকার কথা নয়। একদিন অচৈতন্য থাকার পর তিন দিন আর তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। তারপরেও যে তিনি রেহাই পেলেন তাও না।…

নবেম্বরের সন্ধ্যাগুলি তিনি আন্নার বাড়িতেই কাটাতেন রোজ। শেষ নবেম্বরের ভয়ংকর শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সেদিনও তিনি গিয়ে উঠলেন তাঁর বাড়িতে। অতটা পথ পিতার্সবুর্গের শূন্য ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই শীতে হাঁটতে হাঁটতে পথেই তাঁর হাড় অব্দি হিম হয়ে গিয়েছিল। তিনি আগুনের সামনে থপ্‌ করে বসে পড়ে বলে উঠলেন, 'আন্না শিগগির একগ্লাস ব্রাণ্ডি দাও।'

ব্রাণ্ডি না, আন্না এক বোতল শেরী আর একটা গ্লাস এনে সামনে রাখলেন। পর পর তিন গ্লাস শেরী আর ফুটন্ত দু'গ্লাস চা খেয়ে তবে একটু চাঙা হলেন তিনি।

আন্নার মুখে রা নেই। আতঙ্কিত দুই বড় বড় চোখ মেলে তিনি নিঃশব্দে দেখছিলেন তাঁকে। তার নিরক্ত হলুদ মুখে এতক্ষণে একটু রক্তের আভা দেখে এইবার কথা বলার শক্তি পেলেন, 'এই সাংঘাতিক শীতে তুমি একটা পাতলা কোট গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন, তোমার ফারের অলস্টার গেল কোথায়, এই না সেদিন বন্ধকীর দোকান থেকে কোটটা ছাড়িয়ে আনলে তুমি?'

শুনে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন তিনি তারপর যা বললেন তার সারমর্ম হল: সকাল বেলা এমিলা ফিওদরোভনা এসেছিল। বিয়ের প্রসঙ্গ তুলে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করার পরে চেয়ে বসল পঞ্চাশ রুবল। ছেলে পাশাও ছিল সঙ্গে, তারও বায়না তখনই তাকে কিছু টাকা দিতেই হবে। তাদের সঙ্গে একটু পরে এসে জুটল তাঁর মাতাল ভাই নিকোলাই—সব্বাইকেই সেই মুহূর্তে টাকা দিতে হবে। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কির হাতে যে তখন একটা কানা-কড়িও নেই সে কেউ বিশ্বাস করতে চাইলে না। যে-মানুষ আজ বাদে কাল বিয়ে করতে যাচ্ছে তার হাতে টাকা নেই এ নাকি বোকায়ও বিশ্বাস করে না।

শেষে যখন সত্যি তারা বুঝল তাঁর হাতে টাকা নেই—ওই ফারের অলস্টারটা নিয়ে গেল। ওই অলস্টারটা বেচে যা হয় ওরা ভাগযোগ করে নেবে। নেওয়ার সময় বলে গেল, মসকোআয় যাও, 'পাপ ও শাস্তি' বাবদ এখনো শেষ কিস্তি পাওনা তোমার। ওই টাকা আদায় করে নূতন একটা ফার কোট কিনে নিও। তার আগে অব্দি এই পাতলা অটাম-কোটটাতে শীত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

'অমানুষ, পাষণ্ড।' দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন আন্না। দস্তয়েফ্স্কি-পরিবারের মানুষদের ওপরে এই যে তার মন বিষিয়ে উঠল এ-বিষ আর কোনদিন ধুয়ে মুছে গেল না। বরং তিক্ততা আরও বেড়েছে, দিন দিন বেড়েছে ঘৃণা। আন্না কোনদিন তাদের কাউকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

দস্তয়েফ্স্কির কথা শুনে আন্নার মা যেন সাহস পেলেন, তাঁর মনের কথাটা বলে ফেললেন এবার, 'কিন্তু এমন দরিদ্র-অবস্থায় বিয়ে করা কী তোমার ঠিক হচ্ছে?'

'মা তুমিও ওদের দলে?' চিৎকার করে উঠলেন আন্না, 'দেখতে পাচ্ছ, এই অসহায় মানুষটাকে সবাই মিলে কেবল শোষণ করতে চায়, এতটুকু স্নেহ দিতে চায় না কেউ। নিরাশ্রয় নিরবলম্ব মানুষটা যদি বা একটু আশ্রয়, একটু মমতার আশায় আমাদের কাছে ছুটে এল, তুমি তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ। না না ফিওদর মিখাইলোভিচ্, আমি আছি তোমার পাশে। চিরদিন তোমার পাশে, তোমার কাছে থাকব।'

দস্তয়েফ্স্কি যেন কোন অপরাধ করেছেন এমন গলায় বললেন, 'আমি দরিদ্র, অসুস্থ, প্রৌঢ়, আন্না তোমার যৌবন, তোমার দীর্ঘ জীবনের কথা ভেবে দেখ, তোমার সুকুমার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে দেখ, আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারব না; আমার কাছে এলে তোমার কোন সাধ-আহ্লাদই পূর্ণ হবে না। তোমার মা ঠিকই বলেছেন।'

'তুমি থাম ফিওদর, তোমার কী আছে, কী নেই আমি জানি, আমি জেনে শুনেই তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার মন বলছে, তুমি একদিন রাশিয়ার সাহিত্যে, না, সারা দুনিয়ার সাহিত্যে সূর্য হয়ে জ্বলবে চিরকাল; তোমার জ্যোতি কোনদিন মলিন হবে না। আমার এ-বিশ্বাস যদি সত্যি নাও হয়, এটা ঠিক জেনো, তুমি আমার আকাশে সূর্য হয়ে থাকবে আজীবন।

আন্নার সেই উৎসাহই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে ছিল অসহায় অবসন্ন দুঃস্থ

মানুষটির মনে। আন্নার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্যেই ভগ্নমনোরথ মানুষটি 'পাপ ও শাস্তি'-র শেষ দুই পর্ব দ্রুত শেষ করে ফেলতে পেরেছিলেন। ১৮৬৬-র নবেম্বর ও ডিসেম্বরের দুই সংখ্যায় 'পাপ ও শাস্তি'-র দুই পর্ব বেরিয়ে গেলে, খৃষ্টমাসের সময় কাৎকফের সঙ্গে দেখা করতে মস্কোআয় গেলেন দস্তয়েফ্‌স্কি।

'রসকি ভিসনিক'-এ 'পাপ ও শাস্তি' ধারাবাহিক বেরনো বাবদ সম্পাদক কাৎকফের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন কিস্তিতে চার হাজার রুবল পেয়েছিলেন। চার হাজার সেদিন চাট্টিখানিক কথা নয়। বিশেষ করে দস্তয়েফ্‌স্কির মতন মানুষের পক্ষে। কিন্তু নিজের জন্যে তিনি তার থেকে কিছুই রাখতে পারেন নি। দাদার পাওনাদাররা হাত পেতেছে বারে বারে। কাৎকফ্‌ কখন তাঁকে টাকা দেবেন সেই ধান্ধাতেই যেন থাকত তারা। কাৎকফ্‌ টাকা পাঠালেই এসে হাজির হত। টাকা দিতে না চাইলে জেলে পুরবার ভয় দেখাত। অবশ্য তিনিও হুমকি দিতে ছাড়তেন না, 'আমাকে যদি ঋণের দায়ে জেলে ঠেলো আমিও লেখা বন্ধ করে বসে থাকব। আমার ত অন্য আর কোন সম্পত্তি নেই। আমি লিখলেই তোমাদের টাকা উশুল হবে অতএব হুঁশিয়ার।' তারাও হুঁশিয়ার বই কী, টাকা আদায়ের ভরসা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাঁকে জেলের বাইরে রাখার ইচ্ছেও তাদের আছে। যখন দেখবে আর টাকা আদায় হচ্ছে না, প্রতিশোধ নেবে তাঁকে ফাটকে আটকে। সে-মতলব তারা প্রকাশ্যেই কবুল করে রেখেছে।

কিন্তু শুধু পাওনা মিটিয়েই ত রেহাই নেই তাঁর। পাশাকে টাকা দিতে হবে, দাদার সংসারের চাকা চালু রাখতে হবে, তার ওপরে আছে ছন্নছাড়া মাতাল ভাইটা—তাকেও তিনি ফেলতে পারেন না। এই অসহায় ভাইটির প্রতি তাঁর অন্তরের দরদ ফুটে উঠেছে 'পাপ ও শাস্তি'-র মাতাল মারমেলাদফ্‌কে আঁকতে গিয়ে। নিকোলাইয়ের আদলেই তাকে এঁকেছেন তিনি। তার প্রতি তাঁর মমতা ও করুণা সবটুকু ঢেলে দিয়ে গড়েছেন তিনি মারমেলাদফ্‌কে। তাই ত মারমেলাদফ্‌ যখন মেয়ের বেশ্যাবৃত্তির পয়সায় আকণ্ঠ মদ গেলে তখন সে মানুষটিকে ঘৃণা করতে পারেন না পাঠক, করুণায় আর্দ্র হন।

দস্তয়েফ্‌স্কি কাৎকফের অফিসে এলে তিনি তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, স্বাভাবিক—কেন না তিনি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন, 'রস্‌কি ভিসনিক' নিয়ে এত-যে কাড়াকাড়ি সে-কেবল 'পাপ ও শাস্তি'র জন্যে। আজ আর তলসতয়, তুর্গেন্‌য়েফের নাম কেউ করে না। ওঁদের নাম যেন ভুলে গেছে। আজ

কেবল লোকের মুখে মুখে দস্তয়েফ্স্কির নাম, তাঁর 'পাপ ও শাস্তি'-র প্রশংসা। ১৮৬৬-র গোটা বছর জুড়ে শুধু এটাই দেখে আসছেন কাৎকফ্। স্বতস্ফূর্ত উৎসাহে সে কথাই শোনালেন তিনি। দস্তয়েফ্স্কিও যে জানতেন না তা নয়। তবু সম্পাদকের গলার স্বরে শোনা ভিন্ন ব্যাপার, আরও গৌরবের ব্যাপার। আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল দস্তয়েফ্স্কির মন। কাৎকফকে কায়দা করতে পেরেছেন জেনে অহংকার আরও বাড়ল তাঁর। সেই গর্বে গম্ভীর হয়ে দস্তয়েফ্স্কি এবার এই প্রথম সরকারী ভাবে ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর স্টেনোগ্রাফার আন্না গ্রিগোরয়েভনা স্নিৎকিনাকে বিয়ে করছেন শিগ্গিরই। এবং সে-বাবদে যে তাঁর এক্ষুনি কিছু টাকা দরকার সে-কথাটাও সঙ্গে জুড়ে দিলেন: তাঁর এখন ত্ব'হাজার রুবল চাই। প্রস্তাব রাখলেন টাকাটা এখন এ্যাডভান্স পেলে তাঁর কাগজে তিনি আর একটা উপন্যাস ধারাবাহিক চালাতে রাজী আছেন। প্রস্তাবটা কাৎকফ্ই রাখতেন, দস্তয়েফ্স্কির মুখে শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ লুফে নিলেন। ত্ব'হাজার রুবলের সাত শ' তখনই তুলে দিলেন তাঁর হাতে, বাকি টাকাটা অবিলম্বেই দেবেন কথা দিলেন।

দস্তয়েফ্স্কিকে লুঠ করবার জন্যে জুলুমবাজেরা সব ওৎ পেতেই ছিল কিন্তু এবারে দস্তয়েফ্স্কি কিঞ্চিৎ সংসার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারলেন। পাশা, এমিলা ও পাওনাদারদের মধ্যে মাত্র ত্ব'শ রুবল ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে পুরো পাঁচশ' রুবলই তুলে দিলেন আন্নার হাতে, 'নাও, এবার বিয়ের ব্যবস্থা কর।' বুদ্ধিমতী মেয়ে আর সবুর করলেন না। শুভ কাজ শীঘ্র শেষ করতে উঠেপড়ে লাগলেন। তবু কয়েকটা দিন নানা বাধায় দেরি হল। শেষমেশ ১৮৬৭-র ১৫ ফেবরুয়ারি সব বাধা উৎরে ক্রোইৎস্কির ক্যাথিড্র্যালে এলেন তাঁরা। কতিপয় বন্ধুর উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর পরিবেশে দস্তয়েফ্স্কির দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ সুসম্পন্ন হল।

অনেক আশার শান্তির নীড় বাঁধতে বিয়ে করেই তিনি উঠে এসেছিলেন নূতন ফ্ল্যাটে। কিন্তু যে নীড়ের তলায় সাপিনী কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে সে নীড়ের শান্তি বিষ নিঃশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, স্বাভাবিক। অথচ নিজের সুখের জন্যেই দস্তয়েফ্স্কি এমিলাকে সর্বাগ্রে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। পুরনো ফ্ল্যাটটা দিয়ে দিয়েছেন তাকে। তিনিই তার ভাড়া জোগাবেন, যেমন জোগাচ্ছেন তাদের খোরাক-পোশাক। কিন্তু পরের সুখ যাদের চোখের

বালি তারা সন্তুষ্ট হওয়ার মানুষ কি! পুরনো ফ্ল্যাট থেকে নূতন ফ্ল্যাটের দূরত্ব পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু পাঁচ মিনিটও বুঝি সেখানে থাকে না এমিলা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাত বারোটা অব্দি এ-বাড়িতেই তার আড্ডা। পাশা ও-বাড়ির গৃহস্থালীর কর্তা ছিল। এ-বাড়িতেও সে-ই কর্তা। আন্না আসার পরেও সে কর্তৃত্ব ছাড়ে নি। তাকের দিয়াশলাই থেকে ঘরের কোণের ঝাঁটাগাছটি অব্দি পাশার রাজত্ব। ঝি-চাকরকে হুকুম করার একতিয়ার পর্যন্ত নেই আন্নার। 'তুমি ছেলেমানুষ তুমি কী বোঝ', এই হল তাদের উক্তি। এমিলা আর পাশা—একজন ষড়যন্ত্র করে আর একজন মদৎ দেয়। তাদের চক্রান্তের ভিয়েন থেকে ক্রমাগত হিংসার বাষ্প উঠতে থাকে, দম বন্ধ হয়ে আসে আন্নার।

সেই বিষবাষ্পে রুদ্ধশ্বাস আন্না একদিন ক্ষোভে দুঃখে খেপেই উঠল। দস্তয়েফ্‌স্কি দিয়াশলাই খুঁজছিলেন। পকেটে দেরাজে তাকে কোত্থাও দিয়াশলাই নেই। বিষম বিরক্ত হয়ে তিনি যখন কাগজপত্র উলটে-পালটে তছনছ করছিলেন তখন অপরাধীর মতন শ্লথ পায় আন্না এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁকে দেখেই রেগে উঠলেন, 'এতক্ষণে আসতে পেরেছ, কখন চায়ের জন্যে বলেছি। কই, চা কই।'

আন্নার দু'চোখ ভরে জল তখন থৈ-থৈ করছে, আর্তনাদের গলায় বললেন, চিনি খুঁজে পাচ্ছিনে, চিনি বোধ হয় নেই।'

'কেন, সকালবেলা এক প্যাকেট চিনি আনা হল না? এর মধ্যে ফুরিয়ে ফেললে? দিনে দু' প্যাকেট চিনি খরচ করার পয়সা নেই আমার সে-কী তুমি জান না? এখনও যদি সংসার বেহিসেবে চলে ত তুমি আছ কেন, তুমি এসেছ কী করতে? দিয়াশলাই নেই, চিনি নেই, কী, আছে কী, শুনি? তুমি কী কেবল খাও আর আড্ডা মেরে সময় কাটাও? 'কী, কর কী তুমি?'

আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না পাশা, সে আন্নার হেনস্তা দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে আর দ্রুত পায়চারি করছে। আন্নাকে জব্দ করার মতলব যখন হাসিল হয়েছে তখন সে ঘরে ঢুকল।

'দিয়াশলাই নেই, চিনি নেই, কে বললে? সব আছে।' এক কোণ থেকে সে দিয়াশলাই বের করে দিল দস্তয়েফ্‌স্কির হাতে, বললে, কিচেনের সেলফে চিনিও রয়েছে এই মাত্র আমি দেখে এলাম। ওঁর কেবল বায়না সংসারের ভার তাঁর ওপরে দাও। দিয়ে ত আমি হাত গুটিয়ে বসেছি, অমনি

দেখ, কী বিশৃংখলা, উনি কিছু গুছিয়ে রাখতে পারবেন না কিন্তু গিন্নিপনা করবার ইচ্ছে ষোল আনা।'

'তুমি তুমি তুমি', হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন আন্না, 'তোমার ষড়যন্ত্র! আমাকে গাল খাওয়ানোর জন্যে, আমাকে অপদস্ত করার জন্যে তুমি এ-সব লুকিয়ে রেখেছিলে।'

'বটে, বাবাকে আমার শত্রু করে তোলার জন্যে তুমি নিজে সব লুকিয়ে রেখে এখন সাধু সাজছ? আমি জানিনে কিছু? কিছু দেখিনে ভাবছ? জেঠার ছেলে ওই তেইশ বছরের ছোড়াটা…'

'পাশা তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।' আন্না চিৎকার করে উঠেই হঠাৎ থেমে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে দ্রুত পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে। শোবার ঘরে খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। স্বামীর ওপরে অভিযোগ অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকল।—তুমি মানুষের মন নিয়ে মেজাজ নিয়ে নিগূঢ় সব অভিসন্ধির জটিল জটিল উপন্যাস লিখছ অথচ কাছের মানুষের মন বুঝছ না, এ কী আশ্চর্য অন্ধ তুমি। দেখতে পাচ্ছ না তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধাতে, বিচ্ছেদ ঘটাতে, সন্দেহের বীজ বুনে আমার জীবন নষ্ট করে দিতে তোমার দাদার বউ, তোমার সৎ-ছেলে উঠে পড়ে লেগেলে? মনের মধ্যে গুমড়ে মরেন আন্না, গর্জাতে থাকেন।

কিন্তু স্বামীকে কিছু বলতে পারেন না। বুকের মধ্যে বিষের ধোঁয়া নিয়ে মুখ বুজে সহ্য করে থাকেন। বলবেন কাকে? তাঁর পুরুষ সারাদিন, গভীর রাত অব্দি বইয়ের মধ্যে কাগজের ওপরে উপুড় হয়ে আছেন। যখন শুতে আসেন তাঁর চোখ জোড়া ঘুম। শুয়ে পড়লে মুহূর্ত লাগে না—ঘুমে অবশ হয়ে যান, গাছের গুঁড়ির মতন অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন সারারাত। ঘৃণায় চোখ জ্বলতে থাকে তাঁর, মমতায় চোখ ভিজতে থাকে। অসহায় পুরুষকে দেখতে দেখতে শেষে নিজের অক্ষমতার ওপরেই অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। সেই অসন্তোষ ক্রমশ এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হতে থাকে।

মিথ্যে বার বার উচ্চারণ করলে কী না-হয়! অবিশ্বাসের বীজ দস্তয়েফ্স্কির মনেও বুঝি দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। পাশার উক্তিটার যাথার্থ্য যাচাই করতে তাই তিনি এমিলাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার ছেলে রাত দিন এ-বাড়িতে ঘুর ঘুর করে কেন, কী কাজ তার এখানে?'

'কাজ আবার কী তোমার বউকে সঙ্গ দেওয়া। সমবয়সীরা সমবয়সীদেরই সঙ্গ চায়। তা ছাড়া, বউটা সব সময়ই ত একলা পড়ে থাকে। তুমি তোমার লেখাপড়া নিয়ে থাক। তোমার পাবলিশার তোমার পাওনাদার তোমার প্রুফ প্রেস—সময় কোথায় তোমার ওই সব জরুরী কাজ ফেলে বউয়ের কাছে বসে থাকবার। আসলে তোমার খ্যাতি আর আমার ছেলের সাহচর্য এই দু'য়ে মিলেই তার সুখ বল শান্তি বল সব।

'বটে, বলেছে নাকি সে এ-সব কথা তোমাকে?'

'বলবে কেন, আমরা বুঝি নে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যাও।'

আর খানিকটা বিষ ঢেলে এমিলা চলে গেল। দস্তয়েফ্‌স্কি ছুটে এসে শোবার ঘরে ঢুকলেন। দেখেন আন্না সোফায় অবশ হয়ে বসে আছে। তাঁর দু'চোখ ভরে জল গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে।

আন্নার চোখে জল দেখে দস্তয়েফ্‌স্কি চমকে উঠলেন তাঁর মনের ভিতরকার সন্দেহের সাপটা যেন তাঁকেই ছোবল মেরে বসল। তিনি হাটু মুড়ে বসে পড়লেন মেঝেয়। 'আন্না, তুমি কাঁদছ কেন?'

আন্না রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ না নাগিনীর বিষ নিঃশ্বাসে আমাদের সুখের নীড় পুড়তে শুরু করেছে। আমি এখানে থাকব না। কিছুতেই না। তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব। চল, আমরা পালাই।' আন্না তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলেন। 'আমরা এখান থেকে চলে যাব। এ-জায়গা না ছাড়লে আমাদের উপায় নেই। ওরা আমাদের সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদের জীবন বরবাদ না করে দিয়ে ওরা ছাড়বে না।'

'তাই দেখছি, আমি যাদের সর্বস্বান্ত হয়ে লালন-পালন করছি 'তারা আমার সর্বনাশ করে সেই ঋণ শোধ করতে চাইছে। ওরা বেইমান।'

'সত্যি বেইমান।' ক্রোধে জ্বলে উঠল আন্নার জল ভরা চোখ।

দস্তয়েফ্‌স্কি আন্নাকে বুকে টেনে নিলেন। 'বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি, এ-আমার পাপ। আমারই পাপ। আমারই অকুণ্ঠ প্রশ্রয়ে ওরা এত বাড় বেড়েছে।' আন্নার যৌবন-সরসী জলে অবগাহন করে পবিত্র শান্ত হতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। আদরে সোহাগে তাঁর মনের সব জ্বালা গ্লানি মুছে নিতে চাইলেন।

এবং পরের দিনই ঘুম থেকে উঠে বললেন, 'মসকোআ যাব। কাৎকফে্‌র থেকে যদি কিছু টাকা খসাতে পারি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব আন্না। আর একদিনও থাকব না এখানে। রাশিয়াতেই থাকব না। একেবারে য়ুরোপ চলে যাব। চল, তুমিও চল আমার সঙ্গে।'

আন্নার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'দিনের জন্যে হলেও এই বিষের ধোঁয়া থেকে দূরে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন সেই তাঁর সান্ত্বনা।

কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি যখন বললেন, সেখানে আমার বোন আছে এই সুযোগে তাকে বউ দেখানোও যাবে তখন আন্নার চোখের আলো নিবে গেল। দস্তয়েফ্‌স্কির আত্মীয়ের নামেই এখন আতঙ্ক আন্নার। কি জানি কী মূর্তি ধরে তাঁর সামনে হাজির হবেন সেই মহিলা।

আন্না জানতেন না দস্তয়েফ্‌স্কির এই বোনটিই তার ননদিনীকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছিল দাদাকে।

—'এই ভরা বয়েসে মেয়েটার কী দুঃখীর দশা দেখ, স্বামীটা বিছানায় পড়ে কতদিন ধরে ধুঁকছে। আর বেশীদিন বাঁচবে না। এলেনা খুব লেখাপড়া-জানা কি বুদ্ধিমতী নয় কিন্তু ভারী নরম মনের মেয়ে। বিয়ে করলে ও তোমাকে সেবায় ভালবাসায় শ্রদ্ধায় সুখী করতে পারবে, নিজেকে বিলিয়ে দেবার সেই গুণটি ওর আছে।' দস্তয়েফ্‌স্কিও তখন তেমনি একটি মেয়ে খুঁজছিলেন, আন্না করভিন-ক্রুকফ্‌স্কায়া তাঁকে বিয়ে করতে অসম্মত হলে তিনি তখন বিয়ে করতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং এলেনার মতন নম্র নত সেবাপরায়ণা মেয়েই তিনি কামনা করছিলেন তখন। তাই বোনের উৎসাহে এলেনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখলেন কিন্তু স্বামী বেঁচে থাকতে এলেনা কথা দিতে রাজী হল না। তার পরের ঘটনা পাঠক জানেন। আন্না গ্রিগোরয়েভনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, এলেনার স্বামীর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তিনি আন্না গ্রিগোরয়েভনাকে বিয়ে করে ফেললেন।

এ ব্যাপারটা যদি আন্নার জানা থাকত ত তিনি কিছুতেই মসকোআ যেতে চাইতেন না। কিন্তু আন্নার ভাগ্যি ভাল এলেনার স্বামী তখনও বিছানায় পড়ে ধুঁকছেন (ভদ্রলোক মারা গেছেন আরও আট বছর ভুগে) ফলে দাদার ওপরে বোনের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। দাদার বউকে তাই ভেরা দু'হাত বাড়িয়েই অভ্যর্থনা করল। এতদিন বাদে একটি মিত্র পরিবারের আন্তরিকতার মধ্যে আসতে পেরে আন্না তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু

কপালে দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে? মস্কোআয় পৌছেই দস্তয়েফ্স্কিকে দু' দু'বার মৃগীর আক্রমণে শয্যা নিতে হল। দ্বিতীয় বারের আক্রমণ এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে, দু' ঘণ্টা তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে গোটা পরিবারের সেই হৈ-চৈ আতঙ্ক-দুশ্চিন্তার মধ্যে আন্নার পরিচয় ঘটে স্থানীয় একটি তরুণের সঙ্গে। ছেলেটি ছিল খুব সরল ও আমুদে। রোগ-শয্যার বিষণ্ণ পরিবেশকে সে তার সরস সুন্দর কৌতুকে প্রসন্ন করে রাখত। আন্নাকে ছেলেটির খুব ভাল লেগেছিল। দস্তয়েফ্স্কির পাশে বসেই আন্না তার সঙ্গে গল্প-গুজব করত, তার অনাবিল রসিকতার স্বচ্ছন্দ জবাব দিত, হাসাহাসি করত, স্বাভাবিক। কেন না আন্নার সাদা মনে কোন কাদা ছিল না। কাদা ছিল দস্তয়েফ্স্কির মনে, ঈর্ষার কাদা। চিরদিনই দস্তয়েফ্স্কি ঈর্ষা-কাতর। এখন প্রৌঢ়-বয়েসে তরুণী-ভার্যা পেয়ে আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছেন। হাস্য-পরিহাসে আন্নাকে অমন উজ্জ্বল উচ্ছল হয়ে উঠতে দেখে তিনি ঈর্ষার জ্বলে উঠলেন। এবং দু'দিন ঠোঁট কামড়ে পড়ে থেকে পরের দিন ছেলেটি চলে গেলে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। ঈর্ষায় পেয়ে বসলে দস্তয়েফ্স্কির আর কাণ্ড জ্ঞান থাকত না, তিনি পশুর মতন হিংস্র হয়ে উঠতেন। এবার ও তাই হয়ে উঠলেন তিনি।

"তাঁর চিৎকার আর মুখের বিকৃত ভঙ্গি এমনই বীভৎস হয়ে উঠল যে, (আন্না তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন) আমি ভাবলাম, ফিওদর এক্ষুনি বুঝি আবার ফিট হয়ে পড়বে কিংবা আমাকেই খুন করে ফেলবে এক্ষুনি। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি কেঁদে ফেললাম। আর আমার কান্না দেখে সেই মুহূর্তে ওঁর রাগ জল হয়ে গেল। কেমন হকচকিয়ে উঠলেন তিনি, উদ্বিগ্ন আর বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি। সেদিনের রাত চিরকালের জন্যে আমার মনে ছাপ রেখে গেছে। এমন তৃপ্তি এত সুখ তার আগে কোন দিন পাই নি। সে-রাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঈর্ষা মানুষটির মধ্যে কী দারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি করে। আমি ঠিক করলাম, আমি আর কখনো এমন কিছু করব না যাতে তাঁর মনে এমন ভয়ংকর ক্রোধ জন্মে।"

কিন্তু সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মানুষের মনে সন্দেহ জন্মাতে কিছু করার দরকার হয় না। সন্দেহ বিষের মতন নিজেই নিজের দুঃখ তৈরি করে। তাই আন্নার চৌদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন জুড়েই এ-আগুন মাঝে মাঝে জ্বলে

উঠেছে আর আন্নাকে চোখের জল ঢেলে নেভাতে হয়েছে সে-আগুন। বলতে গেলে এ-সন্দেহবাতিক দস্তয়েফ্স্কির আমৃত্যু সঙ্গী ছিল। মৃত্যুর বছরখানেক আগেকার একটি ঘটনা বলি এখানে। দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য-তহবিল 'লিটের‍্যারি ফাণ্ড'-এর অর্থ সংগ্রহের জন্যে একবার একটা জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল। দস্তয়েফ্স্কিকে দেখতে এবং তাঁর স্বকণ্ঠের পাঠ শুনতে সে-জমায়েতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দস্তয়েফ্স্কির যৌবনের বন্ধু দ. ভ গ্রিগোরোভিচ্। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। আন্না তার স্মৃতি-কথায় ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখেছেন, "আমাদের পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। ফিওদরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে তখন গণ্য মান্য ব্যক্তিরা নাট্য মঞ্চের নিচে হলের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখেই তাঁরা এগিয়ে এলেন ও পরম শ্রদ্ধাভরে ফিওদরকে অভ্যর্থনা জানালেন আর আমি যেহেতু তাঁর স্ত্রী সকলেই আমার হাতে চুমু খেলেন—এটা একটা সামাজিক রীতি। আমিও সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবেই এটাকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নিয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে মঁশিয়ে গ্রিগোরোভিচ্-ও ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনি দু'একটা কথা বলেছেন এবং যথারীতি আর সকলের মতন আমার হাতেও চুমু খেয়েছেন। আমি এতে যে কিছু মনে করব না এবং তৎক্ষণাৎ ভুলে যাব, স্বাভাবিক। তাই হঠাৎ ফিওদরের মুখ গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হলাম। তারপর মঞ্চের ভিতরে তাঁর পাশে এসে বসেছি। দু'একটা প্রশ্নও করেছি কিন্তু তাঁর বিরক্তি দূর হল না। শুধু তাই নয়, হঠাৎ তিনি আমার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকালেন, 'এখানে এসে বসেছ কেন? যাও না, ওই লোকটার কাছে যাও।'

'কোন লোকটা?' আমি অবাক হলাম।

'কিছু বুঝছ না, না? ন্যাকা!'

ওঁর রাগ দেখে এবার আমার হাসি পেল, 'কোন্ লোকটার কাছে যাব, কোন্ লোকটার কাছে আমাকে যেতে বলছ?'

'কেন, যে-মানুষটা অমন আবেগভরে তোমার হাতে চুমু খেল এইমাত্র।'

এখন আর আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। আমি ভেবে পেলাম না স্বামীর কল্পনার সেই অপরাধী মানুষটি কে। ফিওদরের রাগত স্বর চাপা ছিল না। ওই বড় গলার শব্দ আশপাশের সকলে শুনছে ভেবে আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করলাম। এক্ষুনি উনি কিছু কাণ্ড না করে বসেন, আমি উদ্বেগ বোধ করলাম। 'বুঝতে পেরেছি। তোমার মেজাজ ভাল নেই, তুমি এখন

আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ না। আমি তবে অডিটরিয়ামে আমার আসনে গিয়ে বসি।…'

আমি এসে অডিটরিয়ামে বসেছি পাঁচ মিনিটও হয় নি, একজন লোক এসে বলল, 'মঁশিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি আপনাকে ডাকছেন।' আমি তাড়াতাড়ি শিল্পীদের বসার ঘরে হাজির হলাম গিয়ে আবার। আমাকে দেখেই তিনি তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, 'কী সেই লোকটাকে আর একবার না দেখে থাকতে পারলে না বুঝি ?'

আমার ভারী রাগ হল, বললাম, 'হাঁ, তাই।' তারপর হেসে ফেলে বললাম, 'সে-সঙ্গে তোমাকেও একবার দেখতে এলাম। তোমার কিছু দরকার আছে ?'

'না, আমার কিছু চাই নে।' তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমি বললাম, 'তবে যে তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে ?'

'তোমাকে ডাকবার কথা আমি চিন্তাও করি নি। দয়া করে এ ধরনের কল্পনা করো না।'

'বেশ তা হলে চললাম।'

দশ মিনিট বাদেই আবার ডাক পড়ল আমার। আমি ঢুকতেই মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর আনেচকা. আমার হাতে হাত রাখ। এবার আমার পড়ার পালা। আমি যেন সুন্দর করে পড়তে পারি।'

ফিওদর শান্ত হয়েছে দেখে স্বস্তি পেলাম কিন্তু আমার মনের খুঁৎখুঁতি গেল না। কে-সেই মানুষটি যাকে সন্দেহ করে ফিওদরের এত উষ্মা ! এবার ফিওদরই তাঁকে দেখিয়ে দিলেন, 'ওই যে ছোটখাট মানুষটি ফরাসীর মতন দেখতে, দেখ একবার, ভাল করে তাকিয়ে দেখ।' আমি এতক্ষণে চিনলাম। ফিওদরের ছাত্র বয়সের বন্ধু দ্মিত্রি ভেশিলিয়েভিচ্‌ গ্রিগোরোভিচ্‌। ওঁরমা একজন ফরাসী মহিলা, ফিওদরের কাছেই সে কথা শুনেছি। আমি চোখ ফিরিয়ে এনে বললাম, 'ছিঃ তুমি যে কী মানুষ বুঝি নে, ওই বুড়ো-লোকটাকে তোমার ঈর্ষা।' ফিওদর তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল। 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি ক্ষমা চাইছি।'

ওঁকে শান্ত দেখে এবার আমি রাগ দেখালাম, 'প্রত্যেক বার আমি দেখেছি,—পড়বার সময় মঞ্চে এসে তুমি অডিটরিয়ামের চারধারে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে খোঁজাখুঁজি কর, কোথায় বসেছি যদি দেখতে না পাও খোঁজ নিতে লোক পাঠাও, ফের যদি এমন কর ত আমি সোজা হল থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে যাব বলে দিচ্ছি।'

'আমি কী তখন তোমাকে যেতে দেব। মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে ধরব না তোমাকে।'

এমন তীব্র কর্কশ গলায় কথাগুলি উচ্চারণ করলেন উনি যে-আমি চমকে উঠলাম। হেসে বললাম, 'তা তুমি পার, কেলেঙ্কারী করতে তোমার জুড়ি নেই। লজ্জা সরমও নেই।' বলেই আমি চলে এলাম। এবং আমিই সর্তক হলাম যাতে না উনি কোন হুজ্জুতি করার সুযোগ পান।

তবু এমন ঘটনা আরও ঘটেছে, ঈর্ষাকাতর মানুষটা একবার ত রক্তারক্তি কাণ্ডই ঘটিয়ে বসেছিলেন। তা হোক তবু বলব যে, এ-সব ব্যাপার কখনো আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে নি বরং বলা ভাল এ-সব ঘটনার মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসতে, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিলাম। ওই সব ঘটনা আমাদের দাম্পত্যবন্ধনকেই বরং দৃঢ়তর করেছিল।

যা হোক, দশদিন মস্কোআ বাসের লাভ হল নগদ এক হাজার রুবল। আন্না তক্ষুনি প্রস্তাব করে বসল, "এ-টাকার একটা কোপেকও তুমি কাউকে দিতে পারবে না, এটা নিয়ে আমরা য়ুরোপ চলে যাব। আর ওই পাপচক্রের মধ্যে না। আর পিতার্সবুর্গেই থাকব না।"

'নিশ্চয় না, সব গোছগাছ কর, আমরা য়ুরোপ পাড়ি দেব।' দস্তয়েফ্স্কি এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু আন্নার মনে ভয় ছিল, বললেন, কিন্তু দেখো পাশা বা এমিলাকে যেন টাকার কথা বলো না।"

'পাগল, বলি কখনো। কিছুতেই বলব না। বেশী ধ্যানতাড়া করলে বলব, কাৎকফ্ একটা কোপেকও দিলে না। টাকার ধান্ধায় দশদিন বসে থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হল।'

'বলবে, তাই বলবে মনে থাকে যেন।' আন্না সাবধান করে দিলেন।

কিন্তু আন্নার আশঙ্কাই শেষ অব্দি সত্যি হল—শিশুর মতন সরল মানুষটা ওই শিরোমণি শয়তানদের পাল্লায় পড়ে সত্য কবুল না করে পারলেন না, ওদের নাছোড়বান্দা জেরার জবাবে সত্য কবুল করে ফেললেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতগুলি ডাকাতের মতন তাঁর প্রায় গলা টিপে ধরল আর কি। সঙ্গে এসে জুটল ক'জন পাওনাদার। ফলে হাজার রুবল নিমেষে কর্পূরের মতন উবে গেল। আন্নার সব আশায় ছাই দিয়ে সবাই যখন পকেট ভর্তি করে চলে গেল তখন তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। গরীব মা বিয়েতে যৌতুক যৎসামান্যই

দিয়েছিলেন। সেই যৎসামান্য সোনাদানা আর পিয়ানো ফারনিচার ক্রোকারি সব তুলে দিয়ে এলেন তিনি মর্টগেজের দোকানে। তারপরে অত্যাবশ্যক বলে যা রাখলেন তা সরিয়ে দিলেন আত্মীয় বন্ধুর হেফাজতে।

যেদিন তাঁরা মসকোআ থেকে পিতার্সবুগে এসেছিলেন সে-দিনটা ছিল 'পাম সানডে,' ইস্টারের আগের রোববার। তারপরের সোমবার পরিবারের সব দাবি মেটাতে দস্তয়েফ্‌স্কি পকেট উপুড় করে দিয়েছিলেন। আর তার পরের দিনই আন্না ঝেঁটিয়ে সব তুলে দিয়ে এসেছেন বন্ধকীর দোকানে। কী টাকা তাঁর বাবদে পেয়েছেন কাউকে জানালেন না। গুডফ্রাইডের দিন বেলা ছ'টোয় দু' জনে গিয়ে চেপে বসলেন বেরলিনের ট্রেনে।

পাশা, এমিলা, তার ছেলে-মেয়ে অন্য আত্মীয়রা সকলে হতভম্ব। এমন আকস্মিক ঘটনার জন্যে তারা তৈরি ছিল না। তাঁদের বাধা দিতে কেউ কোন অজুহাতও খুঁজে পেলে না। সকলকার সবদাবিই ত মিটিয়ে দিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি, এক্ষুনি আবার টাকার চাপ দেয় কী করে! লোকে বলাবলি করলে, পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হয়ে পালিয়েছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কিন্তু পরিবারের পাপচক্র যে পাওনাদারের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল সে আর ত লোকের জানার কথা নয়।

পাপের চক্রান্ত দু'পায়ে দুমড়ে দিয়ে আন্না সেই যে দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আর ফিরলেন চার বছর তিনমাস পরে। বিজয়িনী বিদেশে সুখের ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কপালে নেই। থাকলে যাকে নিয়ে স্বপ্ন সুন্দর করে তুলবেন তাঁর অমন দুর্মতি হবে কেন? আন্না দু' হাতে কেবল চোখের জল মোছেন।

চার

কপালে করাঘাত করেন আন্না—কপাল, সবই কপাল নয় ত এ দুর্মতি হতে যাবে কেন মানুষটার। 'পাপ ও শাস্তি' লিখে তিনি শুধু পাঠকের মন জয় করেন নি 'রস্‌কি ভিস্‌ৎনিক-এর (রাশিয়ান মেসেনজার) সম্পাদককেও কাৎ করে ফেলেছেন। দস্তয়েফ্‌স্কির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় মুগ্ধ মানুষটা এখন তাঁকে হাতে রাখতে চান। প্রথম কিস্তিতেই দু'হাজার রুবল চাওয়ামাত্র দিয়ে দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আরও দেবেন। বিদেশে টাকার প্রয়োজন হলে দস্তয়েফ্‌স্কি

হাত পাতলে বিমুখ হবেন না। অতএব এখন তিনি মনের আনন্দে নির্ভাবনায় লিখবেন এই ত স্বাভাবিক। তা ছাড়া লিখতে ত তাঁকে হবেই, কাৎকফ্‌ ত তাঁকে অমনি টাকা দিচ্ছেন না আসছে বছরের গোড়া থেকে একটা উপন্যাস তাঁর কাগজে শুরু করার শর্ত রয়েছে, মনের আনন্দে না হোক ওই শর্তের তাগিদেই ত তাঁর এখন লিখতে বসা দরকার। অথচ কী মতিচ্ছন্ন হল মানুষটার! নাকি য়ুরোপের বাতাসেই রয়েছে ওই বিষ, মন-টলা মানুষ নিঃশ্বাস টানলেই বিষক্রিয়ায় বেহুঁস হয়ে যায়? এবার অবশ্য বিষঘ্ন হিসেবে যুবতী বউ সঙ্গে ছিলেন কিন্তু ক'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন?

ট্রেন থেকে তাঁরা প্রথমে নামলেন ভিল্‌নায় তার পরে এলেন বেরলিন। বেরলিনে দস্তয়েফ্‌স্কি ছিলেন মাত্র একদিন। "বেরলিনে আমি একদিনের বেশী থাকতে পারি নি," বন্ধু আপোলোন মাইকফ্‌কে লিখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, "ওই স্টুপিড জরমনদের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই আমার গা-গোলায়।" বেরলিন থেকে চলে এলেন তাঁরা দ্রেসদেন। মাস আড়াই ছিলেন তাঁরা সেখানে। তারপরে সপ্তাহ সাতেক বাদেনে কাটিয়ে পুরো শীতটা থাকবেন বলে আগসটের শেষে চলে এলেন জেনিভায়।

আন্নার নেশা ছিল ডায়েরি লেখার। তিনি খুঁটিনাটি সব কিছুই তাঁর রোজ-নামচায় টুকে রাখতেন। য়ুরোপে এই তিনি প্রথম এসেছেন। তরুণ বয়েসের চোখ দিয়ে তিনি যা দেখেন তাই নূতন লাগে। ভাল লাগে। মুগ্ধ হন। সেই মুগ্ধতার কথায় ভরে ওঠে তাঁর রোজনামচা। আর তার ফাঁকে ফাঁকে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মুখের কথা, মনের ভাষা। তার থেকেই জানা গেছে, আন্নার দ্বিধা ভয় ভালবাসায় উদ্বেল মনের অবস্থা; দস্তয়েফ্‌স্কির শিশুর মতন আবেগ আর জেদ, হাওয়ায়-নড়া পাতার মতন তাঁর অস্থিরতা। স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষটি ভালবাসা দিতে ও নিতে জানতেন। নারীর মন মুগ্ধ করার মতন গুণ ছিল তাঁর মধ্যে; তুর্গেনিয়েফের মতন তিনি আত্মবিলসনে মগ্ন থাকতেন না, কি তলসতয়ের মতন আত্মস্থ স্বয়ংসম্পূর্ণও ছিলেন না তিনি। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ছিল না, ছিল না স্বার্থপরতা। নিজের প্রয়োজনের কাছে সময়ে সময়ে আর সকলের এমন কি স্ত্রীর প্রয়োজনও তুচ্ছ হয়ে যেত বটে কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে উদারতার অভাব ঘটত না কখনো। তা ছাড়া আন্তরিকতায়ও তিনি ছিলেন খুব খাঁটি তাই বিশ বছরের ছোট হয়েও আন্নার কখনো মনে হয় নি, মানুষটিকে আমি নাগাল পেলাম না। ঈর্ষা এবং ক্রোধে যেমন তিনি সংহার-মূর্তি ধরতেন তেমনি পরক্ষণেই দুঃখে

অনুশোচনায় ক্রীতদাসের মতন নতজানু হয়ে পড়তেন। দস্তয়েফ্‌স্কির এই দ্বৈত-চরিত্রই আন্নাকে সাহায্য করেছিল ওই রহস্যময় প্রতিভাধরের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্যজীবনের সাফল্যের জন্যে যদি কাউকে প্রশংসা করতে হয় সে আন্না। নিজের জন্যে মনের কোন কোণে একবিন্দু বাসনা পৃথক করে না রেখে স্বামীর বাসনাই নিজের বাসনা ও স্বামীই সর্বস্ব জেনেছিলেন বলে এবং ভারতীয় নারীর মতন স্বামীর পায়ে নিজের জীবন নৈবেদ্যের মতন নিবেদন করতে পেরেছিলেন বলেই সত্য ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছিল দস্তয়েফ্‌স্কির বিবাহিত-জীবন। এমন শরণাগত উৎসর্জিত নারী না পেলে দস্তয়েফ্‌স্কিকে হয়ত আলোর মধ্যে আলেয়ার আর জলের জন্যে মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত।

নীড় প্রত্যাশী ক্লান্ত মানুষটি একটি সুন্দর সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবে ছিলেন অতিশয় নিরাসক্ত। সেই নিরাসক্তিই আন্নাকে সুযোগ দিয়েছিল সংসারের সব দায় নিজের কাঁধে নেওয়ার। সে-সুযোগেই তিনি নিপুণ কারিগরের মতন আস্তে আস্তে একটি সুখের মিনায় গড়ার বাসনা সফল করতে পেরেছিলেন। শিক্ষা বয়েস রুচি মানসিক গঠন সব বিষয়েই বৈষম্য ছিল তাঁদের মধ্যে। এই বিষম-বিবাহ তবু সত্য হয়ে উঠেছিল, কেন না চরম বিপরীত সব সময়ই এক জায়গায় এসে মেশে।

সাহিত্যের ব্যাপারে শিল্পী দস্তয়েফ্‌স্কি যেমন ছিলেন দুর্জয় ও দুস্তোষণীয়, ব্যবহারিক ব্যাপারে মানুষ দস্তয়েফ্‌স্কি ছিলেন তেমনি দুর্বল অসহায় শিশু-মতন। দস্তয়েফ্‌স্কি-চরিত্রের এই বৈপরীত্যই আন্নাকে তাঁর নিকটতম করতে পেরেছিল। দুর্লভ প্রতিভার শিল্পীকে তিনি মুগ্ধ অবোধ বালিকার মতন পূজা করতেন আর অসহায় অন্যনির্ভর মানুষটিকে করতেন মায়ের মতন মায়া। এবং দস্তয়েফ্‌স্কি আন্নাকে দেখতেন পরম এক সুকৃতির মতন, যে তাঁর সেবাকেই করে নিয়েছে জীবনের ব্রত।

অন্যদিকে আন্নার বালিকাসুলভ চপলতা সব ব্যাপারে শিশুর মতন ঔৎসক্য একটা অকৃত্রিম পিতৃস্নেহে ভরে তুলত তাঁর মন। বসন্তের কচি পল্লবের মতন আন্নার পলকা দীঘল তনু-শরীর অলস চোখে দেখতেন আর এক অননুভূত তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠতেন তিনি।

ঘরের দু'প্রান্তে দু'টেবিলে দু'জনে বসেন। আন্না লেখেন চিঠিপত্র, ডায়েরি অথবা বই পড়েন। দস্তয়েফ্‌স্কি সৃষ্টি করেন বাক্-প্রতিমা ; বড় কঠিন কাজ, তাই

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান, চোখ তুলে তখন আন্নার দিকে তাকান, তার যৌবনের লাবণ্য ঘিরে মন তখন ভ্রমরবৃত্তি শুরু করে। দৃষ্টি-বিদ্ধ হয়ে আন্না ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেলেন। ওই দৃষ্টির সামনে কেমন লজ্জা পান, লাল হয়ে ওঠেন, লাজুক গলায় শুধান, 'কী দেখছ?' তখন আর দস্তয়েফ্‌স্কি বসে থাকতে পারেন না। আন্নাকেও উঠতে হয়। দু'টি শরীর তখন একটি পলতে হয়ে জ্বলতে থাকে।

যে-সব সমালোচক দস্তয়েফ্‌স্কির চরিত্রে স্থায়ী কাম-বিকৃতি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তাঁরা, কী আশ্চর্য, মাদাম দস্তয়েফ্‌স্কির ডায়েরিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ার দরকার বোধ করেন নি, কিংবা পরস্পরকে লেখা চিঠিগুলি গ্রাহ্য করেন নি, নইলে জানতেন, তাঁদের দাম্পত্য জীবনের বন্ধন দৃঢ় করেছিল মিলনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এ বিষয়ে এডোয়ারড হ্যালেট কার সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, '...both found in marriage the complete physical satisfaction which radiates from the modest pages of her 'Diary' and of his letters to her...."

Dostoevsky by Carr E. H. page 158 th.

কিন্তু আগেই বলেছি আন্না তাঁর চঞ্চলমতি একরোখা পুরুষটিকে বড় সহজে বশে আনতে পারেন নি, খুব সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নি দস্তয়েফ্‌স্কির যাযাবর মন। ফলে প্রবাসে প্রথম দিককার দিনগুলিতে অনেক কষ্ট ও নৈরাশ্য সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে। কিন্তু আন্না ভেঙে পড়েন নি। ধৈর্যই ছিল তাঁর চরিত্রের বড় গুণ—যৌবন-বয়েসে পরিণত কালের মন পেলে যা হয়, যৌবন সুলভ হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনমনীয় সংকল্প ও বাস্তব বুদ্ধি যুক্ত হয়েছিল। তাই যত বেশী কষ্ট পেয়েছেন নৈরাশ্যে ভুগেছেন, তত বেশী সংকল্পকঠিন হয়েছেন এবং যৌবনের শরীর আর পরিণত বয়েসের মন দিয়ে আস্তে আস্তে বশ করে এনেছেন দুরন্ত পুরুষকে। কিন্তু সেই বশীকরণের দিনগুলি কী সহজে কাটতে চেয়েছে! সহজ পুরুষ নন যে দস্তয়েফ্‌স্কি। আন্নার বাহু-বন্ধন যত নিবিড় হয়েছে দস্তয়েফ্‌স্কি তত ছটফটিয়ে উঠেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, অবশিষ্ট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে যেন বন্দী করে ফেলছে আন্না। তাঁর সব স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছে। এই ভয়েই বুঝি আন্নাকে তাঁর শত্রু বলে মনে হয়েছিল। মনের সেই গোপন কথাটা প্রকাশ হয়েও পড়ল একদিন। তাঁরা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে এক জায়গায় এসে দেখেন চাঁদমারি খেলা হচ্ছে। ছেলেরা সব

পয়সা দিয়ে হাতের টিপ যাচাই করছে জটলা করে। দস্তয়েফ্‌স্কিও এগিয়ে গেলেন। আন্না বললেন, 'তুমি যাচ্ছ কেন, তোমার হাতে টিপ আছে নাকি, মিথ্যে পয়সা নষ্ট করবে কেবল।' দস্তয়েফ্‌স্কি কোন জবাব দিলেন না, এগিয়ে গেলেন, বন্দুক হাতে নিয়ে প্রথম গুলীতেই লক্ষ্য ভেদ করে ফেললেন এবং তারপরে বার বার—অনেক বারই গুলী ছুঁড়লেন তিনি প্রতিবারই লক্ষ্য নির্ভুল বিদ্ধ হয়। বন্দুক রেখে এসে তিনি বললেন, 'দেখলে ত পারি কিনা,' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমার অনেক দিনকার একটা ধারণা ছিল, 'স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাভাবিক শত্রু' আজ বুঝতে পারছি আমার সে ধারণা ঠিক।'

অহেতুক পয়সা নষ্ট হতে দিতে চান নি আন্না কিন্তু সে কথা না তুলে বললেন, 'বারে, তুমি যে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলে সে-কথা কী আমার মনে ছিল নাকি!'

'আসলে পদে পদে বাধা দেওয়াই স্ত্রীদের স্বভাব। এভাবে বাধা দিয়ে দিয়ে স্বামীদের তারা পঙ্গু করে দেয় তাই ত আমি তাদের বলেছি 'ন্যাচরল্ এনিমী'।

'আমি তোমাকে পদে পদে বাধা দিই, না? বেশ।' মুখ ঘুরিয়ে আন্না একলাই হনহনিয়ে হাঁটতে লাগলেন। দস্তয়েফ্‌স্কি দৌড়ে গিয়ে ধরলেন তাঁকে। হাতে হাত টেনে নিয়ে ক্ষমা চাইলেন দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বিদ্রোহ আর শরণাগতির এই টানা-পোড়েনের মধ্যে কাটছিল তাঁদের দাম্পত্য-জীবন। ঝগড়া করছেন। রূঢ় কথায় কাঁদাচ্ছেন আন্নাকে-আবার আন্নার চোখে জল দেখেই অনুতাপে অস্থির হয়ে পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছেন। অন্যদিকে আবার যতই অনুভব করছেন, আনিয়েচকার কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে ফেলছেন ততই নিজের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন তিনি আর নিজের ওপরে যত অসন্তুষ্ট হচ্ছেন ততই সে-অসন্তোষের ঝাল মেটাচ্ছেন আন্নাকে কাঁদিয়ে।

যত দিন যাচ্ছিল অশান্তি এভাবে ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন আন্না তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই বহু ব্যবহৃত পোশাকের মতন পুরনো হয়ে গেছে কিংবা আন্নার বাহু-বন্ধন খুবই কঠিন লাগছিল তাঁর; তিনি মুক্তির জন্যে ছটফট করছিলেন, বনের পাখি খাঁচায় আটকে গেলে যেমন করে। অথবা নিস্তরঙ্গ নির্ভয় পুকুরে স্নান তাঁর ভাল লাগছিল না তিনি দুর্বার দুরন্ত নদী সাঁতরাতে চাইছিলেন—নির্বন্ধ স্বাধীন যাযাবর অভ্যাসের পূর্বজীবনে ফিরে যেতে চাইছিলেন তিনি, কারো আজ্ঞাধীন থাকতে (তার প্রেম যতই আন্তরিক হোক) বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল মন।

ড্রেসদেনে আন্না লক্ষ্য করলেন কোন কোন চিঠি সম্পর্কে দস্তয়েফ্স্কি অতিশয় চাপা, তেমন কোন চিঠির অস্তিত্বই যেন নেই, এমন ভাবখানা তাঁর। আন্না স্বামীর চিঠি খোলেন না কিন্তু তিনি কবে ক'খানা চিঠি পান কিছুই তাঁর অগোচর থাকে না, তা ছাড়া কোন্ চিঠি কে লিখেছে সে-চিঠিতে কী খবর-বৃত্তান্ত আছে স্বামী স্বেচ্ছায়ই তাঁকে বলেন আলোচনা করেন তাঁর সঙ্গে। এখন পাঁচখানা চিঠির বিষয় নিয়ে আলোচনার পর যদি স্বামী একখানা সম্পর্কে নীরব থাকেন, তাঁর অস্তিত্বই বেমালুম গোপন করে যান ত স্ত্রীর সন্দেহ হবে না? স্ত্রী জানতে চাইবেন না, ব্যাপার কী, কেন বিশেষ একখানা চিঠি এমন গোপন করে রাখতে চাইছেন স্বামী?

দস্তয়েফ্স্কি মাঝেমধ্যে কাফে ফ্রাসৌয়াতে যান রুশী খবরের কাগজ পড়তে, সেই ফাঁকে আন্না একদিন তাঁর দেরাজ হাতড়ে ওই গোপন চিঠির একখানা পড়ে ফেললেন এবং কয়েক দিনের ব্যবধানে আরও একখানা হাতে পড়ল তাঁর।

'জুয়াড়ী'র নায়িকা পলিনা আলেকসান্দ্রভনা যে জ্যান্ত এক যুবতী আর তারও নাম যে পলিনা সুস্‌লোভা আন্নার মন বিষিয়ে দিতে সাড়ম্বরে এ সংবাদটা পাশাই পরিবেষণ করেছিল আন্নাকে।

সে পরিপ্রেক্ষিতে এখন দু' দু'খানা চিঠি পড়ার পরে আন্নার মনের অবস্থা কী হয়েছিল তাঁর ভাষাতেই বলি—"আমি ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলাম। আমি কী করব। আমি কাঁপছিলাম। আমি কাঁদছিলাম। ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম আমি। ভাবছিলাম যদি আবার সেই পুরনো প্রেম নূতন করে পেয়ে বসে আমার স্বামীকে, ওই আলেয়ার আলো যদি আবার করে মন দোলায় তাঁর, মন ভোলায় ত তিনি আর আমাকে ভালবাসবেন না। ঈশ্বর তুমি আমার এ-সর্বনাশ ডেকে এনো না।"

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সে-আকুল প্রার্থনায়ও যেন কর্ণপাত করলেন না। আবার চিঠি এল পলিনার—ভয়ংকর এক চিঠি—পলিনা লিখেছে, তুমি যদি বউয়ের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আমার কাছে চলে আস আমি তোমাকে বিয়ে করব।' এর পরে আর চুপ করে থাকেন কেমন করে আন্না, তিনি সুস্‌লোভার ঠিকানা জোগাড় করে তাকে চিঠি লিখলেন। তার জবাব যখন এল আন্না স্বামীকে সে চিঠি দেখালেন না কিন্তু জানতে দিলেন একজন তাঁকে চিঠি দিয়েছে।

'কে চিঠি লিখেছে তোমাকে?'

'কেন বলব? তোমাকে যারা চিঠি লেখে সবাইর নাম কী আমাকে বল?'

শুনে ঈর্ষা-কাতর মানুষটা সন্দেহে অস্থির হয়ে উঠলেন। দু' তিনদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। হঠাৎ একদিন,

'স্বামী এসে আমার সামনে মেঝেয় বসে পড়লেন। তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে তখন। বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে না জানিয়ে যে-কোন লোকের সঙ্গে পত্র লেখালেখি করবার অধিকার যেমন আমি বজায় রেখেছি তেমনি তোমারও অধিকার আছে যে-কোন লোকের সঙ্গে পত্র বিনিময় করার। কিন্তু আমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি ভেবে কে সেই মানুষটি যার চিঠি তুমি আমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছ?'

'তুমি কার চিঠি গোপন করেছ আগে বল আমাকে'—আমি বললাম। অনন্যোপায় স্বামী তখন সব স্বীকার করলেন, আমিও তখন রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম। 'সুস্‌লোভাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম, সে তার জবাব দিয়েছে আমাকে।'

'কী লিখেছে সে?' জানতে চাইলেন স্বামী। আমি বিজয়িনীর মতন হেসে ফেললাম, একটি মেয়ে যদি আর একটি মেয়েকে চিঠি লেখে সে কী কোন পুরুষের জানতে চাওয়া উচিত, না কি ভদ্রতা?'

তিনি বুঝতে পারেন নি এ-ভাবে আন্না তাঁকে পেঁচে ফেলবে। এর পরে তিনি সুস্‌লোভার সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করে দেন, স্বাভাবিক। এবং স্বভাবতই এই চমকপ্রদ ঘটনাটা দস্তয়েফ্‌স্কির মনে গভীর দাগ কেটে ছিল যার ফলশ্রুতি আমরা দেখি 'ইডিয়েট' উপন্যাসে—আগ্‌লাইয়া ও নাসতাসিয়া ফিলিপোভনার মধ্যে সেই বিখ্যাত পত্র বিনিময়। ১৮৬৭-র পরে দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে সুস্‌লোভার আর কোন পত্র লেখালেখি হয় নি; আন্নার অনুরাগ ও ধৈর্যই সেদিন তাঁকে বিজয়িনী করেছিল।

কিন্তু এক আগুন থেকে যদি বা তিনি রক্ষা পেলেন আর এক আগুন থেকে বুঝি বাঁচার উপায় থাকছে না। তার লেলিহান শিখা দেখে আন্না শিউরে উঠলেন।

নিষিদ্ধ-প্রেমের নিশিতে-পাওয়া মানুষটার কামক্ষুধা হঠাৎ জুয়ার ক্ষুধায় পার্শ্ব-পরিবর্ত করল। সাহায্য করল, বলা ভাল, প্রেরণা জোগাল অনটন—বাড়িওলি ফ্ল্যাটের ভাড়া চেয়ে তাগিদ দিলেন, সে-টাকা অবিলম্বে দিতে হবে। স্বদেশেই মাথার ওপরে ছাদ না-থাকার কথা ভাবা যায় না এটা ত বিভূঁই-বিদেশ। তারপর ধড়ে প্রাণ রাখতে খাওয়াটাও ত অবশ্য। সে অত্যাবশ্যক ব্যাপারটার জন্যে

হাতে যে রেস্ত আছে তাতে হয় ত একমাস কোন মতে চলবে, ইতিমধ্যে স্বদেশের কোন বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ অথবা প্রকাশকের কাছ থেকে অ্যাডভান্স না এলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে। সে-অন্ধকার ঠেকাতে আলেয়ার আলো জ্বেলে আন্নার সামনে ধরলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আসলে নিষিদ্ধ-প্রেমের খোয়াড় ভাঙতেই যেন জুয়ার নেশায় ডুবতে চাইলেন, কি আন্নার কাছে যে তিনি সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নি, তাঁরও যে স্বাধীন ইচ্ছে আছে জুয়ার টেবিলে যদৃচ্ছা খরচ করে বুঝি সেইটেই প্রমাণ করতে চাইলেন। তা ছাড়া তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল, (অনেক ঠেকেও এবং ঠকেও সে বিশ্বাস শিথিল হয় নি) যে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলতে পারলে ধনী হওয়ার সহজ উপায় এক ও অদ্বিতীয় রুলেত-টেবিল। এ-বিশ্বাসের কথা তিনি পদ্রোস্‌তক্‌ (গেঁয়ো ছেলে) উপন্যাসেও নায়কের জবানীতে বলেছেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করি, ভাগ্যের খেলায় মানুষ যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে আর ঠাণ্ডা মাথায় যদি বুদ্ধি খাটাতে পারে ত···তার জিত নিশ্চিত, কেন না তখন আর তাকে ভাগ্যের ওপরে অন্ধের মতন নির্ভর করতে হয় না।'

কিন্তু রুলেত-টেবিলে বসে কোন দিনই তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন নি। যখনই কিছু জিতেছেন ভাগ্যবশেই জিতেছেন, বুদ্ধি খাটিয়ে নয়। এবারও যখন তাঁর মাথায় জুয়ার নেশা চাপল তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করলেন না, আন্নার কথাও ভাবলেন না, আসলে য়ুরোপ জুড়ে যে জুয়ার জাল পাতা তাতেই তিনি জড়িয়ে গেলেন।

তা ছাড়া দ্রেসদেনকেও তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না—একটা স্থবীর পঙ্গু শহর। কুজোঁয় আর খোঁড়ায় ভর্তি। হলুদ রংয়ের ডাকগাড়িগুলি দেখলে তাঁর বমি আসত। একমাত্র ভালর মধ্যে ছিল দ্রেসদেন আর্ট-গ্যালারি। বহু বিখ্যাত শিল্পীর দুর্লভ চিত্রের সংকলন ছিল সেখানে। একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে যখন মেজাজ বিগড়ে যেত তিনি ছুটে যেতেন সেখানে, মহৎ সৃষ্টির রহস্য দেখতে দেখতে চাঙা হয়ে উঠতেন। বহু উপন্যাসে এই সব চিত্রের উল্লেখ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে ; এই সব চিত্রের কথা-প্রসঙ্গে তিনি অভাবনীয় সব নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। দস্তয়েফ্‌স্কির শিল্পবোধ ও জাদুকরী বুদ্ধি এ-সব ক্ষেত্রে দুর্ল'ভ মুনশীয়ানার সাক্ষ্য হয়ে আছে। তবু একমাত্র আর্ট গ্যালারি তাঁকে শেষ অব্দি মুগ্ধ রাখতে পারল না। অসহ্য একঘেয়েমিতে তিনি ক্রমশই খিটখিটে হয়ে উঠতে থাকলেন ; ফলত জরমনদের উদ্দেশে তাঁর গালাগালি

ক্রমেই অমার্জিত হয়ে উঠতে থাকল আর খুঁটিনাটি নিয়ে কোন্দল বাড়তে থাকল আন্নার সঙ্গে।

আসলে সব কিছুর তলায় অভাবের তাড়নাটাই কেবল খুঁটে খাচ্ছিল তাঁকে। ফ্ল্যাট ভাড়া হোটেল খরচ আর চলছিল না। কলমও অচল। তিনি পিতার্সবুর্গ ছেড়ে এসে অব্দি এক কলমও লেখেন নি। বেলিন্‌স্কির ওপরে একটা প্রবন্ধ লেখার বায়না পেয়েছিলেন 'স্‌ভেস্‌দা' কাগজ থেকে। সে লেখাটাও মনোমত হচ্ছিল না বলে, যা লেখেন তাই সেনসারের আওতায় পড়ে বলে, ক্রমাগত কলম কামড়াচ্ছিলেন আর বিরক্ত হচ্ছিলেন। শেষমেশ কলম ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন মধ্যরাতি। আন্না অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তিনি অবশিষ্ট রাত পায়চারি করে কাটালেন। এবং ভোরবেলা চা খেতে খেতে বললেন কথাটা, 'দেখ আনিয়েচকা, এ-ভাবে আর চলবে না। খেতে হবে থাকতে হবে কিন্তু সে-রেস্ত কই আমাদের, ফতুর হয়ে যেতে একমাসের বেশী লাগবে না। তা ছাড়া আমরা ত ড্রেসদেনে পড়ে থেকে পচতে আসি নি। য়ুরোপের কিছু কিঞ্চিৎও যদি দেখতে হয় তার জন্যেও কিছু টাকার ব্যবস্থা দরকার। আন্না ধৈর্য ধরে চুপ করে শুনছিলেন আর জানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, এই ভূমিকার উদ্দেশ্য কী, মোদ্দা কথাটা কী বলতে চান তিনি।

দস্তয়েফ্‌স্কি সেই অপেক্ষমান স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বললেন, 'টাকা পাওয়ার একটা সোজা রাস্তা আমার জানা আছে। সেখানে টাকার ছড়াছড়ি। বুদ্ধিমানের মতন হাত বাড়াতে পারলে হাতে টাকা আব্‌সে উঠে আসে। তবে তার জন্যে কিছু টাকা চাই।'

"জুয়া খেলবে, না ?" গম্ভীর গলায় আন্না প্রশ্ন করলেন।

দস্তয়েফ্‌স্কি হাত চেপে ধরলেন আন্নার, 'রুলেত তেমন ধরনের জুয়া নয়, ভাগ্যই সব নয় সেখানে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আঙ্কিক নিয়মে খেলতে পারলে...'

আন্না উঠে দাঁড়ালেন। একটা অজানা ভয় ও দুশ্চিন্তা তাঁর মুখ ফ্যাকাশে করে দিল। আস্তে আস্তে বললেন, 'বেশ, খেল গে।'

'এখানে নয়, এখানকার টেবিল ভাল নয়। মোটা টাকা জিততে হলে হামবুর্গ যেতে হবে। আমি হামবুর্গ যাব।'

'আমাকে ড্রেসদেনের এই হোটেলে একলা ফেলে ?' নিঃশ্বাসের স্বরে বললেন আন্না।

পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার ভয়ে করুণ হয়ে উঠল দস্তয়েফ্‌স্কির স্বর, হাত ধরে

অনুনয় করে বললেন 'কিছু ভেব না, মাত্র চার দিন থাকব। মাত্র চার দিনে আমি যে-টাকা জিতে আনব তাতেই দেখো, কত জায়গায় আমরা মজা করে বেড়াতে পারব—পারী মাদ্রিদ যেখানে তুমি যেতে চাইবে যাব আমরা।'

পাথরের মতন মুখ আন্নার, চোখে পুকুব-পুকুর জল। তবু অবিচলিত দস্তয়েফ্স্কি। বললেন, 'শোন আমি গিয়ে একবাজি জেতামাত্রই তোমাকে চিঠি লিখব। তুমি হামবুর্গ চলে যাবে। ভয় কি, মাত্র ত চারদিনের ব্যাপার।'

মানুষটা একঘেয়েমিতে মরে যাচ্ছেন, এর থেকে তিনি মুক্তি চান, উত্তেজনা চান, অনিশ্চয়তায় ভুগতে চান, একটা প্রবল ঝাঁকুনি না খেলে তাঁর মনের ঝিমনি কাটবে না। লেখার মেজাজ আসবে না। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলেন আন্না, বুকের ভেতরে যে-কান্না উথ্‌লে উঠেছিল তাকে সংযত করতে পারলেন। আস্তে উচ্চারণ করলেন, 'যাও।'

'মাই লাভ, মাই ডারলিং' দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি আন্নাকে।

দু দিনেই দাম্পত্য সুখ পানসে হয়ে গেছে, ড্রেসদেনের নিরুত্তাপ দিনগুলি আন্না তাঁর পূর্ণ যৌবনের উত্তাপেও উজ্জ্বল উষ্ণ করে রাখতে পারলেন না। আশা-ভঙ্গের সে-দুঃখে ও অপমানে ভেঙে পড়বেন, স্বাভাবিক, তবু দস্তয়েফ্স্কিকে আর প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন না—নীড়ের বন্ধন ছিঁড়ে যে-পাখি আকাশে ডানা মেলে দিতে চায় তাকে বাঁধতে যাওয়া মিথ্যে, তাতে করে তার আরও জেদ বাড়ে, ক্ষোভ বাড়ে, মন ভাঙে—নীরবে চোখ মুছলেন আন্না।

হামবুর্গ, বাদেন-বাদেন, সাক্‌সঁ্যা, লে-বেঁ্য—১৮৬৭-র মে থেকে নবেম্বর অব্দি তিনি পাগলের মতন এক রুলেত-টেবিল থেকে আর এক রুলেত-টেবিলে ছুটেছেন ; সত্য বটে তখন তাঁর ভীষণ অভাব ; রাশিয়ায় তাঁর মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছে পাশা, দাদার দুই বউ ও তাদের সংসার এবং এই বিভুঁই-বিদেশে সঙ্গে রয়েছে যুবতী বউ—টাকার জন্যে হন্যে হয়ে উঠবেন ও সব চেয়ে সহজে যেখানে টাকা মেলে সেখানে ছুটবেন, স্বাভাবিক ; কিন্তু কেবল টাকার জন্যেই পাগল হয়ে তিনি বিদেশের এক হোটেলে সদ্যবিবাহিত বউকে একলা ফেলে হামবুর্গ ছুটে ছিলেন কি ? না। বন্ধু মাইকফ্‌কে লেখা চিঠিতে তিনি নিজেই কবুল করেছেন :

"নিজের সঙ্গে লড়তে লড়তে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। এখন বিদেশে আসার ইচ্ছে ছিল না তবু এসেছি, থাকছি, সঙ্গে রয়েছে একটি সরলা বালিকা। আমার যাযাবর জীবনের সঙ্গী হতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, বরং খুব আনন্দ তার,

যা দেখে তাইতেই সে খুশী, কিন্তু তার এই সরল মনের খুশী ও উচ্ছ্বাস দেখে আমার ভয় করে। দেখে দেখে যখন তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবে, যখন সে বাইরের আর কিছুতে আনন্দ পাবে না, মুখ ফেরাবে আমার দিকে তখন আমি তাকে আনন্দ দেব, মুগ্ধ রাখব কী দিয়ে? আমার এতটুকু আত্মবিশ্বাস নেই অধিকন্তু আমার স্বভাবে রয়েছে নানা বিকার। আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার সঙ্গে থাকতে থাকতে একদিন আন্না ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে উঠবে, ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ হবে। অবশ্য আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী মনের জোর বাস্তব-বুদ্ধি তার। আমি তার হাতেই টাকা-কড়ি ঘর-সংসারের ভার দিয়ে হালকা হয়েছি তবু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। এ সমস্তর ওপরে আর একটা নিদারুণ চিন্তা আমাকে খুঁড়ে খাচ্ছে। কাৎকফ্‌ আমাকে তিন হাজার রুবল অ্যাডভানস দিয়েছে, তার জন্যে উপন্যাস লিখতে হবে। অথচ…"

লিখতে পারছেন না তিনি। কাগজ কলম নিয়ে বসাই সার হয়। দু' চার পাতা যদি বা লেখেন পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে হাজার টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান, মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করেন আর মনের মধ্যে কেবল মাথা খোড়েন। তারপরে সেই বন্ধ্যা যন্ত্রণা ভুলতে একটা আত্ম-বিস্মৃতির উত্তেজনা খোঁজেন, যার মধ্যে বুঁদ হয়ে যেতে পারলে সব ব্যথা ভোঁতা হয়ে যাবে।

আন্নাও এ-ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি যে অন্তঃসত্ত্বা সে খবরটাও তাঁকে জানান নি তখন—যাক্‌, মানুষটা নিজের মতন চলে একটু শান্তি পাক, একঘেয়েমি, নিঃসঙ্গতা ভুলুক।

১৬ মে-র বিকেল বেলা দস্তয়েফ্‌স্কি হামবুর্গের ট্রেনে উঠে বসলেন। দু'চোখ ছাপিয়ে তখন আন্নার গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর চোখ মুছে দিয়ে বললেন 'মাত্র চারদিন, দেখো আনিয়া, চারদিন বাদেই আমি এসে গিয়েছি। আমাদের বাড়িওলি ভদ্রমহিলা খুব ভাল মানুষ, ভয় নেই, তুমি তার কাছে নিরাপদেই থাকবে।'

কিন্তু চারদিন পরে দস্তয়েফ্‌স্কি এলেন না, এল তাঁর চিঠি,…'রুলেতে বাজী জেতার যে-রহস্যটা তোমাকে আমি বলেছি তাতে যে কোন ভুল নেই তার প্রমাণ এসেই আমি কিছু টাকা জিতেছি। তোমাকে রহস্যটা আবার বলছি শোন, 'আসল কথা ধৈর্য। ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলবে। মাথা গরম করেছ কি গেছ।'

চিঠি পড়ে আন্না দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন—উনি যাকে ভাবছেন, বুদ্ধি আর ধৈর্যের হাতিয়ার নিয়ে অন্ধ দৈবের বিরুদ্ধে জেহাদ, সে যে আসলে জলভ্রম—মরীচিকা যে তাঁকে লোভিয়ে নিয়ে শেষে বেঘোরে খুন করবে এ-বুঝি তিনি সর্বস্বান্ত না হলে বুঝবেন না। দৈব বার বার দেয় না। মুহূর্তের জন্যে প্রসন্ন হেসে সে যে পাগল করে পালিয়ে যায়, এত ঘা খেয়েও এটা যার মাথায় আসে না তাকে সব খুইয়েই শিক্ষা পেতে হয়। যাবে, সব যাবে। পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস এবার জল হয়ে নেমে এল চোখ বেয়ে।

সেই সব-খোয়ানোর সংবাদ বয়ে দু'দিন বাদেই চিঠি এল—তিনি ঘড়ি কোট আংটি সব বন্ধক দিয়ে ফতুর হয়ে বসেছেন, '···আর নয়. খুব শিক্ষা হয়েছে, টাকা পাঠাও, আমি চলে আসব।' তুমি চলে আসবে তুমি সেই মানুষ—চিঠিখানা বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আন্না। টাকা মানিঅর্ডার করে বাসায় ফিরে এসে দেখেন তিনি যা ভয় করেছিলেন তাই সত্যি হয়ে আছে। তাঁর চিঠি টাকা পাওয়ার আগেই জানিয়ে বসে আছে—'তোমার টাকা পেলেই যে আমি ফিরব, ফিরতে পারব, মনে হয় না। আশা-ভঙ্গের কান্না আর পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কেউ ফিরতে পারে নাকি।'

পারে না। অন্তত তুমি পাববে না! আন্না বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেললেন।

সেই টাকাও হারলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সর্বসাকুল্যে তিনশ' পঞ্চাশ রুবল জলাঞ্জলি দিলেন। দিয়ে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে মাই অ্যানজেল, মাই ডাব, সেইন্‌ট্‌লি গার্ল ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টি ডাক ছড়ানো থাকে সব সময়—এবার সে শব্দগুলি আরও বেশী করে থাকল, যৎপরোনস্তি অনুশোচনা ও স্তোকবাক্যে ভর্তি চিঠিখানার মোদ্দা কথা হল: '···আর জুয়া খেলব না। টাকা পাঠাও। টাকা পাওয়া মাত্র টিকিট কেটে ট্রেনে উঠব। আমাকে নীচ ভেবো না। কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আমার আছে।···আমার এবারকার হারের পেছনে তোমার জন্যে উদ্বেগ। তোমাকে একলা ফেলে এসেছি এই অন্যায়-বোধ আমাকে থেকে থেকে কেবলই অন্যমনস্ক করেছে বলেই খেলার টেবিলে বারে বারে ধৈর্য হারিয়েছি, বারে বারে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে আমার। তুমি কাছে থাকলে নিশ্চিন্ত মনে খেলতে পারতাম, এতগুলি টাকা নিরর্থক জলে যেত না। যাই হোক আমার ওপরে বিশ্বাস হারিও না। আমি কথা দিচ্ছি, এবার আমি ফিরবই ফিরব। এবার আমি ঠিক করেছি আমার নূতন উপন্যাসে হাত দেব। আর

দেখো, সে-উপন্যাস 'পাপ ও শাস্তি'র থেকে অনেক অনেক ভাল হবে। তোমার মা কিছু সাহায্য পাঠাবেন লিখেছেন। আমাদের এখন সে-টাকাই ভরসা। আমি ড্রেসদেনে পৌঁছেই কাৎকফ্‌কে আরও এক হাজার রুবল অ্যাডভান্‌স্ পাঠাতে লিখব। আর তাকে সে-টাকা দিতেই হবে। আমি ত আর উপোষ থেকে লিখতে পারব না। সে যে ইতিমধ্যে তিন হাজার রুবল দিয়েছে সে-টাকা ত তার উশুল করতে হবে অতএব টাকা তাকে দিতেই হবে। তুমি হতাশ হয়ো না। কাৎকফ টাকা পাঠালেই আমরা সুইট্‌জারল্যাণ্ড চলে যাব।'

টাকা পাঠিয়ে আন্না ডায়েরিতে লিখলেন: "...আমি আর কী করতে পারি। আমি জানি এই আমার ভাগ্য। কিন্তু কত ভাল হত তিনি যদি জুয়া খেলার এই নিদারুণ দুর্মতি ত্যাগ করতে পারতেন।"

এবার টাকা পেয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি সত্যি সত্যি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। জুয়ার টেবিলে না গিয়ে সোজা স্টেশনে এলেন। সারা পথ ভয়ে ভাবনায় কেটেছে তাঁর—না-জানি কী-মূর্তি দেখবেন তিনি আন্নার—কত অনুযোগ কত ভৎ'সনাই না-জানি করবে সে, হয়ত মুখ ফিরিয়েই থাকবে, কথাই বলবেনা... ; কিন্তু তার কিছুই করলেন না আন্না; দীর্ঘদিন পরে তাঁকে পেয়ে আন্না কেবল শিশুর মতন ছুটে গিয়ে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর প্রাণ ভরে কাঁদলেন।

ফলে দস্তয়েফ্‌স্কি ভুগতে থাকলেন বিষম আত্মধিকারে—সোনার মেয়ে আন্নাকে তিনি কষ্ট দিয়েছেন ভেবে নিজেও কাঁদলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনো তাঁকে একলা ফেলে কোথাও যাবেন না। বললেন, 'তোমাকে একলা ফেলে গিয়েছিলাম বলেই আমার এমন সাংঘাতিক হার হল, খাওয়া-থাকার টাকা তোমাকে উপোষ রেখে আমি জলে দিয়ে এলাম কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে এমনটি কিছুতেই হত না, আমি নির্ঘাৎ জিততাম, অঢেল জিততাম।'

আন্না কোন প্রতিবাদ করলেন না, বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকলেন, তাঁর উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে এলে আস্তে আস্তে জানালেন সেই মোক্ষম খবর, 'আমি অন্তঃসত্ত্বা।'

শুনে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমাকে এ অবস্থায় একলা ফেলে রেখে কী সাংঘাতিক উৎকণ্ঠায় ভুগিয়েছি তোমাকে, বিদেশে এ-অবস্থায় হাতে যখন টাকা থাকা একান্ত দরকার তখন কি না আমি ঘরের শেষ কোপেক খরচ করে জুয়া খেলেছি? ছি ছি ছি,' তিনি আন্নার হাঁটুর ওপরে মাথা কুটতে থাকলেন—'আমি একটা স্কাউণ্ড্রেল একটা ক্রিমিনাল...'

'না না না, কেন নিজেকে ওই সব বলে ছোট করছ, তুমি কিছু অন্যায় করো নি। ১৮৬৩-তে ত একবার তুমি অনেক অনেক টাকা জিতেছিলে। এবারও যদি জিততে তোমার কী এত অনুতাপ হত ? আসলে তোমার কোন দোষ নেই, ভাগ্য তোমাকে ঠকিয়েছে, তুমি অন্ধ নিয়তিকে বুদ্ধির জোরে জিততে চেয়েছিলে সেই ত পুরুষকার। আজ ভাগ্য তোমাকে ঠকিয়েছে আর একদিন তুমি তাঁকে তোমার পায়ে লুটিয়ে দেবে। আসুক কাৎকফের টাকা…'

আন্না আশ্বাস দিলেন, তিনি যে তাঁর বিশ্বাসে বিশ্বাসী আন্তরিক হয়ে সে-কথা প্রকাশ করলেন। করতে হবে। এটা তাঁকে বিশ্বাস করাতে না পারলে তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাববেন, ভাববেন, আন্না তাঁকে অশ্রদ্ধা করে হয় ত ঘৃণা করে—এমন মর্মান্তিক ধারণা মাথায় ঢুকলে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবেন। কিছু লিখতে পারবেন না অথচ অবিলম্বেই তাঁকে লিখতে বসতে হবে। না লিখলে কাৎকফের ঋণ শোধ হবে না। তা ছাড়া লেখাই যাঁর জীবিকা না-লিখলে তিনি খাবেন কী ? আজ তাঁরা দু'জন, কিন্তু অচিরেই যে আর একজন আসছে তার কথা ভাবতে হবে না !

সুতরাং অনুযোগ নয়, ভর্ৎসনা না, পাকা গৃহিনীর মতন অথবা নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতন আন্না তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায় বহন করতে লাগলেন। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কিকে বাগমানানো আর জুয়ার টেবিলে ভাগ্য ফেরানো সমান দুরূহ। উভয়ের জন্যেই চাই অসীম ধৈর্য আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি। আন্নারও প্রতিজ্ঞা, এ জুয়ায় তিনি পণ রেখেছেন প্রাণ তাঁকে জিততেই হবে।

জুনমাসের শেষাশেষি তাঁরা রওনা হলেন সুইট্‌জারল্যাণ্ড। পকেটে তাঁর নগদ পাঁচ শ' রুবল, কাৎকফ হাজার রুবলের প্রথম কিস্তি পাঠিয়েছেন। সুতরাং পথের মাঝখানে আন্তর্জাতিক রুলেত-শহর বাদেন-বাদেনে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী ?

'আর একবার ভাগ্য-পরীক্ষা করা যাক, কী বল আনিয়া, এবার তুমি সঙ্গে আছ এবার আর কোন চিন্তা নেই। বুদ্ধি আর ধৈর্যের খেলায় এবার দেখো আমি ভাগ্যকে কেমন কব্‌জা করি।'

'বেশ।' সম্মতি দিতে আন্নার মুখের চেহারা কেমন হল দেখার দরকার নেই, দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর গলার স্বরে সম্মতি পেয়েই ছুটলেন রুলেত-টেবিলে।

তারপরেই শুরু হল আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। যেদিন জেতেন ফুল আর মিষ্টিতে দু' হাত বোঝাই করে ঘরে ফেরেন, যেদিন হেরে যান মুখে এক রাশ কালো মেঘ বয়ে নিঃশব্দে এসে আন্নার কাছে বসে পড়েন। আর আন্না তাঁর সঙ্গে সুখ দুঃখ ভাগ করে ভোগ করেন; তারপরে নির্জনে মেরী মায়ের কাছে হাঁটু পেতে চোখের জলে প্রার্থনা জানান, "মা, তুমি ছাড়া এই অগাধ সর্বনাশ থেকে ওঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তুমি মুখ তুলে চাও।" এদিকে দস্তয়েফ্‌স্কির ভাবখানা এই যেন রুলেতকে পরাজিত বিধ্বস্ত করতেই ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। হয় জয় নয় মৃত্যু এই যেন তাঁর পণ। সেই প্রাণ-পণ খেলায় জিততে জিততে হারতে হারতে বিশ দিনেই পাঁচশ রুবল ফুঁকে দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। আন্না খুলে দিলেন আঙুল থেকে বিয়ের আংটি; তার দু'দিন পরে কবজি থেকে ঘড়ি খুলে দিলেন। সেই শেষ দানে দস্তয়েফ্‌স্কি ভাগ্যের ভ্রূকুটি ভেঙে দিলেন এবার, বন্ধকী দোকান থেকে ঘড়ি আংটি উদ্ধার করার পরেও হাতে থাকল ১৬৮ গালদেন (১ গালদেন দেড় টাকা)। সে টাকা আন্নার হাতে তুলে দিতে আন্না তাঁর বুকে মাথা রেখে বললেন, 'যে-সময় তুমি রুলেত-টেবিলে নষ্ট করেছ তা যদি তুমি লেখায় দিতে এর চেয়ে ঢের ঢের টাকা কী তুমি রোজগার করতে না ফিওদর? তুমি মানুষের মন জয় করতে না?'

'করতাম এবং করবও। লিখে আমি চিরদিনের জন্যে বিশ্বের মন জয় করে রাখব, তুমি দেখো। কিন্তু তাই বলে রুলেতের কাছে হার মানব? রুলেত-টেবিলকে জয় করতে পারব না?'

জুয়াড়ীকে উপদেশ দেওয়া বৃথা, আন্না দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করে গেলেন। দস্তয়েফ্‌স্কি তার পরের দিন ১৭ গালদেন ও তার পরের তিন ১২ গালদেন জিতলেন। উৎসাহে আর উত্তেজনায় থরথর করছেন তিনি তখন। তখন হঠাৎ মনোহারিণী রুলেতের প্রসন্ন হাসি কুটিল হল। ভ্রূকুটি করে মুখ ফিরাল সে। দস্তয়েফ্‌স্কি আবার হারতে থাকলেন। চার শ' গালদেন জেতার পরেই হার শুরু হল। ইতিমধ্যে শাশুড়ী টাকা পাঠিয়েছেন, রুলেতে জেতা টাকা আর ওই সাহায্যের টাকা মিলিয়ে হাতে তাঁর ১,৩০০ ফ্রাঁ। এ-অর্থ নিয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ড পৌঁছতে পারলে তিন মাস নিশ্চিন্তে বসে লিখতে পারতেন তিনি; কিন্তু মোহিনী রুলেত আস্তে আস্তে শূন্য করে দিল তাঁর থলি।

শেষ কড়ি খুইয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন সেদিন। পেছন থেকে এগিয়ে এসে গোন্‌চারফ্‌ তাঁর কাঁধে হাত

রাখলেন। দস্তয়েফ্‌স্কি চমকে উঠলেন। ফিরে তাকিয়ে গোন্‌চারফ্‌কে দেখে বললেন, 'আরে তুমি কোত্থেকে?'

'এখান থেকেই। তুমি ত চোখ তুলে আর কোন দিকে তাকাও না। তাকালে দেখতে পেতে। আমরা রোজ তোমাকে দেখি।'

'বটে, রোজ আমাকে হারতে দেখে আজ ব্যঙ্গ করতে ছুটে এলে বুঝি!'

'আরে ছি ছি কী যে বল!' গোন্‌চারফ্‌ জিভ কাটলেন।

'কিন্তু আমরা বলতে আর কারা, আর কে দেখেছে আমাকে ত বললে না।'

'কে আবার, তুর্গেন্যেফ্‌। রোজই সে ভাবে তোমাকে ডাকবে কিন্তু পাছে তুমি মনে কর তুর্গেন্যেফ্‌ টাকার তাগাদা দিচ্ছে তাই ডাকতে ভরসা পায় নি।'

'বটে আমি তার কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল ধার করেছিলাম সেই পঁয়ষট্টিতে। এখনো সে ধার শোধ করে উঠতে পারি নি—তোমাকে বললে বুঝি সেই কথা।'

'না না তুর্গেন্যেফ্‌কে অত ছোটলোক ভেবো না। সে কিছু বলে নি কেবল হেসেছে।'

'হেসেছে! দেনা শোধ না করে আমি জুয়া খেলছি আর হারছি, তাই দেখে ঠাট্টা!'

'ধ্যাৎ, কে কাকে ঠাট্টা করবে, কেবল তুমিই হার নাকি, সে হারে না, আমি হারি না?' দস্তয়েফ্‌স্কি চটে উঠেছেন দেখে তাকে ঠাণ্ডা করতে গোন্‌চারফ্‌ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'ধ্যাৎ কী, সত্যি ত। সে কারো ধার ধারে না সুতরাং হারলে তাকে বলার কেউ নেই কিন্তু আমি পাওনাদারকে ঠকিয়ে জুয়া খেলছি আর হারছি এটা নিঃসন্দেহে নিন্দে করার মতন। কিন্তু কী করব বল, দস্তয়েফ্‌স্কি হঠাৎ মিইয়ে গেলেন, মলিন গলায় বললেন, হঠাৎ কিছু টাকা রোজগারের ওই ত একমাত্র রাস্তা। তোমার আর তুর্গেন্যেফে্‌র কাছে রুলেত হচ্ছে অবসর-বিনোদন কিন্তু আমার কাছে…যাক গে কিছু টাকা ধার দাও দিকিনি, না, জুয়া খেলব বলে চাইছি না, কিছুটাকা পেলে সুইট্‌জারল্যাণ্ড চলে যাব ঠিক করেছি। রসকি ভিসৎনিক-এ আসছে জানুয়ারি থেকে একটা উপন্যাস ধারাবাহিক চালাব বলে এ-যাবত চার হাজার রুবল অ্যাডভানস্‌ নিয়েছি কাৎকফের কাছ থেকে, অথচ লিখি নি একটা লাইন।"

'এদিকে জানুয়ারি যে বলতে গেলে এসেই পড়ল। এমন করে নিজের

পায়ে কুড়োল মেরো না ফিওদর। টাকা আমি দিচ্ছি কিন্তু তোমাকে ওই রুলেতের নেশা ছাড়তে হবে ভাই।'

"কেউ টাকা ধার দেবে বললে দস্তয়েফ্স্কি যে-কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন জুয়া ত সামান্য। বললেন—'না ভাই আর খেলব না।'

গোন্চারফ্ তখুনি মানি ব্যাগ বের করলেন। সুইট্জারল্যাণ্ড গিয়ে মাসাধিকাল স্বচ্ছন্দে থাকার মতন টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'তোমার একবার তুর্গেনিয়েফের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তুমি নিশ্চয় তার ঠিকানা জান না।' নোট বুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে গোন্চারফ্ তাঁকে তুর্গেনিয়েফের ঠিকানা লিখে দিলেন।

শুনে আন্নাও পরামর্শ দিলেন, যাও দেখা কর গে। তোমারই আগবাড়িয়ে যাওয়া উচিত, সেটাই শোভন।

পুরনো ঋণ শোধ দিচ্ছি নে অথচ জুয়া খেলছি আর হারছি—একটা কুচ্ছিৎ অপমান বোধ দস্তয়েফ্স্কির রক্তে কেন্নোর মতন সহস্র পায় হাঁট ছিল আর তাঁর সারা শরীর রি রি করছিল সেই জ্বালায়। কোনো অংশে ছোট নন তিনি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে বরং বড় অনেক বড়; কিন্তু সে কথা বললে শুনছে কে, —সে ধনী তুমি গরীব সে ঋণ দেয় তুমি ঋণ নাও। তুমি ছোট। মাথা হেঁট করে যেতে হবে যাকে তুমি ঘৃণা কর তার কাছে।

একটা পুরো দিন গুম্ হয়ে বসে থাকলেন তিনি। তার পরদিন জুলাই মাসের দশ তারিখ। দস্তয়েফ্স্কি গুটিগুটি গিয়ে হাজির হলেন তুর্গেনিয়েফের ফ্ল্যাটে। তখন বেলা বারোটা। রাশিয়ার দুই দিকপাল সাহিত্যিক পরস্পরের মুখোমুখি বসলেন। বিপরীত চিন্তার দুই বুদ্ধিজীবী নায়কের সেই সাক্ষাৎকার এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

পাঁচ

তুর্গেনয়েফ্ তখন লাঞ্চ করছিলেন। খাওয়ার টেবিলেই ডেকে বসালেন তিনি দস্তয়েফ্স্কিকে। তুর্গেনয়েফ কাটলেট খাচ্ছিলেন। ওটা শেষ করে আধ গ্লাসটাক লাল মদ খেলেন তারপরে নিলেন ছোট এক কাপ কফি। যে খানসামাটি তাঁকে পরিবেশন করছিল তার গায়ে ফ্রক-কোট, পেছনটা সোয়ালো পাখির লেজের মতন কাটা, হাতে সাদা দস্তানা, পায়ে রাবার-সোল জুতো। লোকটা নিঃশব্দে যাচ্ছিল আসছিল ও বেশ সিমসাম কায়দায় পরিবেশন করছিল। দেখতে দেখতে তুর্গেনয়েফের খাওয়া হয়ে গেল; কিন্তু দস্তয়েফ্স্কিকে তিনি কিছুই খেতে অনুরোধ করলেন না, এমন কী এককাপ কফিও না। এটাকে একটা অপমান বলেই মনে করলেন দস্তয়েফ্স্কি। লোকটা কী অসভ্য—ভেবে দস্তয়েফ্স্কির মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তখনই তুর্গেনয়েফ্ তোয়ালেয় ঠোঁট মুছে রুশ সম্ভ্রান্ত-সমাজের কায়দায় ঠোঁট সুচোলো করে চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে মুখ এগিয়ে এনেছেন দস্তয়েফ্স্কির গালের কাছে। আন্তরিকতাহীন এই সব আনুষ্ঠানিক সম্ভ্রান্ত-ভণ্ডামি দস্তয়েফ্স্কি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারতেন না, আজও মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হলেন।

একজন বিষম বিরক্ত আর একজন অতিশয় আত্মতৃপ্ত মানুষের সামাজিক প্রীতি-বিনিময়ের পরে শুরু হল কথাবার্তা। কথাবার্ত শুরু হল দুই দিক পাল সাহিত্যিকের মধ্যে—জীবনের দুই বিপরীত কোটির মানুষের মধ্যে। একজন জন্মসূত্রে ও স্বভাবে বুর্জোআ (সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ) আর একজন অ্যারিসটোক্র্যাট (সম্ভ্রান্ত-সমাজের প্রথম সারির লোক)। একজন আশৈশব ভুগছেন কেবল বঞ্চনায় ও দারিদ্র্যে আর একজন বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত হয়ে আসছেন চিরকাল—(অভাব যে কী বস্তু তাঁরা জানেন না, কদাচিৎ কখনো দু' একটা বিলাস-দ্রব্যের কাট ছাট করতে হলেই তাঁরা মনে করেন টানাটানি চলছে।) একজন বেপরোয়া না-ছোড়বান্দা—না ক্ষমা করেন নিজেকে, না অন্য কাউকে আর একজন অলস আরামী নির্বিরোধ। সেই ১৮৪৫-এ যখন বেলিনস্কির আড্ডায় প্রথম সাক্ষাৎ তাঁদের সেই থেকেই তুর্গেনয়েফ্‌কে ঈর্ষার চোখে দেখে আসছেন দস্তয়েফ্স্কি—আর তুর্গেনয়েফ্ তাঁকে দেখে আসছেন অভিভাবক-সুলভ অনুকম্পার চোখে, অনুগ্রহ আর প্রশ্রয়ের চোখে। সেই প্রথম দেখার দিনগুলিতেই তুর্গেনয়েফ্ টিপ্পনী কেটে বলতেন, "মস্কো-ডাক্তারের ছেলেটা চাল-চলনে জংলী হলেও লেখে কিন্তু চমৎকার।" তারপরে দস্তয়েফ্স্কি

রাজরোষে নির্বাসিত হলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে রুশ-সাহিত্য দশ বছর এগিয়ে গেছে। ষাটের দশকে এখন তুর্গেন্য়েফের রবরবা বাজার তেমনি নাম-ডাক। লিখব বললে প্রকাশকরা পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে এসে দুয়ারে ধর্না দেয়। সুতরাং দস্তয়েফ্স্কি আজও তাঁকে ঈর্ষা করেন। এই ঈর্ষার সদ্য ফলশ্রুতি তাঁর বেসী (দ্য পজেসড/শয়তান) উপন্যাস ; সেখানে কারমাজিনফ্ চরিত্রে তিনি তুর্গেন্য়েফ্কে নিয়ে যৎপরোনাস্তি কেরিকচার করেছেন, এমন কি উপরি উক্ত খাওয়ার দৃশ্যটাও বাদ দেন নি।

সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তিনি মাইকফ্কে লিখেছিলেন,···ওই সব বিরক্তিকর কথা, মাথাগরম হওয়ার কথা। দু'বছর আগেকার ঋণ আজও শোধ করতে পারেন নি বলে তুর্গেন্য়েফের প্রতি তাঁর ঘৃণার কথা, লিখেছিলেন, "······এই সব ব্যাপারে আমার মেজাজ খিঁচড়ে ছিল তার ওপরে কথায় কথায় উঠল তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'দীম'-এর (ধোঁয়ার) কথা। ফলত অনর্থ বেধে গেল।···তুর্গেন্য়েফ্ বললে, আমার উপন্যাসের মোদ্দা কথা হল—রাশিয়া যদি সমুদ্রের অতলে তলিয়েও যায় ত তাতে কিছু যায় আসে না কারো। ও-নিয়ে আন্দোলন কি গলাবাজিতেও কিছু হবে না। কেউ ট্যাঁ ফোঁ-টুকুও করবে না। আর এই নাকি রাশিয়া সম্পর্ক তাঁর বিশ্বাস। আমি তখনও জানি নে উপন্যাসটি নিয়ে মসকোআয় পিতার্সবুর্গে দারুণ হৈ-চৈ হচ্ছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে চারধারে। সে নিজেই সে-কথা বললে ও বুক ফুলিয়ে দাবি করলে, সে একজন ঘোরতর নাস্তিক। দেবতাবাদ যে খৃষ্টের মতন অমন একজন অপাপবিদ্ধ মানুষ উপহার দিয়েছে বিশ্বজনকে, সে তা মানতেই চায় না। আচ্ছা মানছে না বুঝলাম ; কিন্তু ঈশ্বর না মেনে এরা, এই হেরেজন-চেরনিশেফ্স্কি-তুর্গেন্য়েফরা মানুষকে কী দিলে? নির্লজ্জ আত্মপ্রীতি আর জঘন্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা ছাড়া আর কী পেয়েছে ওদের কাছে রাশিয়া। খৃষ্টকে এরা থু-থু দেয় আর রাশিয়াকে প্রাণভরে গালপাড়ে। ওর নায়ক বলে—'আমি রাশিয়াকে ঘৃণা করি।' কী বীভৎস কাণ্ড, দেখ। এরা আন্তর্জাতীয়তা এনে রুশ-জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করতে চায়। আমি কী এদের কখনো ক্ষমা করব ভাব?" হেরজেন চেরনিশেফ্স্কি তুর্গেন্য়েফ্—সবাইর নাম তুলে গালপেড়ে পত্র শেষ করেছেন দস্তয়েফ্স্কি ফলে তুর্গেন্য়েফের দোষটা যে ঠিক কোথায় পাঠকের বোঝা মুশকিল।

তুর্গেনিয়েফ নাস্তিক বলে দস্তয়েফ্স্কির অসন্তোষ ; কিন্তু তিনি নিজে কী তাও ত স্পষ্ট করে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন নি কখনো। তাঁর অসামান্য চরিত্র

জোসিমা যেমন ঈশ্বরগত-প্রাণ তেমনি ইভান কারামাজোভ ঘোরতর নাস্তিক। দু'জনের মুখেই তিনি এমন সব অকাট্য যুক্তি উচ্চারণ করেছেন যাতে করে পরিষ্কার বোঝা যায় ঈশ্বরে পরিপূর্ণ নির্ভর কোন দিন ছিল না তাঁর, কোন দিনই তিনি ঈশ্বরকে ঐকান্তিক ভাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি।

যাই হোক তুর্গেনিয়েফের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে মাথা গরম করে এসে লাভ হল এই যে, জুয়ায়-মগ্ন মন তাঁর লেখার দিকে ঝুঁকল। তুর্গেনিয়েফ্‌কে ধন্যবাদ দস্তয়েফ্স্কিকে উত্তেজিত করে দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের তিনি পরম উপকার করলেন। তুর্গেনিয়েফের মতন বুদ্ধিমান মনীষার বিরোধিতা করতে গিয়েই সৃষ্টি হতে চলল আর একখানি অমর উপন্যাস। আমি 'ইডিয়েট্'-এর কথা বলছি।

'ইডিয়েট্'-এই আমরা সব প্রথম সার্থক 'Positive good man' চরিত্রের দেখা পাই। অবশ্য এর আগেও 'Positive good man' আঁকার চেষ্টা কম হয় নি; কিন্তু কেউ-ই সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। কেন না, দস্তয়েফ্স্কি বলেন, "এ কাজ সব চেয়ে কঠিন। যিনি এ-কাজে সফল হন তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী।"

Positive good man বলতে সব আগে আমাদের মনে পড়বে চৈতন্যদেব অথবা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। য়ুরোপের খৃশ্চিয়ান-জগৎ একবাক্যে স্মরণ করবেন যীশুকে। কিন্তু কোন মহামানবের আদলে চরিত্র আঁকতে চাইলে তা হয়ে যাবে মহামানব নিয়ে উপন্যাস, তা আর তখন রস-সাহিত্য হবে না। দস্তয়েফ্স্কি বলেন, রস-সাহিত্যের কাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে 'সাধারণ নয়' এমন একটি মানুষকে উপস্থিত করা—সে হবে শিশুর মতন সরল, পবিত্র ও স্বভাবতই সৎ অথচ সে থাকবে যেহেতু মহামানব নয় 'screened with human weakess.' পাঠক তার সম্পর্কে যত জানবেন ততই তার আত্মীয় হয়ে উঠবেন এবং ততই অনুভব করবেন, এ-মানুষটি তাঁর নিজের জাতের নয়, এ-মানুষটির ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। এ যেন কেমন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, একলা। একে বন্ধু, সমাজ, বাপ-মা এমন কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীও ত্যাগ করে যায়। কারো সঙ্গেই সে সহ-অবস্থান করতে পারে না।

এ-হেন জটিল চরিত্র প্রথমেই কোন লেখক কল্পনা করতে পারেন নি। প্রথমে তাঁদের কল্পনায় 'Positive good man' বলতে একটি সরল বিশ্বাসে অটল 'ভাল মানুষই' ধরা পড়েছিল। বিশ্ব-সাহিত্যে তার প্রথম সাক্ষাৎ পাই ষোড়শ শতকে। ঔপন্যাসিক সারভান্তে যে 'good man' চরিত্রটি আমাদের হাতে তুলে দেন তার নাম 'ডন কুইক্সট'। দস্তয়েফ্স্কি লিখেছেন, "...of all the good characters

in christian literature, Don Quixote stands as the most finished of all. But he is good solely because he is ludicrous at the same time comical." ভাঁড় হওয়াতেই চরিত্রটির ওজন কমে গেছে অতি মাত্রায়। এবং কেবল তথাকথিত হিরোইজমের প্রতি শ্লেষ হিসেবেই চরিত্রটি পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছে। অনুরূপ ব্যর্থতা তিনি দেখেছেন হেনরি ফিলডিং-এর Tom Jones-এও। ১৭৪০-এ লেখা এই চারিত্রটি নিয়ে এমন ব্যঙ্গ-কৌতুক করা হয়েছে যে সেই ভাঁড়ামি আর বোকামির তলায় একটি বিশুদ্ধ সৎ চরিত্র সমূলে চাপা পড়ে গিয়েছে। অন্যপক্ষে দস্তয়েফ্স্কির অন্যতম প্রিয় লেখক ডিকেনস্-এর 'পিকউইক' অনবদ্য চরিত্র হলেও ডন কুইক্সটের তুলনায় দুর্বল। তবু মোটামুটি ভাবে এ-সব চরিত্ররা পাঠকের মন কেড়েছে কেবল তাদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্যে। সৎ ও সরল-বিশ্বাসের মানুষকে সবাই ভালবাসে। সবাই যাকে উপহাস করে কিংবা য়ুগোর 'লে মিজেরাবল'-এর নায়ক জাঁ ভালজাঁর মতন, যে কেবল ভাগ্য দোষে অত্যাচারই কুড়োয়, কারো কাছে এতটুকু স্নেহ মমতা পায় না, স্বভাবতই সে-অনন্যোপায় মানুষটির জন্যে পাঠকের মন করুণায় ভরে ওঠে। সেকালের হিউমারের গোপন লক্ষ্যও ছিল তাই "...to arouse Compassion." অর্থাৎ মানুষের মনে করুণার উদ্রেক করা।

কিন্তু অসহায়ের প্রতি এই করুণাকে বড় ভয়ের চোখে দেখেছেন দস্তয়েফ্স্কি, বলেছেন, নায়কের প্রতি পাঠকের করুণার উদ্রেক হলে তার অন্তর্নিহিত সত্য স্বরূপ করুণার নিচে চাপা পড়ে যায়। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় পাঠক তথা লেখকের সমস্ত আয়োজনটাই পণ্ড হয়ে যায় তখন। তাই য়ুগোর 'horrible beauty', ইয়েটস-এর 'terrible beauty'-র চেয়ে 'grotesque beauty'-র মধ্যেই দস্তয়েফ্স্কি দেখেছেন '...avenue to spiritual reality in art' যার লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে খুঁজে বেছে এমন একটি সাধারণ মানুষ বের করা, যে সর্ব-প্রকারে সাধারণ হয়েও উৎকেন্দ্রিকতাবশত অ-সাধারণ। দস্তয়েফ্স্কি বলেছেন, এটাই আর্টে 'reality in a higher sense' অর্থাৎ 'to find the man in a man'. 'Positive good man' প্রসঙ্গে আর্ট realism এর প্রশ্ন যখন এল তখনই 'good man' চরিত্রে দেখা দিল রহস্য ও জটিলতা। চরিত্র থেকে বাদ গেল বোকামি আর ভাঁড়ামি যুক্ত হল মনুষ্যোচিত দুর্বলতা (human weakness) ও উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity). যিনি যুক্ত করলেন উনবিংশ

শতাব্দীর সেই প্রফেট অবশ্যই দস্তয়েফ্স্কি। তাঁর ভাবনা প্রজ্ঞার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বলেই 'ইডিয়েট্'-এর নায়ক প্রিন্স্ মিশকিনকে আমরা পেয়েছি, এক শ' বছর পরেও বিশ্ব-সাহিত্যে যার জুড়ি আর একটি মিলন না। এমন সৃষ্টি কলম ধরলেই করা যায় না তার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি দরকার। দস্তয়েফ্স্কিও যে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি এখন প্রবৃত্ত হওয়ার কথা বলি, তুর্গেন্য়েফের সঙ্গে তর্ক তাঁকে উত্তেজিত করেছিল ঠিকই, সৃষ্টি-কর্মে প্রেরণা জুগিয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু বলতেই হবে প্রবুদ্ধ করেছিল তাঁকে আর একজন মহান চিত্র-শিল্পী, তিনি ওল ব্যাঁ।

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বাদেন-বাদেন ছেড়ে এলেন। এলেন বাসেলে। সেখানকার মিউজিয়ম দেখতে এসে তুর্গেন্য়েফের স্বজাতি-বিদ্বেষের উপযুক্ত জবাব দিতে মনটা তাঁর আরও বেশী বদ্ধপরিকর হল। বদ্ধপরিকর করল ওল ব্যাঁ-এর অমর চিত্র 'ক্রুশ থেকে যীশুর অবতরণ'। তিনি স্থির করলেন, এমনই একটি অপাপবিদ্ধ-চরিত্র সৃষ্টি করবেন তিনি। এই সৃষ্টি-কর্মের স্থান বেছে নিলেন তিনি জেনিভা। ১৮৬৭-র আগসটে লিখতে শুরু করলেন, বই শেষ করলেন ফ্লোরেন্সে এসে, ১৮৬৯-এর জানুয়ারিতে। নিরবচ্ছিন্ন লিখতে পেরেছেন, তা নয়—কোন দিনই নিরবচ্ছিন্ন লেখা হয় নি তাঁর। পদে পদে বাঁধা এসেছে, বিভ্রান্ত করেছে তাঁকে, বিকল করেছে তন্নিষ্ঠ মন—এবারও তাই হল, লাগাতার অভাব ত ছিলই তার ওপরে বার বার অসুখে পড়লেন, শোক পেলেন একটা মর্মান্তিক। জুয়ার নেশার ত কথাই নেই মাঝে মাঝেই সে এসে দুষ্ট-গ্রহের মতন ভড় করেছিল তাঁর ঘাড়ে।

কিন্তু সৃষ্টির নেশা যেহেতু তাঁর রক্তে বিবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লেখা ঠিকই এগিয়ে চলছিল। চলেতেই হবে কেন না ইতিমধ্যে 'রসকি ভিসৎনিক' চার হাজার পাঁচ শ' রুবল ধার দিয়েছে এবং ওই ৪৫০০ রুবল উশুল করতে প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছে আরও ১০০ রুবল করে বিদেশে তাঁর ধড়ে প্রাণ রাখতে।

'ইডিয়েট্' রচনার পরিকল্পনা বস্তুত 'পাপ ও শাস্তি' রচনার সময়তেই তাঁর মাথায় এসে ছিল। উনবিংশ শতকের বুদ্ধিজীবী যৌবনের মনে যে-নিদারুণ সংকট দেখা দিয়েছিল 'পাপ ও শাস্তি'র নায়ক রাসকলনিকফ্ ছিল সেই মানসিকতারই প্রতীক। তদর্থে রাসকলনিকফের মনের মধ্যে যা ঘটেছিল তা তার ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে যতটা উদ্বুদ্ধ ততোধিক সমকালীন জাতীয় চরিত্র থেকে। শুধু জাতীয় বললেও সব বলা হবে না—বলা উচিত ওটা এই পৃথিবীতে জাত সব

মানুষেরই মানসিক সংকট। পৃথিবীর সমকালীন মানবতার সংকট পূর্ণবেগে বিস্ফোরিত হয়েছিল তখনকার রাশিয়ার যৌবনে। যেহেতু সেখানেই স্ববিরোধ সব থেকে তীব্র হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর ভাবজগতের সংকট এ-ভাবে রুশ-জীবনে সংঘটিত হওয়াতে দস্তয়েফ্‌স্কির উপন্যাস জাতীয় হয়েও বিশ্বজনীন তাৎপর্য পেয়েছে। এবং আজ এই বিশ শতকের শেষ পাদে সেই দ্বান্দ্বিক সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠায় উপন্যাসটি আজকের কালেরও পথিকৃৎ নিঃসন্দেহে।

কিন্তু 'ইডিয়েট' ও 'পাপ ও শাস্তি'র মধ্যে পার্থক্য এই যে, দু'খানি উপন্যাসই মানবীয়-সংকট নিয়ে রচিত হলেও 'পাপ ও শাস্তি'তে সংকট যতখানি ব্যক্তিগত 'ইডিয়েট্‌'-এ সংকট ততোধিক সমষ্টি-ভিত্তিক। 'পাপ ও শাস্তি'তে সংকটের শিকার একমাত্র রাসকলনিকফ্‌ ও তারই প্রতিচ্ছায়া স্‌ভিদ্রিগাইলফ্‌। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রদের এ-সংকট বাহ্যত স্পর্শ না করায় তারা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত ও সুস্থ থেকে যেতে পেরেছে। কিন্তু 'ইডিয়েট্‌' উপন্যাসে আমরা দেখি সমস্ত চরিত্ররাই হয়ে উঠেছে সংকটের শিকার। তদানীন্তন সময়ের সংকট কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না। প্রত্যেকে ক্ষতবিক্ষত। তাদের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে। জীবন-রস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে প্রত্যেকের। ফলত 'পাপ ও শাস্তি'র জগতের চেয়ে 'ইডিয়েট্‌'-এর জগৎ আরও বেশী ভয়ংকর এবং বিয়োগান্ত। 'ইডিয়েট্‌'-এ চরিত্ররা যেন জ্বরাক্রান্ত, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। এদিক থেকে ওই দু'খানি উপন্যাস একই রোগের দুই অবস্থা। 'পাপ ও শাস্তি'তে যে বিষবৃক্ষ ছিল অংকুর মাত্র 'ইডিয়েট্‌'-এ তাই ডালে পল্লবে সব রৌদ্র অন্ধকার করে ভয়ংকরের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে দূরে বিদেশে থেকে তিনি স্বদেশকে সামগ্রিক ভাবে দেখবার ও চিনবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি সেখানে বসে রাশিয়ায় প্রকাশিত দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁটিয়ে পড়তেন। তখনকার রুশীকাগজগুলি আইন আদালতের পাতায় বিচারের খুঁটিনাটি বিবরণ বিশদ ভাবে প্রকাশ করত। নৈতিক অধঃপতন, চুরি ডাকাতি ও বিবিধ বিপজ্জনক অপরাধের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্যে কাগজে থাকত আতঙ্ক। জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকত নিদারুণ ভয় ও ভাবনা। দস্তয়েফ্‌স্কি খবরের কাগজের লাইনগুলির মধ্যে দেখতে পেতেন সামগ্রিক জাতীয় সংকটের করাল ছায়া। এ-রকম সংকটেই জাতিকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন এমন বিশ্বাস অবশ্য সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি তিনি তাই বলে সবলে বর্জন করতে পেরেছিলেন, তাও নয়।

ফলত কখনো মনে করেছেন ঈশ্বর আছেন, কখনো মনে হয়েছে ঈশ্বর মানুষের একটা অলীক সান্ত্বনা মাত্র। এই দোলাচল চিত্তেরই সৃষ্টি 'ইডিয়েট্'। উপন্যাসখানি গড়ে উঠেছে আলো ও অন্ধকার আর মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের বিরোধীয় পটভূমিকায়। এই ধূসর-পটভূমিতেই একটি নিষ্কলঙ্ক সৎ মানুষকে 'a positive good man'-কে উপস্থিত করেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি। এই সৎ-এর সাহচর্যে আসা মাত্রই কেমন করে একে একে সব মানুষের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে, বানানো মুখোশ খসে যায়, দস্তয়েফ্‌স্কি তাই দিব্য দীধিতিতে বিধৃত করে আমাদের দেখিয়েছেন ; কিন্তু তাঁর স্বপ্নের সেই মানুষ 'যথার্থ সৎ' স্বপ্নই থেকে গেছে। তলস্তয় 'ইডিয়েট্' পড়ে ঠিকই বলেছিলেন—আদর্শ আসলে আদর্শই, তার সরল হেতু হচ্ছে, বাস্তব জীবনে আদর্শ কখনো অর্জন করা যায় না। সে-জন্যই সে আদর্শ। (an ideal is an ideal simply because it is unatainable in real life)। বাস্তবিকও তাই, 'ইডিয়েট'-এর নায়ক প্রিন্‌স মিশকিনের অতিপ্রাকৃত জগতের অধ্যাত্মমূল্য সাংসারিক মানুষের পক্ষে সত্যি অলভ্য।

'ইডিয়েট্' 'পাপ ও শাস্তি'র মতন ঠাসবুনোনির রচনা নয়। একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত বলে 'পাপ ও শাস্তি' ডাসা পেয়ারার মতন নিরেট হতে পেরেছে। কিন্তু 'ইডিয়েট্'-এর বেলা তিনি একটি কাহিনীর সূত্র ধরে এগোন নি বলে রচনা শিথিল ভঙ্গিতে গড়িয়েছে। আসলে একটি ঘটনার সূত্রে সব চরিত্র না বেঁধে একটি 'আইডিয়া'য় সব চরিত্রকে বিধৃত করার চেষ্টা রয়েছে এখানে। এই 'আইডিয়া' তাঁর মানস-সঞ্জাত এমনই এক নিগূঢ় উপলব্ধি-সমৃদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক ভাবানুকল্প যে 'ইডিয়েট্'-এর শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে 'পাপ ও শাস্তি'র মতন বিশিষ্ট-রচনাকেও অতিশয় সাধারণ মনে হবে। মনে হবে 'ইডিয়েট্'-এ দস্তয়েফ্‌স্কি আরও কয়েক ধাপ ওপরে উঠে এসেছেন।

'পাপ ও শাস্তি'র মতন 'ইডিয়েট্'ও এক-নায়ক উপন্যাস। ওখানে যেমন নায়ক রাসকলনিকফ্ প্রতি দৃশ্যেই উপস্থিত এখানেও তেমনি নায়ক প্রিন্‌স্ মিশকিনকে আমরা প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত দেখছি। দস্তয়েফ্‌স্কি রাস্‌কলনিকফের অপরাধ বিষয়ে ছ' শ' পাতা আলোচনা করেছেন এবং মাত্র ছ' লাইনে তার বিশ্বাসে পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন, আর এই কথা বলেই বই শেষ করেছেন যে, পুনরুজ্জীবন হবে নূতন আর একখানা উপন্যাসের বিষয়, আমাদের বর্তমান উপন্যাসের এখানেই ইতি।

কেন না, রাসকলনিকফের মতন বুদ্ধিজীবীকে বিশ্বাসে পুনরুজ্জীবিত করা

কঠিন। বুদ্ধি যে বিশ্বাসের শত্রু! তাই রাসকলনিকফকে তিনি ওমস্কের জেলে 'দর্শনের এক বিন্দু আলো'র (সোনিয়ার) সামনে ফেলে রেখে নিখুঁৎ সৎ মানুষ 'Pasitive good man' আঁকতে 'ইডিয়েট' রচনায় মন দিলেন।

'পাপ ও শাস্তি'তে পরিপ্রেক্ষিত ছিল জিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত। 'ই'ডিয়েট্'-এ সে পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়ে দেখা দিল দৃঢ় বিশ্বাসে, অবশ্য সেদিক থেকে উভয় উপন্যাসের মধ্যে চিন্তার সাযুজ্য আছে কিন্তু পার্থক্য বিস্তর। 'পাপ ও শাস্তি'র আত্মজিজ্ঞাসা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বাইরের ঘটনার সংঘাতে অন্যপক্ষে 'ইডিয়েট্'-এ সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছে অন্তরের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায়, আত্মিক-সংকটে। রিলিজিয়ন (ধর্ম) নয় এথিকসই (নৈতিকতাই) প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ সৃষ্টি নেই যার বিষয়টি সংক্ষেপে বলা যায় না—একমাত্র 'ইডিয়েট্'-ই তার ব্যতিক্রম। প্রাচীন রুশবংশের উত্তর-পুরুষ একজন প্রিন্স উপন্যাসটির নায়ক। শৈশব থেকেই সে মৃগীরোগে ভুগে আসছে, ফলে তার দেহের শক্তি ও মানসিক সামর্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত। গল্পের শুরুতে দেখা যাচ্ছে সে উত্তরাধিকারসূত্রে-পাওয়া সম্পত্তির দখল নিতে সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার আগেই বিদেশের এক স্বাস্থ্য-নিবাস থেকে দেশে ফিরে আসছে।...এখানে দু'টি যুবতী তার প্রেমে পড়ে। একজন এক জেনারেলের কনিষ্ঠ কন্যা আর একজন এক বণিকের উপেক্ষিত রক্ষিতা। প্রিন্স্ দু'জনকেই সমান ভালবাসে কিন্তু অসহায় বলে উপেক্ষিতার প্রতি দয়াবশত তাকেই বিয়ে করবে বলে স্থির করে কিন্তু অনুগৃহিতা নারী প্রিন্সকে এই ত্যাগ স্বীকারের হাত থেকে বাঁচাতে পালিয়ে যায় ও রোগোজিন নামক আর একজন প্রেমিককে বিয়ে করে। কিন্তু রোগোজিনের ধারণা হয় নাসতাসিয়া তার চেয়ে প্রিন্সকেই বেশী ভালবাসে, এই ধারণার বশে ক্রুদ্ধ সে নাসতাসিয়াকে খুন করে বসে। তারপর প্রিন্স ও রোগোজিন সেই নিহতের পাশে বসে রাত কাটায়। হত্যাকারী ধরা পড়ে ও বিচারে তার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন হয়। জেনারেলের মেয়ে বিয়ে করে একজন জোচ্চোরকে, সে-পুরুষ তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। প্রিন্স নিদারুণ মনস্তাপে মর্মাহত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও আবার করে সুইট্জারল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য-নিবাসে ফিরে আসে। এ ছাড়া উপন্যাসে উল্লেখ্য আরও একটি পার্শ্ব-চরিত্র আছে : সে এক যুবক। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত এই যুবক আত্মহত্যা করতে চেয়ে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনে। প্রসঙ্গত প্রিন্স মিশকিন বর্ণিত মৃত্যুদণ্ডের ভয়ংকর দৃশ্যও পাঠকের মনে চিরস্থায়ী দাগ কাটবে।

কিন্তু এতে করে পাঠক কিছুই বুঝতে পারলেন না, যে হেতু এই সংক্ষিপ্ত সারে কোন গল্পাভাস নেই, রয়েছে কাহিনীর নিছক কাঠামোটা মাত্র। বইটি সম্পূর্ণ পড়ে ফেলার পরে পাঠক যে-তীব্র আত্মবোধের গভীরে তলিয়ে যাবেন ওই কাঠামোর মধ্যে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত মিলবে না, কেন না, দেওয়া যায় না— এ-উপন্যাস ত কাহিনী নয়, ক্ষতবিক্ষত সত্তার আকুল আকুতি। দস্তয়েফ্স্কির সমস্ত রচনার মধ্যে এটাই হয় ত মূক-যন্ত্রণার সব চেয়ে সোচ্চার রচনা। তৎসত্ত্বেও কিংবা তদবস্থ বলেই এ-বইখানা তাঁর সব রচনার চেয়ে অপ্রমত্ত ও পবিত্র। দস্তয়েফ্স্কির অন্যান্য প্রধান রচনাগুলির তুলনায় এই বইখানিতেই ওই অপ্রমত্ত-বোধ সমান ও সার্থক ভাবে প্রথম থেকে শেষ অব্দি প্রসারিত হয়ে আছে। শুদ্ধ-চিন্তার লেখক বলে যে-সব সমালোচক দস্তয়েফ্স্কিকে চিহ্নিত করেন, কথা-শিল্পীর চেয়ে চিন্তা-নায়ক বলে যাঁরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন, যাঁরা তাঁকে নূতন অন্তর্জগতের স্রষ্টা বলে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা দস্তয়েফ্স্কির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সকলের প্রথমে স্থান দেন 'ইডিয়েট্'কে। তাঁরা তাঁর সব উপন্যাস শেষ করে এখানেই আবার করে ফিরে আসেন।

হেতুটা অতিশয় স্পষ্ট। দস্তয়েফ্স্কির যে-দক্ষতা তাঁকে সর্বকালের ও সর্বদেশের 'চিরকালের-আধুনিক' শিল্পীর সম্মান দিয়েছে সে তাঁর মানসজগৎ সৃষ্টির নূতন পরিপ্রেক্ষিত। আমাদের জন্যে এক অব্যাখ্যেয় জগৎ সৃষ্টি করে তিনি সে-জগতে আমাদের উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁরই হাত ধরে আমরা অস্তিত্বের এক উন্নততর স্তরে উপস্থিত হতে পেরেছি। সেখানে আমাদের পুরনো বিশ্বাস, আশা, ভয়, আদর্শ সব—সমস্ত নিরর্থক হয়ে গেছে কিংবা সেই সনাতন সব ধারণাগুলিই নূতন অর্থ ও তাৎপর্য পেয়ে আর এক দীধিতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর এসব সমস্তই সার্থক ভাবে ঘটেছে 'ইডিয়েট্'-এ। নায়ক প্রিন্স মিশকিন আমাদের প্রাত্যহিক জগতের মানুষ নয়, এমন কি সে রাশিয়ার একলারও নয়। আসলে সে কোন বিশেষ দেশ কাল ইতিহাসেরই সীমিত কেউ নয়, সে এক অধরা আদর্শ যা প্রাত্যহিক জগতে সাধারণ প্রকৃতিতে কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠলে আমরা তাকে 'আমার-মানুষ' বলে স্পর্শ করতে পারি—নিজের বোধ দিয়ে, উপলব্ধি দিয়ে, তাকে চিনতে বুঝতে পারি কিন্তু অলৌকিকের আড়ালে বলে তাকে নিত্য-দিনের ব্যবহারের মধ্যে সত্য করে পাই নে। আসলে সে আমাদের জীবন-রহস্যেরই স্বরূপ, বাস্তব জগতের সঙ্গে সংপৃক্ত সে দিব্য-জীবনের উপলব্ধির সত্য হয়ে আছে।

এই অকলুষ 'সৎ' চরিত্র দস্তয়েফ্‌স্কির রচনায় একমাত্র প্রিন্‌স্‌ মিশকিনই নয়, আরও আছে তাঁর পরবর্তী রচনায় যেমন—('পদ্রোসতক') 'গেঁয়ো ছেলে'-তে তীর্থ যাত্রী মাকার দলগোরুকি, 'দ্য ডেভিলস'-এ বিশপ তিখোন, 'কারামাজোভ ভাইরা'-তে এলডার জোসিমা ও আলিওশা—এই সব চরিত্রের মধ্যে দস্তয়েফ্‌স্কি জীবন-রহস্যের অতন্দ্র অনুসন্ধানের প্রয়াস প্রতিপন্ন করে গেছেন।

লেখার সময় দস্তয়েফ্‌স্কি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। এটা তাঁর বরাবরকার বিশ্বাস ছিল যে, নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া বড় কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না। জেনিভায় এসেই 'তনি সেই নিয়মে বেঁধে ফেলেছিলেন নিজেকে। জেনিভায় সকাল হয় এগারোটায়। তখন উঠেই তিনি লিখতে বসতেন আর আন্না বেরিয়ে পড়তেন শহর দেখতে। দুপুর বেলা-তিনটেয় তাঁরা কোন রেস্তোরাঁয় যেতেন। সেখানে ডিনার সেরে আন্না ফিরে আসতেন ফ্ল্যাটে, একটু ঘুমিয়ে নিতেন আর দস্তয়েফ্‌স্কি যেতেন কাফে দ্যু-মোঁদে-তে। রুশী ও অন্যান্য বিদেশী কাগজ পড়তেন কিছুক্ষণ, শেষে ফিরে এসে পড়ার ঘরে ঢুকতেন। বিকেল সাতটায় আবার দু'জনে বেড়াতে বেরোতেন।

সন্ধ্যার ধূপছায়া গাঢ় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের শো-কেসগুলি আলো-ঝলমল করে, শহর রোশনাইতে ভরে যায়। তখন তাঁদের খুব ভাল লাগে। হাঁটেন, আর মাঝে মধ্যে শো-কেসগু'লর সামনে এসে দাঁড়ান। পকেটে পয়সাকড়ি থাকলে এটা-ওটা কেনেন তারপর ফিরে আসেন ঘরে। আন্না আগুন জ্বালেন। চা হয়, দু'জনে বসে চা খান। তখন গত রাতে ও সকালে যা লিখেছেন তার থেকে ডিকটেশন দেন আন্নাকে কিংবা কোন একখানা প্রিয় বই থেকে কিছু অংশ আন্নাকে পড়ে শোনান। ডিকেনসের 'নিকোলাস নিকলবী' ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির প্রিয় বই। য়ুগোর 'লে মিজেরাবল' বালজাকের 'পের গোরিও'-ও ছিল তাঁর সমান প্রিয়। এ-বইগুলি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। আন্নার শিগগিরই সন্তান হবে। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটাতেন সেলাই আর বোনা নিয়ে। আর দস্তয়েফ্‌স্কি মগ্ন হয়ে থাকতেন 'ইডি:য়ট্‌'-এর মধ্যে।

দুরন্ত চরিত্রের বেহিসেবী মানুষটি কেবলই বসে বসে লিখছেন—রাতকে দিন দিনকে রাত করছেন লিখতে লিখতে, ভাবতে ভাবতে; কেমন বেখাপ্পা লাগত আন্নার, ভয় করত। ভাবতেন, যে-কোন সময় লোকটা পাগল হয়ে জুয়া খেলতে ছুটবে কিংবা কৃচ্ছ্রসাধনার পণ রাখতে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

ভাবতে ভাবতে দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন আন্না, নিজেই এগিয়ে এলেন, 'এ তোমার সহ্য হবে না—একটানা এত চিন্তা, এত শ্রম। একটু বিশ্রাম দরকার, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অন্যমনস্ক হওয়া দরকার, নইলে অসুখ করে বসবে।'

'কী বলছ তুমি?' দস্তয়েফ্স্কি ভ্রূ কোঁচকান।

ঢোক গিলে আন্না বলেন, 'জুয়া খেলা তোমার একটা প্রিয় নেশা, ওটা যদি আমার জন্যে জোর করে চেপে রেখে থাক ত খারাপ হবে, অসুখ বাধাবে তখন, তার চেয়ে খেল। তাতে করে তোমার মাথায় একটানা ভাবনার চাপ কমবে। মাথাটা খোলশা হবে আরও। লেখা আরও ভাল হবে।'

দস্তয়েফ্স্কি জীবনে বুঝি এমন অবাক হন নিঃ বলে কী মেয়েটা, যাতে তার সর্বনাশ, যাতে তার উপবাস সেই বিপদ সে স্বেচ্ছায় ডেকে আনছে! বললেন, 'ওই করে আমি তোমার অনেক ক্ষতি করেছি অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে।'

'আমার ক্ষতি আমার কষ্ট হোক, তুমি ত আনন্দ পাবে, তোমার ত লাভ হবে। আখেরে সেই ত আমার লাভ, সেই ত আমার সুখ।'

দস্তয়েফ্স্কির মধ্যে হঠাৎ শয়তান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি লুব্ধ হলেন, ঠিক আছে, কঠিন কাজের মাঝে মাঝে ছেদ প্রয়োজন, বিরাম প্রয়োজন, মাথাটাকে ধুয়ে সাফ করা প্রয়োজন— জুয়া সে-প্রয়োজনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

কাছে পিঠে সাকস্যা লে বাঁ্যা কেসিনোতে আছে রুলেত: অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে চলে গেলেন তিনি সেখানে। রুলেত-টেবিলে বসতে না বসতে ১৩০০ ফ্রাঁ জিত। নিজেকে সংযত করে উঠে দাঁড়ালেন দস্তয়েফ্স্কি, আর না। এই এক গোছা নোট আন্নার হাতে তুলে দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে তিনি তক্ষুনি ছুটলেন ট্রেন ধরতে। কিন্তু ধরতে পারবেন কেন? শয়তান যে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছিল। তিনি স্টেশনে পা দিতে-না-দিতে ট্রেনটা বাঁশী বাজিয়ে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অগত্যা তিনি আবার এসে বসলেন রুলেত-টেবিলে। দুষ্ট-বিধাতা যা দিয়েছিল এবার সবই আবার কেড়ে নিল; শুধু তাই না, ঘড়ি আংটি ওভারকোট সবই বন্ধকীর দোকানে গেল তাতেও ভাগ্য ফিরল না। জেদের মাথায় কেবল শীতে আর অনাহারে কষ্ট পেলেন কয়েক দিন, শেষে আন্নার পাঠানো টাকায় থার্ডক্লাশের একখানা টিকিট কেটে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করতে করতে ঘরে ফিরলেন তিনি। আন্না খুশী হলেন। তবে ঘটে কিছু সুবুদ্ধি আছে মানুষটার, টাকাটা জুয়ার টেবিলে ডালি না দিয়ে টিকিট কেটে ঘরে ফিরেছেন।

সত্যি সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে তাঁর—রুলেত-টেবিলে মার খাওয়ার শোধ তুললেন তিনি টানা একশ পাতা লিখে, নবেম্বর মাসটা পুরোই বুঁদ হয়ে থাকলেন লেখায়। কিন্তু এত পরিশ্রম সইবে কেন দুর্বল স্নায়ুর মানুষটির। মাঝে মাঝে মৃগীর ব্যামোটা চেপে ধরছিল তাঁকে, এবার নূতন উপসর্গ জুটল হৃদ্‌কম্প। হতাশ হয়ে বলেন, 'এমন চমৎকার এগোচ্ছিল উপন্যাসটা, বুঝি আর শেষ করতে পারব না, তার আগেই মরে যাব। বিষণ্ণ হয়ে যান তিনি, বিষাদে ভরে ওঠে মন। কিন্তু আন্নার বিশ্বাসে চিড় ধরে না। ভরা মাসের ভারী শরীর নিয়েই তিনি স্বামীর সেবা করেন, উৎসাহ দেন, ধীরে ধীরে আশংকার মেঘ কাটে। মেঘ যত ঘন-ঘোরই হোক আন্নার অবিচল মনের শক্তি মেঘ ভেদ করে সূর্য শিকার করে আনে।

১৮৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের একটি মেয়ে হল। উঃ, দস্তয়েফ্‌স্কির সে কী সুখ সে কী আনন্দ। 'ইডিয়েট্'-এর প্রথম অংশ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ আর এগোচ্ছিল না। মেয়ে জন্মাতে লেখা শিকেয় উঠেছে তাঁর। তিনি মেয়ের কাছেই বসে থাকেন সব সময়। তন্ময় হয়ে মেয়ের মুখ দেখেন আর ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল মুখ তুলে আন্নার দিকে তাকান। সন্তান-ক্ষুধাতুর মানুষটির বুভুক্ষু পিতৃস্নেহ ৪৬ বছরে এসে পূর্ণ হয়েছে, এ সুখের তুলনা কোথায়।

এখন মাসে ন্যূনতম একটা টাকার নিশ্চয়তা এসে গেছে; কাৎকফ্ মাসে মাসে এক শ' রুবল করে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সন্তান হওয়া বলে কথা—সে-বাবদে বেশ কিছু টাকা নেমে গেছে, তাছাড়া উড়নচণ্ডী মানুষের হাতে টাকা পড়লে উবে যেতে কতক্ষণ; শাশুড়ীর কাছ থেকেও কিছু অর্থ-সাহায্য পেয়েছিলেন তবু অভাব যথাপূর্বম্। কিন্তু সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছে সোনিয়া। জুয়ার নেশাও যেন মেয়ের নেশার কাছে হার মেনেছে। আন্না মেরী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন,—আমি যা পারলাম না মেয়ে যেন তা পারে, মেয়ের মিষ্টি-হাসি যেন জুয়ার নেশা ভুলিয়ে দিতে পারে বাপের।

'দেখ, দেখ, তোমার দিকে তাকিয়ে সোনিয়া কেমন মুখটিপে হাসছে।'

'আমার দিকে ও তাকিয়ে থাকে সব সময়।'

'উহুঁ তা কেন, আমার দিকেও তাকিয়ে থাকে।' আন্না সোনিয়ার চোখের সামনে আঙুল নাড়ে, বলে, 'ওই দেখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে কেমন খলখল করে হাসছে।'

'বটে, চালাকি, এই দেখ তবে, 'সোনিয়া, সোনিয়া', দস্তয়েফ্‌স্কি মেয়েকে

ডাকতে ডাকতে দূরে সরে যেতে থাকেন। মেয়ে স্বর লক্ষ্য করে ঘাড় ঘোরায়, তাঁর দিকে চেয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, শেষে তাঁকে চোখের আড়াল হয়ে যেতে দেখে, আর না দেখে, ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। তিনি ছুটে আসেন। 'কেমন দেখলে, সোনিয়া কাকে বেশী ভালবাসে, দেখলে!'

'বেশ আমি তবে উঠি।' আন্না মেয়ের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতেই মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'কী হল এখন?'

'হবে আবার কী, ওর ক্ষিধে পেয়েছে তাই কাঁদছে। দুধ দাও।'

'ভাঙবে তবু মচকাবে না।' আন্না কটাক্ষ হেনে নিকটে এলেন।

সুখ। এর নামই সুখ। কিন্তু লিখতে বসলে সে-সুখ কোথায় মিলিয়ে যায়, লিখতে পারেন না—লেখেন, কাটেন, ছিঁড়ে ফেলে দেন। শেষে গুম হয়ে বসে থাকেন। লিখতে না পারার অসন্তোষে মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই মনের অবস্থা জানিয়ে মাইকফ্‌কে তিনি লিখেছিলেন তখন: "……কোথায় যেন একটা ত্রুটি, কিসের একটা অভাব থেকে যাচ্ছে, যেমন করে লিখতে চাই তেমনটি কিছুতেই হতে চাইছে না।……এটা একটা বিরাট সমস্যা। মানুষের নৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্ন নিয়ে মূলত তৈরি হয়ে উঠছে 'ইডিয়েট্'। আসলে ওটাই উপন্যাসের ভিত। আমি দেখাতে চাইছি খ্রীষ্টানুরক্তি ও পবিত্র ভালবাসার সঙ্গে কাম ও আত্ম-পরায়ণতার সংঘাত; কিন্তু দেখাতে ঠিক পেরে উঠছি বলে মনে হচ্ছে না।……"

অস্থির অসন্তুষ্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে আন্নার বুক কেঁপে ওঠে। সোনিয়ার কচি দু'হাত কী বাপের গলা জড়িয়ে ধরে কাছে রাখতে পারবে, তার মিষ্টি হাসির টান কী জুয়ার টানের থেকে বেশী হবে? আন্না ভাবেন, আশঙ্কায় বিবর্ণ হয় মুখ, এই সব অস্থির বিষণ্ণ সময়গুলি বড় বিপজ্জনক অথচ আজ ত শুধু তাঁরা দু' জন নন—মেয়ের ভাবনাও আজ তাঁদের ভাবতে হবে, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হবে কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ চিন্তা কী মানুষটির আছে?

নেই। আন্নার আশঙ্কাই সত্যি হল। সর্বনাশের নেশায় আবার পেয়ে বসল তাঁকে। এত সুখ বুঝি সইছিল না তাঁর স্নায়ুতে কিংবা একটানা সুখও বুঝি এক সময় বড় বেশী একঘেয়ে হয়ে ওঠে, দুঃখ পেতে ইচ্ছে করে তখন। সর্বনাশের মুখোমুখি বসতে না পারলে যেন মনেই হয় না বেঁচে আছি। অস্থির মানুষটি একদিন আবার সাক্সঁা-লে-ব্যাঁ-এর টিকিট কেটে বসলেন। বললেন,

'একঘেয়ে দিন আর কাটছে না, কিছু লিখতে পারছি না। যাই, বৈচিত্র্যের মধ্যে দু'দিন কাটাতে পারলে হয় ত এই ধূসর সময় পেরিয়ে আসতে পারব।'

আন্না চুপ করে রইলেন—একটা ঝড়ো উন্মাদনা চাই তাঁর। সর্বনাশের শেষ প্রান্তে পা রেখে শিউরে উঠতে না পারলে বুঝি মনের জড়তা কাটবে না, তিনি লিখতে পারবেন না এক লাইনও।

সেই আবার শুরু হল অর্থক্ষয় আর মনস্তাপ। দূরে গিয়েই দুর্বার হয়ে উঠল আন্নার আর সোনিয়ার টান। যত হারেন ততই যেমন মরিয়া হয়ে ওঠেন, তেমনি আন্নার জন্যে সোনিয়ার জন্যেও ততই আকুল হয়ে ওঠে তাঁর মন। 'তোমরা আমার চোখের মণি, তোমরা আমার জীবন অথচ তোমাদের দিকে না চেয়ে জুয়ায় মেতে সর্বনাশ করছি নিজের, বিষিয়ে তুলছি তোমাদের⋯⋯আর না, সব খুইয়ে ফেলেছি শেষ বারের মতন এক শ' ফ্রাঁ পাঠাও। শেষ দান খেলেই চলে আসব। রুলেতের চাকা কী আমার সঙ্গে বার বারই শয়তানী করবে? আমি শেষ বারের মতন দেখে নিতে চাই।'

সেই চিরাচরিত ব্যাপার। আন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। হাতে আছে মাত্র এক শ' কুড়ি ফ্রাঁ। স্বামী চেয়ে পাঠিয়েছেন এক শ' ফ্রাঁ। তিনি আশা করেন এবার তিনি কিছু জিতবেন। জিততে যদি না পারেন ত পরামর্শ দিয়েছেন কিছু বন্ধক রেখে সংসার-খরচ চালিয়ে নিতে। এ হেন চিঠি পেয়েও আন্না শান্ত থাকলেন। এবং একশ' ফ্রাঁই পাঠিয়ে দিলেন। সে-টাকাও দস্তয়েফ্‌স্কি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না—হার-জিতের নাগর দোলায় দুলতে দুলতে পরাজিত বিপর্যস্ত মানুষটি অনুশোচনায় মৃতপ্রায় হয়ে শেষমেশ ফিরে এলেন শূন্য হাতে। তারপরে চার পাঁচটা সপ্তাহও বুঝি কাটল না। সুখের নীড়ে অভিশাপ নেমে এল। বাপের অদর্শনে মনমরা মেয়ে শীর্ণ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ নিয়ুমোনিয়ায় ধরে বসল তাকে। বাপ-মায়ের মনে নির্মম দাগা দিয়ে মে মাসের ২৪ তারিখে চোখ বুজল সোনিয়া।

"কী সর্বনাশ করেছি জান, আলেয়ার আলোর পেছনে ছুটে ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছি আমি। মরীচিকার নেশার পাপে আমার চরম শাস্তি হয়েছে, আমার সোনিয়া মরে গেছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার⋯⋯।" বন্ধুকে লিখলেন তিনি।

বস্তুত সোনিয়ার অসুখের প্রথম দিন থেকেই কাঁদছিলেন তিনি, সোনিয়ার মৃত্যুর পরে সে-কান্না সে-শোক ঝড়ের মতন আছড়ে আছড়ে শীর্ণ বিবর্ণ করে

ফেলেছিল তাঁকে। আন্না লিখেছেন, "মানুষটির দিকে তাকিয়ে আমি সন্তান-শোকও ভুলে গিয়েছিলাম। ওঁর দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে শিটিয়ে উঠতাম। যে-কোন মুহূর্তে মানুষটি বুঝি মূর্চ্ছা যাবে আর উঠবে না।"

জেনিভা অসহ্য হয়ে উঠল তাঁদের কাছে। জেনিভা থেকে যত দূরে পারেন পালাতে পারলে যেন বাঁচেন আন্না, দূরে অনেক দূরে না নিয়ে যেতে পারলে বুঝি এই শোক-পাগল মানুষটিকে বাঁচাতে পারবেন না আন্না। কিন্তু বেশী দূরে যাওয়ার পয়সা কোথায়? কাছাকাছি শহর ভিভে-র টিকিট কেটে স্টিমারে চড়ে বসলেন তাঁরা।

লেক-জেনিভার জল কেটে স্টিমার চলেছে—বিলীয়মান তটভূমির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দস্তয়েফ্‌স্কি ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে উঠলেন, আন্না অবাক হয়ে শুনলেন, ঈশ্বর ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে স্বামীর নির্মম সমালোচনা। 'কারামাজোভ ভাইরা' উপন্যাসে ইভান যে ভাষায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল অবিকল সেই ভাষা (অথচ কত পরে লেখা ওই বই) না, তখন দস্তয়েফ্‌স্কির মনে না ঈশ্বরে বিশ্বাস না বিদ্রোহ তাঁর কণ্ঠে তখন নিয়তির নির্মম আঘাতে পর্যুদস্ত মানুষের গোঙানি কেবল।

টাকার অভাবে ভিভে-র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গোটা গ্রীষ্ম কাটাতে হল তাঁদের। দস্তয়েফ্‌স্কির স্বাস্থ্য টিকছিল না। শোকের ওপরে আবার মৃগীর অসুখটা বার বার জেরবার করছিল তাঁকে। কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার মানুষ শক্ত কব্জিতে কলম ধরেছিলেন তখন। দিনরাত জ্ঞান ছিল না; বিছানায় উঠে বসতে পারলেই কলম নিয়ে বসতেন। এ-সময়ে আন্নার মা সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁরই অর্থানুকুল্যে কোন মতে তাঁরা ইতালি এসে পৌঁছলেন। তখন সেপ্‌টেমবর মাস। আন্নার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে সুতরাং মিলানে এসে থামতে হল তাঁদের। তারপর মাইকফের সাহায্য এলে নবেম্বরের শেষে ফ্লোরেন্‌সে এসে পৌঁছলেন। ১৮৬২-তে আর একবার তিনি এসেছিলেন ফ্লোরেন্‌সে, সেদিন স্ত্রাখফ্‌ ছিলেন সঙ্গে আর ছিল য়ুগোর সদ্য-প্রকাশিত বই 'লে মিজেরাবল্‌'। সেই বই পড়তে তিনি এমনই মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে স্ত্রাখফ্‌ টানাটানি করেও তাঁকে হোটেলের বার করতে পারেন নি। সেদিনের সেই না-দেখা ফ্লোরেনস এবার তিনি প্রাণ ভরে দেখলেন। দেখলেন বিশ্ববিখ্যাত দুই আর্ট গ্যালারি—'পালাজো পিত্তি' আর 'য়ুফিজি', সব অমর চিত্রের সংকলন। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে সেগুলির উল্লেখ তিনি মাঝেমাঝে

করেছেন। এবং এই ফ্লোরেন্সে বসেই ১৮৬৯-এর প্রথম দিকে শেষ করেছেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতি 'ইডিয়েট্'।

'ইডিয়েট্' লিখে তিনি আরও বিখ্যাত হলেন বটে কিন্তু তাঁর আর্থিক অনটন পূর্ববৎই থেকে গেল। এতদিন কাৎকফ্ নিয়মিত টাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হিসেব করে দেখা গেল চুক্তির চেয়ে তিনি দু' হাজার রুবল বেশী নিয়েছেন। ঠিক হয়েছে ওই টাকা পরবর্তী উপন্যাসের অ্যাডভান্স হিসেবে জমা থাকিবে। কিন্তু এখন? এখন কী করে সংসার চলবে? আর ত কাৎকফ্ টাকা দেবে না অথচ পাশাকে এমিলাকে টাকা জুগিয়ে যেতে হবে, তার ওপরে রয়েছে নিজের সংসার। জুয়া খেলে বার বার তিনি ফতুর হয়েছেন, কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট করে আন্নাকে কষ্ট দিয়েছেন কিন্তু কখনো পাশা কিংবা এমিলাকে টাকা পাঠাতে কসুর করেন নি। আজ সেই কর্তব্য পালনের অক্ষমতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করবে বই কি, তারা যে তাঁর মুখ চেয়ে থাকে।

'ইডিয়েট্' লেখা শেষ হয়ে গেলে তাই চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি। টাকা চাই, টাকা না হলে সব অচল। উপবাস ও অপমানের সামনে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব তিনি যখন ফ্লোরেনসের হোটেলে দুশ্চিন্তার রাত অনিদ্রায় কাটাচ্ছেন তখন আন্নার গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান তিলে তিলে বাড়ছে। আর দস্তয়েফ্স্কির মাথায় বাড়ছে ঋণের চিন্তা; কিন্তু বার বার দেখা গেছে অভাবের চোরাবালিতে যখন তাঁর আমস্তক ডুবু ডুবু অবস্থা তখনই কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারও দিল। হঠাৎ স্ত্রাখফের একটা চিঠি এল—"জারিআ" (প্রভাত) নামে একটা কাগজ বেরোচ্ছে, সম্পাদকমণ্ডলীর ইচ্ছে তুমি কাগজটাতে একটা ছোটখাটো উপন্যাস লেখ।" ডুবন্ত মানুষ যেমন খড় দেখলেও হাত বাড়ায়, তিনি পত্রপাঠ উত্তর দিলেন, "যদি একহাজার রুবল অ্যাডভান্স করে ত এক্ষুনি একটা উপন্যাসে হাত দিতে পারি।" কিন্তু এত টাকা দিতে সম্পাদক অক্ষমতা জানালে দর কষাকষি চলল, শেষ অব্দি তিন শ' রুবলেই রাজী হলেন তিনি। চিন্তা করে দেখলেন উপোষের চাইতে খুঁদের জাউও ভাল।

কিন্তু তিন শ' রুবল হাতে পেয়েও লেখাটা তৎক্ষণাৎ আর হয়ে উঠল না অথচ সেপটেমবরে লেখা দেবার কড়ার করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস গ্রীষ্মের তাপে নিদারুণ গরম হয়ে উঠেছে তাই বলে যে চট্ করে ফ্লোরেন্স ছেড়ে ঠাণ্ডা কোন জায়গায় যাবেন তারও উপায় নেই। হোটেলের ধার শোধ

করতে হবে, মর্টগেজ-দেওয়া জিনিসগুলি উদ্ধার করতে হবে; অগত্যা মে-জুন-জুলাই বসে ফ্লোরেন্সের রৌদ্রে পুড়তে থাকলেন তাঁরা। তার ওপরে ক্রমশ সন্তানের ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন আন্না আর লিখতে না পারার যন্ত্রণায় জ্বলছেন দস্তয়েফ্স্কি। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অবশেষে আবার সাহায্যের হাত বাড়ালেন কাৎকফ্। আগসটের শেষাশেষি তাঁর কাছ থেকে সাত শ' রুবল পেয়ে ইতালির তপ্ত কটাহ থেকে রক্ষা পেলেন তিনি—ভেনিস, ত্রিয়েসৎ প্রাগ হয়ে আবার পা রাখলেন ড্রেসদেনে। দেশের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে থামলেন তাঁরা। সেপ্টেম্বরে জন্মাল আন্নাব দ্বিতীয় কন্যা লিয়ুবভ্। (পরবর্তী কালে এই মেয়েই বাবার জীবনী লিখতে বসে উদ্ভট অপ্রমাণিক নানা তথ্যে ভরে তুলেছিলেন তাঁর স্মৃতির পাতা।) কন্যার জন্মের পরে দুশ্চিন্তা মুক্ত-হলেন দস্তয়েফ্স্কি এবং বসলেন "জারিআ"-র জন্যে উপন্যাস লিখতে।

তিন মাসে ছোট উপন্যাসখানি শেষ হল নাম দিলেন 'ভেচনি মুঝ' (শাশ্বত স্বামী)। উপন্যাসখানি ইডিয়েট-এর মতন অমর সৃষ্টির শ্রমের শেষে ও 'বেসী' (শয়তান)-এর মতন দুরূহ সৃষ্টি-কর্মে হাত দেওয়ার আগে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার অবসরে একটি চিত্তের প্রসাদে পথধরে চলা সাবলীল কলমের অনবদ্য রচনা। মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের বিশ্লেষণে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই উপন্যাসে। প্লটের বিন্যাসেও সেই চাতুর্য সমান সপ্রতিভ। উপন্যাসের স্বামী, প্রণয়ী ও কন্যা লিজা এই তিন চরিত্রই দক্ষ কথাকারের নিপুণ শিল্পকর্ম। ভালবাসা ও ঘৃণার দ্বন্দ্বে জটিল এই কাহিনীর শুরু হয় নাতালিয়া ভাসিলিয়েভনা ত্রুসোৎস্কায়ার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে যখন স্বামী পাভেল পাভলোভিচ্ ত্রুসোৎস্কি স্ত্রীর সংরক্ষিত কতকগুলি পুরনো চিঠির থেকে জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী ন'বছর আগে ভেলচানিনফ্ নামে এক পুরুষের প্রণয়িনী ছিল এবং যাকে তিনি নিজের কন্যা মনে করতেন সেই লিজা ওই প্রণয়ী-পুরুষের ঔরস-জাত সন্তান। কাহিনী জমে ওঠে পাভেলের সঙ্গে পিতার্সবুর্গে ভেলচানিনফের দেখা হওয়ার পর। মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতে সংঘর্ষে কাহিনী কতকগুলি মজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেগে এগোতে এগোতে চরমে ওঠে ঘুমন্ত ভেলচানিনফ্কে খুন করার চেষ্টায় এবং খুন করতে না পারায়।

'পাপ ও শাস্তি' থেকে শুরু করে দস্তয়েফ্স্কির বইগুলি পড়তে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রমের প্রয়োজন হয়; বোঝাই যায় লেখকও যথেষ্ট চিন্তা, যত্ন ও মনোনিবেশ প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু না, এ-বইটি এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম, দুরূহ চিন্তার

থেকে মুক্ত শিল্পী এখানে বাক-পটু বিন্যাস-চতুর শুদ্ধ শিল্পীই কেবল। তা ছাড়া অসম্ভব দ্রুত গতিতে লেখার জন্যেই হয় ত বইখানা দারুণ সাবলীল ও সুখপাঠ্য হয়েছে। 'জারিআ'তে ১৮৭০-এর জানুয়ারি ফেবরুয়ারি—দুই সংখ্যায় উপন্যাসখানি ছাপা হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায়, 'জারিআ'র কাট্‌তি ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় আশাতীত। ফলে 'রসকি ভিসৎনিক'-এর সম্পাদক কাৎকফ্‌ রীতিমত ক্ষেপে ওঠেন। স্বাভাবিক, কেন না বিদেশে তাঁর ধড়ে প্রাণ রাখতে তিনিই ক্রমাগত টাকা যুগিয়ে এসেছেন, 'ইডিয়েট্‌'-এর পাওনা শোধ হওয়ার পরেও ধার পড়ে আছে দু'হাজার রুবল তারপরেও এই সেদিন তিনি সাত শ' রুবল পাঠান তবে দস্তয়েফ্‌স্কি ফ্লোরেনস্‌ থেকে দ্রেসদেনে আসতে পারেন আর সেই উপকারের এই কিনা পুরস্কার, তিনি উপন্যাস দিলেন 'জারিআ'কে। কিন্তু কাৎকফ্‌ রেগেমেগে গাল পেরে চিঠি লিখলেও জেনে গেছেন, ওই অবিবেকী দায়িত্ব জ্ঞানহীন মানুষটার সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না, আবার টাকা চাইলে তাও পাঠাতে হবে যেহেতু আজ রাশিয়ার সব কাগজই এ-মানুষটিকে লুফে নিতে উৎসুক। কিন্তু কাৎকফ্‌ দস্তয়েফ্‌স্কিকে যতই নিমকহারাম ভাবুন তিনি কখনোই বেইমানি করেন নি! আজও যখন "ভেচনি মুঝ" (শাশ্বত স্বামী) শেষ হয়ে গেল তখনই বসলেন কাৎকফের কাগজের জন্যে উপন্যাস লিখতে। 'শাশ্বত স্বামী'-র সাফল্যে উৎফুল্ল 'জারিআ'র সম্পাদক আর একখানা উপন্যাসের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে টাকা অ্যাডভানস করলেন বটে কিন্তু সে-কাগজে দস্তয়েফ্‌স্কি আর লেখেন নি এবং অ্যাডভানসের টাকাটা ফেরত দিয়েছেন তিনি বছর তিনেক পরে। এর হেতুও খুব স্পষ্ট, একসঙ্গে দু'টো উপন্যাস তিনি কোন দিনই লিখতে পারেন না। প্রাণের দায়েও না—সে আমরা আগেই দেখেছি। এবারেও পারলেন না কেন না হঠাৎ একটা টাটকা প্লট তিনি পেয়ে গেছেন, একেবারে হালফিলের ঘটনা।

এ-সময়ে সারা রাশিয়া জুড়েই সন্ত্রাসবাদীরা তৎপর হয়ে উঠেছিল। জার দ্বিতীয় আলেকসান্দারের জীবন-নাশের চেষ্টা দু' দু'বার ব্যর্থ হয়েছে। কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর প্রাণহানির চেষ্টাও সফল হয় নি; কিন্তু ১৮৬৯-এর ২১ নবেম্বরের ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য রকম—এর চিন্তা ও চরিত্র দু'ই আলাদা। এক রুশী দৈনিকের খবরে প্রকাশ: মসকো আর কৃষি-কলেজের ছাত্র ইভানফ্‌কে খুন করেছে নেচায়েফ নামে এক বাইশ বছরের ছাত্র-নেতা। এই ছাত্র-নেতাটি পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৮-৬৯-এ যে ছাত্র-বিক্ষোভ হয় তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করেছিল। তারপরেই সে পালিয়ে আসে জেনিভায়, এখানে সে বাকুনিনের সাহচর্যে আসে ও রুশী বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর বিশ্বাসভাজন হয়। তারপর এখানে সে বাকুনিনের সঙ্গে একযোগে বৈপ্লবিক এস্তেহার প্রকাশ করে কিছুদিন। তার সহযোগিতায় বাকুনিনের 'পিপিলস রেট্রিবিউশন' নামে একটা পত্রিকার দু'টো সংখ্যাও বেরোয়। বাকুনিন সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিশ্ব-বৈপ্লবিক সংস্থার রুশী শাখার সদস্য করে নেন। সেই সদস্যপদের স্বীকৃতি-পত্র হাতে আন্তর্জাতিক নেতা হয়ে সে আসে মস্কোআয়, সেখানে সে পাঁচ-সদস্যের এক-একটি গ্রুপ করে কতকগুলি গ্রুপের এক বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তোলে। এরই এক গ্রুপের সদস্য ছিল ইভানফ্‌। সে নেচায়েফের নেতৃত্ব অস্বীকার করে ও তার অবাধ্য হয়ে ওঠে। দলের শৃংখলা-রক্ষা ও শক্তি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলের সকল সদস্যের সামনে তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় নেচায়েফ্‌, একদিন তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কলেজের হাতার মধ্যে নিয়ে আসে ও খুন করে লাস ফেলে দেয় নিকটের পুকুরের জলে।

সংবাদটা পড়া মাত্রই দস্তয়েফ্‌স্কির টনক নড়ে ওঠে, তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন আন্নার ভাইও ওই কৃষি-কলেজেরই একজন ছাত্র। দস্তয়েফ্‌স্কি তক্ষুনি তাকে ডেকে আনলেন ড্রেসদেনে। তার কাছ থেকে খুঁটেখুঁটে ছাত্রদের মনোভাব, রাজনৈতিক চেতনা আর সংগঠনের ব্যাপার-স্যাপার সব জেনে নিলেন। আর সেই বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে লাগলেন 'বেসী' উপন্যাসের কাঠামো। অতএব 'জারিআ'র জন্যে আর লেখা হয়ে উঠল না তাঁর।

বিদেশে-স্বেচ্ছানির্বাসিত মানুষটির মন তখন দেশে ফেরার জন্যে অস্থির, তার ওপরে আন্নাও ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছেন দেশে ফেরার। তবু সব ভুলে উপন্যাসের জগতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন তিনি, মগ্ন হয়ে থাকছেন। লিখতে লিখতে রাত কখন গভীর হতে হতে আর এক দিনের সকালে এসে ফুরিয়ে যাচ্ছে জানছেন না। উপন্যাসের আয়তন ক্রমশ বাড়ছে, নিহিলিস্ট্‌ নেচায়েফের সংক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ক্রমশ তাঁর হাতে হোমারের রচনার মতন বিশাল হয়ে উঠছে। নীতিবাদ, সামাজিক সংগঠন ও ধর্মের আবর্তের মধ্যে 'ঈশ্বর কী-আছেন?' এই চিরন্তন সংশয়ের প্রশ্নের দিকে এগিয়ে চলে কাহিনী আর তিনিও ক্রমশ স্নায়ু-শিরায় টানটান হতে থাকেন। সৃষ্টির সূতিকাগারে মে মাসের আর্দ্র এলেবেলে বাতাস মোমের ক্ষীণ শিখাটিকে কাঁপাতে থাকে, চায়ের কাপ হাতে তিনি অস্থির হয়ে পায়চারি করেন।

ছয়

লেখা এগোতে চায় না। বিষয় যত জটিল হয়ে উঠতে থাকে ভাবনাগুলি মাথার মধ্যে ততই জট পাকায়। মন তখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আর সেই অন্যমনস্ক মনে এসে হানা দেয় ভয়, সংশয়, হতাশা।

চার বছর তিনি দেশ ছাড়া। এই চার বছরে দেশের মানুষের মনের মাটিতে কত নূতন বোধেরই না অংকুর গজিয়েছে। কতকিছু ঘটে যাচ্ছে সেখানে কিছুই জানছেন না তিনি। তিনি পুরনো হয়ে যাচ্ছেন, পিছিয়ে যাচ্ছেন, মিইয়ে যাচ্ছেন। এ-ভাবে আরও কিছুদিন চললে মাটির রসের অভাবে টবের গাছের মতন শুকিয়ে মরে যাবেন। এ-উপন্যাস ত শেষ হবেই না, নূতন আর কোন উপন্যাসও তিনি লিখতে পারবেন না। তাঁর মনে হল, সাইবেরিয়ার মৃত্যুপুরী থেকে বিদেশের এই স্বেচ্ছানির্বাসন আরও ভয়ংকর, আরও আত্মঘাতী। চার চারটা বছর! মনে হতেই চমকে ওঠেন তিনি—জেনিভা, ভিভে, মিলান, ফ্লোরেনস্, ভেনিস, প্রাগ—ঘুরতে ঘুরতে এখন আবার ড্রেসদেনে অতঃপর কোথায়? দেশে ফিরবেন তিনি কবে? যাঁকে বিদেশের খরচ চালাতে স্ত্রীর স্কাফ' অব্দি মর্টগেজ রাখতে হয় দেশে ফেরার কথা তাঁর পক্ষে ভাবাও অবান্তর অথচ 'বেসী' (শয়তান) শেষ করার স্বার্থেও দেশে ফেরা অপরিহার্য এখন। অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে কাৎকফ্‌কে লিখলেন, 'বেসী' আমি শেষ করে উঠতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। দেশের মাটিতে পা না রাখতে পারলে এ-উপন্যাস কখনো শেষ করা যাবে না।"

চিঠি ডাক-বাক্সে ফেলে ঘরে ফিরে এসে দেখেন আন্না কেমন শিটিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

'কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোমার?'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয়? কীসের ভয়?'

'এখানকার চার্চের রুশী পাদরীটা একটা টিকটিকি। সে সব সময় তোমার পেছনে লেগে আছে।'

'কী করে জানলে?'

'মায়ের চিঠি পেলাম আজ একমাস বাদে, লিখেছে, 'তিনতিনটে চিঠি লিখেছি তোকে, একখানারও উত্তর পাই নি কেন?' তখন পোসট অফিসে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম ব্যাপারটা। পোসট অফিসের কেরানী...'

'কে ? কাতিয়া সোকোভিনা ?'

'হাঁ, বললে, তোমাদের চিঠি তোমাদের হাতে না গিয়ে মাঝেমাঝে ওই পাদরীর হাতে চলে যায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

বললে, 'জান না বুঝি ? সে যে টিকটিকি !'

'বটে !'

'শুধু তাই নয়, এই দ্যাখ একটা এসতেহার, রুশী বিপ্লবীরা বিপ্লবের ডাক দিয়েছে। দ্যাখ, যে-সব বিপ্লবীরা এখনও বিদেশে তাঁদের নামের তালিকা। এতে তোমার নামও রয়েছে, তোমার নামও ছেপেছে ওরা।'

দস্তয়েফ্স্কি আন্নার হাত থেকে এসতেহারখানা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন, নিমেষে কুচি কুচি করে ফেলে বললেন 'এটা এতক্ষণ তুমি ঘরে রেখেছ, আশ্চর্য !'

'কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেই কী রক্ষা পাবে ? এ-এসতেহার তো ওরা একখানা ছাপে নি, আর যাদের হাতে পড়লে বিপদ তারা কী এতক্ষণে পায় নি ভাব ?'

দস্তয়েফ্স্কি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। শেষে হেসে বললেন, 'কয়েদীর গাড়িতেই এবার আমাদের দেশে ফেরার পালা, আন্না। কোন মতে সীমান্ত পর্যন্ত টিকিট কাটতে পারলেই নিশ্চিন্ত, তারপর ওরাই খরচ করে বয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।'

'তুমি জেলের লপ্সি খেতে দেশে যাবে ? তার চেয়ে এই বিদেশে আমরা সকলে এক জায়গায় বসে না খেয়ে মরব।'

কিন্তু ভবিষ্যৎ অতখানি নির্মম ছিল না তাঁদের।

দস্তয়েফ্স্কির চিঠি পেয়ে কাৎকফ্ তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়েছিলেন। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে বন্ধকী মালপত্র খালাস করে তাই দেশে ফিরতে আর দেরি হল না তাঁদের। পথেও কোন অঘটন ঘটল না। সীমান্তে যথারীতি তল্লাসী হয়েছিল কিন্তু আন্না বুদ্ধি করে নিহিলিস্টদের কার্যকলাপের পেপারকাটিং, নোটস, আর 'বেসী'র ওপরে যাবতীয় সন্দেহ-জনক লেখা সুইট্জারল্যাণ্ডে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব সীমান্ত-পুলিশ ও জারের-চর দস্তয়েফ্স্কিকে আর আটক করবে কোন্ সুবাদে ? তাঁরা নির্বিঘ্নে দেশে পৌছলেন। আন্নার প্রেম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, ও অসীম ধৈর্যই জয়ী হল শেষ পর্যন্ত। দস্তয়েফ্স্কি গভীর চোখে তাকান আন্নার দিকে তারপর অন্ধ যেমন

করে তার লাঠি গাছটি ধরে, আন্নার হাত ধরলেন তিনি, বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকের সব বোঝা নামিয়ে দিলেন—সেদিন ১৮৭১-এর এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল জুলাই মাস, গাড়ি ঢুকল পিতার্সবুর্গ স্টেশনে।

আর তারই সপ্তাহখানেক পরে তাঁদের তৃতীয় সন্তান পুত্র ফিওদরকে প্রসব করলেন আন্না (জুলাই ১৮৭১)। তখন তাঁরা থাকছেন একটা হোটেলে। বিদেশ থেকে ট্রাঙ্কে করে যে-সামান্য নিয়ে এসেছেন নিজের বলতে তাঁদের তার বেশী আর কিছু নেই। পুরনো যে-ফ্ল্যাটটায় তাঁরা চার বছর আগে থাকতেন পাশার কাছ থেকে সেটা বাড়িওলা দখল করে নিয়েছে, আর বাকি-ভাড়া আদায় করতে বেচে দিয়েছে মাল-পত্র। দস্তয়েফ্স্কির লাইব্রেরিটা ছিল পাশার হেফাজতে, বইগুলি সব পুরনো বইয়ের দোকানে ঝেড়ে দিয়ে দায় মুক্ত হয়েছে সে। যে-সব বাসন-কোসন আন্না রেখে গিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে সেগুলিও আর তিনি ফেরত পেলেন না—কেউ বললেন হারিয়ে গেছে, কেউ বললেন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়েছে, কেউ খুঁজেই পেলেন না— কোথায় আছে, রেখেছেন। কেবল অপ্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বলে যা কেউ ছোঁয় নি তার ধুলো ঝেড়ে পাওয়া গেল কিছু মূল্যবান রচনার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আর ক'খানা ডায়েরি। অর্থাৎ হোটেলে থাকার খরচ চালাতে অক্ষম তিনি হোটেল ছেড়ে যখন ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে এলেন, ঋণ করে তাঁকে আবার সব কিনে এনে সংসার পাততে হল; নূতন করে ঋণের সংসার শুরু হল দস্তয়েফ্স্কির। কিন্তু এ-সব সমস্যার সব দায় আন্না নিজের মাথায় নিয়ে স্বামীকে মুক্তি দিলেন লেখার জগতে।

দস্তয়েফ্স্কি তখন 'বেসী' (শয়তান) লিখতে মগ্ন।

দু'টি মৌল কাহিনীর ওপরে তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন বইখানাকে। 'এক মহাপাতকের জীবনী' নামে যে বইখানা তিনি লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে নি তারই নায়ক স্তাভরোগিন এক দিকে—তার বিকৃত কাম, নির্মল প্রেম, আর্ত জীবন-জিজ্ঞাসা ও অসহায় নিরবলম্বতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—আত্মহননের পটভূমিতে মাকড়সার জটিল জালের মতন বোনা হয়েছে স্বকালের এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। ওই নৃশংস নাশকতার জালে ক্রমশ জড়িয়ে গেছে উপন্যাসে উপস্থিত সমস্ত চরিত্র। আর সেই মর্মান্তিক সংকটাকীর্ণ সময়ের শিকার হয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রের ভেতরটা বাইরে এসে পড়েছে, যেমন একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে আগাগোড়া থেঁতলে গেলে হয়। এক কথায় এ-বইতে তিনি নির্মম রক্তারক্তি আর রগরগে ষড়যন্ত্রের

চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। চারচারটে খুন দু' দু'টো আত্মহত্যা ছাড়াও রয়েছে সম্ভ্রান্ত মানুষকে দিয়ে সকলের সামনে মেঝের এ মুড়া-ও মুড়া নাক ঘষানো, আগুন লাগানো, জেলা-শাসকের কান কামড়ে দেওয়া ইত্যাদি আর আছে দস্তয়েফ্স্কি-সুলভ নানাবিধ নিষ্ঠুর কৌতুক, বক্রোক্তি এবং শ্লেষ। সবার ওপরে রয়েছে ১৮৬০-এর রাশিয়ার নিন্দার্থে বিশেষিত নিহিলিসট তরুণদের চরিত্র-উন্মোচন। সেদিন সংকীর্ণ অর্থে নিহিলিসট বোঝাত প্রধানত কলেজ ও য়ুনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীদের। এরা ছিল স্বভাব-রুক্ষ। মুখের ওপরে রূঢ় ভাষায় উচিত কথা বলে দিতে দ্বিধা করত না। প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে তাদের সোচ্চার জেহাদ আচারে আচরণেও উগ্র হয়ে উঠত। পোশাকআসাকেও ছিল তারা প্রচলিত রীতির বিপরীত। এরা নোংরা থাকত, অগোছাল থাকত, স্নান করত না। ছেলেরা রাখত লম্বা চুল মেয়েদের মতন, আর মেয়েরা ছেলেদের মতন চুল ছাটতো খাটো করে—তারা চোখে পরত মস্ত সাইজের নীল চশমা, সিগ্রেট খেত আর অবাধ-প্রেমেব প্রচার ও চর্চা করত। ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। সবার ওপরে তাদের কাছে ছিল মানুষ সত্য এবং যা কিছু মূল্য তারা দিত, দর্শনকে নয়, বিজ্ঞানকে। এরা সকলেই সক্রিয় রাজনীতি করত না বটে কিন্তু প্রত্যেকেরই বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি ছিল। এদের মধ্যেও যে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় পার্থক্য আছে এটা সেদিন কেউ বিশ্বাস করত না—সকল বামপন্থী রাজনীতিকরাই নিহিলিসট বলে নিন্দিত হত। নিহিলিসট একটা নিন্দার শব্দ হিসেবেই প্রচলিত হয়েছিল তখন আর দস্তয়েফ্স্কির কলমে সে-নিন্দেই হয়ে উঠেছিল কট্টর সমালোচনার বিষয়। অবশ্য পরবর্তী রচনায় এ-শ্লেষ সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্বে নরম হয়ে এসেছিল। আসলে দ্বিধাবিভক্ত মানুষটি কোন কিছুকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে কিংবা বর্জন করতে পারেন নি। যা হোক, আলোচ্য উপন্যাস রাজনৈতিক হলেও চরিত্রের ভেতরটা বাইরে টেনে আনার শিল্পকর্মটাই ছিল মুখ্য। মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপে উন্মোচন করার দুরূহ সেই চেষ্টার বিরাট ও জটিল পটভূমিতে পর্যবসিত উপন্যাসটি এগোচ্ছিল খুব আস্তে, ধীরে। ফলে ১৮৭২-এর ডিসেমবর এসে গেল বই শেষ হতে, ওই মাসেই 'রুসকি-ভিসৎনিক'-এ শেষ কিস্তি বেরোল তার।

তখনও নেচায়েফের মামলা ঝুলছে আদালতে। সুইস-সরকার সবে মাত্র তাকে ধরে এনে জার-সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই নিয়ে সারা রাশিয়ায় তখন দারুণ কৌতূহল আর উত্তেজনা। এমন প্রত্যক্ষ-রাজনৈতিক

ঘটনার ওপরে রচিত বলে 'বেসী' (শয়তান)-র নাম তখন লোকের মুখেমুখে। বুদ্ধিমতী গৃহিণী এই সুযোগটা হাতছাড়া হতে দিলেন না, নিজেই পাবলিশার হয়ে গেলেন 'বেসী'র। প্রথম মুদ্রণেই ৩,৫০০ কপি ছাপলেন। দাম করলেন তিন রুবল পঞ্চাশ কোপেক। বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায়। ভোর বেলার কাগজে সে-বিজ্ঞাপন পড়ে বেলা ন'টায় এসে দস্তয়েফ্স্কির দরজায় দাঁড়াল পিতার্সবুর্গের তাবৎ বইয়ের দোকানদার। লম্বা লাইন দেখে আন্না শক্ত হয়ে বসলেন: 'দশ কপির কম নিলে কুড়ি পারসেনট, তার বেশী নিলে ত্রিশ পারসেনট কমিশন হাঁকলেন তিনি এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ফেরত বাকি চলবে না। কিন্তু তাতেও পেছ-পা হল না অনেকেই। এক সকালের মধ্যেই চার শ' পনর কপি বই বিক্রি হয়ে গেল।

আন্না তাঁর স্মৃতি-চারণে লিখেছেন, "১৮৭৩-এর ২২ জানুয়ারি আমাদের জীবনের এক স্মরণীয় দিন।" সেদিন থেকে সেই সাফল্যের ব্যবসায় আন্না চালিয়ে গিয়েছিলেন চল্লিশ বছর অব্দি। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে 'বেসী'র তিন হাজার কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আন্না তাঁর ব্যবসায়ের সেই আশাতীত সাফল্যের উৎসাহে প্রকাশনার কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আর দস্তয়েফ্স্কি মন দিয়েছিলেন 'গ্রাঝদানিন' (নাগরিক) পত্রিকার সম্পাদনায়। 'লেখকের দিনলিপি' নাম দিয়ে নিজের মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও বোধকে ধরে রাখার একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল সেই ১৮৬৭ থেকে, এবার সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার সুযোগ এল তাঁর।

দেশে ফিরে এসে যাঁদের সঙ্গে তাঁর নূতন আলাপ হল তার মধ্যে ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল এক ধুরন্ধর ধনী, নাম প্রিনস ভ্লাদিমির মেশচের্স্কি। লোকটির যোগ্যতা ছিল না কিছুই কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আত্মপ্রচারের শখ ছিল খুব। সেই শখ মেটাতে তিনি একটা কাগজ বের করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'গ্রাঝদানিন' (নাগরিক); কিন্তু উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবে কাগজটা বড্ড খুঁড়িয়ে চলছিল। তাকে শক্ত পায়ে দাঁড় করানোর জন্যে তিনি একজন জাঁদরেল সম্পাদক খুঁজছিলেন। যখন শুনলেন দস্তয়েফ্স্কির যত নাম তত টাকা নেই; অমনি এগিয়ে এলেন টাকার টোপ গিলিয়ে মানুষটিকে তাঁর প্রয়োজনে ব্যবহার করতে এবং 'না' বলার সুযোগ যাতে না পায় লোভের টোপটিকে বড় করেই ধরলেন— বছরে তিন হাজার রুবল দেবেন সম্পাদনার জন্যে আর লেখার বাবদে লাইন প্রতি পঞ্চাশ কোপেক।

দস্তয়েফ্‌স্কি কখনো চাকরি করেন নি। অর্থের নিয়মিত সরবরাহ কোন দিনই ছিল না তাঁর। চির-দরিদ্র শুধু নয় চির-ঋণগ্রস্ত মানুষটির এখন টাকার দরকার আরো বেশী। কেন না এখন তাঁকে অন্যান্য দায়ের সঙ্গে নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তানের সংসারও প্রতিপালন করতে হচ্ছে সুতরাং কাগজটি রক্ষণশীল ও প্রগতি-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি টোপ গিললেন, দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। রাজী হওয়ার অন্যতম কারণের কথা আগেই বলেছি—নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বোধ ও বিশ্বাসের সূত্রগুলিকে ডায়েরির আকারে ধরে রাখা। ১৮৭২-এর শেষাশেষি চুক্তিপত্রে সই করে সম্পাদক হলেন তিনি।

কিন্তু পরের তাঁবেদারি করা দস্তয়েফ্‌স্কির মতন প্রতিভার ধাতে সইবার কথা নয়। তা ছাড়া প্রিনসের মতন কট্টর রক্ষণ-শীলের সঙ্গে দ্বৈত-চরিত্রের উদার-পন্থী মানুষটির মতের মিল হওয়াও অস্বাভাবিক ফলত চাকরির শুরুতেই খুঁটিনাটি নিয়ে খিটিমিটি চলতে থাকল। সব চেয়ে খারাপ লাগত প্রিনসের অক্ষম লেখা কেটেকুটে কখনো কখনো আগাপাস্তলা বদলে ছাপতে হত বলে, প্রিনসের অনুরোধে বাজে লোকের অপাঠ্য লেখা ছাপতে হত বলেও তাঁর বিরক্তির শেষ ছিল না। তা ছাড়া ছিল প্রিনসের মতের সঙ্গে মিল রেখে সাময়িক ঘটনার ওপর রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখা, ফলে মাঝে মধ্যেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত; তবু যে তিনি ১৮৭৩-এর গোটা বছরই সম্পাদক থাকলেন সে-নেহাতই 'লেখকের ডায়েরি' লেখার মোহে। কিন্তু সম্পাদনার দায় বইতে গিয়ে সে-কাজটিও তিনি মনোযোগ দিয়ে করে উঠতে পারছিলেন না। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে ১৮৭৪-এর জানুয়ারিতে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

এ সময়টায় তিনি পিতার্সবুর্গে একলাই ছিলেন। ছেলে মেয়ে নিয়ে আন্না থাকতেন স্তারাইয়া রুশায়, এক গ্রীষ্মনিবাসে। পিতার্সবুর্গ থেকে অনেক দূরে লেক ইলমেনের তীরে এই গ্রীষ্মাবাসে যাওয়া-আসার কোন রেলপথ ছিল না সেদিন। গরমের দিনে নভগোরোদ থেকে স্টিমারে চাপতে হত আর শীতের দিনে নদীর জল জমে যখন বরফ হয়ে যেত চাপতে হত স্লেজে। সুতরাং নিঃসঙ্গ বোধ করলেই যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ছুটে যাবেন তার উপায় ছিল না। কালে ভদ্রে যেতেন, তাও দু'চার দিনের বেশী থাকতে পারতেন না। চাকরি ছাড়ার সেও এক কারণ আর এক কারণ নূতন উপন্যাসে হাত দেবার তাগিদ—একটা নূতন পরিকল্পনা রূপ পেতে মনের মধ্যে কেবল ছটফট করছিল। তৎসত্ত্বেও 'নাগরিক'-এর পরিবেশ অনুকূল হলে ডায়েরি রচনার মোহে ও আড়াই শ' রুবল মাসমাইনের

লোভে তিনি হয়ত 'নাগরিক' নিয়েই পড়ে থাকতেন; কিন্তু ইতিহাস তার নিজের গরজেই টেনে নিয়ে এল তাঁকে। রাজনীতির ঘোলা জলের আবর্ত থেকে উদ্ধার করে শান্ত নীল নিস্তরঙ্গ লেগুনের জলে মুক্তি দিল।

একটা বাঁধা আয়ের চাকরি ছাড়লে কী খাবেন, সংসার চালাবেন কেমন করে —প্রশ্নটা দারিদ্র্যে ও ঋণে অভ্যস্ত দস্তয়েফ্‌স্কিকে বড় বেশী বিচলিত করল না। অবশ্য বিচলিত হবার অবসরও পেলেন না তিনি। হাতের টাকা ফুরোতে না ফুরোতেই অভাবিত এক মানুষের কাছ থেকে নূতন উপন্যাসের বায়না এসে হাজির হল। যেমন অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর।

নেক্রাসফের সঙ্গে ১৮৪৫-৪৬-এ দারুণ ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল দস্তয়েফ্‌স্কির। যে-মানুষটি একদিন তাঁর 'অভাজন' পড়ে চোখের জল ফেলেছিলেন আর একদিন তিনিই আবার চোখ-রাঙিয়ে সব সম্পর্ক ছেদ করে চলে গিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর 'অভাজন' লেখার অব্যবহিত পরে লেখা 'দ্য ডাবল' নিয়ে ঘটেছিল। বেলিন্‌স্কির সঙ্গে গলামিলিয়ে তিনিও বইটার নিন্দা করেছিলেন। মাঝখানে 'ভ্রেমিয়া' সম্পাদনার সময় যদি বা তাঁরা আর একবার কাছাকাছি হয়েছিলেন, অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটেছিল 'ভ্রেমিয়া'র সঙ্গে 'সোভরেমেনিক' (সমকালীন) কাগজের রাজনৈতিক কোন্দলের বাবদে। তারপরে দশ বছর পার হয়েছে, 'সোভরেমেনিক' গেছে উঠে নেক্রাসফ সম্পাদনা করছেন 'ওতেচেসৎভেনিয়ে জাপিসকি' (হোম অ্যানালস বা দেশের কথা)। নাম-করা এই প্রগতিপন্থী কাগজে একদা দস্তয়েফ্‌স্কির প্রথম দিককার অনেক লেখা ছাপা হয়েছিল; কিন্তু নেক্রাসফ অভিমান বশে পরবর্তীকালে তাঁর কাছে আর লেখা চাইতে আসেন নি। আজ ১৮৭৪-এর এপ্রিলে সেই অভিমানী মানুষটিই এসে তাঁর দরজায় হাজির।

হঠাৎ কী মনে করে? পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নূতন করে হাত মেলাতে? নাকি 'পাপ ও শাস্তি,' 'দ্য ইডিয়েট,' 'বেসী' ইত্যাদি রচনার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েই নেক্রাসফ্‌ ঝগড়া ভুলে বন্ধুর দারস্থ হলেন উপন্যাসের জন্যে? কৌতূহলী আন্না খোলা দরজার পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি তাঁর স্মৃতি-চারণে লিখেছেন, "আমার স্বামীর একদা-বন্ধু ও পরবর্তীকালের শত্রু হঠাৎ অনেককাল বাদে একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখে আমার দারুণ উৎকণ্ঠা হয়েছিল, আমি দরজায় কান পেতে উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। শুনলাম, নেক্রাসফ্‌ আমার স্বামীকে তাঁর কাগজে লেখবার জন্যে অনুরোধ করছেন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রতি ফলিওপেইজের জন্যে ২৫০ রুবল

দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমার স্বামীকে এতকাল প্রতি ফর্মাও পেইজের জন্যে ১৫০ রুবল পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, এটা নিশ্চয় নেক্রাসফ্‌ জেনেই এসেছিলেন তাই তিনি আশা করেছিলেন, এই লোভনীয় শর্ত শুনে আমার স্বামী লাফিয়ে উঠবেন ; কিন্তু না, দেখলাম, আমার স্বামীর ঘটে কিঞ্চিৎ ব্যবসায়-বুদ্ধি জমেছে, বললেন, 'রসকি ভিসংনিক'-এর কাছে আমি, বলতে গেলে এক রকম বাঁধাই আছি, আমার দরকারের সময় কাৎকফ্‌ দরাজ হাতে টাকা দিয়ে গেছেন। লেখার বাবদ পাওনা মিটে যাওয়ার পরেও দেখা গেল আমি এখনো তাঁর কাছে একটা মোটা অঙ্ক ঋণী, এ-হেন অবস্থায় তাঁকে না বলে-কয়ে দুম্‌ করে তোমার কাগজে লিখতে শুরু করলে নেমকহারামী হবে, আখেরে আমার ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা বিস্তর, তাই ওঁকে একবার বলে-কয়ে নিতে হবে, তা ছাড়া তুমি হয় ত জান না, হাজার তিনেক রুবল অ্যাডভানস্‌ না নিয়ে আমি কোন লেখায় হাত দিই না।'

শুনে নেক্রাসফ্‌ তক্ষুনি বলে উঠলেন, 'সে তুমি কাৎকফের সঙ্গে একটা রফা করে নিও কিন্তু অ্যাডভানস তুমি বলত কালই আমি এসে দিয়ে যাব।'

'তুমি বস,' দস্তয়েফ্‌স্কি উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার গিন্নীকে একবারটি জিজ্ঞেস করে আসি।'

নেক্রাসফের দু' চোখ বিস্ময়ে গোল হয়ে গেল ; কিন্তু তিনি গ্রাহ্য না করে পর্দা ঠেলে ভিতরে চলে গেলেন। আন্না ত পর্দার আড়ালেই ছিলেন, তিনি ঘরে পা রাখতে-না-রাখতে আন্না বলে উঠলেন, 'আমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে এসেছ ? রাজী হয়ে যাও, এক্ষুনি কথা দিয়ে দাও।'

'রাজী হব, কথা দেব। কী বলছ তুমি ?'

'কেন নেক্রাসফের প্রস্তাবে !'

'কী প্রস্তাব, কী করে জানলে তুমি ?'

'আমি পর্দার আড়াল থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি।' আন্না মজা বোধ করে হাসলেন।

'বটে আড়ি পেতে ছিলে, বড্ড কু-অভ্যেস ত, লজ্জা করল না ?' দস্তয়েফ্‌স্কি মুখ গম্ভীর করে তিরস্কার করলেন।

আন্না তিরস্কার গায় না মেখে বললেন, 'এতে লজ্জার কী আছে, তোমার কী কিছু লুকোছাপি আছে নাকি আমার কাছে ? এই ত, নিজেই বলতে এসেছ, কী, বলতে আস নি ?'

'এসেছিলাম।' দস্তয়েফ্স্কি হতাশ হয়ে বললেন, 'তোমাকে অবাক করে দেব, তুমি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমি দেখব, তার কিছু হল না, কিছুই দেখলাম না।'

'তোমার সে-চোখ আছে, যে দেখবে?' আন্না একটা কটাক্ষ হেনে চলে গেলেন।

তিনি আবার ফিরে এলেন নেক্রাসফের কাছে। 'হ্যাঁ হে, গিন্নীকে বললাম সব। শুনে সায় দিলে, তোমার কাগজে লিখতে বাধা নেই, লিখতে পারি এবার।'

'অবাক করলে, তুমি এমন বউ-নেওটা ত জানতাম না। তুমি কী এখন বউয়ের কথায় ওঠ-বস নাকি, তিনি তোমাকে এখন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, বল!' 'নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন নেক্রাসফ্। কিন্তু দস্তয়েফ্স্কি হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হেসো না, ওঁর দারুণ ব্যবসায় বুদ্ধি, দেখছ না, এর মধ্যেই পাবলিশিং বিজনেসটাকে কেমন দাঁড় করিয়ে দিলে।'

তারপর আসল কথায় এলেন তাঁরা। কথাবার্তা পাকাপাকি করে উঠে গেলেন নেক্রাসফ্। দস্তয়েফ্স্কি মস্কোআয় এলেন এপ্রিলের শেষে। এসে যা শুনলেন তাতে তাঁর মেজাজ খিঁচরে গেল। প্রতি ফর্মাও পাঁচ শ' রুবল রেটে তলস্তয়ের সঙ্গে কনট্রাকট হয়ে গেছে কাৎকফের। বিশ হাজার রুবল অ্যাডভান্সও দিয়ে দিয়েছেন তিনি। জানুয়ারি থেকে 'রসকি ভিসৎনিক'-এ 'আন্না কারেনিনা' ধারাবাহিক লিখতে শুরু করবেন তলস্তয়। দারুণ অপমান বোধ করলেন দস্তয়েফ্স্কি, তাঁর বেলা দেড় শ' আর তলস্তয়ের বেলা পাঁচ শ'! এ-অপমানের শোধ নেবেন তিনি লিখে, তলস্তয়ের চেয়ে ভাল লিখে। প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ফিরে এলেন তিনি।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলেন না দস্তয়েফ্স্কি, এবারকার লেখা তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলির তুলনায় নিম্ন-মানের হয়ে গেল। অবশ্য এর জন্যে দায়ী তাঁর বোধের দৈন্য নয়, শরীর। 'নাগরিক'-এর সম্পাদনায় ইস্তাফা দিয়ে তিনি পিতার্সবুর্গ থেকে স্তারাইয়া রুশায় এসে থাকছিলেন, এবং ভালই ছিলেন হঠাৎ সামান্য জ্বর হয়ে বুকে সর্দি বসে গেল মে মাসে। বুকে একটু দোষ আগে থেকেই ছিল এবারকার জ্বর সে-দোষকে আরও খানিকটা দুষ্ট করে দিয়ে গেল, স্থানীয় চিকিৎসায় কিছু ফল হল না। হবেও না। পিতার্সবুর্গের ডাক্তাররা স্বীকার করলেন, পরামর্শ দিলেন এম্স্ যেতে। ওখানকার জলের গুণ আছে, ওখানকার বিশেষজ্ঞদেরও খুব হাতযশ।

জুনের চার তারিখে সেই এম্‌স্‌-এর উদ্দেশে বেরলিনে এসে নামলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। বেরলিনের নাম শুনেই পাঠকের মনে হবে স্টেশনে নেমেই তিনি ছুটলেন রুলেত-টেবিলে জুয়া খেলতে। না, এবারকার অনুমান পাঠকের ভুল হল। তিনি য়ুরোপে শেষ জুয়া খেলেছেন ১৮৭১-এর বসন্তে এখন ১৮৭৪-এর জুন, মাঝখানকার এই চার বছরে তাঁর যে কেবল বয়স বেড়েছে তাই নয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নেশার উত্তেজনাও জুড়িয়ে এসেছে। চরিত্রে এসেছে সাম্যভাব, প্রশান্তি। রুটিন-বাঁধা জীবনের মধ্যে তৃপ্তির স্বাদ পেয়েছেন তিনি। তা ছাড়া এখন আর ভাড়ারে ইঁদুর ডন মারে না। আন্নার নিপুণ গৃহিনীপনায় সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। টাকার জন্যে এখন আর মাথা খারাপ করতে হয় না তাঁকে। অবশ্য তাঁর জীবনের মূল সমস্যা ও তজ্জনিত যন্ত্রণার তখনও শেষ হয় নি তাঁর। ওটা তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন বস্তুত কবর অব্দি। তাঁর অস্তিত্বের যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে মরণে। কিন্তু সে-জীবনযন্ত্রণা ভুলতে জুয়ার নেশায় মজেন নি আর, তার একটা বাইরের বাধাও ছিল। হাতের কাছে রুলেত-টেবিল আর ছিল না। ফেডারেল জর্মনির নূতন আইন ১৮৭২ সালেই সব ক্যাসিনোগুলি থেকে জুয়ার আড্ডা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। ফরাসী-সরকারও জুয়ার ওপরে নানাবিধ শক্ত শক্ত নিষেধ-বিধি চাপিয়ে দিয়েছিলেন ওই একই সময়ে। কেবল মোনাকোর যুবরাজের উৎসাহে জুয়াড়ুরা সেখানে সবুজ বনাতের টেবিল পাততে সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সে-ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির ভ্রমণপথের অনেক দূরে। অতদূর থেকে জুয়ার হাতছানি পৌঁছোয় নি তাঁর কাছে ফলত অবশিষ্ট জীবনের জন্যে জুয়ার নেশা থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বেরলিনে নেমেই তিনি শুনলেন হালে পরলোকগত চিত্রশিল্পী ভিলহেলম কাউলবাকের প্রদর্শনী হচ্ছে রয়েল মিউজিয়মে। অমনি ছুটে গেলেন সেখানে কিন্তু খুব হতাশ হয়ে ফিরে এলেন, শিল্পীর আবেদনহীন 'শীতল রূপক' তাকে এতটুকু উৎসাহিত করল না এবং যথারীতি বেরলিনও না। অন্যান্য বার যেমন এবারও তেমনি এই জর্মন-শহরটা বিশ্রী আর একঘেয়ে লাগল, মানুষগুলি যেমন ভোঁতা তেমনি অসভ্য। কিন্তু এম্‌সের পথে ট্রেনে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল—পাহাড়-পর্বতের অনন্ত-বিস্তার ও তার মধ্যে ছড়ানো-ছিটোনো সুরম্য প্রাসাদ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মারবুর্গ লিমবুর্গের শহর-পরিকল্পনার মধ্যে সুরুচির পরিচয় পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন। কিন্তু এম্‌সে এসে বিরক্তির চূড়ান্ত ঘটল তাঁর। ভিড়, সারা দুনিয়ার মানুষ হাওয়া বদলের আর

কোথাও ঠাঁই না পেয়ে যেন এখানে এসে হাজির হয়েছে। ভিড় চির দিনই তাঁর অসহ্য কিন্তু কী করবেন বুকের মধ্যে অসুখ পুষে ত আর পালাতে পারেন না, চিকিৎসা করাতে এসেছেন ওটা করাতেই হবে।

যে-ডায়েরিতে তিনি 'পদ্রোসতক্‌' (গেঁয়োছেলে) উপন্যাসটির খসড়া করেছিলেন তার মার্জিনে লেখা থেকে জানা যায়, এ-সময়ে তিনি মৃগীর অসুখেও বার বার ভুগছিলেন। দু' এক মাস পর পরই মৃগীর ফিট শয্যাশায়ী করে ফেলছিল তাঁকে, তবু অসুখ নয়, আন্নাকে লিখেছেন, "উপন্যাসে হাত দিতে পারছি না এই উদ্বেগেই আমি ভুগছি নিদারুণ। কোন মতে শুরুটা যদি করে ফেলতে পারতাম ত আমাকে আর পায় কে! আসলে কী জান, শুরুটাই শক্ত। শুরুটা করে ফেলতে পারলে আদ্দেক কাজ খতম।···কিন্তু কী লিখব তোমাকে আন্না, কেবল ছক কাটছি। নিত্য নূতন ছক কাটছি আর দেখছি প্লটে কাহিনীর জটিলতা কেবল বেড়ে যাচ্ছে ···আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই মালমশলা দিয়ে চারচারটা উপন্যাস দিব্যি খাড়া করা যায়। স্ত্রাখফ্‌ বলে ঠিকই, এইটেই আমার মস্ত দোষ···"

কিন্তু স্ত্রীর কাছে তিনি যা-ই লিখুন, আর তাঁর বন্ধু স্ত্রাখফ্‌ তাঁকে যা-ই বলুন, তাঁর ত আসলে ঘটনার ওপরে ঘটনা চাপিয়ে পাঠককে রুদ্ধশ্বাস করা উদ্দেশ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে আলোড়িত করে তোলা, তার সত্তায় নিহিত রহস্যকে অনাবৃত করে ফেলা। যেখানে এ-ভাবে ঘটনার সঙ্গে অস্তিত্বের বিস্ময় জড়িয়ে থাকে সেখানে ঘটনাকে তিনি ছাটবেন কেমন করে। সেইটে তিনি পারলে না বলেই শেষ অব্দি চারখানা উপন্যাসের সমষ্টি হয়ে উঠল 'পদ্রোসক' (গেঁয়ো ছেলে)।

দস্তয়েফ্‌স্কি এ-উপন্যাসের কাহিনী বুনেছেন নায়ক আরকাদি দলগোরুকির স্মৃতি-চারণের মাধ্যমে। এ কাহিনীর সময় সীমা এক বছর।

দলগোরুকি ছিল ভেরসিলফের অবৈধ সন্তান। ভেরসিলফের মালী মাকার ইভানোভিচ্‌ দলগোরুকির বউ সোফিয়ার গর্ভে তার জন্ম। এ-উপন্যাসের যখন শুরু তখন দলগোরুকির বয়েস একুশ। তখনও সে তার বাপ মাকে দেখে নি। তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল মস্কোআর এক বোর্ডিংস্কুলে। সে-স্কুল ছিল এক ভয়ংকর নরক-বিশেষ। (দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর কৈশোরের স্কুল-জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই এখানে তুলে ধরেছেন)। দস্তয়েফ্‌স্কির মতনই সংবেদনশীল ছিল দলগোরুকি, তার ওপরে দলগোরুকির ছিল জন্মের দোষ। ফলে ছাত্র ও

মাস্টারদের সমবেত উপহাস অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় তার জীবন হয়ে উঠেছিল বিষময়। সেই বিষময় পরিবেশে তার একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয় ছিল একটি 'স্বপ্ন': কিংবদন্তীর ধনী হয়ে উঠবে এই স্বপ্ন দেখত সে কেবল, আর সেই স্বপ্ন সত্য করে তুলতে অনন্যোপায় সে জলপানির যৎসামান্য পয়সা সঞ্চয় করত উপোষ থেকে। উপোষ দিয়ে সে উপোষ দেওয়ার শক্তি পরীক্ষা করত।

দস্তয়েফ্স্কির অধিকাংশ চরিত্রের মনেই দেখি এই অর্থগৃধ্নুতা। 'পাপ ও শাস্তি'-র রাসকলনিকফ্ ধনী হওয়ার জন্যে খুন করল এক কুসীদজীবিনীকে, 'জুয়াড়ী'-র আলেকসেই ইভানোভিচ্ হয়ে উঠল পাঁড় জুয়া-পাগল। আর এখানে 'পদ্রোসতক' (গেঁয়োছেলে)-এ দেখি আরকাদি দলগোরুকি সঞ্চয়ের জন্যে উপোষ দিতেও পেছ-পা নয়। সেই আবার এক সময়ে সুযোগ পেয়ে এক যুবতী ধনবতীকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে টাকার জন্যে। ওই চরিত্ররা প্রত্যেকেই দেখেছে ভাগ্যকে তাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে। তাই তারা ভাগ্য ফেরাতে মরিয়া হয়ে লড়তে নেমে গেছে। এই ধনাভিলাষীদের তরফ থেকে আরকাদি দলগোরুকি বলছে—"টাকা ভাগ্যের চেয়ে শক্তিশালী, টাকাই একমাত্র বস্তু যার দৌলতে তুচ্ছ অযোগ্য মানুষও সমাজের মাথায় চড়ে বসবার সুযোগ পায়।…আমার এটাই ছিল দিবানিশির স্বপ্ন; আমার কল্পনা করতে ভাল লাগত যে, আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলছি—তোমরা, গালিলিও-রা, কোপারনিকাস্-রা, শার্লমান-রা —তোমরা, পুশকিন, সেক্সপীয়র-ফিল্ড্মার্শাল-রা, জেনারেলরা—শোন, আমি এক অবজ্ঞাত জারজ-সন্তান তবু দেখ, আমি আজ তোমাদের সবাইকার ওপরে, কেন না আমার টাকা আছে, আর টাকার কাছে তোমরা কে না মাথা নীচু করে থাক।'

আর এক জায়গায় আরকাদি বলছে, 'টাকার ক্ষমতা যে সার্বভৌম তাতে কোন সন্দেহ নেই। একমাত্র টাকাই সমস্ত বৈষম্য দূর করতে পারে, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে সব পারে, তার মত সাম্যবাদীও কেউ নেই। তাঁর আর এক চরিত্র; ইডিয়েট'-এর ইপ্পলিতের চোখের বালি ছিল দরিদ্ররা। দরিদ্রদের সে দারিদ্র্যের জন্যে দুয়ো দিয়ে বলেছে, 'ওই সব মূর্খ মানুষগুলির জন্যে আমার এতটুকু দয়া মমতা নেই, ওদের দেখলে আমার ধৈর্য থাকে না। কেন তারা রথ্শীল্ড হবে না? কার দোষে মানুষ রথ্শীল্ডের মতন কোটী কোটী টাকার মালিক হতে পারছে না?'

মার্ক্স লিখেছেন, "টাকা মানুষকে আকৃষ্ট করে, কারণ যার টাকা নেই তার ভাগ্যে ন্যায়-বিচার জোটে না। সে সব-সময় সমাজের পায়ের তলায় পড়ে থাকে।" সামাজিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত এই অসুস্থ-ভাবনাকে যাঁরা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন মার্ক্স তাঁদের মধ্যে সেক্সপীয়র, গ্যেটে, বালজাককে স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। দস্তয়েফ্স্কির কথা তখনও তিনি জানেন না কারণ দস্তয়েফ্স্কির দু'বছরের বড় এই মনীষী দস্তয়েফ্স্কির মৃত্যুর দু'বছর পর মারা গেছেন। দস্তয়েফ্স্কির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি তাই তাঁর পড়ার সুযোগ ঘটে নি; ঘটলে দস্তয়েফ্স্কির নামটাও যে ওই তালিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত থাকত তাতে কোন সন্দেহ নেই; কেন না অর্থ-বিষয়ক মনস্তত্ত্বে দস্তয়েফ্স্কির অধিকার অতুলনীয় এবং বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। তিনি যে-সব চরিত্র চিত্র করেছেন—কৃপণ, মজুদ্দার কিংবা জুয়াড়ী—তারা সকলেই অসংযমী, আত্মকর্তৃত্বহীন অথবা নাপোলিওঁর মতন মানসিকতার মানুষ, টাকার জন্যে, কি কোন কিছু আত্মসাতের জন্যে তারা খুন করতেও পেছ-পা হয় না। অথচ কৃপণ হোক মজুদ্দার হোক কি খুনী এবং যতই অন্ধ-হোক তারা অর্থলিপ্সায়—অর্থলিপ্সাকে তারা সকলেই আত্যন্তিক নিন্দা করেছে, অর্থলিপ্সু হওয়ার জন্যে নিজেদেরও তারা ক্ষমা করে নি, ক্ষমা করে নি এই জঘন্য পাপে-অন্ধকার দুনিয়াটাকেও,—যেখানে তারা যেচে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করে নি অথচ তার সমস্ত পাপের অংশীদার হতে বাধ্য হয়েছে।

এই হচ্ছে দস্তয়েফ্স্কির মনস্তাত্ত্বিক-প্রাতিস্বিক-দর্শন—দ্বিধা-দীর্ণ মানুষকে একটা নিরবলম্ব শূন্যে পৌঁছে দেওয়া—আজ সে যা-করে কাল সে সে-কাজকেই ঘৃণা করে ও সে-কাজের কর্তা বলে নিজেকেও সে অব্যাহতি দেয় না। এ-ভাবে নিজেকে শুদ্ধু সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে মানুষ একযোগে নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব হয়ে যায়। এ-পৃথিবীতে এ-টাই তার নিয়তি।

স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে তখন আরকাদির বাপ তাকে পিতার্সবুর্গে ডেকে পাঠাল। এত দিনে সে রাজধানীতে আসবার, বাপ-মায়ের কাছে থাকবার সুযোগ পেল। এসে দেখল এক নিদারুণ দারিদ্র্যদশার মধ্যে দিন কাটছে তাদের। জানতে ইচ্ছে হল কী করে তারা এ অবস্থায় এসে পৌঁছল, শুধু তাই নয় বাপের জীবনের সবকিছু জানার জন্যেও সে অস্থির হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে এক সঙ্গে দু' দু'টো বৃত্তি প্রবল ভাবে কাজ করতে থাকল: বাপের স্নেহ থেকে বঞ্চিত সে যেমন তার স্নেহ পাওয়ার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠল, তেমনি, যে তাকে এতকাল নির্দয় ভাবে অবহেলা করে আসছে তার উপরে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষও মনের মধ্যে অনুভব

করতে থাকল। এ-ভাবে দুই বিপরীত মনোবৃত্তির শিকার হয়ে উঠল দলগোরুকি। তার জীবন-স্রোত অন্য আর এক খাতে বইতে শুরু করল। প্রথম যৌবনের অনভিজ্ঞ আবেগ নিয়ে জটিল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে ভাল ও মন্দের টানা-পোড়েনে গড়ে উঠতে থাকল তার ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন। শৈশব ও যৌবনের চিত্র আঁকার দক্ষ কারিগর দস্তয়েফ্স্কির নিপুণ কলমের আঁচড়ে বিবিধ চিন্তা, সংশয়, দুঃসাহস ও সংবেদনশীলতার দ্বন্দ্ব-বিন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠল আরকাদি দলগোরুকি।

কিন্তু যেহেতু অবৈধ সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা উপস্থিত করাই কেবল দস্তয়েফ্কির লক্ষ্য নয়, গল্প ক্রমশ নানা জটিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এগিয়ে চলল। শুরু হল ভিন্ন গল্প, যার নায়ক বিগতদার ভেরসিলফ্। উদ্দেশ্যহীন সে বেরিয়ে পড়েছিল বিদেশের পথে সঙ্গে তার দলগোরুকির মা সোফিয়া আন্দ্রেয়েভনা। সেইলক্ষ্য-ভ্রষ্ট ভ্রমণের এক পর্যায়ে ভেরসিলফ প্রেমে পড়েছিল আর এক বিবাহিতা সুন্দরীর, নাম কাতারিনা আখ্মাকোভা। তার পরে যখন আবার সে ঘুরে ফিরে পিতার্সবুর্গে এসে পৌঁছেছে তখন সে সর্বস্বান্ত। কাতারিনার সঙ্গে তার সেই প্রেমের ব্যাপারটার ওপরেও তখন কালোপর্দা টানা হয়ে গেছে—পথিক-প্রেমিক ঘরে ফিরে মনেও রাখে নি সে-কথা—এ-সব ঘটনা দলগোরুকির পিতার্সবুর্গে আসার আগেই ঘটে গেছে। সেই পুরনো ব্যাপারটাই আবার ঘুলিয়ে উঠল নূতন সমস্যা হয়ে যখন দলগোরুকির সঙ্গে কাতারিনার দেখা হল, পরিচয় হল এবং সে তার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গেল। খবর পেয়ে ভেরসিলফ জ্বলে উঠল হিংসায়। কাতারিনাকে পাওয়ার জন্যে আবার করে সে পাগল হয়ে উঠল। এই নিয়ে পিতাপুত্রের মধ্যে বাঁধল সংঘাত। এই সংঘর্ষের শেষ হল দলগোরুকির অসুখে; বাপ তখন আত্মহত্যা করতে গিয়ে আহত।

এদিকে ভেরসিলফের বৈধ সন্তান আন্না আন্দ্রেয়েভনা ফেঁদে বসে আছে আর এক কাহিনী। সে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে কাতারিনার বুড়ো বাপ প্রিনস সোকোল্স্কিকে। বুড়োর টাকার লোভেই যে আন্না আন্দ্রেয়েভনা তাকে বিয়ে করতে চাইছে এটা কাতারিনার না বোঝার কথা নয় সুতরাং আন্দ্রেয়েভনার মতলব ভেস্তে দিতে উঠে পড়ে লাগল কাতারিনা—লাগতেই হবে বুড়ো বাপকে যদি সে ভাগিয়ে নিয়ে যায় ত কাতারিনা দাঁড়ায় কোথায়, সে-যে বাপের ওপরে খাচ্ছে তার-যে কোথাও আর আশ্রয় নেই। ওই বিপত্তিকে কেন্দ্র করে কাহিনী পল্লবিত হল আর এক শাখায়: বুড়ো প্রিনসের ছেলে সেরগেই হাত পাতলেই

টাকা দিচ্ছে, দলগোরুকিকে। সে জানে না যে তার সহোদর বোন লিজার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখতে সেরগেই ঘুষ দেয় তাকে। শেষে সব জানাজানি হয়ে গেল যখন সেরগেই গিয়ে পড়ল একদল জোচ্চোরের পাল্লায়, তাকে জেল খাটতে যেতে হল। এই চারটি সম্পূর্ণ আলগা ও আলাদা কাহিনীকে একটি অতি সরল কৌশলে এক সূতোয় গেঁথে ফেলেছেন দস্তয়েফস্কি।

সে-কৌশলের সূতোটি একখানা চিঠি। দলগোরুকি দৈবাৎ একখানা চিঠি পেয়ে গিয়েছিল। চিঠিটা কাতারিনা লিখেছিল তার উকীলকে। তাকে একটা বুদ্ধি বাৎলাতে বলেছিল যাতেকরে বাপকে মাথাপাগল বলে গারদে পাঠানো যায়। নিজ নিজ স্বার্থে এ-চিঠিখানা হাত করতে সকলেই উঠেপড়ে লেগেছিল। কাতারিনা চিঠিটা ফেরত চাইছিল পাছে ওটা গিয়ে তার বাপের হাতে পড়ে আর বাপ তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়, কপর্দকহীন সে তখন যাবে কোথায়! আন্না আন্দ্রেয়েভনা চাইছিল চিঠিটা হাত করে মেয়ের মুঠো থেকে বাপকে কেড়ে নেবে তারপর ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে আপদকে। ভেরসিলফের মতলব ছিল চিঠিটা বাগাতে পারলে সে বগলদাবা করতে পারবে তার পূর্বতন প্রেমিকা কাতারিনাকে। কিন্তু দলগোরুকি চিঠিটা ছাড়বে কেন, ওই চিঠিখানা তার হেফাজতে আছে বলেই না কাতারিনাকে সে এমন অনায়াসে কব্জা করতে পেরেছে।

তা এই হল গিয়ে গল্পের কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যে উপন্যাসের শরীর বুনতে বুনতে দস্তয়েফ্‌কি মনস্তত্ত্বের যে মুনশীয়ানা দেখিয়েছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। বস্তুত মনস্তত্ত্বের পথিকৃৎ কথাশিল্পীর মনোবিকলনের চরমোৎকর্ষ দেখতে পাই আমরা এই উপন্যাসে। অধিকন্তু রয়েছে সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের দিকে দস্তয়েফ্‌স্কির জাগ্রত কৌতূহল। দস্তয়েফ্‌স্কির সময়ে ওই দুই রাজনৈতিক মতবাদ সবে তখন রাশিয়ার মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে। তার যথার্থ স্বরূপ ও শক্তি সম্পর্কে না দস্তয়েফ্‌স্কি না অন্য কেউ—স্পষ্টকরে সমকালের কোন বুদ্ধিজীবীই তখনও ধরতে বা বুঝতে পারেন নি। দস্তয়েফ্‌স্কির মনে ব্যাপারটা প্রথম স্পষ্ট দাগ কাটে ১৮৬৭-র সেপটেমবরে। তিনি তখন জেনিভায়। জেনিভায় তখন "লীগ অব পীচ অ্যাণ্ড ফ্রীডম্" এর কনফারেনস হচ্ছিল। সে-কনফারেনসে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত দুই ব্যক্তি—গারিবল্‌দি আর বাকুনিন। দস্তয়েফ্‌স্কি আন্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বক্তৃতা শুনতে। সভায় এসে তাঁর মনে যে-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভাগ্নী সোফিয়াকে লেখা চিঠিতে তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "......তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সোফিয়া, পাঁচ হাজার শ্রোতার সামনে ওই সভায়

সমাজবাদীরা বিপ্লব সম্পর্কে কী উদ্ভট সব কথাই না বলেছিল আর তাই নিয়ে কত না ঝগড়া কথা কাটাকাটি। সভায় সোশ্যালিস্টদের বক্তব্য হল, "দুনিয়ায় যদি সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় ত বাইবেলের ধর্ম বাতিল করে দিতে হবে, সাম্রাজ্য নামে শোষণের বিশাল ব্যবস্থাগুলি ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, মূলধন প্রথার উচ্ছেদ করে আইনের জোরে ধন-সম্পদ সমান ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।"—এগুলি কিছু নূতন কথা নয়। পুঁথিপত্র পড়ে বিশ বছর আগেই মানুষ এ-সব কথা মুখস্থ করে ফেলেছে। কিন্তু কী হয়েছে, এতটুকু বদলেছে কি দুনিয়ার চেহারা? উঁহু, বদলায় নি বলেই বক্তারা গলাফাটিয়ে বললেন, "খৃষ্টীয় প্রেমে কিছু হবে না, আগুন ধরিয়ে দাও, তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়, প্রচলিত সব ব্যবস্থা চুরমার করে দাও……"—নাকি এতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব ও অহিংসায় বিশ্বাসী দস্তয়েফ্‌স্কির খুব খারাপ লাগছিল যখন বাকুনিন বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, "রুশ সাম্রাজ্যবাদই শান্তির সব বড় বাধা। যাঁরা স্বাধীনতা ভালবাসেন, যাঁরা স্বরাজ চান তাঁদের অবশ্যই বুঝতে হবে স্বাধীনতা তখনই পাওয়া যাবে যখন রুশী সাম্রাজ্য ভেঙে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে আর ওই রাষ্ট্রগুলি একটা ফেডারেল গবর্ণমেনটের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে। তখন পোলদের সঙ্গে রুশীদের লড়াই থাকবে না; রুশীদের সঙ্গে অ-রুশীদের লড়াই থাকবে না নিজের দেশে শোষণ অত্যাচার ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটবে—সম-বণ্টনের মধ্যে দেশের সুখ সমৃদ্ধি বাড়বে।"

বাকুনিনের প্রতিবাদ করে গারিবল্‌দি যখন বললেন, "অস্ত্র নয় সৌভ্রাতৃত্ব, রক্ত নয় প্রেম। জাতিতে জাতিতে রাখীবন্ধনই শান্তি। ধর্ম ত্যাগ করলে মানুষ হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক-স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নেতা হওয়ার জন্যে মানুষের দিকে মানুষকে যারা লেলিয়ে দিচ্ছে তাদের নষ্টামিকে বিশ্বাস করবেন না; তারা দেশের সর্বনাশ করবে……," তখন দস্তয়েফ্‌স্কির খুব ভাল লাগল। আর দস্তয়েফ্‌স্কির যত ভাল লাগল সভার মানুষ তত উত্তেজিত হয়ে উঠল, গারিবল্‌দিকে দুয়ো দিতে লাগল, টিটকারি করতে লাগল। মনে হল সকলেই যেন খুনোখুনি রক্তারক্তির পক্ষে। অপমানিত গারিবল্‌দি সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মর্মাহত দস্তয়েফ্‌স্কিও আর সভায় বসে থাকতে পারলেন না।

'দ্য ডেভিলস'-এ যৌবনের এই রুক্ষ-স্বর নিয়ে এলেন দস্তয়েফ্‌কি। কিন্তু তখনও তাঁর সন্দেহ—বিপ্লব সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে পারে কিন্তু মহৎ কিছু উন্নততর কিছু গড়তে পারে কী? এই সংশয়ের কলম 'দ্য ডেভিলস'-এর বিপ্লবী চরিত্রগুলির মুখে কালি লেপে দিয়েছে। অবশেষে 'গেঁয়ো ছেলে'-তে এসে তিনি বিপ্লবের কতকগুলি সার্থক দিক দেখতে পেলেন। ফলে বিপ্লবী-চরিত্র এবার ভিলেন না-হয়ে হয়ে উঠল হীরো। তারা ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে আর সকলের জন্যে দুঃখ কষ্ট বরণ করতে। সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে আগামী কালের দিকে মুখ রেখে। তবু বলা বাহুল্য তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতন এ-উপন্যাসও রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক মতবাদ প্রচারের মাধ্যম নয়। তাঁর লক্ষ্য আরও উঁচুতে। সদসতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ মানুষের স্বরূপ উন্মোচনই তাঁর সাধনা। ভেরসিলফের উক্তির মধ্যেই আমরা তা ব্যক্ত দেখি। ছেলেকে সে বলছে: "মানলাম বিজ্ঞানের সমস্ত রকম আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে আমরা যৎপরোনাস্তি সুখ ভোগ করব, প্রত্যেক মানুষই সমান ভাবে সে-সব ভোগ করবে, আজ আমি ছেঁড়া কম্বলে বসে আছি আর একদিন ভেলভেটের ওপরে বসব ইত্যাদি; কিন্তু তাতে করে কী হবে?……আমি স্বীকার করি দারিদ্র্য দূর করা, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তের একটা বড় কাজ কিন্তু তথাপি বলব এ-আদর্শ অতিশয় তুচ্ছ; মানুষের পরম প্রত্যাশার দিকে গোড়াকার ধাপ মাত্র, কারণ পেট পুরে খাওয়া আর সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার পরেও মানুষ জানতে চাইবে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সে বেঁচে আছে।"

এদিক থেকে 'গেঁয়ো ছেলে'র সঙ্গে 'ইডিয়েট'-এর মিল আছে। দুই উপন্যাসেই একটি সাচ্চা লোক (Positive good man) গোটা পৃথিবীর পাপের বিরুদ্ধে কথা বলছে। 'ইডিয়েট'-এর প্রিনস মিশকিন ব্যক্তিক হৃদয়ের ধার্মিকতার প্রতীক 'গেঁয়ো ছেলে'র মাকার দলগোরুকি নির্বিশেষ মানুষের ধর্মপ্রাণতার প্রতিনিধি—সে সকলের মধ্যে থাকে ও সকলের জন্যে বাঁচে, বসুধাই তার কুটুম্ব। এ অর্থে 'ইডিয়েট' যদি অন্ধকার রাত ত 'গেঁয়ো ছেলে' আসন্ন-প্রভাত। অতঃপর স্বর্গ-তপস্যায় মগ্ন হবেন রাশিয়ার ঋষি, স্বাভাবিক।

সমাজবাদীরা বিপ্লব সম্পর্কে কী উদ্ভট সব কথাই না বলেছিল আর তাই নিয়ে কত না ঝগড়া কথা কাটাকাটি! সভায় সোশ্যালিস্টদের বক্তব্য হল, "দুনিয়ায় যদি সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় ত বাইবেলের ধর্ম বাতিল করে দিতে হবে, সাম্রাজ্য নামে শোষণের বিশাল ব্যবস্থাগুলি ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, মূলধন প্রথার উচ্ছেদ করে আইনের জোরে ধন-সম্পদ সমান ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।" — এগুলি কিছু নূতন কথা নয়। পুঁথিপত্র পড়ে বিশ বছর আগেই মানুষ এ-সব কথা মুখস্থ করে ফেলেছে। কিন্তু কী হয়েছে, এতটুকু বদলেছে কি দুনিয়ার চেহারা? উঁহু, বদলায় নি বলেই বক্তারা গলাফাটিয়ে বললেন, "খৃষ্টীয় প্রেমে কিছু হবে না, আগুন ধরিয়ে দাও, তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়, প্রচলিত সব ব্যবস্থা চুরমার করে দাও……"—নাকি এতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব ও অহিংসায় বিশ্বাসী দস্তয়েফ্স্কির খুব খারাপ লাগছিল যখন বাকুনিন বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, "রুশ সাম্রাজ্যবাদই শান্তির সব বড় বাধা। যাঁরা স্বাধীনতা ভালবাসেন, যাঁরা স্বরাজ চান তাঁদের অবশ্যই বুঝতে হবে স্বাধীনতা তখনই পাওয়া যাবে যখন রুশী সাম্রাজ্য ভেঙে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে আর ওই রাষ্ট্রগুলি একটা ফেডারেল গবর্ণমেনটের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে। তখন পোলদের সঙ্গে রুশীদের লড়াই থাকবে না; রুশীদের সঙ্গে অ-রুশীদের লড়াই থাকবে না নিজের দেশে শোষণ অত্যাচার ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটবে—সম-বণ্টনের মধ্যে দেশের সুখ সমৃদ্ধি বাড়বে।"

বাকুনিনের প্রতিবাদ করে গারিবল্‌দি যখন বললেন, "অস্ত্র নয় সৌভ্রাতৃত্ব, রক্ত নয় প্রেম। জাতিতে জাতিতে রাখীবন্ধনই শান্তি। ধর্ম ত্যাগ করলে মানুষ হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক-স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নেতা হওয়ার জন্যে মানুষের দিকে মানুষকে যারা লেলিয়ে দিচ্ছে তাদের নষ্টামিকে বিশ্বাস করবেন না; তারা দেশের সর্বনাশ করবে……," তখন দস্তয়েফ্স্কির খুব ভাল লাগল। আর দস্তয়েফ্স্কির যত ভাল লাগল সভার মানুষ তত উত্তেজিত হয়ে উঠল, গারিবল্‌দিকে দুয়ো দিতে লাগল, টিটকারি করতে লাগল। মনে হল সকলেই যেন খুনোখুনি রক্তারক্তির পক্ষে। অপমানিত গারিবল্‌দি সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মর্মাহত দস্তয়েফ্স্কিও আর সভায় বসে থাকতে পারলেন না।

'দ্য ডেভিলস'-এ যৌবনের এই রুক্ষ-স্বর নিয়ে এলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। কিন্তু তখনও তাঁর সন্দেহ—বিপ্লব সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে পারে কিন্তু মহৎ কিছু উন্নততর কিছু গড়তে পারে কী? এই সংশয়ের কলম 'দ্য ডেভিলস'-এর বিপ্লবী চরিত্রগুলির মুখে কালি লেপে দিয়েছে। অবশেষে 'গেঁয়ো ছেলে'-তে এসে তিনি বিপ্লবের কতকগুলি সার্থক দিক দেখতে পেলেন। ফলে বিপ্লবী-চরিত্র এবার ভিলেন না-হয়ে হয়ে উঠল হীরো। তারা ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে আর সকলের জন্যে দুঃখ কষ্ট বরণ করতে। সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে আগামী কালের দিকে মুখ রেখে। তবু বলা বাহুল্য তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতন এ-উপন্যাসও রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক মতবাদ প্রচারের মাধ্যম নয়। তাঁর লক্ষ্য আরও উঁচুতে। সদসতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ মানুষের স্বরূপ উন্মোচনই তাঁর সাধনা। ভেরসিলফের উক্তির মধ্যেই আমরা তা ব্যক্ত দেখি। ছেলেকে সে বলছে: "মানলাম বিজ্ঞানের সমস্ত রকম আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে আমরা যৎপরোনাস্তি সুখ ভোগ করব, প্রত্যেক মানুষই সমান ভাবে সে-সব ভোগ করবে, আজ আমি ছেঁড়া কম্বলে বসে আছি আর একদিন ভেলভেটের ওপরে বসব ইত্যাদি; কিন্তু তাতে করে কী হবে?……আমি স্বীকার করি দারিদ্র্য দূর করা, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তের একটা বড় কাজ কিন্তু তথাপি বলব এ-আদর্শ অতিশয় তুচ্ছ; মানুষের পরম প্রত্যাশার দিকে গোড়াকার ধাপ মাত্র, কারণ পেট পুরে খাওয়া আর সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার পরেও মানুষ জানতে চাইবে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সে বেঁচে আছে।"

এদিক থেকে 'গেঁয়ো ছেলে'র সঙ্গে 'ইডিয়েট'-এর মিল আছে। দুই উপন্যাসেই একটি সাচ্চা লোক (Positive good man) গোটা পৃথিবীর পাপের বিরুদ্ধে কথা বলছে। 'ইডিয়েট'-এর প্রিনস মিশকিন ব্যক্তিক হৃদয়ের ধার্মিকতার প্রতীক 'গেঁয়ো ছেলে'র মাকার দলগোরুকি নির্বিশেষ মানুষের ধর্মপ্রাণতার প্রতিনিধি—সে সকলের মধ্যে থাকে ও সকলের জন্যে বাঁচে, বসুধাই তার কুটুম্ব। এ অর্থে 'ইডিয়েট' যদি অন্ধকার রাত ত 'গেঁয়ো ছেলে' আসন্ন-প্রভাত। অতঃপর স্বর্গ-তপস্যায় মগ্ন হবেন রাশিয়ার ঋষি, স্বাভাবিক।

পঞ্চম পর্ব

সঙ্গে। 'নাগরিক' কাগজে যা তিনি সংক্ষেপে শুরু করেছিলেন বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার আকারে তাঁর একক লেখা নিয়ে তাই এখন ১৮৭৬-এর জানুয়ারি থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে তিনি তুলছেন সমাজ-ধর্ম দর্শন বিষয়ক প্রশ্ন, রাখছেন পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সূত্র, লিখছেন ছোট ছোট গল্প ও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত নানা ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সাময়িক বিষয়ের ওপরে এই অনুপুঙ্খ বিচার, সমীক্ষা ও সর্ব বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিবিম্ব পত্রিকাটিকে করে তুলেছে বুদ্ধিজীবীদের হাতে থাকার এক অবশ্য-বস্তু। ফলত কাগজখানির বিক্রয় সংখ্যা দেখতে দেখতে ছ'হাজারে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল জনপ্রিয়তা সচ্ছলতা আর গাদা গাদা চিঠির জবাব দেওয়ার দায়।

অবশ্য তার প্রায় সবখানি দায়ই আন্না হাত বাড়িয়ে মাথায় করে নিয়েছিলেন। প্রেস-কাগজ বিজ্ঞাপন-বিক্রি সব দেখেন আন্না। দস্তয়েফ্‌স্কি কেবল লেখেন, ভাবেন, চিঠির জবাব দেন ও যে-সব জায়গায় না-গেলে নয়, যান ·

ভক্তিমতী স্ত্রীর সেবা, সহযোগিতা, আর্থিক সচ্ছলতা, পল্লীগৃহের আরাম অবশেষে সব পেয়েও অস্থির অতৃপ্ত শিল্পী জীবন-রহস্যের অন্ধকার যবনিকার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন আর মগ্ন হয়ে যান দুরবগাহ চিন্তায়। তাঁর তৃতীয়-নয়নের সামনে প্রহেলিকার কঠিন আবরণ। ওকে ছিন্ন করে সত্তার স্বরূপ আবিষ্কার করতে না পারলে বেঁচে থাকাই যেন নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাবে। তিনি তাই অখণ্ড মনোযোগে শান দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ধী, বুদ্ধি ও বোধকে। তাঁর 'লেখকের ডায়েরি' হচ্ছে সেই গ্রাইণ্ডিং-স্টোন। অথবা এটাকে একটা ল্যাবরেটরিও বলতে পারি, যেখানে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তাঁর ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যয়ের এবং অপেক্ষা করছেন সত্যের সেই তিমির-বিদার অভ্যুদয়ের। অতন্দ্র এই তপস্যা চলল দু'বছর, ১৮৭৭-এর ডিসেম্বর অব্দি। অকটোবরেই তিনি তাঁর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের জানিয়ে দিলেন—বছর দুইয়ের জন্য 'লেখকের ডায়েরি' প্রকাশ বন্ধ থাকবে, হেতু অবশ্য দেখালেন তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্যের; কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ফাঁস করলেন বন্ধু ইয়ানফ্‌স্কিকে।—"এবার একটা উপন্যাসে হাত দেব। অনেক দিন থেকে মাথায় একটা কাহিনী ঘুরছে, চরিত্রগুলি বুকের মধ্যে ছটফট করছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে।" অর্থাৎ নূতন কাহিনীর ইডিওলজি ওখানে যখন পরিপূর্ণ আকার পেল, কাগজ বের করার প্রয়োজন আর রইল না তাঁর; তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

পঞ্চম পর্ব

সঙ্গে। 'নাগরিক' কাগজে যা তিনি সংক্ষেপে শুরু করেছিলেন বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার আকারে তাঁর একক লেখা নিয়ে তাই এখন ১৮৭৬-এর জানুয়ারি থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে তিনি তুলছেন সমাজ-ধর্ম দর্শন বিষয়ক প্রশ্ন, রাখছেন পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সূত্র, লিখছেন ছোট ছোট গল্প ও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত নানা ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সাময়িক বিষয়ের ওপরে এই অনুপুঙ্খ বিচার, সমীক্ষা ও সর্ব বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিবিম্ব পত্রিকাটিকে করে তুলেছে বুদ্ধিজীবীদের হাতে থাকার এক অবশ্য-বস্তু। ফলত কাগজখানির বিক্রয় সংখ্যা দেখতে দেখতে ছ'হাজারে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল জনপ্রিয়তা সচ্ছলতা আর গাদা গাদা চিঠির জবাব দেওয়ার দায়।

অবশ্য তার প্রায় সবখানি দায়ই আন্না হাত বাড়িয়ে মাথায় করে নিয়েছিলেন। প্রেস-কাগজ বিজ্ঞাপন-বিক্রি সব দেখেন আন্না। দস্তয়েফ্‌স্কি কেবল লেখেন, ভাবেন, চিঠির জবাব দেন ও যে-সব জায়গায় না-গেলে নয়, যান—

ভক্তিমতী স্ত্রীর সেবা, সহযোগিতা, আর্থিক সচ্ছলতা, পল্লীগৃহের আরাম অবশেষে সব পেয়েও অস্থির অতৃপ্ত শিল্পী জীবন-রহস্যের অন্ধকার যবনিকার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন আর মগ্ন হয়ে যান দুরবগাহ চিন্তায়। তাঁর তৃতীয়-নয়নের সামনে প্রহেলিকার কঠিন আবরণ। ওকে ছিন্ন করে সত্তার স্বরূপ আবিষ্কার করতে না পারলে বেঁচে থাকাই যেন নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাবে। তিনি তাই অখণ্ড মনোযোগে শান দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ধী, বুদ্ধি ও বোধকে। তাঁর 'লেখকের ডায়েরি' হচ্ছে সেই গ্রাইণ্ডিং-স্টোন। অথবা এটাকে একটা ল্যাবরেটরিও বলতে পারি, যেখানে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তাঁর ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যয়ের এবং অপেক্ষা করছেন সত্যের সেই তিমির-বিদার অভ্যুদয়ের। অতন্দ্র এই তপস্যা চলল দু'বছর, ১৮৭৭-এর ডিসেম্বর অব্দি। অকটোবরেই তিনি তাঁর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের জানিয়ে দিলেন—বছর দুইয়ের জন্যে 'লেখকের ডায়েরি' প্রকাশ বন্ধ থাকবে, হেতু অবশ্য দেখালেন তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্যের; কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ফাঁস করলেন বন্ধু ইয়ানফ্‌স্কিকে।—"এবার একটা উপন্যাসে হাত দেব। অনেক দিন থেকে মাথায় একটা কাহিনী ঘুরছে, চরিত্রগুলি বুকের মধ্যে ছটফট করছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে।" অর্থাৎ নূতন কাহিনীর ইডিওলজি ওখানে যখন পরিপূর্ণ আকার পেল, কাগজ বের করার প্রয়োজন আর রইল না তাঁর; তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

এই সেই উপন্যাস যার কেন্দ্রে রয়েছে পিতৃশাতন। এই সেই চরিত্রগুলি যাদের এক ডাকে পরিচয় 'কারামাজোভ ভাইরা'। এই সেই ভুবনবিদিত কাহিনী তিন তিনটে বছর ধরে চলল যাকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে তোলার কাজ। কিন্তু 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' তিন বছর ধরে লেখা হয়েছে বললে ভুল হবে, আসলে এই বই তিনি তাঁর বোধোদয়ের সময় থেকেই মনে মনে রচনা করতে শুরু করেছেন। সময়টা তখন ১৮৪৪, বয়েস তখন তাঁর চব্বিশ। আসন্ন ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা না দিয়েই তিনি মিলিটারি এনজিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে জনতার পথে নেমে এলেন। রাজকীয় সম্মানের চাকরি, বিলাসের জীবন ও সম্পদ যখন হাতের মুঠোয় তখন তিনি বরণ করে নিলেন কষ্ট অভাব আর অনিশ্চয়ের ভবিষ্যৎ। এই দুঃসাধ্য ব্রতে আত্মনিয়োগ করার আগের দিন তিনি দাদাকে লিখে ছিলেন,'···আমি মানুষ হতে চাই। মানুষ হয়ে ওঠা মানে—আমি কে, কেন, কোথায় ইত্যাকার প্রশ্নের জবাব জানা। এক কথায় নিজেকে চেনা, নিজেকে সহস্র রূপে দেখা, নিজের সহস্র রূপের মধ্যে মৌল স্বরূপটি—যা নিজের বিচিত্র-পরিচয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তার মুখোমুখি আসা, তাকে দেখা।' সেই দুশ্চর সাধনারই ফলশ্রুতি 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'। সারা জীবনের নিরলস সাধনার যে-বিশাল মিনার তিনি গড়ে তুলেছেন 'কারামাজোভ ভাইরা' তারই অত্যুচ্চ শীর্ষ। সেখান থেকে আমরা তাঁর সমগ্র কলাকর্মের বিপুল পটভূমির সবটুকু দেখতে পাই, অবশেষে তাঁর মৌল লক্ষ্যের কেন্দ্র বিন্দুটিও। 'গেঁয়ো ছেলে'র পারিবারিক সংকট ও পিতাপুত্রে সংঘর্ষ; 'শয়তান'-এর নৈরাজ্যবাদ ও ঈশ্বরবাদে সংঘাত; 'ইউয়েট্'-এর অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে ('Positive good man'-এর) অনপেক্ষ সংব্যক্তির একক লড়াই এবং সেই সঙ্গে ওই সব রচনার বাগবৈদগ্ধ্য, শৈল্পিক লাবণ্য, বিন্যাস-কুশলতা সব—সমস্তরই সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ঘটেছে সারাজীবনের চিন্তা, অনুভব ও অভিজ্ঞতার অন্তঃসারের মধ্যে বিগত দশ বছরের রচনার জঠরে পুষ্ট ও পরিশুদ্ধ দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতার চরমস্ফূর্তি; যেন 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' রচনা করবেন বলেই প্রস্তুতি-পর্বে ওই সব রচনাগুলির মধ্যে চলছিল তাঁর আত্যন্তিক নিষ্ঠার অনুশীলন।

'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ্, 'গেঁয়ো ছেলে'র আরকাদি দলগোরুকি ও কাতারিনা আখমাকোভা, 'শয়তান'-এর স্তাভরোগিন ও লিজাভেতা নিকোলায়েভনা, 'ইডিয়েট'-এর প্রিন্স মিশকিন, রগোজিন ও নাসতাসিয়া

প্রেরণা ও প্রমিতি। যার ফলশ্রুতি আমরা দেখি 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'র জোসিমা-চরিত্রে। যে-চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে 'কারামাজোভ ভাইরা' কল্পনাই করা যায় না সে-বই কী কখনো লেখা হত ফাদার আমব্রোসির সঙ্গে দেখা না হলে? বইখানিতে হাত দিতে গিয়ে বার বার তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, ; যেন এমনই একজন যীশুতুল্য মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন—যেন এমন মানুষটির সঙ্গে দেখা না হলে কলম ধরতে পারছিলেন না তিনি। এবার দেখা হয়ে গেল, আর বাধা কোথায়? প্রতুল প্রত্যয়ে ভরে উঠল তাঁর মন। তৈরি হলেন তিনি তাঁর কীর্তির মিনার নির্মাণে।

সলোভিয়ফের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক কূট তর্ক ও বিভিন্ন সেমিনার ও য়ুনিভারসিটিতে তাঁর দেয়া দার্শনিক-ভাষণ দস্তয়েফ্‌স্কিকে সাহায্য করেছে 'অনুকূল ও প্রতিকূল' অংশে ঈশ্বরের প্রতি যুব সমাজের অবিশ্বাস, বিশ্বকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে অস্বীকার ইত্যাদি নৈরাজ্যবাদের কথা অকাট্য যুক্তিতে উপস্থিত করতে আর অপতিনার ঋষির সাহচর্য তাঁকে সাহায্য করেছে ঈশ্বরের বাস্তবতা প্রমাণসিদ্ধ করতে। ফলত জোসিমাকে সৃষ্টি করে তিনি 'অনুকূল ও প্রতিকূল' অংশের অকাট্য যুক্তিকেও খণ্ডন করতে পেরেছেন, প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যীশুর প্রতি বিশ্বাস ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম তথা বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব।

চারলক্ষ শব্দের এই বিশাল ও বিরল মহাকাব্যে মানবিক জীবনকে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে বেষ্টন করা হয়েছে যে, তাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যা কী বিশ্লেষণ করা একেবারেই অসম্ভব। মানবা-মনের অন্তর্বৃত্তির অন্তিম স্পর্শ করতে চেয়ে ও তার অধ্যাত্মধর্ম নিরাকরণ করতে বসে নিদারুণ সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর কতকগুলি মানুষকে ও সেই মানুষের সমাজকে তিনি একটা হত্যার পটভূমিতে সংকর্ষণ করেছেন। হত্যা এমনই একটা ঘটনা যাতে—যে হত্যা করে, যে নিহত হয়, যারা সে-ষড়যন্ত্রে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় অথবা চক্রান্ত ক্রমে জড়িয়ে যায় এবং যে সামাজিক পরিবেশে ঘটনাটা ঘটে, সে সব—সমস্তকে নিয়ে স্বতঃই একটা প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, তার বিষম আলোড়নে সমাজ-মানসের যত বিষ যত অমৃত সব পাক খেয়ে উঠে আসে ওপরে প্রচ্ছন্নকে প্রকটিত দেখা যায় তখন, অনুমানের বিষয় প্রমাণিত সত্য হয়ে ওঠে। ত্বক চিরে দেখালে যেমন আর তর্ক থাকে না— চোখের আড়ালে ত্বকের নিচে রক্ত আছে।

তিনটি বৈধ ও একটি অবৈধ পুত্রের জনক ফিওদর কারামাজোভের খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মূল উপন্যাস।—গ্রুশেংকা নামে এক যুবতী

এই সেই উপন্যাস যার কেন্দ্রে রয়েছে পিতৃশাতন। এই সেই চরিত্রগুলি যাদের এক ডাকে পরিচয় 'কারামাজোভ ভাইরা'। এই সেই ভুবনবিদিত কাহিনী তিন তিনটে বছর ধরে চলল যাকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে তোলার কাজ। কিন্তু 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' তিন বছর ধরে লেখা হয়েছে বললে ভুল হবে, আসলে এই বই তিনি তাঁর বোধোদয়ের সময় থেকেই মনে মনে রচনা করতে শুরু করেছেন। সময়টা তখন ১৮৪৪, বয়েস তখন তাঁর চব্বিশ। আসন্ন ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা না দিয়েই তিনি মিলিটারি এনজিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে জনতার পথে নেমে এলেন। রাজকীয় সম্মানের চাকরি, বিলাসের জীবন ও সম্পদ যখন হাতের মুঠোয় তখন তিনি বরণ করে নিলেন কষ্ট অভাব আর অনিশ্চয়ের ভবিষ্যৎ। এই দুঃসাধ্য ব্রতে আত্মনিয়োগ করার আগের দিন তিনি দাদাকে লিখে ছিলেন,'…আমি মানুষ হতে চাই। মানুষ হয়ে ওঠা মানে - আমি কে, কেন, কোথায় ইত্যাকার প্রশ্নের জবাব জানা। এক কথায় নিজেকে চেনা, নিজেকে সহস্র রূপে দেখা, নিজের সহস্র রূপের মধ্যে মৌল স্বরূপটি—যা নিজের বিচিত্র-পরিচয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তার মুখোমুখি আসা, তাকে দেখা।' সেই দুশ্চর সাধনারই ফলশ্রুতি 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'। সারা জীবনের নিরলস সাধনার যে-বিশাল মিনার তিনি গড়ে তুলেছেন 'কারামাজোভ ভাইরা' তারই অত্যুচ্চ শীর্ষ। সেখান থেকে আমরা তাঁর সমগ্র কলাকর্মের বিপুল পটভূমির সবটুকু দেখতে পাই, অবশেষে তাঁর মৌল লক্ষ্যের কেন্দ্র বিন্দুটিও। 'গেঁয়ো ছেলে'র পারিবারিক সংকট ও পিতাপুত্রে সংঘর্ষ; 'শয়তান'-এর নৈরাজ্যবাদ ও ঈশ্বরবাদে সংঘাত; 'ইডিয়েট্'-এর অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে ('Positive good man'-এর) অনপেক্ষ সংব্যক্তির একক লড়াই এবং সেই সঙ্গে ওই সব রচনার বাগবৈদগ্ধ্য, শৈল্পিক লাবণ্য, বিন্যাস-কুশলতা সব – সমস্তরই সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ঘটেছে সারাজীবনের চিন্তা, অনুভব ও অভিজ্ঞতার অন্তঃসারের মধ্যে বিগত দশ বছরের রচনার জঠরে পুষ্ট ও পরিশুদ্ধ দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতার চরমস্ফূর্তি; যেন 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' রচনা করবেন বলেই প্রস্তুতি পর্বে ওই সব রচনাগুলির মধ্যে চলছিল তাঁর আত্যন্তিক নিষ্ঠার অনুশীলন।

'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ্, 'গেঁয়ো ছেলে'র আরকাদি দলগোরুকি ও কাতারিনা আখমাকোভা, 'শয়তান'-এর স্তাভরোগিন ও লিজাভেতা নিকোলায়েভনা, 'ইডিয়েট'-এর প্রিন্স মিশকিন, রগোজিন ও নাসতাসিয়া

প্রেরণা ও প্রমিতি। যার ফলশ্রুতি আমরা দেখি 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি'র জোসিমা-চরিত্রে। যে-চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে 'কারামাজোভ ভাইরা' কল্পনাই করা যায় না সে-বই কী কখনো লেখা হত ফাদার আমব্রোসির সঙ্গে দেখা না হলে? বইখানিতে হাত দিতে গিয়ে বার বার তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, ; যেন এমনই একজন যীশুতুল্য মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন—যেন এমন মানুষটির সঙ্গে দেখা না হলে কলম ধরতে পারছিলেন না তিনি। এবার দেখা হয়ে গেল, আর বাধা কোথায়? প্রতুল প্রত্যয়ে ভরে উঠল তাঁর মন। তৈরি হলেন তিনি তাঁর কীর্তির মিনার নির্মাণে।

সলোভিয়ফের সঙ্গে তাঁর দার্শনিক কূট তর্ক ও বিভিন্ন সেমিনার ও য়ুনিভার'সটিতে তাঁর দেয়া দার্শনিক-ভাষণ দস্তয়েফ্‌স্কিকে সাহায্য করেছে 'অনুকূল ও প্রতিকূল' অংশে ঈশ্বরের প্রতি যুব সমাজের অবিশ্বাস, বিশ্বকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে অস্বীকার ইত্যাদি নৈরাজ্যবাদের কথা অকাট্য যুক্তিতে উপস্থিত করতে আর অপতিনার ঋষির সাহচর্য তাঁকে সাহায্য করেছে ঈশ্বরের বাস্তবতা প্রমাণসিদ্ধ করতে। ফলত জোসিমাকে সৃষ্টি করে তিনি 'অনুকূল ও প্রতিকূল' অংশের অকাট্য যুক্তিকেও খণ্ডন করতে পেরেছেন, প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যীশুর প্রতি বিশ্বাস ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম তথা বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব।

চারলক্ষ শব্দের এই বিশাল ও বিরল মহাকাব্যে মানবিক জীবনকে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে বেষ্টন করা হয়েছে যে, তাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যা কী বিশ্লেষণ করা একেবারেই অসম্ভব। মানুষী-মনের অন্তর্বৃত্তির অন্তিম স্পর্শ করতে চেয়ে ও তার অধ্যাত্মধর্ম নিরাকরণ করতে বসে নিদারুণ সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর কতকগুলি মানুষকে ও সেই মানুষের সমাজকে তিনি একটা হত্যার পটভূমিতে সংকর্ষণ করেছেন। হত্যা এমনই একটা ঘটনা যাতে—যে হত্যা করে, যে নিহত হয়, যারা সে-ষড়যন্ত্রে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় অথবা চক্রান্ত ক্রমে জড়িয়ে যায় এবং যে সামাজিক পরিবেশে ঘটনাটা ঘটে, সে-সব—সমস্তকে নিয়ে স্বতঃই একটা প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, তার বিষম আলোড়নে সমাজ-মানসের যত বিষ যত অমৃত সব পাক খেয়ে উঠে আসে ওপরে। প্রচ্ছন্নকে প্রকটিত দেখা যায় তখন, অনুমানের বিষয় প্রমাণিত সত্য হয়ে ওঠে। ত্বক চিরে দেখালে যেমন আর তর্ক থাকে না—চোখের আড়ালে ত্বকের নিচে রক্ত আছে।

তিনটি বৈধ ও একটি অবৈধ পুত্রের জনক ফিওদর কারামাজোভের খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মূল উপন্যাস।—গ্রুশেংকা নামে এক যুবতী

নগর-বনিতার অধিকার নিয়ে ফিওদর কারামাজোভ ও তার বড় ছেলে দ্‌মিত্রি কারামাজোভের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রেষারেষি ক্রমশ চরমে ওঠে। হাতাহাতি কথাকাটাকাটি হয়। শেষমেশ সকলকে শুনিয়ে দ্‌মিত্রি হুমকি দেয়, সে তার বাপকে খুন করবে। ফলে বুড়ো বাপকে যখন নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়ে দ্‌মিত্রির ওপরে। অথচ দ্‌মিত্রি নয়, আসলে খুনী হল ফিওদরের অবৈধ সন্তান মৃগী রোগগ্রস্ত স্মেরদিয়াকফ। 'পাপ ও শাস্তি'র সভিদ্রিগাইলফ্‌ রাসকলনিকফের ওপরে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল বুড়োর দ্বিতীয় ছেলে ইভানের সেই প্রভাব দেখি স্মেরদিয়াকফের ওপরে। কেবল ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্মেরদিয়াকফ্‌ একটু বেশী স্থূল এই যা পার্থক্য!

স্মেরদিয়াকফ্‌ ইভানের ধারণার পথ ধরে প্রস্তুত হতে থাকে ও শেষমেশ তারই মতবাদকে কার্যকর করে বসে। অতএব ইভানকেই আমরা বলতে পারি যথার্থ খুনী অথবা তাত্ত্বিক খুনী। অর্থাৎ ইভানই আসলে স্মেরদিয়াকফের হাত দিয়ে খুন করে তাঁর বাপকে। কী ভাবে? হ্যাঁ, ইভানের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের যুক্তিই সংক্রামিত করেছিল স্মেরদিয়াকফ্‌কে। ইভানের নিরীশ্বরবাদই হয়ে উঠেছিল স্মেরদিয়াকফের পাপের প্রেরণা। আর যে-পাপ সে করে নি অথচ ক্রোধবশে মনে মনে পোষণ করত তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্‌মিত্রি যখন গেল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে আর খুনী করল আত্মহত্যা তখন ইভান গেল পাগল হয়ে। সে তার বিবেকের দংশন সহ্য করতে পারল না। যেমন পারে নি 'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ্‌—স্বতঃই স্বীকারোক্তি করতে গিয়েছিল।

কারামাজোভ ভাইরা সব ক'টিই তদানীন্তন রুশী সময় ও সমাজের অস্থির নিরবলম্ব জীবনের যথার্থ প্রতীক হলেও দ্‌মিত্রিকেই আমরা নিকষিত পুরুষ ও প্রকৃত রুশী বলব। দস্তয়েফ্‌স্কির এই চরিত্রই এই নির্মম বিয়োগান্ত কাহিনীর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মর্ম উন্মোচন করেছে। কিন্তু আগেই বলেছি সফল কাহিনী রচনাই এ-উপন্যাসের মুখ্য লক্ষ্য নয়। দুর্লভ মনীষা এ-কাহিনীকে কেন্দ্র করে জীবনের ধর্ম ও মানুষের অস্তিত্বের গহন-রহস্যকে অনাবৃত করতে চেয়েছে, সেদিক থেকে এ-উপন্যাসের সব চেয়ে অভিনিবেশযোগ্য অংশ হচ্ছে ইভান ও আলিওশার তর্ক। এ-বিতর্কের শুরু উপন্যাসের প্রথম দিককার কতিপয় পরিচ্ছেদে। "ঈশ্বর বলে কেউ আছে?" এ-প্রশ্নের উত্তরে দু'ভাই দুই বিপরীত কোটিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও এক সময়ে ইভানের ঈশ্বরদ্রোহিতা এক বিখ্যাত তথ্যের মধ্যে দিয়ে অভিযোগপত্র হয়ে উপস্থিত হয় 'প্রো-অ্যাণ্ড কনট্রা' (অনুকূল

মৃতের আত্মাদের দেখার কোন হেতু নেই তাদের। কিন্তু যখনই সে অসুখে পড়ে, যখনই তার জৈব-ধর্ম বিপর্যস্ত হয়, এই বস্তু-জগতের প্রান্ত-লগ্ন অন্য-জগৎটি প্রকট হতে শুরু করে তার কাছে। এবং যে যত-বেশী অসুস্থ হতে থাকে তত বেশী সেই জগতে অনুপ্রবেশ ঘটে তার। মৃগীর আক্রমণে ফিট হয়ে পড়লে দস্তয়েফ্‌স্কিও এই জগতাতীত সেই জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতেন তাই রোগটাকে তিনি কখনো মৃগী বলে স্বীকার করতেন না, অধিকন্তু আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে রোগটাকে যুক্ত করে দেখতেন, বলতেন, এটা আমার অন্য জগতে প্রবেশের একটা ছাড়পত্র কেবল, অসুখ নয়। অসুখ নয় এ-অর্থেও যে, এ-অসুখের মধ্যে শারীরিক কষ্টের সুখ জনিত মর্ষকামিতাও নিহিত ছিল।

যন্ত্রণার মধ্যে যে সুখ আছে তিনি তার স্বাদ প্রথম পান তাঁর প্রথম স্ত্রী যখন অন্যের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। সেই মর্ষকামের সুখের স্বাদ আরও তীব্রভাবে তিনি ভোগ করেন পলিনা সুস্‌লোভার সঙ্গে প্রণয়লিপ্ত থাকার কালে। সেই থেকে বার বার তিনি নানা প্রসঙ্গে বিপরীতের স্বাদ পেয়েছেন তাঁর বোধের ভিতরে। জীবনভোর তিনি দেখে এসেছেন ভালবাসার সঙ্গে ঘৃণার, অহংকারের সঙ্গে আত্মাবমাননার, সুখের সঙ্গে যন্ত্রণার আত্যন্তিক সহাবস্থান। এবং নিজে সেই বিপরীতের মর্মান্তিক বিরোধের মধ্যেই আনন্তিক সুখ অনুভব করে মর্ষকামী বা দুঃখবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সে-আত্মাশ্রয়ী দুঃখবাদ তিনি প্রচার করেছেন নানা চরিত্রের কণ্ঠে। 'পাপ ও শাস্তি'র মারমেলাদফ্‌ নেশায় চুর হয়ে যেতে চায়, কেন না সে চায়. "নিজের বেঁচে থাকার যন্ত্রণাকে আত্যয়িক তীব্র করে তুলতে।" 'শয়তান'-এর স্তাভরোগিন বার বার নিজেকে অপদস্থ হতে দেয়, বার বার নিজেকে লাঞ্ছিত করার সুযোগ খোঁজে, কেন না তার মধ্যেই সে বেঁচে থাকার চরম সুখ ভোগ করে। 'কারামাজোভ ভাইরা'র লিজা খোকলাকোভা একটি তুচ্ছ চরিত্র—তাকেও দেখি তার ভালবাসার মানুষ আলিওশার সঙ্গে দারুণ ঝগড়ার শেষে দরজার চিপায় আঙুল থেঁতো করে রক্তাপ্লুত হয়ে সুখ পাচ্ছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই লক্ষণগুলিকে বলেছেন বিকৃত-যৌনবৃত্তি (বিলসন কাম ?)। দস্তয়েফ্‌স্কির চরিত্রগুলিও তাই। তদর্থে দস্তয়েস্ক্‌ফিকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, পাপ ও যন্ত্রণার বিশ্লেষণে বিবর্তন এনে তিনি আর এক নূতন দর্শনেরও পথিকৃৎ হয়েছেন। সে-দর্শনের নাম প্রাতিস্বিক-দর্শন (একসিস-টেনশিয়ালিজম)। উনবিংশ শতকের তিন মহাজ্ঞানী (কিয়েৰ্কেগার্দ,

নগর-বনিতার অধিকার নিয়ে ফিওদর কারামাজোভ ও তার বড় ছেলে দ্‌মিত্রি কারামাজোভের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রেষারেষি ক্রমশ চরমে ওঠে। হাতাহাতি কথাকাটাকাটি হয়। শেষমেশ সকলকে শুনিয়ে দ্‌মিত্রি হুমকি দেয়, সে তার বাপকে খুন করবে। ফলে বুড়ো বাপকে যখন নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়ে দ্‌মিত্রির ওপরে। অথচ দ্‌মিত্রি নয়, আসলে খুনী হল ফিওদরের অবৈধ সন্তান মৃগী রোগগ্রস্ত স্মেরদিয়াকফ। 'পাপ ও শাস্তি'র স্‌ভিদ্রিগাইলফ্‌ রাসকলনিকফের ওপরে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল বুড়োর দ্বিতীয় ছেলে ইভানের সেই প্রভাব দেখি স্মেরদিয়াকফের ওপরে। কেবল ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্মেরদিয়াকফ্‌ একটু বেশী স্থূল এই যা পার্থক্য।

স্মেরদিয়াকফ্‌ ইভানের ধারণার পথ ধরে প্রস্তুত হতে থাকে ও শেষমেশ তারই মতবাদকে কার্যকর করে বসে। অতএব ইভানকেই আমরা বলতে পারি যথার্থ খুনী অথবা তান্ত্রিক খুনী। অর্থাৎ ইভানই আসলে স্মেরদিয়াকফের হাত দিয়ে খুন করে তাঁর বাপকে। কী ভাবে? হ্যাঁ, ইভানের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের যুক্তিই সংক্রামিত করেছিল স্মেরদিয়াকফ্‌কে। ইভানের নিরীশ্বরবাদই হয়ে উঠেছিল স্মেরদিয়াকফের পাপের প্রেরণা। আর যে-পাপ সে করে নি অথচ ক্রোধবশে মনে মনে পোষণ করত তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্‌মিত্রি যখন গেল সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে আর খুনী করল আত্মহত্যা তখন ইভান গেল পাগল হয়ে। সে তার বিবেকের দংশন সহ্য করতে পারল না। যেমন পারে নি 'পাপ ও শাস্তি'র রাসকলনিকফ্‌—স্বতঃই স্বীকারোক্তি করতে গিয়েছিল।

কারামাজোভ ভাইরা সব ক'টিই তদানীন্তন রুশী সময় ও সমাজের অস্থির নিরবলম্ব জীবনের যথার্থ প্রতীক হলেও দ্‌মিত্রিকেই আমরা নিকষিত পুরুষ ও প্রকৃত রুশী বলব। দস্তয়েফ্‌স্কির এই চরিত্রই এই নির্মম বিয়োগান্ত কাহিনীর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মর্ম উন্মোচন করেছে। কিন্তু আগেই বলেছি সফল কাহিনী রচনাই এ-উপন্যাসের মুখ্য লক্ষ্য নয়। দুর্লভ মনীষা এ-কাহিনীকে কেন্দ্র করে জীবনের ধর্ম ও মানুষের অস্তিত্বের গহন-রহস্যকে অনাবৃত করতে চেয়েছে, সেদিক থেকে এ-উপন্যাসের সব চেয়ে অভিনিবেশযোগ্য অংশ হচ্ছে ইভান ও আলিওশার তর্ক। এ-বিতর্কের শুরু উপন্যাসের প্রথম দিককার কতিপয় পরিচ্ছেদে। "ঈশ্বর বলে কেউ আছে?" এ-প্রশ্নের উত্তরে দু'ভাই দুই বিপরীত কোটিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও এক সময়ে ইভানের ঈশ্বরদ্রোহিতা এক বিখ্যাত তথ্যের মধ্যে দিয়ে অভিযোগপত্র হয়ে উপস্থিত হয় 'প্রো অ্যাণ্ড কনট্রা' (অনুকূল

মূর্তের আত্মাদের দেখার কোন হেতু নেই তাদের। কিন্তু যখনই সে অসুখে পড়ে, যখনই তার জৈব-ধর্ম বিপর্যস্ত হয়, এই বস্তু-জগতের প্রান্ত-লগ্ন অন্য-জগৎটি প্রকট হতে শুরু করে তার কাছে। এবং যে যত-বেশী অসুস্থ হতে থাকে তত বেশী সেই জগতে অনুপ্রবেশ ঘটে তার। মৃগীর আক্রমণে ফিট হয়ে পড়লে দস্তয়েফ্‌স্কিও এই জগতাতীত সেই জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতেন তাই রোগটাকে তিনি কখনো মৃগী বলে স্বীকার করতেন না, অধিকন্তু আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে রোগটাকে যুক্ত করে দেখতেন, বলতেন, এটা আমার অন্য জগতে প্রবেশের একটা ছাড়পত্র কেবল, অসুখ নয়। অসুখ নয় এ-অর্থেও যে, এ-অসুখের মধ্যে শারীরিক কষ্টের সুখ জনিত মর্ষকামিতাও নিহিত ছিল।

যন্ত্রণার মধ্যে যে সুখ আছে তিনি তার স্বাদ প্রথম পান তাঁর প্রথম স্ত্রী যখন অন্যের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। সেই মর্ষকামের সুখের স্বাদ আরও তীব্রভাবে তিনি ভোগ করেন পলিনা সুস্‌লোভার সঙ্গে প্রণয়লিপ্ত থাকার কালে। সেই থেকে বার বার তিনি নানা প্রসঙ্গে বিপরীতের স্বাদ পেয়েছেন তাঁর বোধের ভিতরে। জীবনভোর তিনি দেখে এসেছেন ভালবাসার সঙ্গে ঘৃণার, অহংকারের সঙ্গে আত্মাবমাননার, সুখের সঙ্গে যন্ত্রণার আত্যন্তিক সহাবস্থান। এবং নিজে সেই বিপরীতের মর্মান্তিক বিরোধের মধ্যেই আনন্তিক সুখ অনুভব করে মর্ষকামী বা দুঃখবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সে-আত্মাশ্রয়ী দুঃখবাদ তিনি প্রচার করেছেন নানা চরিত্রের কণ্ঠে। 'পাপ ও শাস্তি'র মারমেলাদফ্‌ নেশায় চুর হয়ে যেতে চায়, কেন না সে চায়. "নিজের বেঁচে থাকার যন্ত্রণাকে আত্যন্তিক তীব্র করে তুলতে।" 'শয়তান'-এর স্তাভরোগিন বার বার নিজেকে অপদস্থ হতে দেয়, বার বার নিজেকে লাঞ্ছিত করার সুযোগ খোঁজে, কেন না তার মধ্যেই সে বেঁচে থাকার চরম সুখ ভোগ করে। 'কারামাজোভ ভাইরা'র লিজা খোকলাকোভা একটি তুচ্ছ চরিত্র—তাকেও দেখি তার ভালবাসার মানুষ আলিওশার সঙ্গে দারুণ ঝগড়ার শেষে দরজার চিপায় আঙুল থেঁতো করে রক্তাপ্লুত হয়ে সুখ পাচ্ছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই লক্ষণগুলিকে বলেছেন বিকৃত-যৌনবৃত্তি (বিলসন কাম ?)। দস্তয়েফ্‌স্কির চরিত্রগুলিও তাই। তদর্থে দস্তয়েফ্‌স্কিকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, পাপ ও যন্ত্রণার বিশ্লেষণে বিবর্তন এনে তিনি আর এক নূতন দর্শনেরও পথিকৃৎ হয়েছেন। সে-দর্শনের নাম প্রাতিস্বিক-দর্শন (একসিস-টেনশিয়ালিজম)। উনবিংশ শতকের তিন মহাজ্ঞানী (কিয়েৰ্কেগার্দ,

নীৎশে ও দস্তয়েফস্কি) তিন ভিন্ন দেশে পরস্পরের অজান্তে এই বিচ্ছিন্নতার দর্শন ও প্রবাসীমনের মনস্তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। 'পাতাল থেকে আলাপ'-এ তিনি চেরনিশেফ্স্কির দ্বিধার জবাব দিতে গিয়েই প্রথম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'মানুষের প্রকৃতি সব সময় যুক্তির সরল পথ ধরে চলে না, তার সদ্‌বৃত্তিগুলিও তাই। অধিকন্তু মানুষের স্বভাবে রয়েছে পাপের প্রতি স্বাভাবিক টান; অনুরূপ টান তার দুঃখ ভোগের জন্যেও। এই দুইয়ের প্রতি তার প্রকৃতি এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে সে ইচ্ছা করেই পাপ করে ও তার পরিণামে অনিবার্য দুঃখও সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়।' যেমন 'পাপ ও শাস্তি'র স্‌ভিদ্রিগাইলফ্ নিয়েছে, নিয়েছে 'শয়তান'-এর স্তাভরোগিন। বিকৃতকাম লিজা খোকলাকোভাও তার আর একটি উদাহরণ—সে কল্পনা করে মজা পায়, তার চোখের সামনে একটা বাচ্চাকে যখন মারতে মারতে প্রায় খুন করে ফেলা হচ্ছে, তখন সে-দৃশ্য দেখতে দেখতে সে দিব্যি আরামে সিরাপে ভেজানো আনারস খাচ্ছে।

এই যে পাপের প্রতি টান প্রত্যেক মানুষের; চেতনায় কি অবচেতনায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই যে নরক, এর তাৎপর্য প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর 'গেঁয়ো ছেলে' উপন্যাসে। এখানেই তিনি প্রথম সূত্রাকারে উপস্থিত করেন তাঁর তত্ত্ব—এই পাপবোধ, এই নরক-সচেতনতাই মানুষের মতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়; তার মধ্যেকার ভালমন্দের দ্বন্দ্ব অবশেষে নয়-প্রতিনয়ের সংঘর্ষে সমন্বয় হয়, পরমের সঙ্গে সাযোজ্য ঘটায় মানুষের। 'গেঁয়ো ছেলে'-তে এই আভাসিত তত্ত্ব পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে উপস্থিত হয়েছে 'কারামাজোভ ভাইরা' উপন্যাসে দ্‌মিত্রি-চরিত্রের মধ্যে। দ্‌মিত্রি পাপ ও তজ্জনিত দুঃখ অঙ্গিকার করে পরিণামে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে মুক্তি প্রার্থনা করেছে।

ডি. এইচ. লরেন্স্ দস্তয়েফ্স্কির এই তত্ত্বকে এক কথায় বলেছেন, 'Sinning your way to Jesus' কিন্তু তাতে করে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। কেন না, দস্তয়েফ্স্কির 'পাপবোধে' একটা সর্বজনিকতা আছে। মানে পাপকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার করে দেখেন নি—এটা তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়, সমাজ ও দেশে ইতিহাসের বিশেষ অভিব্যক্তি। সমষ্টিগত এই পাপ আমরা দস্তয়েফ্স্কিতে প্রথম দেখি 'বেসী' (শয়তান) উপন্যাসে। তার শেষ পরিচ্ছেদ ক'টিতে। এক জায়গায় স্তেপান ত্রোফিমোভিচ্ আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলছে, 'সব মানুষ সব মানুষের সামনে সব বিষয়ে পাপ করেছে।' এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনি আবার কারামাজোভ

ভাইরা'-তে। তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের কথা উদ্ধৃত করে আচার্য জোসিমা আলিওশাকে বল্‌ছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই সকলের পাপ বহন করছি, দুনিয়ার সব কিছুর জন্যেই আমরা অপরাধী। না, কেবল বিশ্বজনীন পাপেই আমরা পাপী নই, ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ও সকলে সকলের পাপের অংশীদার। খৃষ্টধর্মের মূলেই আছে এই বোধ। সকলের পাপ বহন করে, সকলের পাপে দহিত হয়েই তবে পবিত্র খৃষ্টান হয়ে ওঠে মানুষ। আর এ-থেকেই জন্মে মানুষের প্রতি মানুষের, সর্বজীবে মানুষের প্রেম-বোধ, সৌভ্রাতৃত্ব। মনের মধ্যে এই বোধ সত্যি হয়ে উঠলে, অর্থাৎ তুমি যথার্থ খৃষ্টান হলে, আব সহযাত্রী বন্ধুকে প্রতিবেশী ভাইকে পাপের জন্যে অভিযুক্ত করতে পার না, কেন না, তার পাপের তুমিও যে অংশভাক্‌ হয়ে উঠেছ।

এই যে নিজেকে অন্যের পাপের অংশভাক্‌ করা এটা রুশী জনমানসের এক অকৃত্রিম প্রকৃতস্থ ব্যাপার। যার ফলে ১৮৬০-এর দশকে য়ুরোপের ধাচে জুরী পদ্ধতিতে বিচার প্রবর্তন করে দারুণ অস্বস্তি দেখা দিল।--একেবারে হাতে-নাতে ধরা-পড়া গর্হিত কাজের আসামীকেও জুরীরা সর্বসম্মতিক্রমে বেকসুর খালাস দিয়ে দিচ্ছিলেন। জুরীদের যুক্তি: ওর মতন অবস্থায় পড়লে আমরা হয় ত ওর চেয়েও জঘন্য কাজ করে বসতাম অতএব ওর দোষ নেই। আসলে প্রকৃত খৃষ্টানের কাছে এটাই পরম যুক্তি যা অবশিষ্ট দুনিয়ার কাছে এখনও অজ্ঞাত—মন্তব্য করেছেন দস্তয়েফ্‌স্কি তাঁর 'লেখকের ডায়েরি'তে।

অবশ্য এমন একটা চরম সিদ্ধান্তের পরম বিপদও আছে। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে: 'সকলের পাপের জন্যে সকলে দায়ী' দস্তয়েফ্‌স্কির এই তত্ত্বের সঙ্গে, 'কারো পাপের জন্যে অন্য কেউ দায়ী নয়, একের পাপের অংশভাক্‌ সকলে ত কিছুতেই নয়', চেখফের এ-তত্ত্বের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু 'কারামাজোভ ভাইরা' উপন্যাসখানির শেষ ক'টা অধ্যায় পড়তে বসে এ সব তার্কিক বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি খোঁজার মতন মনের সতর্ক অবস্থা থাকে না অধিকন্তু আমাদের সতর্ক মন কখন অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ হয়ে যায়। খুনের দায়ে দ্‌মিত্রি গ্রেফ্‌তার হওয়ার পর থেকেই দস্তয়েফ্‌স্কির দুরাসদ প্রতিভা আমাদের বুদ্ধি ও আবেগের লাগাম ধরে বসে, আমরা তাঁর মুঠো থেকে অব্যাহতি পেতে ভুলে যাই, প্রশ্ন করতেও মনে থাকে না আমাদের। তিনি আমাদের দিয়ে যা চিন্তা করান, অনুভব করান, তার থেকে অন্য রকম কিছু চিন্তা করার অনুভব করার ক্ষমতা থাকে না আমাদের। এক কথায় আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তাঁর ইচ্ছার

...ছে আত্মসমর্পণ করে তাঁরই চিন্তা, উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের শরিক হয়ে যাই। ব্যাপারটা ব্যাপক ভাবে শুরু হয়, সব তছনছ করে দেওয়া সেই দীর্ঘ জেরার পর্বে। বস্তুত এই দুর্লভ প্রতিভা-ভাস্বর পর্বটির তুলনা করা যায়, এমন আর একখানি উপন্যাস না রুশ-সাহিত্যে না অন্য কোন দেশের সাহিত্যে আজ অব্দি ত নেই-ই ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু ওখানেই সেই উজ্জ্বল চোখ-ঝলসানো প্রতিভার দীপ্ত বিভার শেষ নয়; বস্তুত ওখান থেকে বিচারের শেষ পর্ব ও সাইবেরিয়ায় দ্মিত্রির নির্বাসন অব্দি—বইয়ের শেষ অব্দি ধরুন না কেন, চার লক্ষ শব্দের বিশাল উপন্যাসের দুর্ধর্ষ সব চরিত্রের সমাবেশের মধ্য থেকে দ্মিত্রিই অদ্বিতীয় হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের চোখে, তার জ্বলন্ত উপস্থিতি আড়াল করে দেয় আর সব, সমস্তকে। তখন তার চোখ দিয়ে ছাড়া আর কারো চোখ দিয়েই এই জগৎ ও জীবনকে দেখতে বুঝতে পারি নে: সে যা দেখায় বোঝায় সবই আমাদের নিজস্ব দেখা ও বোঝা, সর্বোপরি আমাদের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। আগে এক জায়গায় বলেছি, দস্তয়েফ্‌স্কি লিখতেন প্রভুর মতন। সেই প্রভুর মতন লেখা যে কী, উপন্যাসটির এই অংশ পড়লেই পাঠক জানতে পারবেন।

ইডিয়েট-এর প্রিন্স্‌ মিশ্‌কিনের মতন দ্মিত্রি কারামাজোভও আমাদের উত্তীর্ণ করে দেয় এক অনাস্বাদিত অধ্যাত্মবোধের উর্ধ্বলোকে, প্রিনস মিশ্‌কিনের মতন দ্মিত্রিকেও মনে হয় না—যে-জগতে সে বাস করছে সে-জগতের মানুষ সে। দ্মিত্রি গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে যার মর্ম তার নিগ্রহকারীর উপলব্ধির উর্ধ্বে। দ্মিত্রি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে; তার অপরাধ খণ্ডনের পক্ষে যত সব বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেগুলি থেকে সে উপেক্ষায় মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেগুলি অস্বীকার করতেই যেন তার উৎসাহ বেশী, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তার এতটুকু আগ্রহ নেই। সে যেন বুঝে গেছে, এই কষ্ট বহন করাই তার জীবনের সত্য। এ-সত্যোপলব্ধি থেকে কিছুতেই সে বিচ্যুত হবে না এই যেন তার পণ। সে পণের হেতুও খুব পরিষ্কার; যে হেতু সে স্থির করেছে সে যদি তার পিতার মৃত্যুর কারণ নাও হয় তবুও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। স্বকৃত কোন পাপ না থাকলেও সে প্রায়শ্চিত্ত করবে; সে প্রায়শ্চিত্ত করবে অন্যের পাপের—সকলের হয়ে সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে সে। এবং এই নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্তের পথেই হবে তার মুক্তির পথে অভিযাত্রা।

দ্মিত্রি কারামাজোভ দস্তয়েফ্স্কির শেষ উপন্যাসের মহৎ চরিতমালার মহত্তম চরিত্র শুধ্ নয়—শুধু নয় তাঁর 'পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়েই মানুষের যথার্থ মুক্তি' এই তত্ত্বের সার্থক উপস্থাপনা--দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমের উর্ধ্বে এ-চরিত্র সার্থকতম শিল্প-কৃতিত্বও হয়ে উঠেছে তার বিয়োগান্ত পরিণামের ভিতর দিয়ে। শিল্পকর্মের নিখুঁত প্রসাদগুণে দ্মিত্রি-চরিত্র উত্তীর্ণ হয়েছে শুদ্ধ কবিতায়। এর সঙ্গে কেবল যৎকিঞ্চিৎ তুলনা চলে দস্তয়েফ্স্কির অন্যতম সফল চরিত্র প্রিন্স্ মিশকিনের, সে-ও আংশিকভাবে। দ্মিত্রি কারামাজোভের কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দ আর শব্দ থাকে না; ধ্বনিতে ও ব্যঞ্জনায় গহন-অবগাহী কবিতা হয়ে ওঠে। প্রিন্স মিশকিনে তার অভাব আছে অনেক ক্ষেত্রে।

অনিবার্য নির্বাসন-দণ্ড সামনে করে দ্মিত্রি বলছে, '…আমি বিশ্বাস করি আমার মনের মধ্যে এত শক্তি রয়েছে যে, আমি সব কিছু পার হয়ে যাব, সব যন্ত্রণা, সব কষ্ট…প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আমি বলতে পারব, আমি আছি— সহস্র উৎপীড়নের মধ্যেও আমি বর্তমান। উৎপীড়নে আমি তছ্নছ হয়ে যাব তখনও আমি থাকব। কয়েদখানায় বন্দী হয়ে থাকব কিন্তু তখনও আমি বাঁচব। আমি সূর্য দেখব। অথবা আমি সূর্য দেখতে পাব না। তবু আমি জানব, সূর্য আছে। আর সূর্য আছে এই বোধই ত গোটাজীবন আসলে।'

অনেক বিখ্যাত সমালোচক ওথেলোর সঙ্গে দ্মিত্রির তুলনা করেছেন। কিন্তু হয় কী? দ্মিত্রি চরিত্রের মধ্যে এমন সব মৌলিক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, এমন কিছু এবং অনেক কিছু আছে যা ওথেলোতে নেই। ঈর্ষা-প্রণোদিত উন্মাদের মধ্যে তা থাকার কথাও নয়। সেদিক থেকে তীব্র যন্ত্রণায় পরিশুদ্ধ দ্মিত্রি অনেক অনেক উচ্চকোটীর সৃষ্টি। তবে চরিত্র দুটিতে একটা মৌল মিল আছে; উভয়েই ভুগেছে গহনমথিত আবেগে, উভয়েরই ভাগ্যে ঘটেছে করুণ বিয়োগান্ত পারিণাম।

এক বালকের অন্ত্যেষ্টি দিয়ে বইয়ের ওপরে যবনিকা পাত করা হয়েছে। এক পাল স্কুল-ছাত্র নিয়ে যে-উপকাহিনীটি উপন্যাসখানির মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল ইলিউশার মৃত্যুতে সে কাহিনীর যেমন শেষ, চার লক্ষ শব্দের বিশাল উপন্যাসখানিরও সমাপ্তি। সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আলিওশা কারামাজোভ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়। সে ভাষণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আসলে ইলিউশা নয়, দ্মিত্রির বিয়োগান্ত পরিণামের কথা ভেবেই দস্তয়েফ্স্কি এই পরিচ্ছেদটি উপস্থিত করেছেন। ও সে

উপলক্ষে দ্‌মিত্রির পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন। কিন্তু যার মুখ দিয়ে তিনি পাপ ও তজ্জাত যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে পরম উপলব্ধির স্তরে উত্তরণ ও চৈতন্য-শুদ্ধির শেষ কথা শুনিয়েছেন দ্‌মিত্রি ও ইভানের তুলনায় সেই আলিওশা বড় বেশী অনুজ্জ্বল এবং অসম্পূর্ণ যেমন অসম্পূর্ণ 'ইডিয়েট'-এর প্রিন্স্‌ মিশকিন। অথচ উপন্যাসের উপক্রমণিকায় একেই তিনি নায়কের ভূমিকা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি ও কাজের মধ্যে এই বিরোধের হেতু সম্পর্কে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন—'আলিওশাকে নায়কের মতন মনে হবে না, কেন না এখানে তার আচরণ অস্পষ্ট অব্যাখ্যাত।' তবে তিনি কথা দিয়েছেন, ভবিষ্যতে 'কারামাজোভ ভাইরা'-র দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হবে আলিওশাকে নায়ক করে, আসলে সেইটেই আমার মূল বই। এ-বইখানা সেই মূল বইয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি যার বিষয় তের বছর আগেকার ঘটনা। পরবর্তী খণ্ড হবে সমকালকে নিয়ে তার নায়ক আলিওশা কারামাজোভ রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেবে ও একটা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে ফাঁসি হবে তার।'

দস্তয়েফ্‌স্কি এ-প্রসঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি আরও বিশ বছর বাঁচব। আমি যা শুরু করেছি তা শেষ করতে আরও বিশ বছর লাগবে আমার।'

লাগত বই কি। আলিওশাকে নায়ক করে 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতেই কেটে যেত নিশ্চয় আরও তিন বছর। তারপরেও ছিল আরও ছ'খানা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা—সম্রাট, মূর্খ সাধু, কাপতেন কারতুজোভের গল্প, এক কবির মৃত্যু, জনৈক ঔপন্যাসিক ও গ্রীষ্মের চিন্তা। এই বইগুলির প্রাথমিক খসড়াও তিনি তৈরি করে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ আগামী বিশ বছরের কাজ তাঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু পরমায়ু? সে যে তাঁর হাতের মুঠো গলে বিন্দু বিন্দু ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে সে তিনি জানবেন কেমন করে। কে কার পরমায়ু জানতে পারে!

প্রফেট শিরোপা ও মৃত্যু

শিল্পীর অস্তিত্বের গভীরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ না ঘটলে তার পক্ষে কোন শাশ্বতিক সৃষ্টি সম্ভব নয়। 'পিতার পাপে শিশু-পুত্রের অসহায় মৃত্যু' দস্তয়েফ্‌স্কির মধ্যে ঘটিয়েছিল সেই সব-তছ্‌নছ্‌ করে দেওয়া বিস্ফোরণ, ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল তাঁকে আড়ষ্ট করে-রাখা ভয় সংশয় সংস্কারের কঠিন দেয়াল। অপাবৃত করে দিয়েছিল তার মোহ-প্রচ্ছন্ন চৈতন্য। অপতিনার সাধুর প্রতীকে সে-জাগ্রত চৈতন্যের ওপরে প্রতিভাসিত হল প্রজ্ঞার তিমিরবিদার দিবা দীধিতি। তাবপরে যা স্বাভাবিক—লেখা হল সেই ভুবন-ভুলানো উপন্যাস 'কারামাজোভ ভাইরা'। যেন উপন্যাস নয় পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রফেট দস্তয়েফ্‌স্কির কালান্তক শেষ বাণী। পৃথিবীর দু'খানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে মহামতি লেনিন যাকে স্থান দিয়েছেন লিও তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'র পরেই; আর পাশ্চাত্যের মনীষীরা যাকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন সকলের ওপরে বলে। আলবের্ট আইনস্টাইন বলেছেন, আমি এই ক্যাসিক্যাল রাশিয়ান লেখককে ভাল বাসি, কেন না তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শুনেছি সেই আর্তনাদ, "...a cry of anguish, of longing and of a thirst for harmony that came into the history of human culture as a question addressed to the 20th century."

অপ্‌তিনার মঠে থেকেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি। সেখান থেকে কৃত-নিশ্চয় মানুষটি চলে এলেন আপন দেশে যেখানে খুন হয়েছিলেন তাঁর বাবা। তারপর সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে ১৮৭৮-এর ২০ জুন এলেন মসকোআয়। এলেন কাৎকফের কাছে।

দরজায় দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাৎকফের তিনি উঠে এসে তাঁর হাত ধরলেন। তারপরের ঘটনা আন্নাকে দস্তয়েফ্‌স্কি চিঠিতে লিখেছিলেন, "...কাৎকফের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুঝতে বাকি থাকল না, আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু জানতাম না তখন আকাশ জুড়ে কালো কঠিন মেঘ জমেছে। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল মুহুর্মুহু; বাজ পড়তে লাগল। অমনি ভারি মন খারাপ হয়ে গেল আমার। একটা অশুভ ইঙ্গিত বলে মনে হল এটাকে। মনে হল, এখন যদি আমি কাৎকফের কাগজে উপন্যাস লেখবার প্রস্তাব তুলি আর কাৎকফ্‌ সে প্রস্তাব বাতিল করে দেয় তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে আসতে পারব না, অপমানিত হওয়ার পরেও আমাকে

সেখানে বসে থাকতে হবে বৃষ্টি না থামা অব্দি। সুতরাং ঠিক করলাম, ঝড় জল শান্ত হোক তখন কথাটা পাড়ব। কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করতে দিলে না কাৎকফ্। ওর জেরার জবাবে আমাকে বলেই ফেলতে হল, তার কাগজে একটা উপন্যাস শুরু করার ইচ্ছে জানাতে এসেছি। শুনেই কাৎকফ্ ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু যেই না বললাম, আমি এবার আর প্রতি ফর্মাও তিন শ' রুবলের কমে লিখছি নে, আর অ্যাডভান্সও নেব হাজার চারেক, শুনে কেমন মিইয়ে গেল সে। কিন্তু কেন আমি চাইব না, বল, তল্‌স্তয়কে সে যদি দিতে পারে পাঁচ শ' রুবল প্রতি ফর্মাতে, আমাকে তিন শ'ও দেবে না? কাৎকফ গুম্ হয়ে থাকল। থাকুক, আমি আর কথা বাড়ালাম না। ঝড়বৃষ্টি ততক্ষণে থিতিয়ে এসেছিল। আমি উঠে পড়লাম। কিন্তু দু'দিন বাদেই সে হোটেলে আমাকে খবর পাঠাল। ভাগ্যিস রাগ করে সেদিনই চলে আসি নি। ওর ওখানে যেতেই বললে, 'এখন দু'হাজার রুবল অ্যাডভান্স দেব, বাকি দু'হাজার অকটোবরে।' তাতেই আমি রাজি হয়ে গেছি।"

অথচ এমন করে অ্যাডভান্স নেওয়ার আর দরকার ছিল না তাঁর তখন। তাঁর তখন যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থা। 'লেখকের ডায়েরি' থেকে প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন তিনি। তাছাড়া বই বিক্রি বাবদেও আয় হচ্ছিল প্রচুর। কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেস তিনি ছাড়তে পারেন নি তখনও। তখনও অ্যাডভান্স না নিলে জুত ধরে না তাঁর। তিনি পকেট ভর্তি টাকা আর বুক ভর্তি উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলেন স্তারাইয়া রুশায়। কলম চলতে থাকল তুফান মেলের মতন। অকটোবরের মধ্যেই এক শ' ষাট পাতা লিখে ফেললেন। ও সেই পাণ্ডুলিপি পকেটে করে আবার চলে এলেন কাৎকফের কাছে। দ্বিতীয় কিস্তির অ্যাডভান্সের জন্যে হাত পাতলেন। পুরো অ্যাডভান্সটা হাতে না পেলে যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কাৎকফও দুঁদে কাগজ-মালিক। দস্তয়েফ্স্কিকে দু'দিন মসকোয়ায় বসিয়ে রেখে এক শ' ষাট পাতা সব পড়লেন, তাঁর সঙ্গে গোটা উপন্যাসের বিষয় ও বিন্যাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন, খুব তর্ক-বিতর্ক হল। সমস্ত সংশয় দ্বিধা দূর হলে তখন তাঁকে আরও দু'হাজার রুবল অ্যাডভান্স দিলেন কাৎকফ্।

ফিরে এসে আবার কলম তুলে নিলেন তিনি। আর কোন দিকে তাকাবেন না, টানা লিখে বইখানা শেষ করবেন এই তাঁর সংকল্প। কিন্তু সে সাধ দুঃসাধ্য করে তুলেছিল তাঁর অনুরাগীরা। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসত মানুষ যেন

আগুনের দিকে ছুটে আসছে পতঙ্গের পাল। নিকটে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ত তারা। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মূক মুখে কথা ফুটত না তাদের। যারা আসতে পারত না তারা চিঠি লিখত। গাদা গাদা চিঠি আসত রোজ। কত আবেদন নিবেদন, আর কত অদ্ভুত আবদারই না থাকত সে-সব চিঠিতে। ব্যক্তিগত, অত্যন্ত গোপন-সমস্যার সমাধান পর্যন্ত চেয়ে পাঠাত মেয়েরা। মেয়েরাই ছিল তার প্রধান ভক্ত, আর ছিল পর্যুদস্ত অশান্ত জীবনের যত মানুষ। তারা সান্ত্বনা চাইত, প্রেরণা চাইত, আশীর্বাদ চাইত আর চাইত তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু। তিনি যেন তাদের আত্মার আত্মীয়, বেঁচে থাকার প্রেরণা, প্রাণবায়ু সকলের।

দস্তয়েফ্‌স্কি এসব চিঠি পেয়ে কখনো বিরক্ত হতেন না বরং সাগ্রহে প্রত্যেকটি চিঠি তিনি মন দিয়ে পড়তেন ও জবাব দিতেন। সংক্ষিপ্ত হলেও সে জবাবে আন্তরিকতা থাকত, মমতা থাকত। থাকত বহুদর্শী মানুষটির প্রজ্ঞার বিভা। সময়ের অভাব, অসুস্থতা, লেখার চাপ ইত্যাদির ওপরে এই চিঠির বোঝা তাঁকে বড় ক্লান্ত করে ফেলত, তবু তিনি কোন একখানা চিঠিকেও উপেক্ষা করতে পারতেন না। বরং তাদের কৌতূহল পূর্ণ করতে, তাদের ভালবাসার চিঠির জবাব দিতে আনন্দই পেতেন। পৃথিবীর কোন কালের কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী-ই পাঠক, স্তাবকদের চিঠির জবাব দিতে এত কষ্ট স্বীকার করেন নি। তিনি স্পষ্টই বলতেন, দূরের মানুষের সঙ্গে, অদেখা মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব, ভালবাসার সম্পর্ক রাখা সহজ, নিত্যপরিচয়ের গ্লানি বিষাক্ত করে না মনের স্বাস্থ্য, প্রাণের স্ফূর্তি, প্রতিবেশীকে খুশী করা সব চেয়ে কষ্ট। ইভান কারামাজোভের মুখ দিয়ে তিনি শুনিয়েছেন—"কবে তুমি কোন্ দোষ-ত্রুটি করেছ সেইটেই সব সময় প্রতিবেশীরা মনে করে বসে থাকে, তাই তাদের ভালবাসা দেওয়ার মতন কঠিন কাজ আর দুনিয়াতে নেই।" আর এক জায়গায় বলেছেন "প্রতিবেশীরাই প্রতিবেশীর সবচেয়ে বড় শত্রু অথচ তাদের ভালবেসেই আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে—কী কঠিন ব্রত!" স্তারাইয়া রুশার মতন নির্জন শান্ত গ্রামও মুখর হয়ে উঠত তাঁর স্তুতিকারদের কোলাহলে, তাদের বেশীই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তারা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে যেমন আসত তেমনি আসত তাদের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের নানা অনুষ্ঠানকে তাঁর মহান উপস্থিতি দ্বারা গৌরবান্বিত করবার প্রার্থনা নিয়ে। সময় নেই, স্বাস্থ্যে কুলোচ্ছে না ইত্যাদি বলেও তিনি রেহাই পেতেন না—তিনি যে তাদের আত্মার 'সৌরভ' তারা যে তাদের 'প্রভুকে' মাথায় করে নিয়ে যেতে এসেছে। তাই যেতে হত তাঁকে,

তাই তিনি এত কাজ সত্ত্বেও সব জায়গায় যেতেন, এযে খ্যাতির বিড়ম্বনা, এত সইতেই হবে।

এ-বিড়ম্বনা সার্থক হত তাঁর প্রতীক্ষায় অস্থির হাজার হাজার শ্রোতার হর্ষ-ধ্বনিতে, তাদের অভিভূত বিনীত প্রণামে। তাঁকে যে সবাই সভায়-সমিতিতে ধরে নিয়ে গিয়ে শুধু প্রতিমার মতন বসিয়ে রেখে গলায় মালা দিয়ে পুজো করত, তা নয়। তাঁকে পড়তে হত, বলতে হত। বেশীর ভাগই তিনি নিজের রচনা থেকে পড়তেন অথবা আবৃত্তি করতেন তাঁর প্রিয় কবি পুশকিন থেকে।

'সোনালী স্বর ছিল দস্তয়েফ্‌স্কির,' বলেছেন মুগ্ধশ্রোতা ভেন্‌গিওরফ্‌। গোনচারফ্‌ তুলনা করেছেন সে-স্বরের সঙ্গে গলিত লাভা-স্রোতের, এমনই সর্বগ্রাসী ছিল সে-স্বরের জাদু। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে যেতে হত তাঁর পাঠ কি আবৃত্তি শুনতে। কারণ সে-গুলি হত কোন শিক্ষা বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কল্পে। বিরাট বিরাট হলে সে-সব অনুষ্ঠান হত আর দস্তয়েফ্‌স্কি আসছেন শুনলে সেখানে সরষে রাখার জায়গা থাকত না। ঠাসাঠাসিতে সমস্ত হল কেবল গম্‌গম্‌ করত।

রুশী সাহিত্য ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে এমনই এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত সেমিওন ভেন্‌গিওরফ্‌। তিনি লিখেছেন, "দস্তয়েফ্‌স্কির সঙ্গে তুলনা করা যায় সেদিনের রাশিয়ায় আর একজন আবৃত্তিকার ছিলেন না। তিনি যখন তাঁর রচনা থেকে পড়তেন, কণ্ঠস্বরের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি শুনে মনে হত না তিনি উপন্যাসের কোন একটা অংশ পড়ছেন, মনে হত তাঁর স্বরে ছন্দোবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসছে এক অ-লৌকিক অ-লোকায়ত বাণী। সেদিন তিনি পড়ছিলেন 'কারামাজোভ ভাইরা' থেকে: তচরুপের দায়ে অভিযুক্ত বাপকে বাঁচাতে কাতারিনা ইভান্‌নোভনা আসছে মিতিয়ার কাছে টাকা ধার নিতে। অংশটা তিনি পড়ছিলেন উদাত্ত স্বরে। তাঁর কাঁপা কাঁপা রোমাঞ্চকর স্পষ্ট উচ্চারণ প্রত্যেকটি শ্রোতার বুকের গভীর মথিত করে দিচ্ছিল। আমি কখনো এমনটি আর দেখি নি—কত রকম শ্রোতাই ত সামিল হয়েছে এই জমায়েতে অথচ গোটা হলে এতটুকু শব্দ নেই। যেন শ্বাসবন্ধ করে বসে আছে সবাই। হাজার মানুষের এতবড় আসরটাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে একটা মানুষের গলার স্বর।
...দস্তয়েফ্‌স্কি যখন পড়তেন তাঁর শ্রোতারা নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে যেত কিংবা আপন সত্তার গহনে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় তলিয়ে থাকত। তারা সকলেই তখন

ওই অসুন্দর শীর্ণ বৃদ্ধের ইচ্ছার মুঠোয় আত্মসমর্পিত পুতুল। কিন্তু দস্তয়েফ্স্কি যেন সেখানে নেই। তাঁর উজ্জ্বল চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন কোন দূর লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে আছে।”

১৮৭১-র মধ্যেই উপন্যাসের তিন ভাগের দু'ভাগ কাৎকফের কাগজে ছাপা হয়ে গেছে। কিন্তু অবশিষ্ট একভাগ আর কিছুতেই শেষ করে উঠতে পারছেন না তিনি। তখন যেন তাঁকে কাছে পাওয়ার পাগলামিতে আরও বেশী করে পেয়ে বসেছে পিতার্সবুর্গের দিকপালদের। বিশিষ্ট মানুষদের বৈঠকখানায় বৈঠকে বার বার উপস্থিত থাকবার সনির্বন্ধ অনুরোধ আসছে। বিশেষকরে নাট্যকার আলেকসি তলস্তয়ের বিধবা বিখ্যাত ধনী কাউনটেস সোফিয়া তলস্তয়ের বায়না, তাঁর বৈঠকখানায় প্রতি বৃহস্পতিবার কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হবে। সেদিন শ্রীমতী সোফিয়া তলস্তয়ের আমন্ত্রণ পাওয়া ছিল একটা বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার, দস্তয়েফ্স্কির মতন মানুষও তাই তাঁর আন্তরিক আমন্ত্রণের অমর্যাদা করতে পারতেন না। শরীর খারাপ কি লেখায় ব্যস্ত বলেও না। লিও তলস্তয়কে স্ত্রাখফ্ লিখেছিলেন, “…গোনাচারফ্ আর দস্তয়েফ্স্কির মতন আমারও কাউনটেসের মজলিসে হাজির থাকতে সাধ যায়। তিনি যে শুধু ধনী কাউনটেস তাই নন, খুব শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতীও বটেন। কিন্তু ওখানে যাওয়ার মতন পোশাক-আসাকই যে আমার নেই” এই কাউনটেসই দস্তয়েফ্স্কিকে ড্রেসদেন মিয়ুজিয়মের দুর্লভ চিত্র সিসটাই ম্যাডোনার একটি মস্ত ফটোগ্রাফ উপহার দিয়েছিলেন। শ্রীমতী আন্না লিখেছেন, “জীবনের শেষ ক'টা দিন প্রত্যহের বেশ কয়েক ঘণ্টা দেখেছি আমার স্বামী ওই ফটোখানার সামনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কাছে গেলেও তিনি টের পেতেন না। তাঁর ধ্যান ভাঙত না। আমি তখন নিঃশব্দে চলে আসতাম।”

শুধু কাউনটেস সোফিয়া নন দস্তয়েফ্স্কির ক্ষণিক সান্নিধ্যের জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকতেন তখন সমাজের প্রথম সারির প্রত্যেকে, এতে অ্যারিসটোক্র্যাট, নোবল কি রাজপুরুষে কোন পার্থক্য ছিল না। এমন কি জার স্বয়ং তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতে নিমন্ত্রণ করতেন। জার সম্রাজ্ঞীও ছিলেন দস্তয়েফ্স্কির একজন মুগ্ধ পাঠিকা। তিনি যেচে দস্তয়েফ্স্কির হাত থেকে তাঁর বই উপহার নিয়েছেন। আর এই সব দেখে দেখে বন্ধু আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চোখ টাটাত মন পুড়ত অসূয়ায়, স্বাভাবিক। কিন্তু এহেন প্রতিষ্ঠাকেও যে তুচ্ছ করে তিনি সকলের নাগালের বাইরে রুশী সাহিত্যে মধ্য-আকাশের সূর্য হয়ে

জ্বলে উঠবেন ; তাঁর প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যাবে সকলের এ তাঁরা কেউ সাত জুনের আগে কল্পনাও করতে পারেন নি, বস্তুত দস্তয়েফ্স্কি নিজেও না। আসলে ঘটনাটা যেমন অতর্কিত তেমনি অপ্রত্যাশিত। উত্তর-পুরুষের বিচারে 'কারামাজোভ ভাইরা' দস্তয়েফ্স্কির শেষ সাফল্যের দুরাসদ রচনা হলেও সেই পরম-উৎকর্ষের ফলশ্রুতিকেও ক্ষণকালের জন্যে সমকালের চোখে ম্লান করে দিতে পেরেছিল তাঁর জীবনের অন্তিমপর্বের সেই উজ্জ্বলতম ঘটনাটি।

তখনও ছাপার দু'শ' পাতার মতন লিখতে বাকি 'কারামাজোভ ভাইরা'। তখন নিমন্ত্রণ এল তাঁর মসকোআ থেকে।…"পুশকিনের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে 'পুশকিন উৎসব'-এর আয়োজন করেছি আমরা। আপনাকে এ-উৎসবে আসতেই হবে, অবশ্যি আসবেন"—রুশী সাহিত্য-প্রেমীদের মসকোআ-সমাজ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল তাঁকে। এদিকে আবার তিনি সদ্য শ্লাভ-ফিলানথ্রফিক সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। তাঁদেরও আগ্রহ সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন তিনি ওই উৎসবে। দু'দিককার সেই আত্যন্তিক আবদারের ডাক ও কবিগুরুর প্রতি তাঁর আজন্মের শ্রদ্ধার টান তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। উপন্যাস লেখার জরুরী প্রয়োজন মুলতবি রেখে, বুকের কঠিন অসুখটাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে স্তারাইয়া রুশা থেকে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ২৩ মে তিনি এসে পৌছান মসকোআয়। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন পুরনো বন্ধু ইভান আকসাকফ্, কাৎকফ্ ও আরও অনেক বিশিষ্ট শ্লাভোফিল সদস্য। গাড়ি থেকে নামতেই আক্সাকফ্ ছুটে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ তুমি এসে পড়েছ ফিওদর। তুর্গেনিয়েফ্-কোভালেফ্স্কিরা দল বেঁধে এসেছে, এই মওকায় ওরা পুশকিনকে নস্যাৎ করবে, জাতীয়তাবাদকে গাল পেড়ে ওদের পশ্চিমী মতবাদটা চাপিয়ে দেবে সবাইর ওপরে। এই মতলবে ওরা য়ুনিভারসিটিকেও প্রায় কব্জা করে ফেলেছে। আমাদের কিন্তু একমাত্র তুমিই ভরসা। তুমি ভিন্ন গতি নেই আমাদের।'

'সেই পুরনো ঝগড়া।' দস্তয়েফ্স্কি গম্ভীর হয়ে বললেন।

'হাঁ ভাই, তাই।' দস্তয়েফ্স্কিকে গাড়িতে তুলে তাঁর পাশে বসে বললেন, 'তুমি কোনদিন মসকোআতে বক্তৃতা করো নি। তোমার বক্তৃতা শোনার জন্যে মসকোআর মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে। তোমাকে নিয়ে কি টানাটানি পড়ে যায় দেখো।'

কথাটা যে মিথ্যে বলেন নি আক্‌সাকফ্‌ নিত্যি তারই নূতন নূতন প্রমাণ পাচ্ছিলেন তিনি। উৎসব সুরু হওয়ার কথা ছিল পুশকিনের জন্মদিন ২৬ মে থেকে; কিন্তু হঠাৎ তিন চারদিন আগে জার দ্বিতীয় আলেকসানদারের পত্নী সম্রাজ্ঞী মারিয়া আলেকসানদ্রোভনার মৃত্যু ঘটায় উৎসবের দিন পিছিয়ে গিয়েছিল ৬ জুন। লেখা বন্ধ করে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে অসুস্থ শরীর নিয়ে কতকগুলি নিষ্ক্রিয় দিন মিথ্যে নষ্ট করতে হবে ভেবে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন প্রথমে; কিন্তু সে অসন্তোষ দিনেকের বেশী ঠাঁই পেল না তাঁর মনে, হঠাৎ তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ধনী বুদ্ধিজীবী পরিবারগুলিতে, আর নানা প্রতিষ্ঠানের ভোজ-সভায়। তাঁর যে এত এত ভক্ত আছে এই শহরে তা তিনি কোন দিনই জানতেন না, আক্‌সাকফের কথাও তিনি বিশ্বাস করেন নি, তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, অকাজের দিনগুলি হোটেলের ডেকচেয়ারে শুয়ে শুয়েই আলস্যে কাটিয়ে দিতে হবে—অথবা চলে যাবেন এখান থেকে। কিন্তু ঘটল উল্টোটা, ভক্ত নাগরিকের অভিনন্দনের চাপে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এতটা বুঝি হত না যদি লিও তলস্তয় আর গোনচারফ্‌ যোগ দিতে আসতেন উৎসবে। তাঁরা দু'জন এই জাতীয় উৎসবকে মিথ্যে আবেগ বলে তুচ্ছ করে যে যাঁর জায়গায় বসে থাকলেন। গোটা শহর জুড়ে তাই তুর্গেন্যেফ্‌ আর দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে আসর জমে উঠল। সমকালীন রাশিয়ায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন ওঁরা চারজন। তাঁদের দু'জনের অনুপস্থিতিতে অন্য দু'জন ভাগাভাগি করে ভোগ করতে থাকলেন মুগ্ধ ভক্তদের বিস্ময়াপ্লুত শ্রদ্ধার অর্ঘ। দুই দিকপাল এসে গোটা শহরকে যেন দু'টুকরো করে ফেলেছেন। এপাড়ায় যদি দস্তয়েফ্‌স্কিকে নিয়ে মাতামাতি ত ওপাড়ায় তুর্গেন্যেফ্‌কে নিয়ে। আজ বস্তুত মসকোআ শহর দুই শিবিরে দ্বিধা হয়ে গেছে, এক শিবিরের নেতা তুর্গেনিয়েফ্‌ আর এক শিবিরের…

কেউ জানে না উৎসব-সভায় তুর্গেন্যেফ্‌ কী বলবেন, কিন্তু যাই বলুন তিনি যে একজন কট্টর য়ুরোপ-প্রেমী এটা সবাই জানে—জানে তুর্গেনিয়েফের বক্তৃতা বিদ্বেষ ছিটোবে শ্লাভোফিলদের বিরুদ্ধে। দস্তয়েফ্‌স্কি যদি উপস্থিত না থাকতেন শ্লাভোফিলদের আদর্শ, যাকে তাঁরা এখন জাতীয়তাবাদ বলছেন—তুলে ধরার দায় বর্তাত দলের নেতা ইভান আক্‌সাকফের ওপরে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের ছোট্ট গণ্ডির বাইরে তাঁর বড় একটা নাম-ডাক নেই, তাঁর কথা কে শুনবে, ক'জন গ্রাহ্য করবে, সংশয় ছিল সদস্যদের। তাঁরা ভয়ে মরছিলেন ওয়েস্‌টারনার-রাই

জাঁকিয়ে বসবে আসর, বিদেশের মোহে ভুলিয়ে দেবে জনতার মন। জাতীয়তাবাদ কোণ ঠাসা হয়ে যাবে, জনমত চলে যাবে ওদের মুঠোয়। এমন সংকটে দস্তয়েফ্স্কিকে পেয়ে তাঁরা যে কী দারুণ বর্তে গেছেন স্টেশনে আক্সাকফের কথাতেই তা বোঝা গেছে। এমন অবস্থায় দস্তয়েফ্স্কির মতন এক জনমন-অধিনায়ক কথাশিল্পী ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতীয়তাবাদীই যে হয়ে উঠবেন তাঁদের দল-নায়ক, স্বাভাবিক। স্বভাবতই দস্তয়েফ্স্কিও খুব উল্লসিত হলেন কারণ এবার তিনি জাতীয়তাবাদী দলের নায়ক হিসেবে তাঁর চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোশ খুলে দেবার সুযোগ পাবেন। ব্যক্তিগত মতানৈক্য হয়ে উঠবে সমষ্টিগত। হয়ে উঠবে জাতীয় প্রশ্ন—জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমী প্রেমকে ধরাশায়ী করতে পারবেন। এমন সোনার সুযোগ আর মিলবে না ; উল্লসিত হবেন বই কি দস্তয়েফ্স্কি।

ফুলের মালা আর প্রশস্তি চয়ন করতে করতে ৮ জুনে এসে পৌঁছলেন তিনি। উৎসব শুরু হল। স্ত্রাংস্ত্নাই মঠে এক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুশকিনের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে 'পুশকিন স্মৃতি-তর্পণ'-সভা বসল। অধ্যাপকরাই সেখানে বক্তা। বক্তৃতাও করলেন তাঁরা গবেষণামূলক তারপর সভার যে আসল লক্ষ্য তুর্গেনিয়েফ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-সদস্য নির্বাচন ও সম্মান-সূচক উপাধি দান—সে-কাজটি সম্পন্ন হলে ছাত্রদের হাততালি আর উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে পশ্চিমী চিন্তা চাষের উর্বর জমি অতঃপর সে-বিষয়ে আর তর্ক থাকল না। দস্তয়েফ্স্কি সযত্নে নিজেকে এ-ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু তাঁদের সম্মানে প্রদত্ত সিটি কাউনসিলের ভোজ-সভায় সেদিন সন্ধ্যায় তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হল। ভোজ-সভায় তাঁরা অনুরুদ্ধ হলেন পুশকিন থেকে কিছু আবৃত্তির জন্যে। তুর্গেনিয়েফের অভিনেতা সুলভ চতুর ও চটুল স্বরক্ষেপ, বিরতি-বিন্যাস ইত্যাদি আবৃত্তির নাটকীয় কারুকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন অতিথিদের হৃদয় জয় করে নিল ; বিপুল হাততালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বসে পড়লেন। দস্তয়েফ্স্কি সে-আসরে আদৌ সুবিধে করতে পারলেন না ; তার 'সোনালী স্বর' কি 'লাভা স্রোতের মতন আবেগ' আপ্লুত করতে পারল না শ্রোতাদের। জাতীয়তাবাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্যেই শ্রোতারা তাঁকে পাত্তা দিলে না ভেবে তিনি ক্ষুণ্ন হলেন, মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তুর্গেনিয়েফের কাছে হেরে গিয়ে। পরে যখন শুনলেন,

হাততালি দেওয়ার জন্যে তুর্গেন্‌য়েফ্‌ নিজে চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোজসভায় আনিয়েছিলেন, জেদে ভরে উঠল তাঁর মন—সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর এতকালের ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা করবেন—তিনি শেষ দিনের শেষ সুযোগের অপেক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হলেন। মূল সভাতেই মূল্যায়ন হবে তাঁদের প্রতিভার, প্রত্যয়ের।

সেই মূল সভার অধিবেশন আগামী কাল। উৎসবের সেই প্রকাণ্ড অধিবেশনে যোগ দিতে দূর দূরান্তের লোক ইতিমধ্যেই অনেক এসেছে, আরও অনেক আসছে, আসবে। তারা সকলেই পুশকিনের ভক্ত, তারা কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই অধিবেশনে যোগ দিচ্ছে। সেই বিপুল জনতার তুলনায় পশ্চিমপ্রেমী তুর্গেন্‌য়েফের চাটুকাররা সংখ্যায় ক'জন! দস্তয়েফ্‌স্কি এতটুকু বিচলিত হলেন না।

যথাসময়ে বিরাট মণ্ডপে অধিবেশন শুরু হল। বিরাট প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গা নেই। গ্রীন-রুম থেকে মঞ্চে উঠে এসে ক্ষণেকের জন্যে দস্তয়েফ্‌স্কির নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। এত বড় সভায় এমন সুসজ্জিত মণ্ডপে তিনি কখনো ভাষণ দেন নি। ওপরে সিলিং থেকে ঝুলছে বিরাট বিরাট সব ঝাড়-লণ্ঠন। তাদের বহুশাখ-স্ফটিকস্তম্ভে নিপুণ কারিগরের হাতে জড়ানো মালাকার স্ফটিক গোলকগুলি প্রতিফলিত আলোয় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। নিচে সামনের আসনগুলিতে অভিজাত পরিবারের তরুণী, গৃহিণীরা, সামন্ত ও রাজন্যবর্গ স্ব স্ব পদমর্যাদা ও বংশগৌরবের তকমাধারী ধনী প্রভুশ্রেণী; তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অতিথি জনতার সারি। রবাহুতরা আরো পেছনে। নির্দিষ্ট আসনগুলি পূর্ণ হয়ে গেলে জনতা উপচে পড়েছে দেয়ালের গায়ে গায়ে। তারও দূর পেছনে সারি সারি দর্শক ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মধ্যে থেকে উঠছে অধীর প্রতীক্ষার গুঞ্জন। গোটা সভাস্থলই অধৈর্যে অস্থির। দস্তয়েফ্‌স্কি মঞ্চের পাশে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। একজন ঘোষক অধিবেশন প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বলে তুর্গেন্‌য়েফ্‌কে আমন্ত্রণ জানালেন ভাষণ দেবার জন্যে।

তুর্গেন্‌য়েফ্‌ উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন মঞ্চের মাঝখানে। বলতে শুরু করলেন। একটা খাড়া চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাষণ শুনবার জন্যে। লিখিত বক্তৃতা বটে কিন্তু নাটকীয় বাচন কৌশলে তিনি তাঁকে মৌখিক বক্তৃতায় রূপান্তরিত করলেন। তুর্গেন্‌য়েফের কণ্ঠস্বর কড়ি ও কোমলে, ধৈবত ও গান্ধারে ওঠানামা করতে

লাগল। থেকে থেকে উদাত্ত অনুদাত্ত গলায় বিরাম নিয়ে নিয়ে ভাষায় ছন্দের আন্দোলন তুলতে থাকলেন; মাঝে মধ্যে বাকবৈদগ্ধের ভাষণে আরোপ করে চললেন গম্ভীর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা; ফলত শ্রোতারা দেখতে দেখতে নীরব উৎগ্রীব ও মনোযোগী হয়ে উঠল। দস্তয়েফ্‌স্কি লক্ষ্য করলেন, তুর্গেন্‌য়েফের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়েছে সভা। কিন্তু একটু বাদেই চমকে উঠলেন তিনি, তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটল। কী ফল এই সুকৌশল বাগ্মীতায় যদি না থাকে তার ভার, অন্তঃসার, ফাঁপা বেলুনের মতন শূন্যসার সে নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে বাধ্য। সমস্ত বাক্‌বিভূতি, বিন্যাস ও স্বর-সংযোগের লক্ষ্য যদি না হয় শ্রোতাদের একটা প্রত্যয়ে পৌঁছে দেওয়া, ত সে-বাগ্মিতা কতক্ষণ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারে? বেশীক্ষণ না। দস্তয়েফ্‌স্কি দেখলেন, শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তাদের আবেশ কেটে যাচ্ছে; তুর্গেন্‌য়েফ্‌ নিজের হঠকারী কৌশলের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছেন। পুশকিনকে প্রশংসা করতে হলে জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করতে হবে কিন্তু পশ্চিমী-সভ্যতা ও তার রাজনীতির ধ্বজাবাহী স্বদেশ-ধর্মের প্রতি আস্থাহীন আন্তর্জাতিকতাবাদী তুর্গেন্‌য়েফের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়! দস্তয়েফ্‌স্কির ধারণা ভুল হল না। তুর্গেন্‌য়েফ্‌ কয়েকবার কাশলেন। থামলেন কয়েকবার। বিভ্রান্ত তিনি তাঁর সমকালকে উৎসাহিত করতে পারছেন না টের পেয়েছেন, তা করতে হলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। তুর্গেন্‌য়েফ্‌ তাই যেন বিচলিত। স্ব স্ব দেশে যেমন শেক্সপীয়র দান্তে, পুশকিনকে তেমনি রুশীজাতির জাতীয় কবি বলতে আপত্তি আছে তুর্গেন্‌য়েফের। তাই ক্ষণকাল বিচলিত বাগ্মী শব্দ নিয়ে খেলা করে কৌশলে সমস্যাটা এড়িয়ে এলেন নেক্রাসফের প্রসঙ্গে। নেক্রাসফ্‌ হালে মারা গেছেন। তাঁর সম্পর্কে উপস্থিত মানুষের মনে একটা নরম জায়গা আছে জেনে তাঁকেই পুশকিনের সার্থক উত্তর-সাধক হিসেবে 'জনতার কবি', 'জাতীয় কবি' বলে ঘোষণা করে উপসংহার টানলেন তিনি। হাততালি পড়ল, প্রচুর হাততালি পড়ল। কিন্তু দস্তয়েফ্‌স্কি দেখলেন, সে হাততালির মধ্যে যেন আত্মার কোন যোগ নেই, নেহাতই যেন সৌজন্যমূলক সে হাততালি। কেন না, কেউ ছুটে এল না তুর্গেন্‌য়েফ্‌কে অভিনন্দন জানাতে, কেউ একটা ধন্যবাদের ধ্বনিও দিল না। বোঝা গেল তুর্গেন্‌য়েফ্‌ তাদের হতাশ করেছেন। ওয়েসটারনার-রা বে-পাত্তা হয়ে গেল দেখে দস্তয়েফ্‌স্কি খুশী হলেন ঠিকই কিন্তু নিজের সম্পর্কে খুব আশাবাদী হয়ে উঠতে পারলেন না। এই সভা তাঁকেও হতাশ করবে না, কে বলবে!

দস্তয়েফ্‌স্কি অন্যমনস্ক মনে উঠে দাঁড়ালেন। তুর্গেন্‌য়েফের বক্তৃতার পরে ৭ তারিখের অধিবেশন শেষ হল।

পরের দিন ৮ তারিখে 'পুশকিন স্মরণোৎসব'-এর সমাপ্তি অধিবেশন। সেই মণ্ডপ। কাচ-মণি-কাঞ্চন খচিত স্ফটিক আধারে সেই আলোর সমারোহ। জনপূর্ণ আসরের সেই গম্‌গম্‌ আওয়াজ। আজও এসেছেন কালকের অভিজাত সম্ভ্রান্তরা, রাজপুরুষ ও ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবীর দল আর সাধারণ মানুষ। আসন উপচে পড়েছে আজও। আজো মানুষের ভিড় আসনের অভাবে দেয়ালের গায়ে, পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই চোখে-মুখে আজও সেই উৎসাহ, সেই উত্তেজনা ঔৎসুক্য যা দেখেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি কাল তুর্গেন্‌য়েফের বক্তৃতা দেবার আগে। না, আজ যেন তারা আরও বেশী ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত চঞ্চল বুঝি সংকল্পবদ্ধও। আজ যেন তারা স্থির করবে কে তাদের কণ্ঠের ভাষা, মনের আশা, কে তাদের আপনার লোক।—তুর্গেন্‌য়েফ, না দস্তয়েফ্‌স্কি?

'এখন দস্তয়েফ্‌স্কি ভাষণ দেবেন।' ঘোষকের কণ্ঠ নীরব হতে না হতে হাততালিতে সভা মুখর হয়ে উঠল, উঠল অভিনন্দন-ধ্বনি। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ালেন ঈষৎ আনত শীর্ণ-দেহ জীর্ণ-মুখ বৃদ্ধ। বৃদ্ধ অথচ চোখের চাহনিতে উজ্জ্বল মর্মসন্ধানী দৃষ্টি, পদক্ষেপে সবল দৃঢ়তা, সর্বাঙ্গের ভাঙ্গতে প্রত্যয়। দস্তয়েফ্‌স্কিকে দেখে আর এক দফা হাততালির অভিনন্দন জানাল সভা। দস্তয়েফ্‌স্কি মাথা নত করে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

ভাষণটি তিনি যত্ন করে লিখে এনেছিলেন কিন্তু যেহেতু সে-রচনা তাঁর সারাজীবনের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ফলশ্রুতি, ওর প্রতিটি শব্দ তাঁর কণ্ঠস্থ। সুতরাং কাগজের পাতায় নয়, সভার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই তিনি ভাষণ শুরু করলেন। কেবল মাঝে মাঝে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিলেন লেখার ওপরে যাতে না খেই হারিয়ে ফেলেন, লক্ষ্য চ্যুত হন। তবু শুরু যখন করলেন গলায় জড়িয়ে থাকল জড়তা, স্বরে সংশয়, যেন ভয়ে ভয়ে কথা বলছেন। অবশ্য বেশীক্ষণ লাগল না তাঁর সে-দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে, সে সংশয় জয় করতে। পুশকিনের প্রতি তাঁর আবাল্য লালিত ভক্তি, তাঁর আদর্শে আনস্তিক বিশ্বাস আর উপস্থিত শ্রোতাদের আগ্রহ তাঁর জড়তা দ্বিধা মুছে দিল, তাঁর স্নায়ুতে শিরায় এনে দিল উদ্যম। তাঁর কণ্ঠ সবল-উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রত্যয়ে প্রবল হয়ে উঠলেন তিনি। পুশকিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবিগলিত আবেগ জলপ্রপাতের মতন বেগবান করে তুলল তাঁর সোনালী কণ্ঠস্বর। সে-স্বরে গোটা আসর গম্‌গম্‌ করতে থাকল।

তিনি পরম বিশ্বাসে উচ্চারণ করলেন, "…এ বিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই যে, পুশকিন রাশিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে। তিনিই সব প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'আলেকো' আর 'ওনেজিনদের* দিকে। এরা রাশিয়ার দুই বিপরীত কোটির মৌলিক প্রকৃতির মানুষ। আলেকো আর ওনেজিনরা ছিন্নমূল, সমাজ-তাড়িত যাযাবর আর তাতিয়ানারা* পরমসহিষ্ণু, নৈতিক দায়িত্ববোধ ও বিশ্বস্ততার প্রতীক, আদর্শ রুশী রমণী। একমাত্র তুর্গেনিয়েফের 'ভদ্রলোকদের আস্তানা' উপন্যাসে লিজার চরিত্রে ছাড়া পুশকিনের তাতিয়ানার সার্থক উপস্থাপনা আর কোথাও দেখি না।"…সভাগৃহ মুখর করে হাততালি পড়ল। সামনের সারিতে শ্রোতার আসনে তুর্গেনিয়েফ্‌। আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলেন দস্তয়েফ্‌স্কির দিকে। দু' মুহূর্ত থেমে থেকে শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিনন্দন গ্রহণ করে দস্তয়েফ্‌স্কি আবার শুরু করলেন, "…পুশকিনের এই দৈবী দৃষ্টি রাশিয়ার নিজস্ব। তাঁর অলৌকিক স্বরে কান পাততে হবে আমাদের। কবি পুশকিন ও তাঁর মহান কাব্য রাশিয়ার নিয়তির প্রতীক।"…হঠাৎ প্রবল শব্দে চতুর্দিকে আবার হাততালি পড়ল। তিনি রুদ্ধশ্বাস হয়ে থেমে পড়লেন, তিনি বুঝতে পারলেন, প্রভুর মতন তিনি সকলকে নিজের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন। আবার শুরু করলেন, "…রাশিয়ার এক পরম দায়িত্ব য়ুরোপকে বোঝা, তার সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবিধান করা। সত্যিকারের রুশী হওয়ার অর্থই হচ্ছে সকল মানুষের ভাই হওয়া, বিশ্ব সেবায় নম্র ও বিনীত হওয়া।" বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর স্বর আন্দোলিত বাতাসের মতন সভাগৃহ উত্তাল করে বয়ে যেতে থাকল। শ্রোতারা বার বার হাততালি দিচ্ছিল। চারধার থেকে আপ্লুত কণ্ঠের চিৎকার উঠছিল শ্রদ্ধার ভক্তির ভালবাসার। পদে পদে থামছিলেন তিনি, থেমে থেমে বলছিলেন…দেখতে দেখতে তুর্গেনিয়েফের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা—মানুষে মানুষে যত রকম ভেদ-বিসংবাদ তিক্ত ব্যবধান মিলিয়ে আসছিল। তিনি যেন বুকের কপাট হাট খুলে দিয়ে দু'পক্ষকেই দু'হাতে বুকে টেনে নিয়েছেন, "…পাশ্চাত্যপ্রেমী ও রুশ্‌পন্থী উভয়েই ভবিষ্যৎ রাশিয়ার মুক্তির হাতিয়ার, উভয়ের সম্মিলিত শক্তিই রাশিয়ার প্রাণের শক্তি…রাশিয়ার সত্যিকার মহত্ত্ব রয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্রতে……একজন প্রকৃত রুশীর কাছে য়ুরোপ তথা অবশিষ্ট পৃথিবীর সৌভাগ্য তার মাতৃভূমির

* পুশকিনের কাব্যে কয়েকটি চরিত্রের নাম।

সৌভাগ্যের মতনই প্রিয়, কারণ সে-সৌভাগ্য জয় করা হয়েছে অস্ত্রের জোরে নয় সৌভ্রাতৃত্বের জোরে। আমাদের এই সৌভ্রাতৃক-উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। আমি বিশ্বাস করি, কালক্রমে, ব্যক্তিনির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারব, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে পুনর্মিলনের সেতু তৈরির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাই যথার্থ অর্থে রুশী হওয়া—রাশিয়ার মনের মাটিতে য়ুরোপের স্বপ্নকে সত্য করে তোলা, দুনিয়ার সব মানুষকে ভাই বলে বুকে টেনে নেওয়া, বিশ্বকে সৌভ্রাতৃত্বের ঐক্যে গ্রথিত করার সাধনাই প্রকৃত রুশী হওয়া।

তখন—

না, অন্য কারো নয়, দস্তয়েফ্‌স্কির ভাষাতেই তখনকার সভার ছবিটা তুলে ধরি। সভার শেষে হোটেলে এসে তিনি আন্নাকে চিঠি লিখতে বসলেন, "...আমি উঠলাম আমার ভাষণ পড়তে...তুমি কল্পনা করতে পারবে না আন্না, আমার ভাষণ কী বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল...আমি কী খুব সহজে পড়তে পেরেছি ভাব, দু'চারটে লাইন পড়তে না পড়তে উল্লাসের শব্দ, হাততালি (অবশ্য 'কারামাজোভ ভাইরা'বাবদেই)--কানে তালা-লাগা সেই সম্বর্ধনার ধ্বনি শেষ হলে আবার পড়তে শুরু করি...আবার সেই কর্ণবিদারী শব্দে হল ভেঙে পড়ে আবার থামি আমি, মাথা নেড়ে নেড়ে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করি। এ-ভাবে প্রতি পাতায় পাতায় বাধা পেয়ে পেয়ে আমার ভাষণ শেষ হয়।

"আমি পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করি—'যদি পুশকিন আমাদের মধ্যে না জন্মাতেন, পুশকিনের মতন মানুষকে যদি না আমরা পেতাম ত নব্যরাশিয়ার স্বাধীনতার স্বপ্ন এমন দুর্জয় শক্তি হয়ে কখনোই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হত না।' আমার ভাষণে উন্নমিত জনতার প্রবল চিৎকারের মধ্যে আমি ঘোষণা করি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাণী, তখন সভার সব মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আনন্দে এমন করে এক সঙ্গে ফেটে পড়তে আমি কোনদিন দেখি নি এত মানুষকে। আমি কখনো দেখি নি, মানুষ এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে পারে, এমন করে চেনা-অচেনা নির্বিশেষে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে পারে: না-না আর ঘৃণা নয়, ভালবাসা—আজ থেকে আমরা একে অন্যকে কেবলই ভালবাসব।

"উথাল-পাথাল আবেগে সভার শৃংখলা ভেঙে পড়েছিল। সকলে একসঙ্গে ছুটে আসছিল মঞ্চের দিকে, আমার দিকে। অভিজাত ঘরের গৃহিণী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ছাত্রী পদস্থ রাজকর্মচারী ছাত্র ও জনতা, শ্লাভোফিল সদস্যরা—সব ছুটে এসেছে আমার কাছে। চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে, আমাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলেছে। হঠাৎ কয়েকটি ছাত্র কোন ফাঁকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপরে। পা ছুঁয়ে চুমু খেল। আর একদিনের আর একটি ছবি মনে কর—নেক্রাসফের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশে সমাধি-বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলাম—"নেক্রাসফ্ ছিলেন একজন শুদ্ধ কবি সে-বাবদে পুশকিন ও লেরমন্তফের পরেই তাঁর স্থান", শুনে সেদিন উপস্থিত একদল তুর্গেন্য়েফ্-পন্থী" যুব-র‍্যাডিক্ল্ ছাত্র কী বলেছিল মনে আছে? বলেছিল, "না, না, মিথ্যে কথা, নেক্রাসফ্ পুশকিনের চেয়ে বড় কবি—পুশকিন, লেরমন্তফ্ ত বায়রন-পন্থী। আজ কোথায় তুর্গেন্য়েফ্-পন্থী র‍্যাডিক্ল্দের সেই জিগীর, আজ তারা পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। পঁচিশ বছরের সাধনা আমার, বিশ্বাস আমার, রচনা আমার সত্য হয়েছে সার্থক হয়েছে।

"ভিড় ঠেলে যারা কাছে আসতে পারে নি তারা দূর থেকে রুমাল উড়িয়েছে আর তারস্বরে বলেছে, 'তুমি আমাদের প্রফেট, তুমি আমাদের 'মানুষ' করেছ।' আমি মঞ্চ থেকে পালিয়ে যেতে পথ খুঁজছিলাম। দুই বৃদ্ধ একসঙ্গে এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াল, বললে, 'বিশ বছর আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম,' একজনকে দেখিয়ে আর একজন বললে, 'মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ছিল আমাদের, আপনার 'ব্রাতিয়া কারামাজোভি' পড়ার পর থেকে আমাদের মন বদলাতে থাকে, আজ আপনার বক্তৃতা শুনে আমাদের মনের মালিন্য একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে, আমরা আবার বন্ধু হয়েছি, আলিঙ্গন করেছি একজন আর একজনকে। আপনি আমাদের সেইন্ট, আপনি আমাদের প্রফেট। বলতে বলতে তাদের কান্না-ভেজা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

" 'প্রফেট' 'প্রফেট' জনতার গলাফাটা চিৎকারে ভেঙে পড়ছিল হল ঘর। আমি জনতার চাপ এড়াতে কোন মতে উইংসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, তখন তুর্গেন্য়েফ্ এসে হাজির। তার চোখে জল। সে আবেগ ভরে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। এবার সত্যি আমি অবাক হলাম। মনে মনে জেনে গেলাম আমি জিতে গিয়েছি। আমার জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে।...তুমি আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে নিয়ে এলাম না বলে তুমি অভিমান করেছিলে। এখন বুঝতে পারছি, সে আমার অন্যায় হয়েছিল। সত্যি তোমাকে নিয়ে আসা উচিত ছিল আমার। তুমি এলে নিজের চোখে সব দেখতে পেতে।

আমি কী সব গুছিয়ে বলতে পারলাম, না কি ঠিক ঠিক বলতে পারলাম ?…বোধ হয় কিছুই বলা হল না।"

সভায় দস্তয়েফ্‌স্কির পরবর্তীকালের জীবনীকার যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বলেছেন—'সত্যি তিনি তাঁর স্ত্রীকে সব গুছিয়ে লিখতে পারেন নি, ঠিক ঠিকও লিখতে পারেন নি, হয় ত আবেগকে তাঁর ভয় ছিল, তাই সভায় তাঁকে নিয়ে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল তিনি স্ত্রীর চিঠিতে তার যৎসামান্যই উল্লেখ করেছিলেন।'

দস্তয়েফ্‌স্কিকে কোন মতে উইংসের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় ঠেলে ঠুলে পৌঁছে দিয়ে ইভান আক্‌সাকফ্‌ শেষমেশ উঠে এলেন মঞ্চে। তিনিই ছিলেন শেষ বক্তা, ভাঙা-সভার এলোপাথাড়ি হৈ-চৈ-এর মধ্যে তিনি প্রাণপণ চিৎকার করে বললেন, 'দস্তয়েফ্‌স্কির ভাষণের পরে আর কারো কিছু বলার নেই, থাকতে পারে না, কেন না, ও-ত ভাষণ নয় আসলে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কালো মেঘের একটা গাঢ় আচ্ছাদন অনেক দিন ধরে অনেক দিক থেকে ঢেকে রেখেছিল রাশিয়ার আকাশ। ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সব, কেউ কোন পথ দেখতে পাচ্ছিল না। দস্তয়েফ্‌স্কির ভাষণে সে-মেঘ কেটে গেল। অন্ধকারের শেষ হল। আজ নূতন সূর্যের উদয় হয়েছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সামনের পথ, ভবিষ্যৎ। আজ থেকে এক নূতন যুগের সূচনা হল—সৌভ্রাতৃত্বের যুগ। আজ থেকে ভুল বোঝাবুঝির শেষ হল।'

আক্‌সাকফের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হল। কিন্তু সেখান থেকে 'প্রফেট' 'প্রফেট' বলে যে-ধ্বনি উঠল তা আর থামল না—নগর প্রান্তর অরণ্য পর্বত ব্যাপ্ত করে রাশিয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। রাশিয়া ছাড়িয়ে সে-ধ্বনির ঢেউ দুনিয়ার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গেল।

খুরধার দুর্গম দূর পথের প্রান্তে লাঞ্ছিত পথিক অবশেষে যশোলক্ষ্মীর কোলে আশ্রয় পেলেন। আজীবন সংগ্রামী নায়কের মাথায় 'পরম-পুরুষের' শিরোপা পরিয়ে দিল জাতি।

কিন্তু দুয়ার থেকে হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁকে বুকে তুলে নিলেও চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে পারল না সমকাল। সমালোচকরাই দিলে না। 'রুগ্ন', 'নির্দয়' প্রতিভা বলে তাঁকে দুয়ো দিয়ে মানুষের মন থেকে তাঁর নাম মুছে দিলে। কিন্তু

অনিকেত মানুষের বুকের ভাষা যাঁর কণ্ঠে, তাঁকে চিরদিন চেপে রাখা যায় না। ভুলে থাকা অসম্ভব। তাই দেখি বিশ শতকের প্রথম দিকে আবার করে তিনি আবিষ্কৃত হলেন। রুশ প্রফেটের দুশ্চিন্তা সংক্রমিত হল য়ুরোপের মানুষের মনে ও মগজে।

তাই বুঝি একদিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এক আন্তরিক প্রস্তাব রেখেছিলেন ক্রিস্টোফার হোলিস্, বলেছিলেন, "পার্লামেন্টে সদস্য পদের প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার আগে মনোনয়ন-যোগ্য হওয়ার জন্যে অবশ্যই 'দস্তয়েফ্স্কি বিষয়ে' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।" (Every prospective M. P. should be required to pass an examination in Dostoevsky before being elected.)

তার কারণও ছিল। ওই যে দস্তয়েফ্স্কি বলেছিলেন, ওপর তলার সুশৃঙ্খল শক্ত পলেস্তরার তলায় চাপা পড়ে রুদ্ধশ্বাস তপ্ত-অসন্তোষ গর্জাচ্ছে, প্রথম মহাযুদ্ধে তারই খানিকটা বিস্ফোরিত হয়ে এক প্রবল ধাক্কাতেই গোটা য়ুরোপকে টালমাটাল করে দিয়েছিল, পাশ্চাত্ত্যের গোটা মানুষের সমাজ ও জীবন এক সর্বাত্মক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উঠেছিল আতঙ্কে অস্থির হয়ে। সেই সঙ্কটে 'দ্য ডেভিলস'-এর লেখক হয়ে উঠলেন বিপ্লবের প্রেরণা। তারও পরে ১৯৪০-এ যখন চিন্তার জগতে শূন্যতার সৃষ্টি হল, পুরনো বিশ্বাস আর ধরে রাখতে পারল না মানুষকে, এই বিশ্ব ও প্রতিভাসের মধ্যে যুক্তি এবং উদ্দেশ্য খুঁজে না পেয়ে খেই হারিয়ে ফেলল, আশ্রয়চ্যুত হল নিরবলম্ব জাতি, সেই মর্মান্তিক সময়ে তাদের আশ্রয় হয়ে উঠল—রাসকলনিকফ্, প্রিন্স মিশকিন, জোসিমা, ইভান কারামাজোভ, দ্‌মিত্রি কারামাজোভ, আলিওশা কারামাজোভ—বিবিধ নামে 'প্রফেট' দস্তয়েফ্স্কি স্বয়ং।

অর্থাৎ 'নোটস্ ফ্রম দ্য আণ্ডার গ্রাউণ্ড'-এর মানুষটিকে চিনতে পৃথিবীর লেগেছে অর্ধেক শতাব্দী। প্রথম দস্তয়েফ্স্কিকে বিশ্ববাসী চিনল মনস্তত্ত্বের পথিকৃৎ—মানুষ-মনের দ্বন্দ্ব-সঙ্কটের সার্থক বিশ্লেষক বলে, চিনল একজন নৈতিকচিন্তার ও প্রাতিস্বিক দর্শনের মহান অগ্রগামী নায়ক বলেও। কিন্তু আরও অর্ধশতক লেগেছে তাঁকে নন্দনতত্ত্বের লেখক ও দক্ষ কথাশিল্পী হিসেবে চিনতে। তবু এখনও তাঁকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পৃথিবীতে আরও কয়েকটা বিপ্লব অতিক্রান্ত হওয়ার দরকার আছে। কেন না মানুষ বড় রহস্যময়। মানুষের এই রহস্যময়তাকে দস্তয়েফ্স্কি নিজের অস্তিত্বের গভীরে খুঁজেছেন ও কয়েক শত

চরিত্রের মধ্যে সেই রহস্যকে সর্বজনিক করে নিজেই তিনি নিজের সৃষ্টির মধ্যে রহস্যময় হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু ১৮৮০-র মে-তে সে রহস্য তখনও অসমাপ্ত। তখনও 'কারামাজোভ ভাইরা' উপন্যাসের দু'শ' পাতা লিখতে বাকি। মস্‌কোআ থেকে স্তারাইয়া রুশায় ফিরে এসে তক্ষুনি তিনি বসে গেলেন লিখতে।

লিখতে লিখতে শীত এসে পড়ল। সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই তিনি সপরিবারে এসে পিতার্সবুর্গে বাসা নিলেন। তখন 'কারামাজোভ ভাইরা' শেষ হয়ে গেছে। ফাঁকে ফাঁকে লিখে শেষ করে ফেলেছেন 'লেখকের ডায়েরি'র একটি বিশেষ সংখ্যাও। তাতে সংকলিত করেছেন 'পুশকিন ভাষণ' ও সে-বিষয়ে নানা তর্ক ও সমালোচনা; দিয়েছেন নানা জিজ্ঞাসার জবাব। ১৮৮০-র অকটোবরে 'রসকি ভিসৎনিক'-এ উপন্যাসটির শেষ পর্ব ছাপা হওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছে 'লেখকের ডায়েরি'র সেই বিশেষ সংখ্যা; আর বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে ৬০০০ কপি। আবার ছাপাতে হয়েছে তাকে। অর্থাৎ তিনি দেহে মনে তখন পরিশ্রম করছিলেন অমানুষিক। একটা দুরন্ত প্রেরণা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। পুশকিন-ভাষণের সাফল্য, 'কারামাজোভ ভাইরা'-র খ্যাতি তাঁকে বুঝি ঠেলে তুলছিল কোন দুঃসাধ্য সাধনার দুরারোহ তুঙ্গে। পরম প্রজ্ঞার সেই অন্তিম চূড়োয় পৌঁছনোর জন্যেই যেন তিনি সর্বস্ব পণ করে পরিশ্রম করছিলেন, শরীর ক্রমশ দুর্বল রুগ্ন হয়ে পড়ছিল, গ্রাহ্য করছিলেন না। এভাবে ১৮৮১-র ২৬ জানুয়ারি এল। তখন গভীর রাত। নিবিষ্ট মনে লিখছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। গড়িয়ে চলে গেল একটা বাক্‌সের নিচে। বাক্‌স সরিয়ে সেই কলম আনতে গিয়ে বুকে চোট খেলেন। গলা দিয়ে রক্ত উঠল। তিনি শয্যা নিলেন। আর উঠলেন না। বয়েস হয়েছিল তখন তাঁর উনষাট বছর তিন মাস।

খবরটা যখন তলস্তয়ের কাছে পৌঁছল তাঁর সেই শোকার্ত উক্তি ভুলবার নয়, "আমি কোন দিন মানুষটিকে দেখি নি, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কও ছিল না। তথাপি আমি যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেলাম অকস্মাৎ মনে হল আমি একজন ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মানুষ হারিয়েছি। মানুষটি যে আমার কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল এর আগে বুঝতে পারি নি। প্রায়ই ভেবেছি, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসব অথবা যেকোন প্রকারে হোক আমাদের একদিন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটবে। অথচ দেরি হচ্ছিল আর যতই দেরি হচ্ছিল ততই ভাবছিলাম

অবিলম্বে এ ত্রুটি শুধরে নিতে হবে ; কিন্তু পারলাম না হঠাৎ দুঃসংবাদ এল—মনে, হল নির্ভর করবার আমার একটা শক্ত খুঁটি কে যেন কেড়ে নিল, আমার কী যেন সর্বনাশ হল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, তখনই টের পেলাম তিনি আমার কতখানি আপনজন ছিলেন। আমি কেঁদে ফেললাম। সেই থেকে কেবল কাঁদছি।"

শুধু তলসতয় নন ; সে-দিন কেঁদেছেন সকলেই। সকলেই ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছেন শেষ বারের মতন একবার তাঁদের প্রিয় 'প্রফেট'কে দেখতে।

জানুয়ারির ৩১ তারিখ তাঁর মরদেহ আলেকজান্দ্র-নেভ্‌স্কি গির্জার মাটিতে সমাধিস্থ হল। সে এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। দোর্দণ্ড প্রতাপ কোন জারও কোন কালে এত সম্মান পান নি। জানুয়ারির নিদারুণ শীত অগ্রাহ্য করে তার মরদেহের পেছনে পেছনে পথে নেমে এসেছিল ত্রিশ হাজার মানুষের এক স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ; পনরটা ব্যাণ্ডপার্টি যোগ দিয়েছিল সে-মিছিলে। ছাত্ররা তাঁর সাইবেরিয়ার শাস্তির জীবন স্মরণ করে মিছিলে সামিল হয়েছিল ডাণ্ডা-বেড়ি পরে। বাহাত্তরটি প্রতিষ্ঠান পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছিল তাঁর সমাধিতে। দস্তয়েফ্‌স্কির মৃত্যুতে ব্যক্তি-মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল আত্মীয় বিয়োগের দুঃখ, সমগ্র জাতি অনুভব করেছিল অনপনেয় ক্ষতি।

গির্জার বুড়ো ঝাড়ুদার অবাক হয়ে বলেছিল, 'কোন মানুষ মরলে যে এত বড় মিছিল হয়, এত এত মানুষ এসে ভিড় করে গির্জায় আমি কোন দিন দেখি নি, কোন মহামান্য জারের মৃত্যুতেও না। আর এক অবাক কাণ্ড, সারা গির্জা ঝেঁটিয়েও আমরা কোথাও এক টুকরো সিগারেট কি এক পাটি জুতো পাই নি। অথচ এসব সময়ে ওসব আমাদের কুড়োতে হয় ঝুড়ি ঝুড়ি।'

অভূতপূর্ব নিঃসন্দেহে—মিছিলে কারো মাথায় টুপী ছিল না, পায়ে ছিল না জুতো, কেউ একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দেয় নি। রাশিয়ার এমনই শ্রদ্ধার জন হয়ে উঠেছিলেন দস্তয়েফ্‌স্কি, এমনই ভালবাসত তাঁকে রাশিয়ার মানুষ। আজ ত সারা দুনিয়ার তিনি আপনজন, অপমানিত ও লাঞ্ছিতের সাথী। এত ভালবাসা বুঝি পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক পান নি।

সমাপ্ত

সূত্রগ্রন্থ

Blackmur, Richard Palmer—*Eleven essays in the European novel.*

Carr, Edward Hallett—*Dostoevsky.*

Coulson, Jessie—*Dostoevsky : a self portrait.*

F. M. Dostoevsky—*The Diary of a writer.*

Fanger, Donald—*Dostoevsky and romantic realism.*

Field, Andri—*The Complection of Russian Literature.*

Freud, Sigmund—*Dostoevsky and Parricide, (complete psycological works vol XXI).*

Fueloep-Miller, René—*Fyodor Dostoevsky : insight, faith and prophechy.*

Harper, Ralph—*The seventh solitude.*

Hingley, Ronald—*The undiscovered Dostoevsky.*

Hubben, William—*Four prophets of our destiny.*

Karyakin, Y—*Re-reading Dostoevsky.*

Magarshack, Devid—*Dostoevsky.*

Mochulsky, Konstantin Vasilevich—*Dostoevksy.*

Pachmuss, Temira—*F. M Dostoevsky : dualism and synthesis.*

Rowe, William Woodin—*Dostoevsky : child and man in his work.*

Sajkovic, Miriam T.—*F. M. Dostoevsky : his image of man.*

Simmons, Ernest. J.—*Dostoevsky : the making of a novelist.*

Steinberg, A.—*Dostoevsky.*

Soloviev, Evgenii Andreevich—*Dostoevsky : his life and literary activity.*

Wasiolek, Edward—*Dostoevsky : The major fiction.*

Wellek Rene—*Dostoevsky : a collection of critical essays.*

Westbrook, Perry. D.—*The greatness of man : an essay on Dostoevsky and Whitman.*

Yarmolinsky, Avrahm—*Dostoevsky : his life and art.*

Yermilov, Vladimir—*Fyodor Dostoevsky.*

Zernov, Nicolas—*Three Russian Prophets.*

সাময়িক পত্র

সোভিয়েত দেশ (সংখ্যা ২২, নবেম্বর ১৯৭১)

Soviet Literature (monthly. No. 10. Moscow 1971).

আলোচিত রচনাবলী (কালানুক্রমিক)

সম্পাদিত পত্রিকা (কালানুক্রমিক)

বিবিধ প্রসঙ্গ (বর্ণানুক্রমিক)

আলোচিত 'চরিত্র' (বর্ণানুক্রমিক)

দস্তয়েফ্স্কি পরিবার

স্বকাল ও অন্য কালের মানুষ (বর্ণানুক্রমিক)

কয়েকটি গুরুতর মুদ্রণ-ত্রুটি

যা হয়েছে	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	যা হবে
কোরিয়ার	৪৬ ; ১২৪	১৫ ; ১৬	কুরিয়ার
হাভাতে	৭৪	২৩	হাভাতে
সত্য ওঠে নি।	১৬৪	১০	সত্য হয়ে ওঠে নি।
ভালবাসার জন্য	১৬৫	১৬	ভালবাসার জন
স্বহানুভূতি	১৭৪	৯	সহানুভূতি
অবাক করে	১৭৭	২৩	আবার করে
হাঁকের	১৮০	১৫	জোঁকের
তির্থক	২৬৬	১৪	তির্যক
ভালবেসে থেকে	৩৮২	১	ভালবেসে থাকে
ক্যাসিক্যাল	৪৬৮	১২	ক্ল্যাসিক্যাল

